প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ১৯৫৯
প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং,
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩
মুদ্রাকর : মমতা মণ্ডল, নিউ মণ্ডল প্রিণ্টার্স,
৪/১ই বিডন রো, কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রমীল,

তোমাকেই দিলাম।

নিবেদন

আমার প্রবন্ধের একটি সুনির্বাচিত সংকলন প্রকাশের প্রস্তাব প্রথমে উত্থাপন করেছিলেন আমার গুণগ্রাহী বন্ধুবর্গই। তাও বেশ কিছুকাল আগে। কিন্তু বয়সজনিত অক্ষমতা এবং স্বভাবগত আলস্যহেতু যথাসময়ে সে-কাজে মনোনিবেশ করা হয়নি। ইদানীং দে'জ পাবলিশিং-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর দে এ-বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করাতে স্বভাবতঃই উৎসাহ বোধ করেছি। কিন্তু প্রবন্ধ নির্বাচন করতে গিয়ে দেখি কাজটি বড় সহজ নয়। আপন হাতের রচনা আপন সন্তানের ন্যায়, প্রত্যেকটির প্রতি সমান মমতা। কোন্‌টি ছেড়ে কোন্‌টি রাখব? এ শুধু আমার কথা নয়; বাছাই করতে গেলে সকল লেখককেই এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়।

নির্বাচনের কাজটিকে অপেক্ষাকৃত সহজ করে নেবার জন্যে আমি আমার প্রবন্ধ সমূহকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছি—কিছু রবীন্দ্র প্রসঙ্গে, কিছু সাহিত্য প্রসঙ্গে। এ-ছাড়া অপর একটি ভাগে আছে শিল্পী সাহিত্যিকদের কথা; সর্বশেষে স্বদেশ এবং সমাজ বিষয়ক আলোচনা। বেশি বাছাবাছি করতে যাইনি, প্রতি বিভাগে অতি আলগোছে কয়েকটি করে তুলে নিয়েছি। লোকে বলে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, বিশেষ বিশেষ বিভাগে বিভক্ত করার দরুন এক্ষেত্রেও অনেক প্রবন্ধই গঙ্গা পায়নি।

বিভাগের ফলে আর কিছু না হোক্ বিষয়ের বৈচিত্র্যে পাঠকবর্গ একটু স্বাদবদলের সুযোগ পাবেন। বিষয়বস্তু বিভাগশঃ চতুর্বর্ণে ভাগ করেছি বটে, কিন্তু কোন লেখাই অন্ত্যজ নয় বা শূদ্র নয়, প্রত্যেকটিই খাঁটি সাহিত্য কুলোদ্ভব। অপরের কাছে যেমনই হোক, আমার চোখে প্রত্যেকটি লেখাই কুলীন এবং সমান মর্যাদার অধিকারী।

আমার অন্যান্য গ্রন্থের বেলায় যা হয়েছে এবারেও তাই—পুত্রকন্যারা এবং পুত্রবধূ হাত মিলিয়ে সব সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রেস কপি তৈরি করেছে। আমার বিশেষ আনন্দ যে আমার নাতনী সায়ন এবং টুম্পাও উৎসাহের সঙ্গে ঐ কাজে হাত লাগিয়েছে। আমার শান্তিনিকেতনের নিত্যসঙ্গী সুবীর ঘোষ এবারেও পূর্ববৎ সর্বপ্রকারে সহায়তা করেছেন। এছাড়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রেস কপি তৈরিতে সহায়তা করেছেন শ্রীমতী মীরা সেন এবং শ্রীতপনকুমার দাস। আমি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

রবীন্দ্র সঙ্গমে

সাহিত্য প্রসঙ্গে

শিল্পে-সাহিত্যে সমাজে

স্বদেশে সমাজে

রবীন্দ্র সঙ্গমে

মর্ত্য-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল কিন্তু এই অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যে সেই পরিচয় খুব যে বিস্তার লাভ করেছে এমন বলা যায় না। বরং দেখা গিয়েছে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রকাব্যের চাইতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ইউরোপে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কীর্তির চাইতে যেমন কর্তা মহৎ কাব্যের চাইতে তেমনি কবি; সেদিক থেকে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। ইউরোপীয় পাঠক রবীন্দ্রকাব্যে যা পায়নি হয়তো তাঁর ব্যক্তিত্বে তাই পেয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ ভ্রমণে যান তখন যুদ্ধক্লান্ত পশ্চিম মহাদেশ তাঁর মুখে শান্তির বাণী শুনে তাঁকে প্রধানত শান্তির দূত এবং মানব-প্রেমিক হিসাবেই দেখেছে। তাঁর কবি ভূমিকা তখনকার মতো খানিকটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। তার পরেও ইউরোপে তাঁর কবিখ্যাতি আর বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। এখানে এর মূল কারণটির সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনা খুব অবান্তর হবেনা। যুদ্ধটা একটা প্রচণ্ড বাত্যার মতো ইউরোপীয় জীবন এবং সমাজকে একবারে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়েছিল, ফলে সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভয়ঙ্কর রকমের একটা পরিবর্তন এসেছিল। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপে যে নতুন যুবক সম্প্রদায় দেখা দিল এরা কোনরকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে, কাজেই জীবনের প্রতি এদের অদ্ভুত এক হ্যাংলাপনা। মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি, রোসো এবার একটু জীবনটাকে ভোগ করি—এই তাদের মনোভাব। আরেক শ্রেণী—এর চাইতেও এক ডিগ্রী চড়া। তারা বলতে লাগল, আমরা তো বলতে গেলে মরা মানুষ, তোমরাই মরতে পাঠিয়েছিলে, বরাত জোরে বেঁচে এসেছি। এখন আমাদের ধর্মকথা শোনাতে এসনা, আমরা নীতিকথা শুনবনা, তোমাদের আইন-আদালত মানবনা, আমাদের যা খুশি করব। আগের দল যদি করেছে হ্যাংলাপনা, এরা শুরু করল বেলাল্লাপনা। সমাজে নানা রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। আরো এক দল—এঁরা উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, এঁরা যুদ্ধের সময় থেকেই যুদ্ধবিরোধী কবিতা লিখে আসছিলেন। যুদ্ধের অন্যায়কে তাঁরা অনন্যোপায় হয়ে সহ্য করেছেন। কিন্তু যুদ্ধশান্তির পরে রাষ্ট্রনায়কদের প্রতারণা আরোই অসহ্য মনে হয়েছে। যুদ্ধের হতাশ্বাসের চাইতে

শান্তির নিরাশ্বাস এঁদের মনে গভীরতর আঘাত দিয়েছে। কোথায় গেল সব মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকের দল যারা গালভরা কথা বলেছিল—যুদ্ধের পর পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে—কই, সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কিছুমাত্র পরিবর্তনের লক্ষণ নেই, পুরনোকেই আঁকড়ে ধরে বসে আছে। বুঝতে বাকি নেই—তলে তলে সবাই আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, আরেকটি যুদ্ধ অনিবার্য। এঁরাই এ যুগের সাহিত্যিক। এঁদের মনে দারুণ তিক্ততা, জীবন সম্বন্ধে গভীর হতাশা, এই ঘুণেধরা সভ্যতার প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা। এঁদের এই তিক্ততা হতাশা এবং অবজ্ঞার ভাব তীব্র ঘৃণাত্মক এবং ব্যঙ্গাত্মক রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। সেদিনকার কবি যুদ্ধ প্রত্যাবৃত বিক্ষুব্ধ যুবকচিত্তের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার একটু নমু না দেওয়া যাক—

walked eye-deep in hell
believing in old men's lies, then unbelieving
came home, home to a lie,
home to many deceits,
home to old lies and new infamy,
usury age-old and age-thick
and liers in public places.

ইউরোপের এই যখন মেজাজ তখন রবীন্দ্রনাথের শান্তস্বভাব মৃদুভাষী কাব্য তাদের ভাল লাগবেনা, এ একরকম জানা কথা। মিষ্টি কবিতায় মিষ্টিক কাব্যে তখন তাদের অরুচি ধরেছে। এমন যে ইয়েট্‌স্—রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে যাঁর সুরের এবং স্বাদের মিল ছিল তিনিও ক্রমে সমতল ভূমি ত্যাগ করে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উর্ধ্বগামী হলেন। ইংরেজী কাব্যের চলন বলন ঠাট ঠমক সব বদলে গেল।

অথচ এ কথা বুঝতে বিলম্ব হয় না যে এঁরা কাব্যে সাহিত্যে যে তিক্ততা প্রকাশ করেছেন তা জীবন সম্বন্ধে বীতস্পৃহা-সঞ্জাত নয় বরং উল্টো—জীবনে এঁদের স্পৃহা আছে, জীবনকে এঁরা ভালবাসেন। কিছু বা অদৃষ্টের চক্রান্তে, বেশির ভাগ মানুষের চক্রান্তে এঁরা সেই জীবনের প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন—এই তাঁদের ক্রোধের কারণ। এঁদের আক্রোশ বর্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং সমাজ-ব্যবস্থার ওপর।

ইউরোপ জীবন-বিলাসী। ইউরোপীয় পাঠক রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে জীবনের বার্তা খুব বেশি খুঁজে পায়নি। বলা বাহুল্য রবীন্দ্র-কাব্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়

পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত 'গীতাঞ্জলি'র কবি হিসেবেই পরিচিত। নোবেল প্রাইজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'গীতাঞ্জলি' কাব্য অতিমাত্রায় প্রাধান্য লাভ করেছে। এর ফল ভাল হয়নি। নোবেল প্রাইজের দৌলতে অর্থলাভ যেটুকু হয়েছে তার চাইতে অনর্থ হয়েছে বেশি। বেশির ভাগ লোক গীতাঞ্জলিকেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলে জেনে রেখেছে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আর যে সব কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন তারও বেশির ভাগ গীতাঞ্জলি জাতীয়। ইংরাজীতে যাকে বলে hymn—সেই জাতীয় কবিতা অনুবাদে তাঁর কলম খেলত ভাল, এইজন্যে ঐ দিকেই তিনি ঝুঁকেছিলেন। ফলে ইংরেজ পাঠকের কাছে তিনি কেবলমাত্র অধ্যাত্মবাদী মরমীয়া কবি হিসাবেই পরিচিত হয়েছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পাঠক যাঁরা অনুবাদের মারফত তাঁকে জেনেছেন তাঁরাও রবীন্দ্রনাথকে প্রধানত অধ্যাত্মবাদী কবি বলেই জেনেছেন। আমরা ভারতবাসীরা অমনিতেই আধ্যাত্মিক জাতি বলে গর্ব করে থাকি। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে অধ্যাত্মবাদী কবি বলে ভাবতেই আমাদের ভাল লাগে। বাংলাদেশেও এরূপ পাঠকের সংখ্যা বড় কম নয়। ফলে রবীন্দ্রসাহিত্যের একটা মস্ত বড় দিক কতকটা অনাদৃতই রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে একজন প্রকৃত জীবনরসিক, জীবনরসজ্ঞ কবি হিসাবেই যে তাঁর প্রকৃষ্টতম পরিচয় এ কথা ইউরোপীয় পাঠক জানবার অবকাশ পায়নি, কারণ অনুবাদের অভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের বারো আনা অংশ তাদের অনধিগম্য। আমাদের কাছেও এ জিনিসটি খুব স্পষ্ট নয়, কারণ আমরা ভারতবাসীরা ঠিক জীবনরসজ্ঞ নই, ও রস আমাদের ধাতে সয়না। বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথই এই যুগে সর্ব প্রথম আমাদের জীবন ধর্মে দীক্ষা দিলেন সেই কথাটি বলবার জন্যেই এই প্রবন্ধ।

যুদ্ধক্লান্ত ইউরোপ একদিন রবীন্দ্রনাথকে মানবপ্রেমিক বলে আবিষ্কার করেছিল—সেটা রাজনীতির ক্ষেত্রে। ওদেশের লোক জানত না যে সাহিত্য ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে মানব-প্রেমিক। কাব্যে সাহিত্যে চিরকাল তিনি মানুষেরই জয়গান করেছেন। শুধু মানবপ্রেমিক বললে সবটুকু বলা হয় না, তিনি জীবন প্রেমিক এবং মর্ত্য-প্রেমিক। কেবল অধ্যাত্মলোকে বাস করেন নি, মর্ত্যলোকেই বেশির ভাগ বিচরণ করেছেন। দেবতার চাইতে মানুষকে বেশি মূল্য দিয়েছেন, স্বর্গের চাইতে মর্ত্যকে, পরকালের চাইতে ইহকালকে।

এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, এটি বিশেষ করে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি। ইউরোপীয় কবির মুখেই আমরা শুনেছি—Oh! the joys of mere living! ওদেশের কবিই

বলেছেন, I will drink life to the lees. আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের মুখেই অনুরূপ কথা আমরা প্রথম শুনলাম। 'জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা' মিটাবার কথা, 'শত লক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা' নিঃশেষে পান করবার কথা তিনিই আমাদের শোনালেন। পৃথিবী সুন্দর, জীবন সুন্দর—এই সুন্দর পৃথিবীতে শুধু বেঁচে থাকার যে আনন্দ সে আনন্দের কথা এমন করে আর কেউ আমাদের শোনাননি। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রকাব্যের এই দিকটি ইউরোপের কাছে অজ্ঞাত। তারও চাইতে বড় দুর্ভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসীরাও এ সম্বন্ধে উদাসীন। দেবদ্বিজে আমাদের স্বভাবজাত ভক্তি, আমরা রবীন্দ্র-কাব্যে মানুষ ছেড়ে দেবতা খুঁজেছি, মর্ত্যকে ভুলে স্বর্গকে। অথচ এটাই চিরকালের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা এই পৃথিবীকে ভালবাসতেন, পৃথিবীর সৌন্দর্য তাঁদের মনোহরণ করেছিল। বেদগানে তাঁরা পৃথিবীর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন; বলেছেন, পশ্য দেবস্য কাব্যম্—দেখ দেবতার কাব্য কী অপূর্ব এই সৃষ্টি। মুগ্ধ চিত্তে তাঁরা সূর্যস্তব করেছেন, সমুদ্রবন্দনা গেয়েছেন। এই পার্থিব জীবনকে মনে প্রাণে ভালবেসেছেন। বলেছেন, যিনি জীবনের সত্যরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর সম্পূর্ণম্ জগদেব নন্দনবনং—সমস্ত জগৎ তাঁর কাছে নন্দনকানন রূপে প্রতিভাত হবে; সর্বেঽপি কল্পদ্রুমঃ—সমস্ত মানুষকে কল্পতরুর ন্যায় উদারমনা মনে হবে; সর্বৈব স্থিতিরেব রম্যবিষয়া—পৃথিবীর সমস্ত কিছু রমণীয় বলে মনে হবে।

জীবনকে ভালবাসা, জীবনের সত্যরূপকে প্রত্যক্ষ করা সর্বোত্তম পুণ্যকর্ম—এই অত্যাশ্চর্য কথা একদিন ভারতীয় ঋষির মুখেই উচ্চারিত হয়েছিল। অথচ ভাবতে অবাক লাগে একদিন এই ভারতবর্ষই আবার জীবনের দিকে একেবারে পিছন ফিরে মুখ ঘুরিয়ে বসল, জীবনকে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করল। ইহলোকে সুখের আশা ছেড়ে দিয়ে পরলোকের ভরসায় বসে রইল। সভ্যতার রূপান্তর এইভাবেই ঘটে। সেই দূর অতীতে আমাদের সভ্যতার যখন শৈশব এবং কৈশোর অবস্থা তখন তার দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, মন ছিল সবল। পৃথিবীর সব কিছু তার কাছে সুন্দর ঠেকেছে, জীবন পরম উপভোগ্য মনে হয়েছে। সেই সভ্যতার ক্রমে বয়স বেড়েছে; বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে মন যেমন পেকেছে, মুখে তেমনি পাকা পাকা কথা বেরিয়েছে—সব মিথ্যা। সব মায়া। সংসারকে কক্ষণো বিশ্বাস কোরো না। কে বা তোমার স্ত্রী, কে বা পুত্র, কেউ আপন নয়, কাউকে বিশ্বাস নেই। এই এক অদ্ভুত জীবনদর্শন। জীব যদি জীবনকে মূল্য না দেয়, মানুষ যদি মানুষকে বিশ্বাস না করে তবে জীবনধারণের অর্থ কি?

ভাগ্যিস—সংসার মিথ্যা, সংসার মায়া—আমরা মুখে যতখানি আওড়াই, মনে মনে ততখানি বিশ্বাস করি না। স্ত্রী পুত্র কন্যা কেউ তোমার আপন নয়—এ সব কথা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করলে জীবনে কি আর কোন স্বাদ গন্ধ থাকত ? কিন্তু ক্ষতি যা হবার হয়েছে। এক যুগ গিয়েছে যখন বেশির ভাগ লোক এ সব বিশ্বাস করেছে। সারাক্ষণ এই জাতীয় কথা যদি কানের কাছে লোকে জপতে থাকে তবে জীবনের প্রতি আস্থা একটু নড়বড়ে হয়ে আসবেই। দেশের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত। এ ধরণের গুরুগম্ভীর উক্তি তারা বিনা প্রশ্নে মেনে নেয় এবং একে ধর্মচিন্তার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে এই মনোভাব আমাদের দেশবাসীর মধ্যে ক্রিয়া করে এসেছে এবং তার ফলে জীবনের প্রতি আমাদের আগ্রহ বেশ খানিকটা কমে এসেছিল। মোহমুদ্গরের মুদ্গরটি বড় হাল্কা ওজনের নয়, একটি গোটা জাতির কোমর ভাঙবার পক্ষে এটিই যথেষ্ট ছিল।

যিনি একদিন এ জাতীয় দর্শন প্রচার করেছিলেন তিনি ক্যালনা লোক ছিলেন কিম্বা নেহাৎ বাজে কথা বলেছিলেন এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। নিশ্চয় তাঁর যুগে এ দেশের লোক এমন অত্যধিক মাত্রায় সংসারে আসক্ত হয়ে পড়েছিল, সাংসারিক ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে এত বেশি ব্যাপৃত থাকত যে, এর বাইরে কোন জিনিসকে মূল্য দিতে তারা ভুলে গিয়েছিল, সে জন্যে একটু সাবধান বাণীর হয়তো-বা প্রয়োজন হয়ে থাকতে পারে। সব দেশে, সব সমাজেই কোন না কোন সময় এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজ কবির যেমন ক্ষোভ—The world is too much with us getting and spending—এও তাই। তার বেশি গুরুত্ব আরোপ করবার কোন প্রয়োজন ছিলনা। সংসারের প্রতি মোহকে একটা ভয়াবহ ব্যাপার মনে না করলেও চলত।

যে কথা বলছিলাম, এর ফল শুভ হয়নি। জাতিগত ভাবে আমরা নির্জীব এবং নিস্পৃহ হয়ে পড়েছিলাম। জীবনটাকে একটা প্রচণ্ড বোঝা বলে আমার মনে হয়েছে। ভাবে ভঙ্গিতে, চিন্তায়, কথায় কর্মে তাই প্রকাশ পেয়েছে। জাতির চিন্তার মধ্যে যা বাসা বাঁধে ভাবার মধ্যে তাই শিকড় গেড়ে বসে। প্রবাদবাক্যের জন্ম এই ভাবেই হয়। আমাদের কাছে জীবন যে কত বোঝা তার প্রমাণ আমাদের সুপরিচিত প্রবাদবাক্যে—প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত। দেশের অর্ধেক লোক বলে, মরলেই বাঁচি। এ তো সুস্থ জাতির লক্ষণ নয়। যে পৃথিবী আমাদের গৃহ তার প্রতি আমাদের মমতা নেই, টান নেই। দুদিনের ঘর, তার জন্যে আবার মায়া বাড়ানো-কেন ? এই মনোভাবকেই আমরা বিজ্ঞতার

চরম লক্ষণ বলে মেনে নিয়েছিলাম। পার্থিব সুখের প্রতি বীতস্পৃহা ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। কয়েক শতাব্দীর প্রশ্রয়ে এই নিরাসক্তি আমাদের স্বভাবগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সভ্যতা বরাবর এক রাস্তায় চলেনা, মাঝে মাঝে ওর মোড় ঘুরে যায়। সভ্যতার চাকাটা যখন কর্দমাক্ত পথে আটকা পড়ে অচল হয়, তখন তাকে নতুন পথে চালু করবার জন্মে কোন বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয়। যুগের প্রয়োজনেই সেই ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় মনকে নির্জীব নির্লিপ্ত নিরাসক্তি থেকে মুক্ত করার জন্মে নতুন জীবন-দর্শনের প্রয়োজন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই নতুন জীবন-দর্শনের জন্মদাতা। শঙ্করাচার্য বলেছিলেন, এই সংসার বড় বিচিত্র স্থান, একে বিশ্বাস কোরো না। রবীন্দ্রনাথের মুখেও সেই বিচিত্র বার্তা আমরা শুনলাম, কিন্তু একেবারে অন্য সুরে, অন্য অর্থে—একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ কি বিচিত্র সুন্দর এই পৃথিবী। অন্তহীন এর সৌন্দর্য, অন্তহীন এর আনন্দ। পৃথিবী এক আনন্দ নিকেতন। 'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ'—অঙ্গ নয়তো যে আনন্দে গড়া আমার জীবন। এ ধরণের কথা কত যুগ আমরা শুনিনি। যে দেশের লোক বলে, মরলেই বাঁচি, সে দেশের কবি বললেন, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'। পৃথিবীর মনোহর রূপ তাঁর নয়ন মন মুগ্ধ করেছে। কোথায় লাগে এর কাছে স্বর্গ। স্বর্গ মর্ত্যের তুলনা করে মর্ত্যকেই উচ্চতর স্থান দিয়েছেন। বলেছেন, 'মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে, সে যে মাতৃভূমি' (স্বর্গ হইতে বিদায়)—বলা বাহুল্য মাতৃভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী। এরও আগে 'ছিন্নপত্রে'র একটি চিঠিতে বলছেন—'ঐ যে মস্ত বড় পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি! ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল-নিস্তব্ধতা প্রভাত-সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দু' হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি—এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম!' "বসুন্ধরা" কবিতায় সুন্দরী বসুন্ধরার প্রতি প্রেম প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে—'ইচ্ছা করিয়াছে, সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে সমুদ্র মেখলা-পরা তব কটি দেশ।'

আমাদের বিমুখ মনকে তিনি আবার পৃথিবীর দিকে ফেরালেন। অসংখ্য গানে কবিতায় পৃথিবীর অফুরন্ত সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের চোখকে এবং মনকে আহ্বান করলেন। রবীন্দ্রকাব্য বলতে গেলে সৌন্দর্যের এক বিরাট ভোজ এবং এর বেশির ভাগই পার্থিব সৌন্দর্য। এর মধ্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত

ছড়ানো, গন্ধ মাখানো, সমগ্র জিনিসটি রসে আর্দ্র। অর্থাৎ এর স্বাদ প্রধানত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। রবীন্দ্রকাব্যের যে অংশ অপার্থিব মহিমা বা অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের আভাস অর্থাৎ মিস্টিসিজম্-এর কুয়াশা সেটাকেই বড় করে দেখা হয়েছে, আর যে অংশে (এবং এইটিই তার কাব্যের বৃহত্তম অংশ) তিনি মুক্ত কণ্ঠে পৃথিবীর এবং জীবনের জয়গান করেছেন তাকে আমরা বেশি আমল দিতে চাইনি। একটু আধ্যাত্মিক গন্ধ বা ধোঁয়াটে ভাব না থাকলে আমরা তাকে যথেষ্ট উঁচু স্তরের কাব্য বলে মনে করিনা। আমাদের অলংকার শাস্ত্রে কাব্যের স্বাদকে ব্রহ্ম-স্বাদ-সহোদর বলা হয়েছে। এই উক্তির তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় বলেই এই জাতীয় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। নির্মল আনন্দের স্বাদকেই বলা হয় ব্রহ্ম স্বাদ। সে আনন্দ কেবল তত্ত্বজ্ঞান থেকে লাভ করতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। সামান্যতম জিনিস—কোন নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ, হঠাৎ শোনা কোন গানের সুর, প্রভাত আলোর ঝিকিমিকি—এমনি তুচ্ছতম জিনিস কবিকে প্রভূততম আনন্দ দিতে পারে। অন্তত রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছে এবং কবির যা মহত্তম গুণ—আপন মনের আনন্দ তিনি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব, তিনি সাধারণকে অসাধারণ করেছেন, সামান্যতম জিনিসের মধ্যেও যে সৌন্দর্য লুক্কায়িত আছে তাকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। শুধু তাই নয়, সেই সৌন্দর্যকে তিনি অপরের দৃষ্টিগোচর এবং অনুভূতিগোচর করেছেন। 'এই তো ভাল লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়'—খুব সামান্য কথা কিন্তু কিছু বা ভাষার যাদুতে কিছু বা সুরের মাধুর্যে মুহূর্তে মনকে প্রসন্ন করে। চোখের সুমুখে এমন একটি আনন্দোজ্জ্বল ছবি এনে দেয় যে, আমাদের অতি পরিচিত অভ্যাস-মলিন পৃথিবীর মূর্তি সম্পূর্ণ রূপে বদলে যায়।

যে দেশে কেমন আছ জিজ্ঞেস করলে সুস্থ সবল-দেহ যুবকের মুখেও শুনতে হয়—এই একরকম কেটে যাচ্ছে—যেন কিছুই ভাল লাগছে না, কোন কিছুতেই স্বাদ পাচ্ছে না—সেইদেশের কবি প্রাণ খুলে বলেছেন, ভাল লাগছে, চোখ মেলে যা দেখেছি তাই ভাল লাগছে। 'লাগল ভাল, মন ভোলাল, এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই, লাগল ভাল'। জীবনভর ঐ একটি কথাই বললেন—ভাল লাগল। এর মূল্য অপরিসীম। আমাদের রুগ্ন চিত্তে বিস্বাদ মুখে তিনি জীবনের স্বাদ ফিরিয়ে আনলেন।

কোন আনন্দের অভিজ্ঞতাকে মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখাকে আমরা দুর্বলতা বলে মনে করি। সুখ দুঃখের কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়াকেই

জ্ঞানীজনের লক্ষণ বলে জেনেছি। আর রবীন্দ্রনাথকে দেখলুম জীবনের অতি ক্ষুদ্র (আসলে ক্ষুদ্র নয়) আনন্দটিকেও কৃপণের ধনের মত বুকে করে আগলে রেখেছেন। বালক বয়সে একবার কোথায় নৌকোয় যেতে গভীর রাত্রে জেগে উঠে এক ছোকরা মাঝির গান শুনেছিলেন। চাঁদের আলোয় নদীর জল উদ্ভাসিত, বালক মাঝির কণ্ঠে গভীর রাত্রের গান অপূর্ব লেগেছিল। সেটি অক্ষয় হয়ে রয়েছে তাঁর জীবনে। তিরিশ বছর বয়সে ছিন্নপত্রের এক চিঠিতে এই কাহিনীটি বলছেন মনের সমস্ত অনুরাগ মেখে—'একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে—গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনিনি। হঠাৎ মনে হল, আবার যদি জীবনটা ঠিক সেই দিন থেকে ফিরে পাই!' কত কাল আগে শোনা কিশোর কণ্ঠের গানটি সারাজীবনে ভুলতে পারেননি। মৃত্যুর ঠিক ছ'মাস আগে এই কাহিনীটি আবার স্মরণ করেছেন একটি কবিতায় (আরোগ্য—৪নং কবিতা)—

মনে এল, কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে,
দু'পহর রাত্রি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।

সহসা উঠিনু জেগে।
শব্দশূন্য নিশীথ-আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের
ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে তন্বী নৌকা তরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ;
দুই পারে স্তব্ধ বনে জাগিয়া রহিল শিহরণ।

জীবনের প্রান্তসীমা যত নিকটবর্তী হয়েছে ততই সতৃষ্ণ নয়নে পিছন ফিরে তাকিয়েছেন। সারা জীবনের সঞ্চিত ধন, প্রতিটি আনন্দ-ঘন মুহূর্ত উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দিয়েছে। শেষ পর্বের বহু কবিতায় তাঁর শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন, বলা যেতে পারে দ্বিজত্ব লাভ করেছে। ফিরে ফিরে কৈশোরের কথা, যৌবনের কথা বারম্বার বলেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই শেষ পর্বের কবিতার মধ্যে আমাদের পণ্ডিতম্মন্যরা গলদঘর্ম হয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ আর কাকে বলে। কোন কোন কবিতায় মৃত্যুর কথা অবশ্যই বলেছেন, তাঁর দেবতাকেও স্মরণ করেছেন। কিন্তু সমস্তকে ছাপিয়ে উঠেছে পৃথিবীর প্রতি তাঁর অসীম মমতা, জীবনের প্রতি গভীর

কৃতজ্ঞতা—'যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই'। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে বলছেন—

প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায় ;
আমি বেঁচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও ;

ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে,
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে ;
তারি পুণ্য-অভিষেকে করি আজ স্নান।
(রোগশয্যায়—২৭নং কবিতা)

এই সময়কার আর একটি কবিতায় বলেছেন—

আমি জানি, যাব যবে
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি
সাক্ষ্য দেবে পুষ্প বন ঋতুতে ঋতুতে
এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।

রবীন্দ্রকাব্যের তথা রবীন্দ্রসাহিত্যের সব চাইতে বড় কথা—'ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে।' গদ্যে পদ্যে গানে স্বরে ছন্দে এই কথা যেমন অশ্রান্তভাবে সারাজীবন বলেছেন এমন আর কোন কথা নয়। সেই ছোকরা মাঝির গান স্মরণ করে বলেছেন, ইচ্ছা করে কবির গান গলায় নিয়ে 'একটি ছিপছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কি আছে। জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মত একবার হু হু করে বেড়িয়ে আসি।...উপবাস করে আকাশের দিকে তাকিয়ে অনিদ্র থেকে সর্বদা বিতর্ক করে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্য হৃদয়কে কথায় কথায় বঞ্চিত করে, স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাইনে। পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ, তা না মনে করে একে বিশ্বাস করে, ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে, মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মত মরে গেলেই যথেষ্ট—দেবতার মত হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।' (ছিন্নপত্র—৩৬ নং চিঠি)

অতি পরিচিত একটি গানে—তাঁরায় তারায় দীপ্ত শিখায় অগ্নি জলে—এই

কথাটি বলতে চেয়েছেন যে বহুযুগ আগে ঐ নক্ষত্র-লোকে তাঁর জন্ম হয়েছিল। অনেক জন্ম কাটিয়েছেন জ্যোতিষ্কলোকে। কিন্তু বলেছেন—লাগলনা মন, ওখানে তাঁর ভাল লাগেনি। তারপর বহু জন্মজন্মান্তরের পরে তিনি এসেছেন শ্যামল মাটির ধরাতলে। এখানে—লাগল রে মন লাগল রে। এই পৃথিবীতে এসে ভাল লেগে গেল। এখানে কাটাতে পারেন অনন্তকাল। বলেই গিয়েছেন—'আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে।'

মায়াময় জগৎ আর মোহময় জীবন থেকে যাঁরা আমাদের মুক্তি দেন তাঁরা মহাপুরুষ আখ্যা লাভ করেন। আমরা ভুলে যাই যে এমন মহাপুরুষও আছেন যিনি নতুন করে আমাদের মনে মোহের সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় মহাপুরুষ। তিনি ছিলেন বলে পৃথিবীকে এত সুন্দর, জীবনকে এত মনোহর দেখলাম। তাঁর কাব্যের ছোঁয়াচ না লাগলে আমার চোখে আকাশ এমন নীল হত না, পৃথিবী এমন শ্যামলকান্তি হতনা। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমি এজন্য কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমার মন থেকে কোন মোহ কেড়ে নেননি বরং নতুন মোহের সৃষ্টি করে আমার আনন্দের সম্ভার বাড়িয়ে দিয়েছেন। 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি'—একথা যখন বলেছেন তখন আমাদের অনেককালের ভুলে-যাওয়া ঋষিবাক্যকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। আবার নতুন করে আমাদের শেখালেন—সম্পূর্ণম্ জগদেব নন্দন বনং। মৃত্যুর অনতিপূর্বে বিখ্যাত কবিতায় বলেছেন—

শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব ধরণীর
বলে যাব তোমার ধূলির তিলক পরেছি ভালে।

পৃথিবীর ধূলিকণাকেও যিনি ভালবেসেছেন তিনি মানুষকে কতখানি ভালবেসেছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া ভাল। পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসাতে আমাদের পারলৌকিক লাভ কতখানি হয়েছে বলতে পারিনে। কিন্তু লৌকিক লোকসান হয়েছে প্রচণ্ড। আমাদের পুরাণের গল্পে পৃথিবীকে কামধেনু আখ্যা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কিনা ওর কাছে যা চাইবে তাই পাবে। আশ্চর্যের বিষয় এই কামধেনুর কাছে আমরা কোনকালে কিছু কামনা করিনি। পৃথিবীর কাছে কিছু চাইনি, সেও আমাদের কিছু দেয়নি। ইউরোপ কিন্তু পৃথিবীকে কামধেনু হিসাবেই ব্যবহার করেছে, ওকে দোহন করে ধনরত্ন বের করেছে। আমরা যখন আমাদের ভারতমাতার গুণকীর্তন করে কবিতা লিখেছি, গান রচনা করেছি তখন ইংরেজ এসে তল্লাস করেছে ভূমিগর্ভে কোথায় আছে তেল,

কোথায় কয়লা, কোথায় মাইকা, ম্যাঙ্গানিজ, সোনা। আমাদের খনিজ সম্পদ বনজ সম্পদ ওরাই আহরণ করেছে, আমাদের কামধেনুকে ওরাই দোহন করেছে। তার ফল ভোগ আমরা করেছি, এখনও করছি। জীবন-লক্ষ্মীর আরাধনা যে করেনা ভাগ্যলক্ষ্মী তার দিকে ফিরে তাকায় না।

পৃথিবীতে এসে পৃথিবীকে ভালবাসতে পারলাম—এর চাইতে বড় কৃতার্থতা আর কিছু নেই। এমন কি সংসারে এসে কি পেলাম আর না পেলাম সে হিসাব করতেও বসব না। রবীন্দ্রনাথ যে একথা বলেছেন তার কারণ তিনি জানতেন হিসাবের কোন প্রয়োজনই হবেনা। আমি যদি পৃথিবীকে ভালবাসি তবে পৃথিবী আপনি আমাকে উজাড় করে দেবে। আমাদের এই বোধ ছিলনা বলেই রবীন্দ্রনাথকে এমন অশ্রান্তভাবে পৃথিবীর গুণকীর্তন করতে হয়েছে, নইলে আমাদের চেতনা ফিরে আসত না।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহুলোকের একটি ধারণা আছে যে, তিনি অতিশয় সুখী মানুষ ছিলেন। সংসারে যা কিছু মানুষের আকাঙ্ক্ষিত—রূপ গুণ, ধন মান, যশ প্রতিপত্তি—সমস্তই তিনি অপর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছিলেন। কাজেই সংসারের এবং পৃথিবীর গুণগান করা তাঁর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা সত্য মনে হলেও বাস্তবিক পক্ষে এটি সত্য নয়। দুঃখের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে যতখানি হয়েছে খুব কম লোকের জীবনেই তা হয়। দীর্ঘ জীবনে তিনি যত শোকের আঘাত পেয়েছেন, বিচ্ছেদের দুঃখ যতখানি তাঁকে সইতে হয়েছে একজন মানুষের জীবনে সচরাচর তা ঘটেনা। মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ ছাড়া মতবিরোধের ফলেও বহু আপনজন, বহু স্নেহভাজন পর হয়ে গিয়েছেন। যে মানুষের জীবনে কতগুলি দৃঢ়বদ্ধ মূলনীতি থাকে, বন্ধুবিচ্ছেদের দুঃখভোগ তাঁর জীবনে অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের মত এমন নির্জন মানুষ সংসারে বড় দেখা যায় না। তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাঁর জীবনে সুখের চাইতে দুঃখের অংশ ঢের বড়। কিন্তু এমনি মনের এলকেমি বা রাসায়নিক শক্তি যে কঠিনতম দুঃখকেও তিনি গভীরতম আনন্দে পরিণত করেছেন। 'এই করেছ ভাল নিঠুর এই করেছ ভাল'—মিথ্যা উক্তি নয়। দুঃখের দহনে তাঁর জীবন সমৃদ্ধতর হয়েছে, সোনার মত উজ্জ্বলতর দীপ্তি লাভ করেছে। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি—

ক্ষণে ক্ষণে যত মর্মভেদিনী
বেদনা পেয়েছে মন
নিয়ে সে দুঃখ ধীর আনন্দে

বিষাদ করুণ শিল্প ছন্দে
অগোচর কবি করেছে রচনা
মাধুরী চিরন্তন ॥

বহুকাল থেকে আরো একটি অভিযোগ শুনে এসেছি যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি একপেশে। কেবল জীবনের ভালটাই দেখেছেন, মন্দটার প্রতি চোখ মেলে তাকাননি। জীবনের জটিলতাকে অস্বীকার করে তার লঘুকরণের চেষ্টা করেছেন। সত্যান্বেষী পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন যে, জীবনের অপূর্ণতা সম্বন্ধে এমন কি জীবনের বিকার সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ ছিলেন এমন মনে করবার কোন হেতু নেই। মৃত্যুর অনতিপূর্বে মানবসভ্যতার সঙ্কটের কথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে গিয়েছেন; অবশ্য তাই বলে মানুষের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারান নি। এ যুগের কবিরা বর্তমান সভ্যতার উপরে খড়্গহস্ত; বর্তমান সাহিত্যের বার আনা অংশ বিদ্রূপাত্মক। এই সব ক্ষুব্ধচিত্ত ক্রুদ্ধমতি সাহিত্যিকদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ মানুষটা অনেক বেশি স্থিতধী, সহজে তিনি বিচলিত হননি। বলেছেন—

অপূর্ণ শক্তির এক বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।

জীবনকে খণ্ডিত করে টুকরো করে দেখি বলেই আমাদের অত ভয় ভাবনা। আমরা ভাবি মানব সভ্যতার বুঝি অন্তিমকাল উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন অখণ্ড দৃষ্টিতে, এজন্য পৃথিবীর মহিমা, মানুষের মহিমা তাঁর চোখে কোনকালে ক্ষুণ্ন হয়নি। বলেছেন, গুহাগহ্বরের ভাঙাচোরা রেখাগুলি যেমন হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনা তেমনি নিত্যদিনের বাধাবিঘ্ন দুঃখশোক জীবন লক্ষ্মীর মহিমাকে কলঙ্কিত করতে পারবেনা। জীবনের অখণ্ড মহিমা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তারই জয়গান তাঁর কাব্যে সাহিত্যে—

যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি
জীবনের শেষ বাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।

বিজয়ার করকমলে

কবি সাহিত্যিকের শক্তি জিনিসটা সব সময়ে স্বয়ম্ভু বা স্বতঃসাধ্য নয়। বিনা প্রয়াসে, বিনা প্রেরণায় স্বতঃউৎসারিত হয়ে প্রকাশ পায় না। অন্তরে যে শক্তি নিহিত আছে বাইরে থেকে কোন তাগিদ বা উদ্দীপনা না এলে সে শক্তি বৈদ্যুতিক কারেণ্টের মতো শর্ট সার্কিট হয়ে মাঠে মারা যায়। কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি গল্পগুচ্ছের কথাই ভাবুন। জমিদারির কাজে যদি গ্রামে না যেতেন তো বাংলার পল্লীজীবনের সঙ্গে পরিচয় হত না, গল্পগুচ্ছের গল্প লেখাও হত না। অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়েও জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসে সে গল্প লেখা সম্ভব ছিল না। আর ছিন্নপত্র? ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় যে বিচিত্র শোভাযাত্রা আমাদের চোখের সুমুখে উদ্‌ঘাটিত সে আমরা কোথায় গেলে পেতাম? ছিন্নপত্রের মননে চিন্তনে কথনে বর্ণনে যে নিপুণ কারুকলা যে চিকন লাবণ্য বঙ্গসরস্বতীর অঙ্গভূষণ তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত থাকতে হত। গল্পগুচ্ছ এবং ছিন্নপত্রের জন্য যদি শিলাইদহ পতিসর সাজাদপুরের কাছে ঋণ স্বীকার না করি তাহলে ওই দুই গ্রন্থের রসগ্রহণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্বন্ধেও এই কথা। শান্তিনিকেতনে এসে বিদ্যালয় স্থাপন না করলে রবীন্দ্রসংগীত এমন অজস্রধারায় প্রবাহিত হত না। ছেলেমেয়েদের বিনোদনের জন্য নানা উৎসবের প্রবর্তন করেছেন, গান বেঁধে দিয়েছেন, নাটক রচনা করেছেন। একদিকে যেমন বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, অপরদিকে তেমনি সাহিত্যভাণ্ডারের সম্পদ বেড়েছে।

কবি-জীবনের প্রারম্ভে কিশোর বালকের প্রতিভাকে যিনি সর্বাগ্রে উদ্দীপিত করেছিলেন সেই নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর কাছেও আমাদের ঋণ অপরিসীম। কাব্যরচনার প্রথম প্রহরে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কাদম্বরী দেবীর সভাকবি। কতকাল আগে কাদম্বরী দেবী পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। যে প্রতিভার শৈশবকে তিনি অতি আদরে লালন করেছিলেন তার বিশ্বজয়ী বিকাশ এবং বিভাস তিনি দেখে যাননি। সেদিন এতখানি কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। তথাপি তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই।

এর বহু বৎসর পরে কবি যখন বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন, বয়স ঘাটের কোঠায় তখন আবার স্বল্পকালের জন্য অপর এক রমণীর অতিথিভবনে সভাকবি হয়ে বসেছিলেন। কাদম্বরী দেবীর মত ইনিও ছিলেন মুগ্ধ শ্রোতা। এঁকেও কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছেন, কিছু কবিতা এঁকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। আজকের দিনে কবির সভায় টীকাকার ব্যাখ্যাকার সমালোচকের ভিড়। বাস্তবিক পক্ষে কাব্য পাঠের আসরে এঁদের প্রয়োজন খুব জরুরী নয়। কবির সভায় সর্বোচ্চ স্থান শ্রোতার। আদিকাল থেকে কবিরা গান করে শুনিয়েছেন, শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনেছে। এটাই নিয়ম; বিচার বিবেচনা, আলোচনা সমালোচনা ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথ তেমন শ্রোতার কদর বুঝতেন। গোড়ার দিকের একাধিক কাব্যগ্রন্থ তিনি কাদম্বরী দেবীকে উৎসর্গ করেছেন। পূর্বোক্ত রমণীর গৃহে বসে যে কবিতা লিখেছিলেন এবং তাঁকে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন সে সব কবিতা যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল তখন সে গ্রন্থটি তিনি তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলেন। এটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'পূরবী'।

১৯২৫ সালে যখন 'পূরবী' কাব্য প্রকাশিত হল তখন উৎসর্গপত্রে—বিজয়ার করকমলে—কথা দুটি লক্ষ্য করেছি কিন্তু তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইনি। গ্রন্থের উৎসর্গ ব্যাপারটা একটা মামুলি রীতি বলেই মনে করতাম। কাজেই ইনি কে, কে এই বিজয়িনী রমণী এসব জানবার জন্যে তেমন কোন কৌতূহল বোধ করিনি। তখন বয়স অল্প, নিজেকে কাব্যের মস্তবড় সমজদার বলে মনে করতাম। মনে মনে বলেছি—কাব্য কার? যার হাতে তুলে দিয়েছেন তার না যে-রস পেয়েছে তার? এইজন্যে 'মহুয়া'র উৎসর্গপত্রটি ঠিক আমার মনোমত। বলেছেন—

জানিনা তোমার নাম
তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি।

এই তো খাঁটি কথা। যার কাছে ভাল লেগেছে, যে আমার গানের মর্ম বুঝেছে তাকেই দিলাম আমার এই গানের ডালি।

কিন্তু এর আরেকটা দিকও আছে; সেদিন তা ভেবে দেখিনি। কাব্য-সৃষ্টির দুই পর্ব—পূর্বরাগ আর অনুরাগ। কাব্য রচনার পূর্বে যে রোমাঞ্চ সৃষ্টির প্রেরণা যোগায় তাকে বলব পূর্বরাগ আর কাব্যের মাধ্যমে সে রোমাঞ্চ যখন পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয় তখন শুরু হয় অনুরাগের পর্ব। পূর্বরাগের পালা কবির, অনুরাগের পালা পাঠকের। যাঁরা কাব্যানুরাগী তাঁরা অনেকেই নিজের অনুরাগ

নিয়ে এত ব্যস্ত যে পূর্বরাগের কথাটা তাঁদের খেয়াল থাকে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে পূর্বকথা অজ্ঞাত থাকলে রস-সম্ভোগও অপূর্ণ থাকে। কারণ ঐ পূর্বকথার মধ্যে কাব্যের মর্মকথা লুক্কায়িত থাকার সম্ভাবনা। সেটি জানা থাকলে অনেক অস্পষ্ট জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবির জীবন থেকেই কাব্য উৎসারিত। কবি জীবনের ছোটবড় অনেক ঘটনারই কাব্যিক মূল্য আছে। সেসব ঘটনা জীবন কাব্যের একেকটি পর্ব বা সর্গ। 'পূরবী' কাব্য কবি জীবনের এমনি একটি পর্বের পার্বনী।

এখন আর কারো অজানা নেই যে, যে করকমলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পূরবী' গ্রন্থটি অর্পণ করেছিলেন সে করকমল দুটি ভারতীয় নয়। সূর্যকিরণে সব জিনিসেরই রূপান্তর ঘটে। বিদেশিনী 'ভিক্টোরিয়া' রবিকরস্পর্শে হয়েছেন 'বিজয়া'। রবীন্দ্রনাথ সেদিন অনেকটা ঠিক অমিট রায়ের মতই বেশ একটি চমক লাগিয়েছিলেন—'আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে, পরিচিত জনতার সরণীতে'। আমাদের দেশে তখন শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া সত্যই অপরিচিতা ছিলেন, যদিচ পশ্চিম দেশে তাঁর খ্যাতি ছিল বহু বিস্তৃত।

শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত আর্জেন্টিনা রাজ্যের অধিবাসিনী, ধনী সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম। বহু গুণের অধিকারিণী—সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, সুলেখিকা। স্প্যানিশ, ফরাসী, ইংরেজি ভাষায় তাঁর সমান অধিকার। বহু গ্রন্থের রচয়িতা, স্প্যানিশ ভাষায় পরিচালিত সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাত্রী এবং সম্পাদিকা। এককালে আর্জেন্টাইন পি. ই. এন-এর ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯৩৬ সালে ব্যুয়েনোস্ এয়ারিস-এ যে পি. ই. এন্ কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তিনি তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। নিজগুণে দেশে বিদেশে সমাদর লাভ করেছেন। ধনে মানে রূপে গুণে ইনি নারীকুলরত্ন।

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ এবং নারীরত্ন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সাক্ষাৎ বলতে গেলে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এরূপ অনন্যসাধারণ দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ সচরাচর ঘটে না, ঘটলেও তা জীবনব্যাপী বন্ধুত্বে পরিণত হয় না। এই সূত্রে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির দুটি উক্তি মনে পড়ছে। জার্মান মনীষী কাউণ্ট কাইজারলিং তাঁর স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন, দেশবিদেশের সর্বোত্তম প্রতিভাবানদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু 'I have met only one man who in my view is truly worthy of reverence...he is the Indian poet Rabindranath

Tagore.'[১]

ঐ প্রবন্ধটিতেই তিনি প্রসঙ্গক্রমে আরো বলেছেন যে, পৃথিবীর সর্বোত্তম প্রতিভাবানদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে নারীজগতে ঠিক তেমন প্রতিভা আছে কিনা তিনি সঠিকভাবে বলতে পারেন না। তবে একটিমাত্র রমণীকে তাঁর কাছে অসামান্য মনে হয়েছে—তিনি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো—'In recent years I have come in contact with one woman whose superlative eminence is beyond question, namely the Argentinian Victoria Ocampo. A wonderfully beautiful woman of great vitality, acute intelligence, fine aesthetic feeling, enormous power of work and great social position.' সুতরাং এই দুই-এর সাক্ষাৎকে আমি যে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে উল্লেখ করেছি সেটা খুব একটা অত্যুক্তি নয়।

একদিক থেকে এই সাক্ষাৎ যেমন ঐতিহাসিক ঘটনার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ, আরেকদিক থেকে এটি তেমনি দৈব ঘটনার ন্যায় রোমাঞ্চকর। কারণ, সাক্ষাতের কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যাচ্ছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম রাষ্ট্র পেরু ভ্রমণে। সেখানে স্বাধীনতা লাভের শতবর্ষপূর্তি উৎসব। পেরু সরকারের আমন্ত্রণে বিশেষ অতিথি হিসাবে সেই উৎসবে যোগদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ পেরু অভিমুখে রওনা হয়েছেন। আর্জেন্টাইনের ব্যুয়েনোস এয়ারিস বন্দরে তাঁর জাহাজ দাঁড়াবে। এই সংবাদ প্রচার হওয়া অবধি সেখানকার সাহিত্যানুরাগীরা ভারতীয় কবির দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন। বলাবাহুল্য ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান। গীতাঞ্জলির ভক্ত পাঠিকা—ইংরেজি, ফরাসী, স্প্যানিশ—তিনটি অনুবাদই তিনি গভীর মনোনিবেশসহকারে পাঠ করেছেন। রবীন্দ্র-কাব্যের তিনি এতই ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, আর্জেন্টাইনের বিখ্যাত সংবাদপত্র La Nacion-এ তিনি ইতিপূর্বে 'রবীন্দ্রকাব্যপাঠের আনন্দ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

তাঁর জীবনের খুব একটি সংকটকালে গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদ তাঁর হাতে এসে পড়েছিল। গীতাঞ্জলি যে তাঁর প্রাণে কি শান্তির প্রলেপ এনে দিয়েছিল সে কথা তিনি অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় নিজেই লিখেছেন। বলেছেন, গীতাঞ্জলি

১। Significant Memories by Count Hermann Keyserling : Visva Bharati quarterly : May 1937.

তাঁর অশ্রুর উৎস খুলে দিয়েছিল। তাঁর সমস্ত দুঃখ অশ্রুজলে ধুয়ে নির্মল হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে গীতাঞ্জলি তাঁর গীতা। দশ বছর ধরে যে কবির স্বপ্ন তিনি দেখছিলেন, সে কবি তাঁর নগরদ্বারে উপস্থিত। ওঁর মনের অবস্থাটা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই প্রকাশ করা যায়—ওগো মা, রাজার দুলাল চলি যাবে মোর ঘরের সুমুখ পথে—তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না, দুটো কথা হবে না! ধৈর্য রক্ষা করা দায় হয়ে উঠেছিল।

১৯২৪ সালের ৬ই নভেম্বর আণ্ডিস জাহাজ ব্যুয়েনোস্ এয়ারিস বন্দরে এসে পৌঁছল। জানা গেল কবি অসুস্থ। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে রায় দিয়েছেন হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা ভালো নয়, পেরু গমনের অভিলাষ ত্যাগ করতে হবে, আপাতত এখানেই বিশ্রাম প্রয়োজন। ওদিকে রাজধানী লীমা নগরে পেরুর রাষ্ট্রপতি লেগুইয়া অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন করে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। আর্জেণ্টাইন সংবাদপত্র La Nacion-এ সংবাদ প্রচারিত হল, কবি পেরু গমনের ইচ্ছা ত্যাগ করেছেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই ব্যাপার নিয়ে আর্জেণ্টাইন এবং পেরু রাজ্যের মধ্যে একটি বড় রকমের কূটনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল।[২] লেনার্ড এলমহার্স্ট লিখিত প্রবন্ধে সমস্ত ব্যাপারটির একটি অতি কৌতুকাবহ বিবরণ পাওয়া যায়।[৩] যাক্ কূটনৈতিক মহলে যাই ঘটুক না কেন, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো হাতে স্বর্গ পেলেন। নিজেই বলেছেন, কবির অসুস্থতার সংবাদে তাঁরও উদ্বেগ কম হয়নি, কিন্তু পেরু-ভ্রমণ বাতিল করে তাঁকে যে ব্যুয়েনোস্ এয়ারিস-এ থেকে যেতে হল তাতে ভিক্টোরিয়া মনে মনে খুশিই হলেন। কবির অসুখটাও দৈবানুগ্রহ বলেই মনে হল। বিদেশে বিভূঁয়ে অসুস্থ কবিকে নিয়ে সেক্রেটারি লেনার্ড এলমহার্স্ট বিপন্ন। কবিকে নিয়ে উঠেছেন এক হোটেলে। ডাক্তাররা বলেছেন নগরের কোলাহল থেকে দূরে কোন নিভৃত স্থানে বিশ্রাম আবশ্যক। সেই সংকটমুহূর্তে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এগিয়ে এসে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ব্যুয়েনোস এয়ারিস নগরের উপান্তে সান ইসিড্রো অঞ্চল। বনেদী সম্ভ্রান্তবংশীয়দের বাসস্থান। লা প্লাতা নদীর

২। 'This almost led to a major political crisis between Argentine' and Peru' : On the Edges of time by Rathindranath Tagore. p. 149.

৩। সাহিত্য আকাদমি প্রকাশিত Centenary Volume-এ Personal Memoirs of Tagore প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তীরে মিরালরিয়ো (নদীশোভনা) নামে সুরম্য অট্টালিকায় কবির বাসের ব্যবস্থা হল। ওপরের বারান্দায় বসে তিনি নদীর শোভা দেখতেন। নিচে ফুলের বাগান, ভিক্টোরিয়াকে সঙ্গে করে রোজ বাগানে বেড়াতেন। বাগানের বিদেশী ফুল মনোহরণ করেছে, কবিতায় তাদের সম্ভাষণ জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য, ফুলের সঙ্গে ফুলবনবিহারিণীও মিশে গিয়েছেন। শ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার আতিথ্যাশ্রয়ে কবি পুরো দুটি মাস সান ইসিড্রোতে কাটিয়েছিলেন। 'পলাতকার' রুগ্ন বধূ বিনুর মত রবীন্দ্রনাথও বলতে পারতেন—'এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে'। বলেছেনও। 'পূরবী'র 'অতিথি' নামক কবিতাটিতে এই সেবাময়ী কল্যাণী রমণীর প্রতি অকুণ্ঠিত ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন— 'প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে নারী মাধুর্যসুধায়।' অপরপক্ষে, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোও বলেছেন যে, ঐ দুটি মাস তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় অংশ।

বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার বয়সী কিন্তু যে সম্পর্কটি স্থাপিত হল সেটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক। যেখানে মনের মিল সেখানে বয়সের অমিলটা বড় হয়ে দেখা দেয় না। আর সম্পর্কটাও দ্রুত এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। প্রথমটায় একান্ত অনুরক্ত ভক্ত। নিজেই বলেছেন, ইচ্ছে করত ওঁর গৃহদ্বারে শুয়ে লুটিয়ে থাকি। এমন যে প্রখরা মহিলা তাও মুখে বাক্য ছিল না। নীরবে অতিথির সেবার আয়োজনটুকু করে দিয়ে দূরে দূরে থাকতেন। অথচ মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করতে মন সরত না—I could not afford to lose a single crumb of this presence.[৪] অতিথির সামান্যতম আনন্দ বিধানের জন্য তিনি বোধকরি প্রাণ দিতে পারতেন। বলেছেন, I could have torn my heart out to please him.[৫] এই সূত্রে আরো বলেছেন, Indeed it was he who was doing me a service by acceptig it from me. বলবার ভঙ্গিটিও একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের—

তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;
গ্রহণ করেছ যত [illegible]

ধীরে ধীরে সংকোচ কেটেছে। কবি তাঁকে গান গেয়ে শুনিয়েছেন, তিনি কবিকে

৪। Tagore on the Banks of the River Plate—Victoria Ocampo (Sahitya Akadami Centenary Volume)

৫। Ibid.

ফরাসী কবিতা তর্জমা করে শুনিয়েছেন। বরাবরই প্রখরা, পরে মুখরাও হয়েছেন। তর্ক করেছেন, কলহ করেছেন (অবশ্যই কপট)—রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন 'foolish'। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন 'conceited'। হাস্য পরিহাস রসিকতা সারাক্ষণই চলত।

—You must have been a strikingly handsome boy when you were studying in England. Were all the English girls madly in love with you ?[৬]

রবীন্দ্রনাথ হেসে বলতেন, সে আর বলতে!

মাঝে মাঝে কবিকে হুকুম করতেও ছাড়েননি। এক্ষুণি যে কবিতাটি লিখলেন, লক্ষ্মী ছেলের মত সেটি আমাকে অনুবাদ করে শোনান তো। কবি তক্ষুণি মুখে মুখে অনুবাদ করে শুনিয়েছেন। পরে নিজের হাতে লিখে কবিতাটি বিজয়ার হাতে দিয়েছেন। তাঁকে সর্বদা বিজয়া বলেই সম্বোধন করতেন।

এই বিজয়ার করকমলেই 'পূরবী' কাব্য উৎসর্গ করা হয়েছে। গ্রন্থ প্রকাশের অল্পদিন পূর্বে একটি চিঠিতে বিজয়াকে লিখেছেন—Very few people will know that they ought also to thank you for this gift of lyrics which I am about to offer to them.

'পূরবী' প্রকাশের পরে ১৯২৫ সালের ২৯শে অক্টোবর তারিখে 'পূরবী'র এক খণ্ড বিজয়াকে পাঠাচ্ছেন। চিঠিতে লিখেছেন, বইখানা নিজে তোমার হাতে তুলে দিতে পারলে খুশি হতাম। আরো বলেছেন, তুমি এর একটি কথাও বুঝতে পারবে না। আবার যারা বুঝবে তারা জানবে না—কে এই বিজয়া, যিনি এসব কবিতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

আগেই বলেছি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ দৈব ঘটনার ন্যায় রোমাঞ্চকর। কিন্তু এরও চাইতে রোমাঞ্চকর ঘটনা কবির জীবনে কখনো কখনো ঘটে। কবি-মানুষের অনুভূতিশক্তি এত সূক্ষ্ম এবং এত তীব্র যে কোন কোন মুহূর্তে অকস্মাৎ তাঁরা ভবিষ্যতের কোন সূচনা কিংবা অনাগতের আভাস স্পষ্টত দেখতে পান। কেবল রবীন্দ্রনাথ নয়, অন্যান্য কবির বেলায়ও এটি লক্ষ্য করা গিয়েছে। সুস্থ সবল তিরিশ বছরের যুবক শেলী নিজ মৃত্যুর কথা বারবার এমন করে কেন বলেছেন? তিনি কি তাঁর আসন্ন মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন? মনে হয়, কবিদের এ যেন এক দৈব শক্তি। 'পূরবী' সম্পর্কে

৬। Ibid.

এই কথাটা কেন বলছি, একটু খুলে বলা আবশ্যক। 'পূরবী' কাব্যের প্রথমাংশ দেশে থাকতে লেখা। কিন্তু এর বৃহৎ অংশ বিদেশ যাত্রার পথে জাহাজে বসে কিংবা আর্জেণ্টিনায় পৌছবার পরে বুয়েনোস্ এয়ারিস-এ অথবা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্যাশ্রয়ে সান ইসিড্রোতে লেখা। খুব বিস্ময়কর বলেতে হবে যে, আর্জেন্টিনায় পৌছবার একমাস আগে জাহাজে বসে কবি 'আহ্বান' নামে একটি কবিতা লেখেন। তাতে বলেছেন—

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে
তারে বারংবার
ফিরেছি ডাকিয়া
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে
খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।

স্বভাবতই মনে হবে যেন কার আবির্ভাবের প্রত্যাশায় তিনি অপেক্ষা করে আছেন, কোন অলক্ষ্যচারিণীর নিঃশব্দ আগমনবার্তা যেন তাঁর কাছে ঘোষিত হয়েছে। এই যাঁর আগমন প্রতীক্ষা তিনি করছেন তিনি আর কেউ নন—তাঁর কাব্যের প্রেরণাময়ী। তাঁর জীবনের কোন মাহেন্দ্রক্ষণে এঁর সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন। জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মূর্তিতে তিনি দেখা দিয়েছেন। 'পূরবী' কাব্য এমনি একটি মাহেন্দ্রক্ষণের ইতিহাস। এর পশ্চাদ্ভূমিকাটি লক্ষণীয়। 'পূরবী' রচনাকালে কবির বয়স ষাট উত্তীর্ণ, তেষট্টি পার করে চৌষট্টিতে পা দিয়েছেন। মনে আশঙ্কা, জীবনের শেষ পর্ব উপস্থিত, কিন্তু এখনও কত কথা বলার বাকী—

মনে জানি এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই
পূর্ণ তানে মোর শেষ গান।

অসমাপ্ত বাণীর বেদনা মনকে অধীর অসহিষ্ণু করে তুলেছে।—

কোথা তুমি, শেষবার
যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সঙ্গীতে?
মহানিস্তব্ধের প্রান্তে
কোথা বসে রয়েছ রমণী,
নীরব নিশীথে।
(আহ্বান,'পূরবী)

'অপরিচিতা' নামক কবিতায় ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি—

পথ বাকি আর নাই তো আমার,
চলে এলাম একা ;
তোমার সাথে কই হল গো দেখা ?

এখানে বলে রাখা ভালো যে, তিনি তাঁর প্রেরণাময়ী হিসাবে কেবলমাত্র একটি অদেখা অচেনা অপরিচিতা রমণীর কথাই ভাবছেন এমন নয়।

চিত্তে তোমার মূর্তি নিয়ে
ভাবসাগরের খেয়ায় চড়ি।
বিধির মনের কল্পনারে
আপন মনে নতুন গড়ি।

(স্বপ্ন, পূরবী)

একে বলা যেতে পারে তাঁর মানসসুন্দরী বা তাঁর কবিতা কল্পনালতা।

রবীন্দ্রকাব্য ভালো করে বুঝতে হলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে তাঁর মনে একটি কল্পনায় গড়া রমণীমূর্তি বিদ্যমান।

একদিকে তাঁর জীবন দেবতা, অপরদিকে এই মানসসুন্দরী—এই দুই শক্তিই তাঁর জীবনে এবং কাব্যে মূল প্রেরণা জুগিয়েছে, (বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়)। বলা বাহুল্য, মানসসুন্দরীর জীবন্ত প্রতিনিধি মর্ত্যলোকে বিরল। তথাপি লৌকিক জীবনে যেসব রমণীর মধ্যে তাঁর মানসসুন্দরীর কোন নিকটসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরাও প্রেরণাদাত্রী হিসাবে কাজ করেছেন। এঁরা কবিজীবনের লীলাসঙ্গিনী। অতীতে যাঁরা তাঁকে এভাবে প্রেরণা জুগিয়েছেন, যাঁরা আজ মর্ত্যলোকে নেই তাঁদের তিনি ফিরে ফিরে ডেকেছেন। আবার নতুন প্রেরণারও সন্ধান করেছেন। রোমক দেবতা জেনাসের ন্যায় অতীত ভবিষ্যৎ দুদিকেই তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত। অনাগতকে যেমন ডেকেছেন বিগতকেও তেমনি ভোলেননি। পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করে থাকবেন, 'পূরবী' কাব্যে একটি nostalgia-র ভাব আছে, চলতে চলতে ক্ষণে ক্ষণে পিছন ফিরে তাকাচ্ছেন। বিগত জীবনের স্মৃতিচারণ অনেক কবিতার মধ্যেই বর্তমান (কিশোর প্রেম, খেলা ইত্যাদি কবিতা দ্রষ্টব্য)।

মোর প্রভাতের খেলার সাথি আনত ভরে সাজি
সোনার চাঁপাফুলে।
অন্ধকারে গন্ধ তারি ঐ যে আসে আজি
একি পথের ভুলে।
বকুলবীথির তলে তলে আজ কি নতুন বেশে

সেই খেলাতেই ডাকতে এল আবার ফিরে এসে।
(খেলা, পূরবী)

এখানেও সেই অপরিচিতা অনাগতার আভাস আছে, কিন্তু বিগতা এবং অনাগতা একসঙ্গে এক হয়ে মিশে গিয়েছে।

অদেখা অজানা অনাগতর সম্পর্কে কবির এক অদ্ভুত অনুভবশক্তি। দেখার আগেই যার আগমনবার্তা তিনি কবিতায় ঘোষণা করেছেন, দেখার পরে তাকে কাব্যের সিংহাসনে বসাবেন, তাতে আর বিচিত্র কি? কবির মনকে মুহূর্তের জন্যেও যে একবার আকৃষ্ট করেছে তারই কাছে তিনি বাগদত্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পূরবী'র 'আকন্দ' নামক কবিতাটি পড়ে দেখুন। ভুবনডাঙার মাঠে বেড়াতে গিয়ে পথের ধারে দেখেছিলেন সন্ত-ফোটা আকন্দ ফুল। মনে মনে কথা দিয়েছিলেন, 'তোমার আসন কাব্যে দেব পেতে'। সুদূর আর্জেন্টিনায় গিয়ে মনে পড়ে গেল অযত্নবর্ধিত অনাদৃত ফুলটির কথা। লিখলেন কবিতা—

বোলো তারে, চোখের দেখা
ফুটেছে আজ গানে—
লিখনখানি রাখিনু এইখানে।

ভুবনডাঙার ফুলকে যেমন ভোলেননি, আর্জেণ্টিনার ফুলকেও তেমনি ভোলেননি, ফুলবিলাসিনীকে তো নয়ই (বিদেশী ফুল'দ্রষ্টব্য)। 'অতিথি' নামক কবিতাটি যে একান্তভাবে বিজয়ার উদ্দেশ্যে রচিত, একথা সর্বজনবিদিত। এছাড়া 'পূরবী'র আরো অনেক কবিতায় বিজয়ার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি পাঠক মাত্রেই অনুভব করবেন।

রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরক্ত ভক্তের সংখ্যা বড় কম নয়। এঁরা সকলেই দীর্ঘদিন তাঁর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু মাত্র দুটি মাসের পরিচয়ে আর কোন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মনকে এতখানি অধিকার করতে পারেননি। ভিক্টোরিয়ার অসাধারণ ব্যক্তিত্বই এই কৃতিত্বের মূলে। তিনি সার্থকনামা বিজয়া। আর্জেণ্টিনায় মাত্র দুটি মাস ছিলেন (১৯২৪ এর ৬ই নভেম্বর থেকে ১৯২৫ এর ৪ঠা জানুয়ারী)। সময়ের দিক থেকে সংকীর্ণ হলেও এটি তাঁর জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়। এলমহার্স্ট তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বলেছেন, আর্জেণ্টিনায় অবস্থানকলে তাঁকে যতটা মনের আনন্দে থাকতে দেখেছি এমন আর কোথাও নয়। হাসিখুশিতে যেন ঝলমল করছেন। এলমহার্স্টকে লেখা একটি চিঠিতে কবি নিজেও একথার উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, তোমাদের সঙ্গে আমার বয়সের অনেক ব্যবধান, সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। সেদিন একাধারে একই সঙ্গে আমার বার্ধক্য এবং যৌবন তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ। ভিক্টোরিয়াকেও

চিঠিতে লিখেছেন—'It often comes to my mind like a dream those days in Argentina made delightful by your loving care.' আর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—'Those days belong to an irrovocable past.' জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই সুখস্মৃতিকে সযত্নে লালন করেছেন।

এই সম্মান ভিক্টোরিয়ার অবশ্য প্রাপ্য। কেবল যে আতিথ্যের দ্বারাই রবীন্দ্রনাথকে পরিতৃপ্ত করেছেন এমন নয়। বিদেশে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে প্রচার করেছেন ইনি তাঁদের মধ্যে সবচাইতে নিষ্ঠাবতী। এঁর ভক্তিতে কোনকালে এতটুকু চিড় ধরেনি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছেন, জনসভায় বক্তৃতা করেছেন, বহুস্থানে রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করে শুনিয়েছেন। একটি চিঠিতে লিখেছেন, প্রত্যেকটি কবিতা আমি প্রাণ ঢেলে দিয়ে পড়েছি কারণ এর অন্তর্নিহিত সত্যকে আমি যে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেছি। এছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৩০ সালে প্যারিস-এ অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ছিলেন ঐ প্রদর্শনীর প্রধান উদ্যোক্তা। এখানে আর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপিতে কবি যে কাটাকুটি করেছেন, কলমের খামখেয়ালিতে সেই কাটাকুটির মধ্যে বিচিত্র সব মূর্তি ফুটে উঠত—কখনো প্রাগৈতিহাসিক কোন জন্তু বা পাখি কিংবা মানুষের মুখ—কখনো ভ্রূকুটি-কুটিল, কখনো বিকট হাস্যে বিকৃত। কবি মনের এই খামখেয়ালিপনা তখনই ভিক্টোরিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কবির অনুমতি নিয়ে তিনি এসব ছবির কিছু ফটো তুলে রেখেছিলেন। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো গর্ব করে বলেছেন, তাঁর সান ইসিড্রোর গৃহেই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছে। এখানে বলে নেওয়া ভালো ১৯৩০ সালে প্যারিসের চিত্রপ্রদর্শনী উপলক্ষ্যেই দুজনের শেষ দেখা। শান্তিনিকেতনে আসবার জন্য বিজয়াকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর আসা হয়নি। কবির নিজের ইচ্ছে ছিল, আরেকবার সমুদ্রে পাড়ি দেবেন, আবার দেখা হবে। ১৯৩৬ সালে এক চিঠিতে লিখেছেন—Let me still cherish the hope of finding the chance to cross the sea and meet you once again before my days are over.

সাক্ষাৎ পরিচয়ের ইতিহাস এখানেই শেষ। কিন্তু অসাক্ষাতে একে অন্যকে নিরন্তর স্মরণ করেছেন। পত্রালাপ অব্যাহত ছিল। সাক্ষাতে যতখানি কাছে এসেছিলেন, অসাক্ষাতে বোধকরি আরো কাছে এসেছেন। অবশ্য কবির জীবনে সকল পরিচয়ই কাব্যরূপ গ্রহণ করে। অনুসন্ধানী পাঠক কাব্যের মধ্যেই

সে পরিচয় খুঁজে পাবেন। চিঠিপত্রের চাইতেও এই পরিচয় বেশি সত্য, কারণ মানবিক সম্পর্কের মধ্যে যেটুকু স্থায়ী সেটুকুই শুধু কাব্যে স্থান পায়, বাকিটুকু ঝরে যায়। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সেই সত্য পরিচয়টাকে খুঁজে বের করা বড় সহজ নয়, কারণ কবিমানুষেরা সত্যবাদী বটে কিন্তু সবসময়ে স্পষ্টবাদী নন। রবীন্দ্রনাথ 'পূরবী'র যুগে পাঠকদের mystify করবার চেষ্টা করেছেন, একথা সকলেই জানেন। সুখের বিষয়, শেষ জীবনে শেষ লেখায় আর কোন অস্পষ্টতার আড়াল রাখেননি। মৃত্যুর ঠিক চারমাস পূর্বে পরপর দুটি কবিতায় (শেষ লেখা—৪ এবং ৫নং কবিতা) 'বিদেশের প্রেয়সী'কে সুস্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করেছেন—

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।

লক্ষ্য করবার বিষয়, আকন্দ ফুলটিকে যেমন কাব্যের আসনে বসিয়েছিলেন, বিজয়ার দেওয়া চেয়ারটিকেও[৭] তেমনি এই দুই কবিতায় চিরস্থায়ী করে গেলেন, বিজয়াকে তো বটেই।

এ পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে বুঝতে বাকি থাকে না যে ইনি অসাধারণ রমণী। তিনি যেমন রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর গুণমুগ্ধ। ভিক্টোরিয়া বলেছেন, গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আমি ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করেছি। আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'For me the spirit of Latin America will ever dwell in my memory incarnated in your person'. দেশী বিদেশী কোন গুণবতী সম্পর্কেই এমন উচ্ছ্বসিত ভাষায় কথা বলেননি। একটি প্রশ্ন কখনো কখনো আমার মনে হয়েছে কিন্তু তার সঠিক জবাব আজ কারো কাছেই পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর সুবিখ্যাত গান—

৭। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর গৃহে যে চেয়ারটিতে কবি বেশির ভাগ সময় বসতেন, দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় সেই চেয়ারটি ভিক্টোরিয়া কবির সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন। চেয়ারটি আকারে বৃহৎ, জাহাজের কেবিনে ঢুকছিল না। ভিক্টোরিয়া জাহাজে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা করে কেবিনের দরজা কাটিয়ে খুলে তবে সেটিকে ভেতরে ঢোকাবার ব্যবস্থা করেন। চেয়ারটি এখন বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

সুনীল সাগরে শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে

এ গান তিনি কার কথা ভেবে লিখেছিলেন ? কে জানে ? তা যিনিই হউন—হয়তো ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে এ গানের কোনই যোগ নেই—তথাপি এ কথা বলতে বাধা নেই যে রিভার প্লেট তটবাসিনী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সত্যই তুলনাহীনা।

এত কথার পরে অনেকের মনে স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠবে যে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সম্পর্ক কি কেবলমাত্র বন্ধুত্বের বা পারস্পরিক গুণগ্রাহিতার সম্পর্ক ? এই সম্পর্কের মধ্যে কি একটু মধুরের আভাস লাগেনি ? এ প্রশ্ন আগে থেকেই কারো কারো মনে এসেছে। নানা মহলে এ বিষয়ে আলোচনাও শুনেছি। যাঁরা রোমান্সসন্ধানী তাঁরা কল্পনায় অনেক কিছু অনুমান করে নিতে পারেন। তবে অনুমানকে বোধকরি বেশি প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো। তাই বলে আমি প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যেতে চাই, এমন কথা ভাববার কোন হেতু নাই। বরঞ্চ আমি বিশ্বাস করি যে, কবিকে সম্পূর্ণভাবে জানলে তবে কাব্যের রসাস্বাদন সম্পূর্ণ হয়।

যাঁরা একটু গভীরভাবে এই দুটি মানুষকে জানবার চেষ্টা করবেন তাঁদের বুঝতে বাকি থাকবে না যে এঁরা আসলে ইংরেজিতে যাকে বলে kindred spirits ; এঁরা সমধর্মা, কাজেই এঁদের সম্পর্ক অত্যন্ত স্বাভাবিক। অন্যান্য ভক্তদের মতো ভিক্টোরিয়া রবীন্দ্রনাথকে সর্বদা গুরুদেব সম্বোধন করেছেন। কিন্তু চিঠিতে অসংকোচে বলেছেন Believe me, Gurudev, I love you. রবীন্দ্রনাথও (বাক্যালাপে পত্রালাপে সর্বত্রই বিজয়া বলে সম্বোধন করেছেন) প্রায় প্রত্যেকটি চিঠিই শেষ করেছেন একটি কথা দিয়ে—ভালোবাসা, সেটি বাংলা অক্ষরে লেখা। ভিক্টোরিয়া বলেছেন, তিনি কবির কাছে কয়েকটি মাত্র বাংলা কথা শিখেছিলেন, তার মধ্যে একটিমাত্র তাঁর মনে আছে, সেটি 'ভালোবাসা'। মনে রাখতে হবে এঁরা দুজনেই সাধারণের বহু উর্ধ্বে। সাধারণ নিয়মে যাচাই করতে গেলে এঁদেরকে ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে। বিশেষ করে, রবীন্দ্রনাথ মানুষটিকে আগে ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার, তবেই এঁদের সম্পর্কটিকে আমরা ঠিকভাবে বুঝতে পারব। প্রথম কথা, রবীন্দ্র-চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, তিনি স্বভাবতই পথিকচিত্ত মানুষ। নিজেই বলেছেন, আমি নিত্য পথের পথী—রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এর চাইতে বড় সত্য আর কিছু নেই। পথে যা কুড়িয়ে পেয়েছেন পথেই তা ফেলে গিয়েছেন, সঙ্গে বয়ে বেড়াননি। মাঝে মাঝে অবশ্যই পিছন ফিরে তাকিয়েছেন। এই

পিছন ফিরে দেখা তাঁর কাব্যে একটি বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। শেষের দিকের কাব্যে ঐ nostalgic feelingটি বিশেষভাবে উপভোগ্য। বহু বিচ্ছেদ বেদনা তাঁর জীবনে ঘটেছে, বহু আপনজন দূরে চলে গিয়েছেন। কোন বন্ধনই তাঁর জীবনে স্থায়ী হয়নি। তিনি সারাজীবন একান্ত নিঃসঙ্গ, কারণ তিনি জন্ম-পথিক। তাই বলে জীবনের কোন অভিজ্ঞতাকেই ভোলেননি। কাব্য-সৃষ্টিতে তাকে কাজে লাগিয়েছেন।

সংসারে ভালোবাসার একটা দাবী আছে; সেই দাবীকে এড়িয়ে যাওয়া ভালো কি মন্দ সে প্রশ্নের আলোচনা এখানে অবান্তর। তবে এইটুকু আমাদের জানা আছে যে রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসা বলতে বুঝেছেন মন দেওয়া-নেওয়া। তাঁর প্রেম মনোজাত মনসিজ, মনে তার জন্ম, মনেই তার লয়। নিজ মুখে বললে কি হবে, যে ভালোবাসা বলে—সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এই জীবনের কলরব—সেই অন্ধ আবেগকে তিনি কোন কালে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর মতে পরিপূর্ণ মুক্তির মধ্যেই প্রেমের যথার্থ প্রকাশ। তিনি নিজেকে যেমন কোন বন্ধনের মধ্যে বাঁধতে দেননি, অপরকেও কোন বন্ধনের মধ্যে টানতে চাননি।

চাই না তোমায় ধরতে আমি
মোর বাসনায় ঢেকে—
আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও,
নয় খাঁচাটার থেকে।

(বিপাশা, পূরবী)

এই কবিতা বিজয়ার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে ব্যুয়েনোস্ এয়ারিস-এ লেখা। অথবা—

হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
এমন কী মোর আছে দিতে।
তাই তো আমি বলি তোমায় নতশিরে,
তোমার দেখার স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে।

(আশঙ্কা, পূরবী)

যেখানেই তিনি হৃদয়াবেগের কোন তীব্রতা দেখেছেন সেখানেই সভয়ে পিছিয়ে এসেছেন। 'সভয়ে' কিন্তু এ কি স্বভাবভীরুতা, না চিত্তের দৃঢ়তা? রবীন্দ্রচরিত্রে আমি যতটুকু প্রবেশ করেছি তাতে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, রবীন্দ্রনাথ মানুষটি আশ্চর্যরূপে আত্মস্থ।

রবীন্দ্র-চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে প্রবন্ধ শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ এ কথা সর্বতোভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন-বিধাতা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করছেন। বিধাতার সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সাধ, আহ্লাদ, সুখ বা স্বার্থচিন্তা তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এইজন্য সাংসারিক জীবনে তাঁকে অনেক সময় নির্মম হতে হয়েছে, নিজেকেও নানাদিক থেকে বঞ্চিত করতে হয়েছে। বিজয়াকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি তাঁর জীবনে এই বিধি-নির্দেশ বা Destiny-এর কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, 'Our friendship will grow to its fulness of truth when you know and aceept my real being and see clearly the deeper meaning of my life…that I aceept my destiny and if you also have the courage fully to accept it we shall ever remain friends'. রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ। তথ্য নির্ণয় করতে গিয়ে তত্ত্বকথা এসে গেল। তত্ত্বে আমার রুচি নেই তথাপি বলতে হল এই কারণে যে, সাহিত্যিকের জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখা এ যুগের রেওয়াজ। শেলী, বায়রন, গ্যয়টে, পুশকিন নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়েছে। রবীন্দ্র-জীবন নিয়েও অদূর ভবিষ্যতে উপন্যাস রচিত হবে। সেদিন ফ্যাক্ট হবে ফিকশন। সেই আপদধর্মে মূলগত মানুষটিকে যেন আমরা ভুলে না যাই।

'পূরবী' গ্রন্থে 'চাবি' নামে একটি কবিতা আছে, এটিও ব্যুয়েনোস্ এয়ারিস-এ বসে লেখা। রবীন্দ্রচর্চায় যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের পক্ষে এ কবিতাটি মূল্যবান পথনির্দেশক। বলেছেন—

বিধাতা যেদিন মোর মন করিলা সৃজন
বহু-কক্ষে-ভাগ-করা হর্ম্যের মতন,
শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানামতো অতিথির তরে—
নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবিখানি ফেলি দিলা দূরে।

সারা জীবনে কত অতিথি বহির্দ্বারে এসে অপেক্ষা করেছেন, অন্তঃপুরে কেউ প্রবেশ করতে পারেননি। কারণ অন্তঃপুরের চাবি রবীন্দ্রনাথেরও হাতে ছিল না। এর কয়ক্ষতি দুঃখবেদনা রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন বহন করেছেন। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন সেই পথিকের পথ চেয়ে, যে 'অজানা সমুদ্র-উপকূলে

কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি···খুলিবে সে গুপ্তদ্বার কেহ যার পায়নি সন্ধান'।

বিজয়া কি সেই চাবি খুঁজে পেয়েছিলেন? পেয়ে থাকলেও কোন লাভ হয়নি। 'শেষের কবিতা'র সেই পাগলা স্যাকরার কথা আপনাদের মনে আছে—যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আংটি সম্পূর্ণ করলে·অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে—এই পাগলা স্যাকরাই রবীন্দ্রনাথের Destiny। বিজয়া যদি সে চাবি খুঁজে পেয়েও থাকেন, রবীন্দ্রনাথ নিজেই কোন অসতর্ক মুহূর্তে সেটি আবার সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু সে বেদনাটি মনের কোণে থেকে গিয়েছে। প্রমাণ, মৃত্যুর মাত্র এক বৎসর পূর্বে ১৯৪০ সালের ১০ই জুলাই তারিখে বিজয়াকে লেখা চিঠি—'Ofen it comes to my mind the picture of that riverside home and the regret that in my absent-minded foolishness I had failed to accept fully the precious gift offered to me.

রবীন্দ্রনাথ ও হিমেনেথ দম্পতি

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণস্পৃহা ছিল অদম্য। যিনি নিজেই বলেছেন—দেশে দেশে মোর দেশ আছে, বলেছেন—ঘরে ঘরে মোর ঠাঁই আছে—তিনি যে ঘরে বসে থাকবার মানুষ নন, সে তো বোঝাই যায়। অন্তহীন কৌতূহল; বলতেন—কত দেশ কত জাতি, কত ভাষা কত ধর্ম কত বর্ণের মানুষ—পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে সকল দেশ সকল জাতির সঙ্গে পরিচয়টা সারা করে নিতে হবে। ক'দিন পরে পরেই সাগর পাড়ি দিয়েছেন। পূর্ব পশ্চিম দুই ভূখণ্ডেই সমান আনাগোনা। ইউরোপে গিয়েছেন কতবার কিন্তু ভাবলে অবাক লাগে যে স্পেন দেশটিতে কখনো যাননি। অথচ সে দেশে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত সংখ্যা ছিল প্রচুর। এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। ইংলণ্ড দেশটি আকারে ছোট কিন্তু ইংরেজী ভাষাভাষী জগৎটি সুবৃহৎ। স্পেনও ইংলণ্ডের মতোই ক্ষুদ্র রাজ্য কিন্তু স্প্যানিশভাষী জগৎটিও বড় ছোট নয়। কারণ দক্ষিণ আমেরিকার ন্যায় একটি উপমহাদেশের সবকটি রাজ্যই মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, চিলি, পেরু প্রভৃতি সমস্তই স্প্যানিশ ভাষাভাষী। ব্রেজিল ব্যতিক্রম, সে দেশের ভাষা পর্তুগীজ। ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের একটা দীর্ঘকালীন সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলে ইংরেজী ভাষাভাষী দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের পরিচয় যতখানি ঘনিষ্ঠ স্প্যানিশভাষী দুনিয়ার সঙ্গে ততখানি নয়। সেজন্যে একথা আমাদের জানা নেই যে একসময়ে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড আমেরিকায় যতখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন, খাস স্পেন এবং স্প্যানিশভাষী দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহে ততখানি আলোড়নেরই সৃষ্টি করেছিলেন। ইংরেজি গীতাঞ্জলির প্রকাশ এবং নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইয়ুরোপের দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায় গীতাঞ্জলি অনুবাদের ধুম পড়ে গেল। যাঁরা অনুবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন পরে বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিকরূপে পরিচিত হয়েছেন। ফরাসী অনুবাদক আন্দ্রে জীদ নোবেল প্রাইজ লাভ করেছেন। স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন খ্যাতনামা কবি হুয়ান রামন হিমেনেথ—পরবর্তীকালে নোবেল প্রাইজ বিজেতা। হিমেনেথ ইংরেজী জানতেন না; পত্নী সেনোবিয়া ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। পত্নীর সহযোগিতায় হিমেনেথ অনুবাদ-কার্য সমাধা করেছিলেন। শুধু গীতাঞ্জলির অনুবাদ করেই কান্ত হননি। রবীন্দ্রনাথের সবকটি ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ, নাটক

করবী ব্যতীত সবকটি নাটক এবং যে কটি গল্প ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল হিমেনেথ দম্পতি দীর্ঘকাল ধরে সমস্তই স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। স্পেন এবং লাটিন আমেরিকার দেশসমূহে এসব অনুবাদের বহুল প্রচার এবং প্রচুর সমাদর হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে এই সমস্ত অনুবাদ মিলিয়ে একটি অখণ্ড শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে স্প্যানিশ জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রচারক ছিলেন হিমেনেথ দম্পতি। লাটিন আমেরিকার দেশে দেশে রবীন্দ্র-কাব্যের জয়যাত্রার সূচনা করেছিলেন এঁরাই তাঁদের অনুবাদের মাধ্যমে। প্রথম সোরগোলটা সবচেয়ে বেশি হয়েছিল ইংলণ্ডেই কিন্তু ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকরা কেউ সজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেছিলেন এমন বলা চলে না। লাটিন আমেরিকা কিন্তু একেবারেই মজে গিয়েছিল। সেখানে কবি-যশঃপ্রার্থী অনেকেই গীতাঞ্জলির অনুকরণে হাত মক্স করতে শুরু করেছিলেন। ঐ অনুকরণ প্রয়াস এত বেশি প্রকট হয়েছিল যে তাকে রীতিমতো টেগোর কাল্ট আখ্যা দেওয়া যেতে পারত। অনুকরণস্পৃহাটা সাহিত্যসমাজের একটা ব্যাধি। হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয়, কখনো এপিডেমিকের আকার ধারণ করে, একদিন আবার আপনিই নির্জীব হয়ে থেমে যায়। অনুকরণকারীদের মধ্যেও দেখা যায় পরে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেন, তাঁরা নিজগুণে নিজস্বতার দ্বারাই বড় হন, পরস্বাপহরণের দ্বারা কেউ বড় হতে পারেন না। তবে কৃতজ্ঞতাবোধ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিধর্মেরই অঙ্গ। একদিন যাকে ওস্তাদ বলে মান্য করা হয়েছে, পরে তাকে নস্যাৎ করতে গেলে কবিধর্মের মর্যাদা থাকে না। চিলির নোবেল প্রাইজ বিজয়িনী কবি গাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে কখনো অস্বীকার করেননি। বরং মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করেছেন যে যাঁরা তাঁর জীবনের বুনিয়াদ তৈরী করে দিয়েছেন, যাঁরা তাঁর প্রধান শিক্ষাদাতা তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। মেক্সিকোর প্রধান কবি আমাদো নার্ভেকে মিস্ত্রাল আমেরিকান টাগোর আখ্যা দিয়েছিলেন। চিলির অপর নোবেল প্রাইজ বিজয়ী কবি পাবলো নেরুদা। নেরুদার উপরে রবীন্দ্রপ্রভাব খুবই সুস্পষ্ট। দুজনের কোনো কোনো কবিতায় সাদৃশ্য লক্ষণীয়। নেরুদার একটি কবিতা (ইংরেজি অনুবাদ) In my sky at twilight you are like a cloud—রবীন্দ্রনাথের 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' গানটির প্রতিধ্বনি বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রকাব্যের মাধ্যমে বাঙলাদেশ এবং বাঙালী জীবন সম্বন্ধেও রবীন্দ্রভক্তদের মনে যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল। গীতাঞ্জলির যুগে ইংলণ্ডের কবি-সাহিত্যিকরাও বলেছিলেন, যে দেশ এবং যে পরিবেশে এ কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে, সে দেশ এবং সে দেশের জীবনকে জানার

প্রয়োজন আছে। পাবলো নেরুদা বোধকরি এরূপ একটি তাগিদ অনুভব করেছিলেন, মনে হয় বাঙলাদেশের প্রতি তাঁর একটি আন্তরিক টান ছিল। তিনি সত্যি সত্যি এদেশে এসেছেন এবং কিছুদিন কলকাতায় কাটিয়েছেন। ধুতি পাঞ্জাবি পরে দিব্যি বাঙালী সেজে ঘুরে বেড়াতেন। নিজেই বলেছেন লোকে নাকি তাঁকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির ছেলে বলে মনে করত।

ছোট বড় মাঝারি সকল কবি-সাহিত্যিকের উপরেই রবীন্দ্রপ্রভাব অল্পবিস্তর পড়েছিল ; গুণমুগ্ধ পাঠকের তো অন্তই ছিল না। কিন্তু এ সমস্তের মূলে যে মানুষটি, তাঁকেই আমরা ভুলতে বসেছি। স্পেন এবং স্প্যানিশ জগতে রবীন্দ্রনাথের বিজয় অভিযান শুরু হয়েছিল হিমেনেথ পত্নী থেনোবিয়া কামপ্রুবির গীতাঞ্জলি অনুবাদের কল্যাণে (১৯১৫)। আগেই বলেছি কবি হিমেনেথ ইংরেজি জানতেন না, তবে স্প্যানিশ অনুবাদটি স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত প্রয়াসেরই ফল। পরবর্তী গ্রন্থসমূহের অনুবাদও দুজনে মিলেই করেছেন। হিমেনেথ পরে নোবেল প্রাইজ লাভ করে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন। পত্নী থেনোবিয়া কবি নন, কাব্য-প্রেমিক। তাঁকে তাঁর প্রাপ্যটুকু কেউ দেয়নি। তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী তথা ভারতীয়দের কাছ থেকে কিছু কৃতজ্ঞতা তিনি অবশ্যই দাবী করতে পারতেন। সুবৃহৎ স্প্যানিশ জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়তা সম্পর্কে আমরা একমাত্র ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকেই জেনে রেখেছি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁকে মস্তবড় সার্টিফিকেট দিয়ে রেখেছেন—'For me the spirit of Latin America will ever dwell in my memory incarnated in your person.' ভিক্টোরিয়া যদি হন সমগ্র স্প্যানিশ আমেরিকার প্রতিনিধি তাহলে হিমেনেথ দম্পতিকে বলতে হবে খাস স্পেনের প্রতিনিধি। ভিক্টোরিয়া সর্বপ্রকারেই অসাধারণ, সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না ; থেনোবিয়াও আদৌ সাধারণ নন, তিনিও অসাধারণ মহিলা। তাছাড়া রবীন্দ্রভক্তিতে এবং রবীন্দ্রকাব্যানুরাগে থেনোবিয়া ভিক্টোরিয়ার চাইতে এক তিল কম নন। ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে আমাদের দেশে আলোচনা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ-ভিক্টোরিয়ার চিঠিপত্রও কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু থেনোবিয়া যে চিঠিপত্র লিখেছিলেন তা প্রকাশিত হয় নি। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুদের মধ্যেও অনেকে ঐসব চিঠির খবর রাখেন না। সেজন্য তিনি এ দেশে একরকম অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছেন। কবিকে তিনি প্রথম যে চিঠিটি লিখেছিলেন সাধ্যমতো তার একটি বাংলা অনুবাদ করে আপনাদের সুমুখে রাখছি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ পেয়েছে, একবার ভেবে দেখবেন।

একেবারে যেন প্রাণটি ঢেলে দিয়ে চিঠিটি লিখেছেন। কত ভয়ে ভয়ে কত ভাবনা চিন্তার পরে। কতখানি দ্বিধা নিয়ে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তা লক্ষ্য করবার মতো। আমি তো যতবার পড়েছি ততবারই মনে হয়েছে—'হে মাধবী, ভীরু মাধবী, তোমার দ্বিধা কেন?' মনে রাখতে হবে যে গীতাঞ্জলির অনুবাদ করেছিলেন ১৯১৫ সালে আর প্রথম চিঠিটি লিখছেন পুরো তিন বছর পরে ১৯১৮ সালে বহু দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে।

এখানে একটি মজার কথা বলছি। হিমেনেথ দম্পতির কথা বলতে গিয়ে সে দেশের একজন লেখক বলছেন—শ্রীমতী থেনোবিয়া কামপ্রুবি এবং রামন হিমেনেথ-এর মধ্যে প্রেমের দৌত্য কার্যটি নিজ অজ্ঞাতসারেই করেছিলেন ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁদের দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ এবং আলাপ-পরিচয় ১৯১৩ সালে। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তখন সমস্ত ইয়ুরোপ তোলপাড়। ইংরেজি জানতেন বলে থেনোবিয়া নিজে থেকেই স্পানিশ ভাষায় গীতাঞ্জলি অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নিজে যে কবি নন। তাই মনে সংশয় ছিল। সেজন্যে সদ্য পরিচিত উদীয়মান কবি হিমেনেথ-এর কাছে তাঁর অনুবাদটি পেশ করেছিলেন। থেনোবিয়ার অনুবাদে রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে হিমেনেথ চমৎকৃত। অনুবাদের কাজে দুজনেই হাত মেলালেন, অজান্তে কখন দুজনের মন গেল মিলে। ১৯১৬ সালে দু'এর বিবাহ। পূর্বোক্ত লেখক বলছেন—Unwillingly the Indian poet played the role of cupid in their courtship—অর্থাৎ কিনা রবীন্দ্রনাথ নিজের অজান্তেই এদের লক্ষ্য করে পঞ্চশরের শর নিক্ষেপ করেছেন। বলেছেন, কোর্টশিপের সময় দুই প্রেমিকের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ উভয়ত এবং অবিরত। যাক্ এবার রবীন্দ্রনাথকে লেখা থেনোবিয়ার সেই চিঠির অনুবাদটি পড়ে দেখুন:

মাদ্রিদ

১৩ই আগস্ট, ১৯১৮

প্রিয় স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

দীর্ঘদিন ধরে আপনাকে মনে মনে কত যে চিঠি লিখেছি তার সীমা সংখ্যা নেই। শেষ পর্যন্ত আজ যখন মনস্থির করে আপনাকে চিঠি লিখতে বসেছি তখন আবার বিশ্বাস হতেই চাইছে না যে এ চিঠি সত্যি সত্যি আপনার হাতে গিয়ে

পৌঁছোবে। সেই সঙ্গে আবার এ কথাও মনে হচ্ছে যে গত চার বছর ধরে যত কথা আপনাকে বলব বলে জল্পনা-কল্পনা করেছি তার কিছুই তো এ চিঠিতে বলা হবে না। আমার স্বামী কেবলই বলেন, "লিখো না, চিঠি লিখতে যেয়ো না। বুঝতেই তো পার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জানেন না, চেনেন না। চিঠিতে তুমি তাঁকে কতটুকু কি বলতে পারবে? কটা দিন সবুর কর, যুদ্ধটা থামতে দাও। তখন রবীন্দ্রনাথ যদি ইংলণ্ডে থাকেন আমরা সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব; না হয় তো একেবারে ভারতবর্ষে গিয়ে সেই যেখানে তিনি তাঁর ইস্কুল করেছেন সেইখানটিতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, সেটাই হবে সব চাইতে ভাল।" কিন্তু ভারতবর্ষ কি কাছে? সে যে দূর দূরান্তর দেশ। তা ছাড়া, সময় কি কারো জন্যে বসে থাকে? যদি কোনোকালে আমাদের সাক্ষাতের সুযোগ না ঘটে, সাক্ষাৎ পরিচয়ের আনন্দ থেকে যদি বঞ্চিত হতে হয় তবে সে দুঃখ রাখবো কোথায়? এই পৃথিবীতে যুগে যুগে কত মহাপুরুষের আগমন হয়েছে, আহা, একটি মুহূর্তের জন্যে যদি তাঁদের কাছটিতে গিয়ে বসতে পারতুম! আর যখন ভাবি তেমনি এক মহামানব আজকের দিনেও এই পৃথিবীতে বর্তমান, অথচ তাঁর দুর্লভ সংস্পর্শের আকাঙ্ক্ষায় এ মুহূর্তে ছুটে না গিয়ে অকারণে সময় বয়ে যেতে দিচ্ছি—এ চিন্তা নিতান্তই অসহনীয়।

আজ তিন বৎসরেরও অধিক কাল ধরে আমরা আপনার কাব্যগ্রন্থ অনুবাদে নিযুক্ত আছি। ভাবছি একটি খণ্ডের কাজ সমাপ্ত হলেও আমরা ভারতবর্ষে গিয়ে আমাদের অনুবাদ আপনার কাছে পেশ করব। আপনার যদি সময় থাকে তাহলে তো কথাই নেই নতুবা আপনার আস্থাবান কোন সুযোগ্য বন্ধুর সহায়তায় মূল বাংলা কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের অনুবাদ যাচাই করে নেবার ইচ্ছা। একটি নিখুঁত সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশেই আমাদের আগ্রহ। দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষায় আমরা অজ্ঞ, বোধকরি সারা স্পেন দেশে একজন মানুষও নেই যিনি বাংলা ভাষা জানেন। কিন্তু ভারতবর্ষ এবং আন্দালুসিয়ার (স্পেন-এর দক্ষিণাঞ্চল) প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীবনযাত্রায় এমন একটি মিল আছে যে আপনার কাব্য পাঠ করে এ দেশীয়দের সকলেরই মনে হয় যেন আপনি তাদেরই ঘর-সংসারের কথা বলছেন। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় আপনার পাঠক সংখ্যা নিঃসন্দেহে ঢের বেশি কিন্তু রসানুভূতির দিক থেকে তারা আমাদের মতো গভীরভাবে আপনাকে পেয়েছে একথা আমি কখনো স্বীকার করবো না। এ দেশের কাব্যামোদীরা আপনাকে যে কতখানি ভালবাসে এবং আপনার কাব্যকে যে কী ভাবে তারা অন্তরে গ্রহণ করেছে তা দেখলে আপনি নিশ্চয় বিস্মিত

হতেন। আমাদের অনেকেরই আপনার এসব গানের সুর শুনবার বড় সাধ হয়; কিন্তু সে সাধ পূরণ করবার কোন উপায় তো এখানে নেই। অবশ্য গান বা কবিতার কথাগুলো এমনিতেই এত সুরেলা যে আমাদের পরিচিত কোন কোন সুরকার আপনার কবিতার ছন্দে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু নতুন সুর সৃষ্টি করেছেন, সংগীত রচনা করেছেন। আমাদের একজন খুব নামী সুরকার কিছুদিন আগে আমাদের বলছিলেন যে 'ডাকঘর' পাঠ করে তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছেন যে 'ডাকঘরে'র কাহিনীটিকে অবলম্বন করে তিনি একটি সিম্ফনি বা সুরধ্বনি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। 'ডাকঘর' এ দেশের মানুষের মনে যতখানি সাড়া জাগিয়েছে একমাত্র 'ক্রেসেণ্ট মুন' (শিশুর কবিতা) ছাড়া আর কিছুতে ততখানি নয়। আপনি যে ভাবে প্রাণ ঢেলে দিয়ে শিশু এবং শৈশবের বন্দনা করেছেন তাতেই আপনি সকলের মন কেড়ে নিয়েছেন। আপনার কাব্যের অনুবাদ পাঠ করে কতজন যে আমাদের অভিন্দন জ্ঞাপন করেছেন এবং এখনও করছেন তার ইয়ত্তা নেই। কত সময় ভেবেছি, এসব অভিনন্দন আপনারই প্রাপ্য এবং সরাসরি আপনাকেই তা নিবেদন করে দেব। আবার ভেবেছি আপনার কাছে বোধকরি এসবের তেমন মূল্য নেই, সেজন্যে নীরব থেকেছি।

আপনার 'জীবনস্মৃতি' পাঠ করে আমাদের বড় আনন্দ হয়েছে এই ভেবে যে ফাদার পেনারান্দাকে (ইনি সেণ্ট জেভিয়ার্স বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক ছিলেন) আপনি জানতেন, শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন। ফাদার পেনারান্দা এবং আমার স্বামী—দুজনেই আন্দালুসিয়া অঞ্চলের অধিবাসী। আমার স্বামী ছেলেবেলায় জেসুইট সম্প্রদায়ের স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। সেখানে ফাদার পেনারান্দার দু-একজন আত্মীয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ফাদার পেনারান্দার সঙ্গে আপনার পরিচয়ের সুবাদে মনে হয়েছিল আপনার সঙ্গে আমাদেরও যেন একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হল। এইকথা ভেবে 'জীবনস্মৃতি' পাঠমাত্র সেই দিনই আপনাকে চিঠি লিখতে প্রায় বসে গিয়েছিলাম।

প্রিয় স্যার রবীন্দ্রনাথ, আশা করছি, দীর্ঘ পত্র লিখে আপনাকে বিরক্ত করছি না। সকল মানুষের প্রতি আপনার অকৃপণ করুণার কথা ভেবে এই আশা পোষণ করছি যে আপনার কাছ থেকে আমার এই চিঠির জবাব আসবে। দীর্ঘদিন লেগে যাবে এই চিঠি ভারতবর্ষে গিয়ে পৌঁছোতে, জবাব আসতে আবার ততদিন। কিন্তু যত দীর্ঘদিনই হোক, আমি আপনার অমলের মতোই আকুল প্রত্যাশা নিয়ে আপনার চিঠির প্রতীক্ষায় বসে থাকব।

থেনেবিয়া কামপ্রুবি দ্ব হিমেনেথ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস মতো চিঠি পেয়েই জবাব দিয়েছিলেন। শ্রীমতী থেনোবিয়া সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিলেন; অনতিবিলম্বে চিঠির জবাব পেয়ে অতিশয় আনন্দিত হয়েছিলেন। পত্রালাপ কিছুকাল অব্যাহত ছিল। কিন্তু ভাবলে খুব দুঃখ হয় যে, একটু চোখের দেখা এবং সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়ের জন্যে এত যাঁরা ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে কোন-কালেই রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়নি। হিমেনেথ দম্পতির ভারতবর্ষে আসা হয়নি, ভ্রাম্যমান রবীন্দ্রনাথেরও স্পেন দেশে যাওয়া হয়নি। থেনোবিয়াকে প্রথম চিঠিতেই কবি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে যুদ্ধ শেষ হলেই তিনি আবার ইয়ুরোপে যাবেন এবং তখন স্পেন-এ তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। ইয়ুরোপে গেলেনও ১৯২১ সালে; স্পেনে যাওয়া স্থির। মাদ্রিদে তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন সম্পূর্ণ, প্রধান উদ্যোক্তা হিমেনেথ দম্পতি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে যাত্রা গেল বরবাদ হয়ে। টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেওয়া হল যে স্পেন ভ্রমণ আপাতত স্থগিত রইল। পরে কখনো হবে। হিমেনেথরা কতখানি যে হতাশ হয়েছিলেন বলবার নয়। টেলিগ্রামটি করেছিলেন বোধকরি কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ। শ্রীমতী থেনোবিয়া মনের দুঃখ রথীন্দ্রনাথকেই লিখে জানাচ্ছেন। বলছেন—কবির জন্যে নির্দিষ্ট বাসগৃহটি তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে নিজ হাতে গোলাপ ফুল দিয়ে সাজিয়েছিলেন। কবির ভক্তরা অজস্র গোলাপ নিয়ে এসেছিলেন দক্ষিণাঞ্চল থেকে—বোধকরি সেই আন্দালুসিয়া থেকে। লিখেছেন, সেই ফুলের রক্তিমাভায় এবং সৌগন্ধে কবি নিশ্চয় উল্লসিত হতেন।

যাহোক, আশা দিয়েছিলেন, পরে যাবেন কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত হয়নি। আশা পূরণ আর হল না। একটু চোখের দেখাও নয়, দুটো মুখের কথাও নয়। তাহলেও স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই রবীন্দ্র ভক্তি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। হিমেনেথের কবি-খ্যাতি যখন দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে প্রসারিত তখনও রবীন্দ্র-রচনা যখনই ইংরেজিতে কিছু প্রকাশিত হয়েছে তখনই স্বামী-স্ত্রীতে মিলে তা অনুবাদ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করেই কয়েকটি কবিতা রচনা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে রচিত একটি কবিতায় নাম—The ashes of Tagore। এটিই বোধকরি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর শেষ কবিতা। পত্নী থেনোবিয়া এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। কবিতাটির একটি বাংলা অনুবাদ সাধ্যমত দেবার চেষ্টা করছি। ইস্পানী থেকে ইংরেজি, ইংরেজি থেকে বাংলা—পথ পরিক্রমায় অনেকখানি নিঃসন্দেহে খোয়া যাবে। তাহলেও দেখুন যেটুকু পাওয়া যায়:

রবীন্দ্রনাথের চিতাভস্ম

বসেছিলাম সমুদ্রবেলায় আমার সেই চেনা স্থানটিতে। ঢেউ-এর দিকে হাত বাড়িয়ে শখ করে নিলাম তুলে খানিকটা ফেনা। ফেনা মিলিয়ে গেলে হাতে যা লেগে রইল, মনে হচ্ছিল যেন ঝিনুকের গুঁড়োর মতো দেখতে তাজা একটু ছাই।

জানি না কেন, আমার মনের একটা কথা হঠাৎ যেন আপনা থেকেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। খুব প্রত্যয়ের সঙ্গে বেশ একটু জোর গলাতেই বলে উঠলাম—'এ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের চিতাভস্ম।'

এমন কথা কেন আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল? তুমি তো শুনেছিলে আর আমার হাতের মুঠোয় ছাইমতো দেখতে সেই ফেনাও দেখেছিলে। হাত থেকে কিছুতেই যাচ্ছিল না, চক্‌চক্ করছিল—একেবারে তাজা, জীবন্ত।

অগ্নিদাহনে এক মহাজীবন ভস্মে পরিণত হয়েছে। গঙ্গা তাকে বহন করে এনে সাত সাগরের জলে মিশিয়ে দিয়েছে। সমুদ্রবাহিত কবিদেহ ভস্মাকারে আজ সমস্ত পৃথিবীর অঙ্গে-অঙ্গে মিশে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের দেহাবশেষ আজ পৃথিবীর সাগরজলে মিশে আছে। এই যে তাঁর দেহভস্ম আমার হাতে এসে লাগল, এ তো অকারণে নয়। একদা আমরা যে তাঁর বিশাল হৃদয়ের স্পন্দনকে আমাদের স্প্যানিশ কাব্যের ছন্দে গেঁথে নিয়েছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পত্র বিনিময় হয়েছিল ১৯১৮তে; পূর্বোক্ত কবিতাটি লিখছেন তার ত্রিশ বছর পরে। দেখা যাচ্ছে ভক্তিতে এতটুকু জঙ ধরেনি। এর কয়েক বছর পরেই ১৯৫৬ সালে নোবেল প্রাইজ লাভ করে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করলেন। রবীন্দ্রনাথের সমগোত্রীয় কবি, এখন সমপর্যায়ভুক্ত হলেন। হিমেনেথ-এর বয়স তখন পঁচাত্তর। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নোবেল প্রাইজের শুভ সংবাদটি এসে পৌছেছিল একটি অশুভ মুহূর্তে। পত্নী থেনোবিয়া তখন অন্তিম শয্যায়। সংবাদটি তিনি শুনেছিলেন মাত্র। নিরানন্দ গৃহে আনন্দোৎসবের আর অবকাশ হয়নি।

স্প্যানিশ জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক রবীন্দ্রজীবনের একটি অতি স্বল্প আলোচিত অধ্যায়। শ্রীমতী থেনোবিয়ার চিঠিটি এবং কবি হিমেনেথ-এর কবিতাটি ঐ স্বল্পালোকিত অধ্যায়টির উপরে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারে বলে মনে করি।

গল্পগুচ্ছের ভূমিকা

ছোটগল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কে আমার জানা নেই। এইটুকু শুধু জানি যে জন্মমুহূর্তেই তিনি পূর্ণযৌবনা—গ্রীক পুরাণে বর্ণিত দেবী প্যালাস এথেনার ন্যায় born in full panoply। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনব্যাপী প্রস্তুতির ইতিহাস আছে, কিন্তু ছোটগল্পের আবির্ভাব যেমন অকস্মাৎ, বিকাশ তেমনি দ্রুত।

সব দেশেই দেখা গিয়েছে ছোটগল্প সাহিত্যের পরিণত বয়সের সন্তান। সাহিত্যে এই এক অভিনব ব্যাপার—আগে বড় জিনিসে হাত পাকিয়ে তবে ছোট জিনিসে হাত দিতে হয়। মহাকাব্য আগে, গীতিকাব্য পরে, উপন্যাস আগে, ছোটগল্প পরে। বলা বাহুল্য এরও সঙ্গত কারণ আছে। ছোট জিনিসের কারুকলা বড় জিনিসের চাইতে সূক্ষ্মতর, সেজন্যেই এর আবির্ভাবে বিলম্ব। সূক্ষ্মকে আয়ত্ত করতে সময় লাগে। কলাকৌশল যথেষ্ট পরিণতি লাভ করলে তবেই সূক্ষ্ম জিনিসের সৃষ্টি সম্ভব। সূক্ষ্ম বলতে বুঝি, যার ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে বৃহতের আভাস লুক্কায়িত। এদিক থেকে বলা যেতে পারে যে প্রত্যেকটি ছোটগল্প এক একটি বালখিল্য উপন্যাস। বালখিল্যগণ আকারে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, তথাপি তাঁরা ঋষি। ঋষিত্বের পরিমাপ গঠনে নয়, মননে। ছোটগল্পের কৃতিত্ব তার বিস্তারে নয়, গভীরতায়।

সাহিত্যের যত সন্তান-সন্ততি আছে, ছোট গল্প তার মধ্যে সব চাইতে বয়ঃকনিষ্ঠ। বাংলা ছোটগল্পের বয়স পঁচাত্তরের বেশি নয়। অথচ বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ছোটগল্পের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে এমন আর কিছুতে নয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রথম গল্প রচয়িতা। গল্পগুচ্ছে যে শিশুর জন্ম গল্পগুচ্ছতেই তার পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্তি। ক্ষণে ক্ষণে তার মূর্তি বদল হয়েছে। হিতবাদী এবং সাধনার পাতায় যাকে দেখেছি কমনীয় কান্তি, সবুজপত্রে তার পেশী সবল সুদৃঢ় মূর্তি। বাংলা ছোটগল্পের জন্ম এমন একটি শুভমুহূর্তে হয়েছে, যখন বাংলা সাহিত্য প্রাদেশিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্যের ধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তার ফলে জন্মমুহূর্তেই ও প্রবীণের সমাজে ভিড়েছে। অর্বাচীনের দলে ওকে অনাবশ্যক কাল কাটাতে হয়নি। কাব্য-সাহিত্যে, গদ্যসাহিত্যে গোড়ার দিকে আমরা আধ আধ বুলি শুনেছি। কিন্তু আমাদের কথা-সাহিত্যের মুখে প্রথমেই পাকা কথা। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের যুগ আমাদের

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ। সেই যুগে জন্মেছে বলে তার সমস্ত প্রসাদগুণ ও একাধারে লাভ করেছে।

গল্প মানুষের মনকে যেমন টানে এমন আর কিছুতে নয়। এজন্যে আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সাহিত্য প্রধানত গল্পই বলে আসছে। মহাকাব্য যখন লেখা হয়েছে তখনও কবিরা গল্প উপন্যাসই লিখেছেন তবে ছন্দোবদ্ধ কাব্যে লিখেছেন। অবশ্য যাঁদের সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁরা আমাদের চেনা-জানার আওতায় নয়; তাঁরা দেবদেবী, রাজা-রাজড়া, বাদশা-বেগম। গল্প উপন্যাসের পাত্র হিসাবে আজকের দিনে এঁরা অপাত্র। প্রকৃত গল্প উপন্যাসের সৃষ্টি তখনই হয়েছে যখন কবি সাহিত্যিকরা একথা উপলব্ধি করেছেন যে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনই একেকটি গল্প। এ গল্পের যে রোমাঞ্চ তার সঙ্গে আর কোন রোমাঞ্চের তুলনাই হয় না। আমরা যখন কোন ঘটনাকে উল্লেখ করে বলি গল্পের চাইতেও রোমাঞ্চকর তখন 'গল্প' কথাটাকে আমরা কদর্থে ব্যবহার করি। ধরে নিই যে গল্প জিনিসটা একটা অবাস্তব উদ্ভট ব্যাপার, সত্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। গল্প যখন প্রগলভতা প্রকাশ করে, বলে, সত্যকেও হার মানিয়েছি তখনই সে আত্মঘাতী হয়। মানুষের জীবনই চরমতম রোমাঞ্চ! সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, রাগ-বিরাগ, ভাল-মন্দের কত ঘাত-প্রতিঘাত। চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার, সদিচ্ছার সঙ্গে স্বভাবের, দৃষ্টের সঙ্গে অদৃষ্টের, দৈবের সঙ্গে জৈবের সংঘাতে আবর্তন! নদী যেমন নিত্যবহমান জলধারা, মানুষ তেমনি নিত্য-বহমান গল্পের প্রবাহ। তাই পরস্পর দেখা হলেই প্রশ্ন, এই যে কি হল হে, কি খবর, তারপরে? এই তারপরের সঙ্গে 'তারপরে' বোনা হয়ে পৃথিবী জুড়ে মানুষের গল্প গাঁথা হচ্ছে। একেই বলে জীবনের কাহিনী। গল্প-উপন্যাসই মানুষের প্রকৃত ইতিহাস।

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই গল্প আছে, যিনি গল্প লেখেন তাঁর জীবনে তো বটেই। বহু অভিজ্ঞতায় মন যাঁর সমৃদ্ধ তিনিই গল্প বলার অধিকারী। কাব্য-সাহিত্য প্রধানত বহুদর্শনের ফল। বহুদর্শনের সুযোগ সকলের জীবনে আসে না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অভিজাত বংশোদ্ভবের পক্ষে সে সুযোগ সহজলভ্য ছিল না। এদিক থেকে গল্পগুচ্ছ রচনার ইতিহাসটিকেই একটি গল্প বলা যেতে পারে। আগেই বলেছি রবীন্দ্রজীবনের অন্যতম বৃহৎ ঘটনা জমিদারি পরিচালনার ভার-গ্রহণ। কবি মানুষকে কেউ জেনে-শুনে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেয় না। মহর্ষির ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি আর সব ছেলেকে বাদ দিয়ে কি ভেবে সর্বকনিষ্ঠ কবি-পুত্রটির হাতেই উক্ত ভার অর্পণ করেছিলেন তা বুঝে ওঠা কঠিন। কবিপুত্র

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এ নিয়ে পরিবারে খানিকটা মন কষাকষিরও সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বলা আবশ্যক যে মহর্ষি নানা ব্যাপারেই অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি যে প্রতিভা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা মেলা ভার। তাঁর কবি-পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তিনি যেমন সুস্পষ্টভাবে দেখেছিলেন এমন আর কেউ নয়। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিপ্রতিভার প্রথম পুরস্কার পিতার হাত থেকেই পেয়েছিলেন। কবিকে পুরস্কৃত করা রাজার কর্তব্য, দেশে আজ রাজা নেই, সে কর্তব্য আমাকেই পালন করতে হল—মহর্ষির এই উক্তি দৈববাণীর ন্যায়।

দেশের যিনি মহাকবি হবেন, দেশ সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। জমিদারি পরিচালনার ভার চাপিয়ে দিয়ে দেশকে জানবার এবং চেনবার পথ মহর্ষি সুগম করে দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে তিনি আগেও উৎসাহ দিয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে যৌবনারম্ভে রবীন্দ্রনাথের একবার খেয়াল গিয়েছিল গরুর গাড়িতে করে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে পেশোয়ার পর্যন্ত যাবেন। পরিবারস্থ কেউ এ প্রস্তাব অনুমোদন করেননি। 'কিন্তু পিতাকে যখনই বলিলাম তিনি বলিলেন, এ তো খুব ভালো কথা ; রেল গাড়িতে ভ্রমণকে কি ভ্রমণ বলে।' (জীবনস্মৃতি)। মহর্ষি নিজে যে একসময়ে পদব্রজে এবং ঘোড়ার গাড়িতে নানা স্থান পর্যটন করেছিলেন সে সব কথাও উৎসাহের সঙ্গে পুত্রকে বলেছিলেন। যা হোক মহর্ষির মনে যে উদ্দেশ্যই থাক একথা নিশ্চিত যে জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দেবতার বর লাভের ন্যায় হয়েছে। এটি তাঁর জীবনের এক বৈপ্লবিক ঘটনা। এ যাবৎ রবীন্দ্রনাথের জীবন কেটেছে আপন পরিবারের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে—অনেকটা যেন এক বিরল বসতি দ্বীপের অধিবাসীর মতো। দেশের জনসমাজ থেকে তিনি একেবারেই বিচ্ছিন্ন ছিলেন। 'ছবি ও গান'-এর ভূমিকায় নিজেই বলেছেন: 'আমি ছিলাম বাতায়নবাসী, বৃহত্তর সংসারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না।' মনের পরিণতির জন্য এই যোগাযোগ অত্যাবশ্যক ছিল। এতদিনে সেই শুভ যোগাযোগ ঘটল। দেশের কবি এই প্রথম দেশকে দেখলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'বাংলাদেশের হৃদয়ে সেই প্রথম প্রবেশ করেছি।' সেই প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্রটি 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। আমি গল্পগুচ্ছের ভূমিকা লিখতে বসেছি কিন্তু গল্পগুচ্ছের প্রকৃত ভূমিকা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই লিখে গিয়েছেন। ছিন্নপত্র একাধারে গল্পগুচ্ছের ভূমিকা এবং টীকাগ্রন্থ। অনেক গল্পের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে এখানেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। কোন্ কোন গল্পের পরিবেশ এবং পটভূমিকাও এই গ্রন্থের নানা

বর্ণনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজমুখের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—"ছিন্নপত্র যখন লিখছিলুম—স্রোতের শেওলার মত ছোট ছোট দৃশ্য ঘটনা সেই সঙ্গে ভেসে এসেছিল…তখনই লিখলুম 'গল্প সপ্তক'।"

শিলাইদহ এবং পতিসরে যখন নিয়মিত কাছারি করতে শুরু করলেন তখন দেশের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হল। দেশ বলতে শুধু তো দেশের মাটি নয়। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, দেশ জিনিসটা মৃন্ময় নয়, চিন্ময়। অর্থাৎ দেশ বলতে বোঝায় দেশের মানুষ। সে মানুষ যে কী দরিদ্র কী অসহায়—এ তিনি নিজ চোখে না দেখলে কখনো বিশ্বাস করতেন না। নদীমাতৃক বাংলার পল্লীশ্রী একদিকে যেমন তাঁকে মুগ্ধ করেছে, এই একান্ত দুর্বল অসহায় মানুষগুলিও তেমনি তাঁর মনকে নিরন্তর টেনেছে। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে বলেছেন, এখানকার শস্যক্ষেত্রে এবং স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে এবং লোকালয়ে মানুষ যে সুখদুঃখময় ভালবাসার নীড় রচনা করেছে, এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মত এমন আপনার ধন আর কোথায় পাওয়া যেত। বলেছেন, 'আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে, 'আমি দেবতার মেয়ে কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারিনে। জন্ম দিই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে।…এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর…।' সংসারের সমস্ত ট্র্যাজেডির মূলেই এই কথা—মানুষ অসহায়, জীবন অসম্পূর্ণ। গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পেই এই ট্র্যাজেডির সুরটি আছে। ছিন্নপত্রের ১৮নং চিঠিটি (ঐ যে মস্ত বড় পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ইত্যাদি) গল্পগুচ্ছের বহু গল্পের পটভূমিকা রচনা করেছে। গল্পগুচ্ছের মূল সুরটি ঐ একটি চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে।

এই জন্যই বলছিলাম যে গল্পগুচ্ছের প্রথম অলিখিত গল্পটি হল রবীন্দ্রনাথের জমিদারি পরিচালনার ভারগ্রহণ। এ যদি না করতেন তো বাংলাদেশকে চেনা হত না, দেশের মর্মস্থলে কখনো পৌছোতে পারতেন না। অবশ্য এ পরিচয় না ঘটলেও গল্প-উপন্যাস হয়তো তিনি লিখতেন কিন্তু সে গল্প হত ইতিহাসের মোড়কে ঢাকা বৌঠাকুরানীর হাট, মুকুট, দালিয়া জাতীয় গল্প। বড়জোর কবি-মনের যাদু মিশিয়ে 'ক্ষুধিত পাষাণ' বা 'দুরাশা' গল্পের কুয়াশাচ্ছন্ন মোহের সৃষ্টি করতে পারতেন। ঐ গল্পে অপূর্ব রসের সৃষ্টি করেছেন সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না। তথাপি বলতে হবে এ ঠিক গল্প নয় কাহিনী। খুব ফিকে ধরনের

হলেও এখানেও ইতিহাসের একটু ছোপ লেগেছে। সত্যিকারের গল্পের জন্ম হল পদ্মাতীরে লোকালয়ের কোলে আমাদের একান্ত পরিচিত লোক-সমাজকে আশ্রয় করে। গল্পগুচ্ছের প্রথম দুটি গল্প—ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা গল্প নয়, গল্পের ছাঁচে ঢালা, আজকাল যাকে বলে রম্যরচনা। ভারতীতে প্রকাশিত এ দুটি গল্প লেখা হয়েছিল ১২৯১ সালে, তখনও ছিন্নপত্রের বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি। গল্পগুচ্ছের প্রথম আসর বসেছে সাপ্তাহিক হিতবাদীর পাতায়। প্রথম খাঁটি গল্প 'দেনাপাওনা' ১২৯৮ অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৯১ সালে লেখা; ততদিনে সাজাদপুর, পতিসর, শিলাইদহ অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর মোটামুটি পরিচয় হয়ে গিয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার কথা যে ইতিপূর্বে ছিন্নপত্রের যে চিঠিটির কথা আমি উল্লেখ করেছি সেটিও ঐ ১৮৯১ সালে লেখা। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে গল্প রচনার উপযোগী মেজাজটি তখনই তৈরি হয়েছে।

বাংলাসাহিত্যে বাংলাদেশের নিবিড়তম ছবি সর্বপ্রথম ফুটে উঠল গল্পগুচ্ছের গল্পে। বাংলাদেশের নদী-জল, আকাশ-বাতাস, আলো-আঁধারি—প্রতিটি গল্পের মজ্জায় মিশে গিয়েছে। পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে পল্লীবাসীর মানুষের স্বভাব মিশে গিয়ে প্রত্যেকটি গল্পকে বিশেষ একটি বাঙালী চরিত্র দিয়েছে। গল্পগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ যতখানি বাঙালী, এমন আর কোথাও নন। তাঁকে বাঙালী কবি, বাঙালী নাট্যকার বললে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অস্বীকার করে শুধু ভৌগোলিক পরিচয়টিকে স্বীকার করা হয়। কিন্তু গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে বাঙালী গল্প রচয়িতা। আমাদের আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, সরলতা-কপটতা, শত্রুতা-মিত্রতা, হিংসা-বিদ্বেষ, স্নেহ-প্রেম, ঔদার্য-মাধুর্য, সমস্ত মিলিয়ে বাঙালী জীবনের একটি সমগ্ররূপ এখানে ফুটে উঠেছে। অবশ্য আপন দেশের মানুষকে ভাল করে জানলেই সকল দেশের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রটি খুঁজে পাওয়া যায়। সব দেশেরই শ্রেষ্ঠ গল্প রচয়িতা একান্তভাবে আপন দেশের কথা বলেছেন এবং সেই কথাই সকল দেশের সকল মানুষের কথা হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'লোকের চিত্ত থেকে দেশের মাটির থেকে, বিশ্বের রস আকর্ষণ করেছি।' (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ)।

আমি যাকে গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্প বলছি, সেই 'দেনা-পাওনা' গল্পটি বাঙালী জীবনের একটি অতি পুরাতন মর্মবেদনার ইতিহাস নিয়ে রচিত। কন্যার বিবাহে বরপক্ষের দাবি মেটানো যে কী প্রাণান্তকর এবং মেটাতে না পারলে কী মর্মান্তিক তার পরিণতি, বাংলাদেশের পিতামাতা এককালে তা মর্মে মর্মে টের পেয়েছে। কন্যার পিতার মত অসহায় জীব সংসারে কমই ছিল। এই ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের

মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। এ-জন্যে ঐ বিষয়টি একাধিকবার তাঁর গল্পে ফিরে ফিরে এসেছে। দেনাপাওনার বহুকাল পরে লেখা 'অপরিচিতা' গল্পে ঐ একই সমস্যা, 'হৈমন্তী' গল্পেও এরই আভাস। গোড়ার দিকের বেশির ভাগ গল্পেই একটি বিষাদের আভাস আছে। ঐ যে ছিন্নপত্রের পূর্বোল্লিখিত চিঠিতে বলেছেন, আমাদের এই পৃথিবীর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ ছায়া লেগে আছে, প্রথম যুগের অধিকাংশ গল্প সম্বন্ধেই ঐ কথাটি বলা চলে। এদেরও মুখে একটি বিষাদের ছায়া লেগে আছে। বিশ্বসংসারের মধ্যে কোথাও একটা যেন অসম্পূর্ণতা আছে—কোন কাজের আরম্ভ যে-ভাবে, অবসান সে-ভাবে হয় না, কাছের মানুষ দূরে চলে যায়, আত্মীয় অনাত্মীয় হয়ে ওঠে। মিলন সেখানে বিচ্ছেদের ছায়ায় ম্লান, জীবন মৃত্যুর ভয়ে ম্রিয়মাণ। ছিন্নপত্রের সেই চিঠির কথাই বারংবার মনে আসে। মাতা বসুন্ধরার আদিমতম বেদনাটি নিয়ে মানব-সন্তানের জন্ম হয়েছে—'আমি ভালবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে, আরম্ভ করি সম্পূর্ণ করতে পারিনে, জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে।' বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যে একটি অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ-বেদনা আছে, 'পোস্ট-মাস্টার', 'ব্যবধান' ইত্যাদি গল্পে তারই প্রকাশ। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, 'যেতে নাহি দিব' কবিতা এবং 'পোস্টমাস্টার' গল্প একই সময়ে—১২৯৮-৯৯ সালে লেখা। মৃত্যু যে কী ভয়ঙ্কর ব্যবধানের সৃষ্টি করতে পারে, 'জীবিত ও মৃত' গল্পের কাদম্বিনী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মরলে তো কথাই ছিল না, মরেছে এই ভ্রান্ত ধারণার ফলেই বিশ্বসংসারে তার আর স্থান হল না। 'তাহার চতুর্দিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।' একদিকে যেমন বিশ্বসৃষ্টির রহস্য, অপরদিকে তেমনি বিশ্বপ্রকৃতির আত্মীয়তা এই সব গল্পে বিশেষ একটি পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। কোথাও কোথাও প্রকৃতিদেবী স্বয়ং একটি চরিত্র হিসাবে দেখা দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সুভা' গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখোমুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।' মূক বধির কন্যা সুভার ট্র্যাজেডি আর কিছু নয়, পরিচিত প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে তার বিচ্ছেদ। 'আপদ' এবং 'অতিথি' গল্পের দুই বালক নীলকান্ত এবং তারাপদ বাংলা পল্লীপ্রকৃতির দুই সন্তান। আকারে প্রকারে মনে হয়, দুই যমজ ভ্রাতা, কিন্তু স্বভাবে বিপরীত—একটি স্নেহের কাঙাল, আঁকড়িয়ে ধরতে চায়, অপরটি স্নেহ-প্রীতির কোন বন্ধনে ধরা দিতে নারাজ, সে নিরুদ্দেশের যাত্রী। অধিকাংশ গল্পেই একটি প্রচ্ছন্ন বেদনায় আকাশ বাতাস মন্থর; মেঘ ও রৌদ্র দুই-য়ে মিলে এক করুণ মধুর মায়া বিস্তার করেছে।

বেশির ভাগ গল্পেরই মর্মকথাটি—'সব-সুখ-দুখ-মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এসো হে।' এর মানে এই নয় যে, গোড়ার দিকের গল্পে বৈচিত্র্যের কিছু অভাব আছে। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির বিচিত্র লীলা মিশে আশ্চর্য বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। অতিশয় সরলচিত্ত গ্রাম্য মানুষের জীবনেও আকস্মিক বিপাকে বিষম জটিলতার সৃষ্টি হয়। দুখিরাম রুই আর ছিদাম রুই যেমন, তাদের ঘরের বউ চন্দরাও তেমনি মাটি কাদা, রোদে জলে মেশা পঞ্চভূতে গড়া আদিম প্রকৃতির মানুষ। 'এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।' অতিশয় সরল চিত্ত বলেই এদের ক্রোধ যেমন হিংস্র, অভিমান তেমনি প্রচণ্ড। মিথ্যা বলতে শেখেনি, অনভ্যাসের মিথ্যা অনর্থ বাধায়, নিরপরাধের মৃত্যু ঘটায়। এমন নিটোল নিখাদ গল্প (শাস্তি) সাহিত্যে বিরল। চন্দরার দেহ সৌষ্ঠবের সঙ্গে গল্পটির অঙ্গ সৌষ্ঠবের যথেষ্ট মিল আছে। 'শরীরটি অনতিদীর্ঘ, আঁটসাঁট, সুস্থসবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব আছে যে, চলিতে-ফিরিতে নড়িতে-চড়িতে দেহের কোথাও কিছু বাধে না···কোথাও কোন গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই।' গল্পটির মধ্যেও কোথাও এতটুকু শিথিলতা নাই।

ক্রমে সংসারের ক্ষয়-ক্ষতি, বিচ্ছেদ-বেদনা ছাড়াও জীবনের নানা রহস্য, নানা কৌতুক উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল। গল্পের আসর বিস্তৃত হল, গ্রাম ছাড়িয়ে শহরে এল। শহরে শিক্ষিত মানুষের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা গল্পের বিষয়বস্তু হল। ছোটগল্পের অন্যতম প্রধান উপাদান প্রেম। রবীন্দ্রনাথ যে প্রেমের গল্প লিখেছেন, তা স্বাদে গন্ধে একেবারেই আলাদা। 'নষ্টনীড়' অনন্য চরিত্রের গল্প। অনন্য এই কারণে যে, সমস্ত গল্পটি প্রেমের রসে অভিষিক্ত, কিন্তু প্রেমের কথা একটিও নাই। অনির্বচনীয়কে রবীন্দ্রনাথ বচন দেবার চেষ্টা করেননি। চারু এবং অমল kindred spirit, এরা একজন আরেকজনের মনকে টানবেই, চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তেমনি। নিরাকার ব্রহ্মের ন্যায় প্রেমও নিরাকার। বাতাসকে যেমন চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, প্রেমও তেমনি—ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু সমস্ত দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আধুনিকরা যাই বলুন, সত্যকারের প্রেমের স্বরূপ এ-ই। 'নষ্টনীড়' এবং 'পয়লা নম্বর' গল্পের বিষয়বস্তু এক। উভয় আখ্যায়িকাতেই নীড় নষ্ট হয়েছে। শেষোক্ত গল্পে অনিলা এবং সিতাংশুমৌলি kindred spirit নয়, বরং দু'জনকে বিপরীতধর্মী বলা চলে। তথাপি পুরুষের পৌরুষ রমণীর মনকে টেনেছে। পণ্ডিতম্মন্য অহংসর্বস্ব স্বামীটি যখন বড় বড় তত্ত্বকথার আলোচনা করেছেন, প্রতিবেশী

সিতাংশুমৌলি তখন অশ্বচালনায়, এসরাজ বাজনায় কিংবা টেনিস খেলায় অনায়াস নৈপুণ্যের দ্বারা রমণীর মনকে জয় করেছে। স্বামীর মুখে যখন বড় বড় আদর্শের বাণী উচ্চারিত হয়েছে প্রতিবেশীর গোপন লিপিতে তখন রমণীর স্তবগান ধ্বনিত হয়েছে। প্রণয়-প্রার্থীর প্রতি প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ের কোন প্রমাণ নেই অথচ তার প্রতি রমণীর গোপন অনুরাগটি জানতে বাকি থাকে না। এখানেই গল্পের মহিমা। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এক্ষেত্রেও প্রেম নিরাকার। অনিলা যদি গিয়ে সিতাংশুমৌলির কাছে আত্মসমর্পণ করতেন তো গল্পের ছন্দপতন হত। 'একরাত্রি' গল্পে এক পুরুষ এবং এক রমণী ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাতে একান্ত নির্জনে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল। একে অন্যের পরিচিত, বাল্যকালে একসঙ্গে পাঠশালায় গিয়েছে, খেলাধূলা করেছে, একদা বিবাহ-বন্ধনের প্রস্তাবও উত্থাপিত হয়েছিল, তথাপি বাক্য বিনিময় মাত্র হল না অথচ একে অন্যের উপস্থিতির রোমাঞ্চ সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করেছে। ব্রাউনিং-এর 'The last ride together' কবিতার নায়কের উক্তি স্বভাবতই মনে হবে—who knows but the world may end to-night? সেই রাত্রি যদি অনন্ত-রাত্রি হত, তবে আর কথা ছিল না, কিন্তু রাত্রি শেষ হল, দুর্যোগেরও অবসান হল। 'সুরবালা কোন কথা না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, আমিও কোন কথা না বলিয়া আমার ঘরে গেলাম।' আজকের দিনের পাঠক এ-কে সহজে মেনে নেবেন না, তাঁরা বলবেন, রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ককে মানেননি, সামাজিক সম্পর্কটাকেই মনে রেখেছেন; পরস্ত্রী আর পরপুরুষের বাধা অতিক্রম করতে পারেন নি। দেহ এবং মন—দুই নিয়ে মানুষ। কোনটাই অপ্রধান নয়। রুচি অনুযায়ী কেউ একটিকে প্রাধান্য দেন, কেউ অপরটিকে। কিন্তু তাই বলে একজন খাঁটি কথা বলছেন, অপরজন বেখাঁটি এমন কথা কেউ বলবে না। তবে একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, রবীন্দ্রনাথ মদনকে মনোজাত মনসিজ হিসাবেই দেখেছেন।

বাঙালী পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটিকে রবীন্দ্রনাথ নানা দিক থেকে নানা ভাবে বিশ্লেষণ করে দেবার চেষ্টা করেছেন। এই বিষয়টিকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ, প্রধাণত এর উপরেই সংসারের সুখ-শান্তি নির্ভর করে। আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটিকে শাস্ত্র এবং সমাজ বিধানের দড়িদড়া দিয়ে যথাসাধ্য মজবুত এবং টেকসই করে বাঁধবার চেষ্টা হয়েছে, তথাপি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি করে ধীরে ধীরে estrangement বা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, এই সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি গল্প রচনা করেছেন। সম্পর্কটা

এত বেশি স্পর্শকাতর যে, সহজেই বন্ধন শিথিল হবার আশঙ্কা থাকে এবং একবার ভাঙচুর ঘটলে সহজে আর জোড়া লাগে না।

'একটা জড়পদার্থ ভাঙিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু দুটি মানুষকে যেখানে বিচ্ছিন্ন করা হয়···পরে আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না। কারণ, মন জিনিসটা সজীব পদার্থ, নিমেষে নিমেষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্তন।' (দিদি, গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ড)। 'দিদি' এবং 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের বিষয়বস্তু এক। উভয় ক্ষেত্রেই এক তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাবে একে অন্যের প্রতি একান্ত অনুরক্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হল। একটিতে এক শিশুভ্রাতার প্রতিপালন, অপরটিতে প্রথমা পত্নীর আগ্রহাতিশয্যে সপত্নী গ্রহণ—দুর্দৈবের কারণ। দু ক্ষেত্রেই ঘোরতর ট্র্যাজেডি—একটি মরণান্তিক, অপরটি মর্মান্তিক। 'নিশীথে' গল্পের বিষয়বস্তু অনুরূপ কিন্তু গল্পের গঠনপ্রণালী ভিন্নরূপ, অধিকতর চমকপ্রদ। 'দৃষ্টিদান' গল্পটি একই শ্রেণীভুক্ত; পূর্বোক্ত গল্পগুলির মত এখানেও একটি ট্র্যাজিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু অকস্মাৎ সেটি কমেডিতে পরিণত হয়েছে। এই কারণে গল্পটি অন্য গল্পগুলির মত সুসম্বদ্ধ নয়, একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত। অর্থাৎ গল্পটা যেভাবে শুরু হয়েছে সেভাবে শেষ হয়নি, শেষটুকু অনাবশ্যকরূপে নাটকীয়। যে মানুষ আপন দুরদৃষ্টকে বিধাতার অভিপ্রায় বলে মেনে নিয়েছে তার জীবনে নাটকীয়তার অবকাশ কোথায়? অপরপক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে 'মানভঞ্জন' গল্পে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটি খুব স্বাভাবিক ভাবেই নাটকীয় পরিণতি লাভ করেছে। পারস্পরিক ভালবাসার উপরেই উক্ত সম্পর্কটি স্থাপিত; সেই ভালাবাসা মানুষের সূক্ষ্মতম অনুভূতি। এর উপরে কোন প্রকার জবরদস্তি চলে না। অনাবশ্যক ভার চাপাতে গেলে সমস্ত সৌধটি ধসে পড়বার আশঙ্কা। অপরপক্ষে ভালবাসার যাদুবিদ্যা যার জানা আছে নিতান্ত অকরুণার মনকেও সে জয় করতে পারে। 'সমাপ্তি' গল্পের অপূর্ব সে কথাটি প্রমাণ করে দিয়েছে। ভালবাসা এমন জিনিস, একদিকে যেমন মানুষকে অন্ধ করে অপরদিকে তেমনি তাকে দিব্যদৃষ্টি দান করে। 'ত্যাগ' গল্পটি এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হেমন্ত কুলীন ব্রাহ্মণ, না জেনে বিয়ে করেছে এক কায়স্থ কন্যাকে। প্রকৃত তথ্য যেদিন জানল বহুযুগের সংস্কারে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। জাত বাঁচাবার জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করাই স্থির করেছিল। কিন্তু ভালবাসা যেখানে অকৃত্রিম সেখানে জাতি ধর্মের ব্যবধান যে কত কৃত্রিম তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। হেমন্তও বুঝতে পেরেছে। সমস্ত সংস্কার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলতে পেরেছে, 'আমি

স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।' পিতা হরিহর গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, 'জাত খোয়াইবি ?' হেমন্ত কহিল, 'আমি জাত মানি না।'

উপরে যে ক'টি গল্পের করেছি তার সব ক'টিই ১২৯৯-১৩০৫ সালের মধ্যে লেখা। মনে হয় একটা সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টা নিয়ে নানা দিক থেকে ভেবেছেন। এর বহুদিন পরে ১৩২১-২২ সালে এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের গল্পে আবার ফিরে এসেছে। 'হালদার-গোষ্ঠী', 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর' গল্পের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব গল্পে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটেছে সেটা কোন সংঘাতের ফলে নয়, চারিত্রিক বৈষম্যের ফল। 'হালদার-গোষ্ঠী' এবং 'স্ত্রীর পত্র'—গল্প দুটি একই theme-এর variation। বনেদী পরিবারের ছেলে বনোয়ারীলাল একটু বিশেষ ধরনের মানুষ, গতানুগতিক জীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা ; এজন্য বনেদী পরিবারের হাল-চলের সঙ্গে নিজেকে সে একেবারেই মেলাতে পারেনি। কিন্তু কৌতুকের বিষয় যে বনোয়ারীলালের স্ত্রী কিরণ বাইরে থেকে এসেও এই পরিবারের জীবনযাত্রার সঙ্গে অতি সহজে নিজেকে খাঁজে খাঁজে মিলিয়ে নিয়েছে। হালদার-গোষ্ঠীর বড় বউ হবার যোগ্যতা যে পরিমাণে সে অর্জন করেছে ঠিক সেই পরিমাণে বনোয়ারীলালের কাছ থেকে সে দূরে সরে গিয়েছে। এর ঠিক উল্টোটি ঘটেছে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে। এখানেও একটি বনেদী পরিবার, স্বামীটি বনেদী পরিবারের আদর্শ সন্তান, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার বাইরে কখনো পদক্ষেপ করেন না। এঁর স্ত্রী মৃণাল এ পরিবারের পক্ষে বেমানান তো বটেই বিপজ্জনকও বলতে হবে। কারণ স্ত্রীলোকের যা থাকতে নেই তাই ওর আছে—আছে প্রচুর পরিমাণ বুদ্ধি, তার ওপরে আবার কবিসুলভ একটি মন। এমন মেয়ে সাবেকী চালের নিতান্ত গতানুগতিক জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবে কি করে ? 'পয়লা নম্বর' গল্প এরও তিনবছর পরে লেখা। এ গল্পের তুলনা নেই। স্ত্রী অনিলা ধরণীর ন্যায় ধৈর্যশীলা, কিন্তু স্বামীর হৃদয়হীন শুষ্ক পাণ্ডিত্যের দৌরাত্ম্য সেও সহ্য করতে পারেনি। আশ্চর্যের বিষয় যে অত্যন্ত অরসিক স্বামীটিকে নিয়ে কবি অপূর্ব রসের সৃষ্টি করেছেন। ঐ আত্মকেন্দ্রিক স্বামীটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ যতখানি শ্লেষ বর্ষণ করেছেন আর কোথাও কারো প্রতি এতখানি করেছেন বলে মনে হয় না। অপরপক্ষে এই গল্পের রমণী যে এতখানি কম কথা বলে নিজেকে এমন নির্বাক নির্বিকার রেখেও এতখানি মাধুর্য বিকীর্ণ করতে পেরেছে—চরিত্র রূপায়নে এটি অপূর্ব কলাকুশলতার পরিচায়ক।

এ পর্যন্ত আমার আলোচনা প্রধানত গল্পগুচ্ছের প্রথম তিন খণ্ড নিয়ে।

চতুর্থ খণ্ডের গল্প ভিন্ন জাতের, এর স্বাদ-গন্ধ আলাদা। প্রথম দিককার গল্প বেশির ভাগ গ্রাম বাংলার গল্প, পদ্মাতীরে বসে লেখা। বোধ করি সেই কারণেই ঈষৎ একটি আর্দ্র হাওয়া প্রতিটি গল্পের মধ্যে প্রবাহিত। তাতে গল্পগুলিকে ভারি একটা সজীবতা দিয়েছে। যেখানে শহুরে শিক্ষিত মানুষের কথা বলেছেন সেখানেও সেই সজীবতা অব্যাহত অথচ কোন প্রকার উগ্রতা নেই। গ্রামের গল্প গ্রাম্য-দোষ মুক্ত, শহুরে গল্পগুলিও আত্যন্তিক নাগরিক দোষে দুষ্ট নয়। কিন্তু শেষ পর্বের গল্প ক'টি ভয়ঙ্কর রকম শহুরে গল্প। ভালমন্দের প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় এদের স্বভাব আলাদা। গ্রামের হোক, শহরের হোক আদ্য মধ্য পর্বের গল্পগুলিতে একটা open-air atmosphere ছিল, শেষ পর্বে এসে হঠাৎ যেন গল্পগুলো হুড়মুড় করে খুব একটা ফ্যাসনেবল্ ড্রইংরুমে ঢুকে পড়েছে। সেখানকার ঝকঝকে গৃহসজ্জা আর ঝলমলে আলো যেমন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, এদের বাকচাতুর্য তেমনি ভালমানুষ পাঠকদের বিভ্রান্ত করে তোলে। সবাই ভয়ঙ্কর রকমের তুখোড় লোক—বিদ্যায় বুদ্ধিতে বাক্যে কর্মে। আগেকার গল্পে মানুষগুলোকে যতখানি পরিচিত মনে হয় এরা ততখানি নয়। বলা বাহুল্য যাঁরা এসব গল্পের পাঠক তাঁরা বেশির ভাগ উচ্চশিক্ষিত শহুরে মানুষ কিন্তু তাঁদেরও অনেকের কাছে এরা—অভীক, বিভা, ডক্টর সেনগুপ্ত, অচিরা, নন্দকিশোর, মোহিনী, নীলা—খুব যে একটা পরিচিত এমন মনে হয় না। অথচ শহুরে পাঠকদের কাছেও গল্পগুচ্ছের গ্রামবাসীরা তেমন অপরিচিত মনে হবে না। খাঁটি মানুষ কারো কাছেই অপরিচিত নয়, অপরপক্ষে কৃত্রিম মানুষ সকলের মনেই সন্দেহের উদ্রেক করে। রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে' মালতী বলেছিল,

> রাম রাম! এত মেয়েও আছে সে দেশে,
> এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়!
> আর তারা কি সবাই অসামান্ত,
> এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা!

এই গল্পগুলো পড়লে আমাদেরও সেই কথাই মনে হয়—এত ছেলেমেয়ে আছে আমাদের এই পোড়া দেশে যারা সবাই অসামান্ত, যাদের এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা!

লক্ষ্য করবার বিষয় যে রবীন্দ্রকাব্যে আদ্য মধ্য অন্ত্য কোন পর্বেই Sophistication নেই কিন্তু অন্ত্য পর্বের গল্প অতিমাত্রায় sophisticated। এটা অস্বাভাবিক এমন কথা বলব না, কারণ সমাজজীবনে sophistication এলে সাহিত্যের কোন না কোন বিভাগে তা প্রতিফলিত হবেই। আমার শুধু

বক্তব্য এই যে, এ গল্পগুলোর স্বভাব আলাদা। 'শেষের কবিতা'র যে বাক্যচ্ছটা বাংলাদেশকে চমকিত করে দিয়েছিল সে বাক্যের সম্মোহন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। চরিত্রচিত্রণে, ভাষার বৈদগ্ধ্যে এ গল্পগুলো "শেষের কবিতা'র off-shoots। সেই যে সিসিমিসিদের বৈঠকখানায় ঢুকে পড়েছিলেন সেখান থেকে আর বেরোতে পারেননি। এই সূত্রে আর একটি কথাও লক্ষ্য করবার আছে। অন্ত্য পর্বের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় পিছন ফিরে তাকিয়েছেন। 'ছিন্নপত্রে'র সঙ্গে 'গল্পগুচ্ছে'র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কথা আগে উল্লেখ করেছি। শেষপর্বের কোন কোন কবিতায় 'ছিন্নপত্র' ফিরে এসেছে, বহুকাল আগে দেখা অনেক ছবি চোখের সুমুখে ভেসে উঠছে -আর nostalgia-র মন-কেমন-করা ভাব দেখা দিয়েছে সেই সব কবিতায়। অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। 'ছিন্নপত্রে'র একটি চিঠিতে কবি তাঁর একটি বাল্যস্মৃতির উল্লেখ করেছেন,—'বহুকাল হল ছেলেবেলায় বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম, একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানলাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট, ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টিগলায় গান ধরেছে—গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি শুনিনি।' (ছিন্নপত্র ৩৬ নং চিঠি, ১৮৯১ সালে লেখা) এবার গল্পগুচ্ছের 'অতিথি' গল্পের একটি বর্ণনা দেখুন—'এই বলিয়া সে কুশলবের পাঁচালি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মত সুমিষ্ট স্বরে দাশুরায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল; দাঁড়ি মাঝি সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল ·· নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব রসস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল—দুই নিস্তব্ধ পটভূমি কুতূহলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া যে সকল নৌকা চলিতেছিল তাহাদের আরোহীগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেইদিকে কান দিয়া রহিল।' (১৮৯৫ সালে লেখা)

এবার এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন 'আরোগ্য' কাব্যের ৪নং কবিতার একটি অংশ—

মনে এল কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে
দুপহর রাত্তি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে···

(১৯৪১ সালে মৃত্যুর সাতমাস পূর্বে লেখা)

'ছিন্নপত্রে' উল্লেখ নেই এমনও অনেক পূর্বদিনের স্মৃতিচারণা শেষপর্বের কাব্যে স্থান পেয়েছে কিন্তু 'গল্পগুচ্ছে'র শেষপর্বে পিছন ফিরে তাকাবার কোন অভিরুচি নেই।

(অন্ত্যপর্বের কাব্যে এবং অন্ত্যপর্বের গল্পে এই চারিত্রিক বৈষম্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়)। 'ছিন্নপত্রে'র সঙ্গে 'গল্পগুচ্ছে'র যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল এখানে এসে সেই সম্পর্কটি ছিন্ন হয়ে গেছে। এসব গল্পের দৃষ্টিভঙ্গি, বাক্‌ভঙ্গি সবই আলাদা —ভাবে ভাষায় প্রথম পর্বের স্নিগ্ধ ভাবটি নেই। প্রথমদিকের গল্পে কবিধর্মের সঙ্গে বাস্তবধর্মের আশ্চর্য মিল ঘটেছে। আমাদের দীন-দরিদ্র দেশের মানুষকে এবং তার প্রাত্যহিক জীবনকে তিনি দরদী প্রেমিকের চোখ দিয়ে দেখেছেন, শেষ-দিকের গল্পে তিনি আধুনিক জীবনের কৌতুককে প্রধানত স্যাটায়ারিস্টের দৃষ্টিতে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকারে আধুনিক ভাবাপন্ন কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তাঁর আধুনিকতা সর্ববিষয়ে তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্যবোধের দ্বারা শোধিত এবং পরিশ্রুত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অতি আধুনিকদের প্রতি অবশ্যই তাঁর একটি স্নেহমিশ্রিত প্রশ্রয়ের ভাব ছিল কিন্তু প্রশ্রয় সত্ত্বেও যেখানে বাড়াবাড়ি দেখেছেন সেখানে স্নেহমিশ্রিত ব্যঙ্গ বর্ষণ করতে ছাড়েননি। প্রথমদিকের গল্পে বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত যাই ঘটুক Human dignity কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। এমন যে ছিদাম রুই-এর বউ চন্দরা—সেও dignified, কিন্তু শেষদিকের গল্পে সকল চরিত্রে সেই dignity রক্ষা করা হয়নি। বোধকরি সেটা ইচ্ছাকৃত। আধুনিকতার প্রগল্‌ভতা ডিগনিটির পক্ষে অনুকূল নয়। স্বামীর আদর্শ রক্ষার জন্য মোহিনীর জোরগলার ঘোষণার মধ্যে এমন একটা অতিশয়তা আছে যে সমস্ত জিনিসটা লঘুক্রিয়া বলে সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সমস্ত সৌধটি ধ্বসে পড়বার উপক্রম হয়েছে। মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ মনে মনে হাসছেন। 'ল্যাবরেটরি' গল্পটাকে অনেকে দুঃসাহসিক আখ্যা দিয়েছেন। সাহিত্যে দুঃসাহসিক কথাটা নিতান্তই অবান্তর। যা রসগ্রাহ্য, সাহিত্য শুধু তাই প্রকাশ করবে, সেটার প্রকাশে সাহসের প্রয়োজন হয় না, শুধু রসবোধের প্রয়োজন। সাহিত্যে যাকে আজ দুঃসাহসিক বলা হচ্ছে সেটা আর কিছু নয়, সমাজে প্রচলিত নীতি, দুর্নীতিবোধকে বাতিল করে দেওয়া। এটাকে সাহস বা দুঃসাহস বলে না, একে বলে বাহাদুরি দেখানো। রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় সস্তা বাহাদুরি কখনো দেখাতে চাননি, কাজেই তাঁর বেলায় দুঃসাহসিক আখ্যাটি অপপ্রয়োগ। 'ল্যাবরেটরি' গল্পে এইটুকু শুধু বলতে চেয়েছিলেন যে উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তাহলে ছোটখাটো চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষণীয়। তবে এটা হল গিয়ে তত্ত্বকথা। গল্পটার দুর্বলতা ঐখানে। তত্ত্বকথা দিয়ে গল্প হয় না। গল্প উপন্যাসের চরিত্রকে সর্বাগ্রে convincing হতে হবে, বহু আস্ফালন সত্ত্বেও মোহিনী পাঠককে convince করে না। অথচ এমন যে super natural বা অতিপ্রাকৃতের কাহিনী

—'ক্ষুধিতপাষাণ' কিম্বা 'মণিহারা' গল্প—যেখানে সমস্ত ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে, সেখানেও গল্পের যাদুতে পাঠকের মনকে লেখক বশ করতে পেরেছেন। কোল্‌রিজ যাকে বলেছেন Suspension of disbelief—পাঠকের কাছে সেটি আদায় করতে পারাই গল্প রচয়িতার প্রধান কৃতিত্ব। যে যাদুগুণে নবাবী আমলের মোহিনীকেও আমরা বিশ্বাস করতে পেরেছি তার অভাবে এ আমলের সোহিনীকে আমরা বিশ্বাস করতে পারছিনা। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায় এবং চিত্তের দৃঢ়তায় সোহিনী নিজেকে অসাধারণ প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছে। সেই আপ্রাণ চেষ্টাই তাকে Undignified করে তুলেছে এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের উক্তি মনে পড়েছে—'কোন মেয়েকে যখন আমরা অসাধারণ বলি, তখনই সে অসি ধারণ করে বসে। তাতেই তার পতন হয়।' (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ : রানী চন্দ)। সোহিনী সম্পর্কে ঐ কথাটি অনেকসময় আমার মনে হয়েছে।

এই জন্যেই বলছিলাম যে, শেষদিকের একাধিক আধুনিকতার আস্ফালনের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সামান্য একটু কারণও ছিল। এইসময় আমাদের নব্য সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথকে সেকেলে আখ্যা দিয়ে নিজেদের আনকোরা আধুনিকতাকে সরবে সগর্বে জাহির করবার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে মনে ক্ষুব্ধ হননি এমন নয়। কিন্তু অল্পবিস্তর আস্ফালন যে যৌবনের স্বভাবগত, একথা বোঝা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না, কাজেই তাকে উপেক্ষা করা সহজ হয়েছে। জবাব যা দেবার, প্রসন্ন কৌতুকে এসব গল্পের মধ্য দিয়েই দিয়েছেন। 'শেষের কবিতা' থেকেই শুরু। একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে 'শেষের কবিতা'ও একটি স্যাটায়ার। অকসফোর্ডের ডিগ্রিধারী দুর্ধর্ষ সায়েব অমিট রায়ে, কেটি মিত্তির, বিমি বোসকে ছেড়ে প্রেমে পড়ল গিয়ে লাবণ্যর—কাজ করে গবর্নেসের, ওদের সমাজে বলতে গেলে অপাংক্তেয়। ভাবে স্বভাবে ওদের তুলনায় সেকেলে ধরনেরই বলতে হবে তথাপি লাবণ্যকে মনে ধরল। এর মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন allegory আছে, সেটি উপভোগ্য। লাবণ্য কি ? না Grace। অমিত এতদিনে আবিষ্কার করেছে যে এতকাল যে রমণী-সমাজে সে মিশে এসেছে তাদের মধ্যে রমণীয়তা নেই অর্থাৎ কিনা Grace নেই, চাতুর্য আছে, মাধুর্য নেই। লাবণ্যর সঙ্গে তার যে মিল হলনা —তার কারণ লাবণ্য বুঝতে পেরেছে যে বহু-স্পর্ধিত যৌবন সত্ত্বেও অমিতের মনটি অপরিণত। সে ছেলেমানুষ, নিজের মনকেই সে জানেনা। একদিন কেটি মিত্তিরের হাতে পরিয়েছিল হীরের আংটি আজ পরিয়েছে লাবণ্যর হাতে।

প্রথম আংটির মর্যাদা সে রাখেনি, দ্বিতীয়টির রাখবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? অপরপক্ষে দেখেছে যতই রূঢ় তার আচরণ তথাপি কেটি মিত্তিরের প্রেম খাঁটি। অমিতের দেওয়া আংটি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে এনামেল করা গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। লাবণ্য সেই মুহূর্তেই মন স্থির করে ফেলেছে। অমিতের তুলনায় লাবণ্যর মন ঢের বেশি পরিণত। প্রেমের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ত্যাগে। যে জিনিস তার হাতের মুঠোয় ছিল তাকে সে এক মুহূর্তে ত্যাগ করেছে। কচ ও দেবযানীর কাহিনীতে এই ত্যাগের মহিমা দেখিয়েছে কচ, দেবযানী দেখাতে পারেনি অথচ কচ দেবযানীকে কিছু কম ভালবাসেনি। একজন পারে, অপরজন পারে না তাঁর কারণ একজনের মন Mature অপরজনের immature। প্রেম ভালবাসা জীবনের বৃহত্তম এবং মহোত্তম ব্যাপার। অপরিণত মন নিয়ে ভালবাসতে গেলে কি হাস্যকর পরিণতি ঘটে 'গল্পগুচ্ছ' দ্বিতীয় খণ্ডে 'অধ্যাপক' গল্পটি তার কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত। তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন যে আমি অমিট রায়ের প্রেম কাহিনীটিকে হাস্যকর বলতে চাইছি। করুণে মধুরে মিলিয়ে এটি অতি সুখপাঠ্য একটি ট্রাজি-কমেডিতে পরিণত হয়েছে। অমিত কেটি মিত্তিরের কাছেই ফিরে গিয়েছে কিন্তু তাকে গ্রহণ করবার আগে নৈনিতালের সরোবর জলে তাকে শোধন করে নিয়েছে। কেটি মিত্তির হয়েছে কেতকী মিত্র। (বলা বাহুল্য অমিট রায়েও হয়েছে অমিত রায়) দেখা যাচ্ছে আধুনিকতার রঙ ক্রমেই ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। অমিতের বোন লিসি বলেছে, কেটিকে এখন নাকি চেনাই যায়না, কেননা ওকে বড্ড বেশি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। এই কথাটির মধ্যেই শেষ পর্বের গল্প সম্বন্ধে আমার মূল্য বক্তব্যটি প্রকাশ পেয়েছে এবং এই জন্যেই 'শেষের কবিতা' সম্পর্কে এতক্ষণ ধরে এত কথা বলেছি। আধুনিকে আর স্বাভাবিকে যে কতখানি তফাৎ শেষের দিকে সব গল্পে না হলেও কোন কোন গল্পে সেই কথাটি বোঝাবার একটি প্রচ্ছন্ন প্রয়াস আছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

কথাসাহিত্যের আদিতে উপকথা, উপকথার রাজ্যে সম্ভব-অসম্ভবে সীমানা সংঘর্ষ নেই। সেখানে দৈত্য-দানব, দেবতা-মানুষ এক রাজ্যের অধিবাসী; বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। সাহিত্যে বাস্তবতার জন্ম সেইদিন হয়েছে যেদিন মানুষের রাজ্য থেকে দৈত্যদানব এবং দেবতাকে নির্বাসিত করা হয়েছে। নিছক মানুষকে নিয়ে যে কল্পিত কাহিনী তারই নাম উপন্যাস। মানুষ মরজীব, দেবতাদানব দুই-ই দুর্মর। এইজন্য নির্বাসনের পরেও দেবতা আর দানব উপন্যাসের রাজ্যে বেশ কিছুকাল ছদ্মবেশে বাস করেছে। অর্থাৎ গোড়ার দিকে উপন্যাস মাত্রেই দেবদুর্লভ আদর্শ চরিত্র এবং মনুষ্যরূপী দানব অর্থাৎ ভিলেন্ চরিত্র দেখা যেত। এটা উপন্যাসের নাবালক দশা। ইংরেজী উপন্যাসের শত-বর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতা চোখের সুমুখে হাজির ছিল বলে বাংলা উপন্যাস অল্পকাল মধ্যেই নাবালক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। বাংলা উপন্যাস বলতে গেলে জন্মমুহূর্তেই সাবালক। তার কারণ বাংলা উপন্যাস গোড়াতেই একটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার স্পর্শ পেয়েছিল। তাই বলে বঙ্কিমবাবু ধরেই নির্ভেজাল উপন্যাস রচনা করেছেন এমন কথা বলব না। গোড়ার দিকে যা লিখেছেন ইংরেজীতে তাকে বলে রোমান্স, খাঁটি উপন্যাস নয়। তাছাড়া তিনি উপন্যাসের উপকরণের সঙ্গে ইতিহাসের ব্যসন মাখিয়েছেন। রাজা উজীর, বাদশা-বেগমের কাহিনী উপকথার সামিল। কারণ এদের জীবনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ যোগ নেই। স্বর্গের ইন্দ্রপুরী সম্পর্কে যতটুকু জানি, মোগল অন্তঃপুর সম্পর্কে বোধ করি তারও চাইতে কম জানি। বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন গোবিন্দলাল-রোহিনীর কাহিনী, 'রজনীর' কাহিনী, নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর কাহিনী রচনা করলেন, সেদিন উপন্যাসের রাজ্যে আমাদের আসন পাকা হল।

সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের যখন আবির্ভাব তখন আমাদের গদ্য-ভাষার যেমন শীর্ণ মূর্তি, তেমনি আড়ষ্ট তার গতি; দ্রুত লঘু পদক্ষেপে বিচরণ করবার ক্ষমতা তার ছিল না। তাতে কষ্টে সৃষ্টে ন্যায়ের তর্ক, হয়তো বা শাস্ত্রালোচনাও চলতে পারত, কিন্তু নর-নারীর প্রণয়কাহিনী বর্ণনা করবার মতো কমনীয়তা বা ব্রীড়া-ভঙ্গি তাতে ছিল না। বাংলা ভাষার দেহটিকে অতি যত্নে সুষমামণ্ডিত করে বঙ্কিমচন্দ্রই তাকে উপন্যাস-রচনার উপযোগী করে নিয়েছিলেন। একবার ভাষার রাজপথটিকে নির্মাণ করে নিয়ে বঙ্কিমের প্রতিভা প্রতি পদক্ষেপে যোজন পথ

অতিক্রম করেছে। বঙ্কিমের যখন জন্ম ইংরেজী উপন্যাসের বয়স তখন ঠিক একশ বছর। আর তিনি যখন উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলেন তখন রিচার্ডসন, ফিল্ডিং স্কট, ডিকেন্স, জেন অস্টেন পর্যন্ত ইংরেজী উপন্যাসের বিস্তৃত ক্ষেত্র বঙ্কিমের সম্মুখে প্রসারিত ছিল। সেই দূরপ্রসারী অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন।

উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে বঙ্কিম যখন প্রস্থানের উদ্যোগ করছেন ঠিক সেই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ। অত্যন্ত সসংকোচ প্রবেশ, বলাই বাহুল্য। ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে একান্তই বঙ্কিমের অনুগামী। 'বউঠাকুরানীর হাট' বাইশবছর বয়সের রচনা। জীবনের সঙ্গে পরিচয় যৎসামান্য, এইজন্য জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে প্রবেশ না ক'রে তাঁর প্রথম আখ্যায়িকাটিকে তিনি অতি সন্তর্পণে একটি রাজ-পরিবারের প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন। নিজেই বলেছেন, এ যেন কয়েকটি চরিত্র নিয়ে পুতুল-খেলা। তথাপি বঙ্কিম এই প্রথম রচনাকে সস্নেহ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই কাহিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজেরও অনেকখানি মমতা ছিল, পরবর্তীকালে এর একাধিক নাট্য-রূপায়ণেই তার প্রমাণ। এছাড়া সাহিত্যরসিক মাত্রেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, বসন্ত রায়ের চরিত্রের মধ্যে পরবর্তীকালের ঠাকুর্দা চরিত্রের বীজ লুক্কায়িত। আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র উদয়াদিত্য। এঁর স্বভাবসুলভ কোমলতা এবং উদারতাকে অপরে দুর্বলতা বলে ভুল করে, কিন্তু বিপদে ইনি নিঃশঙ্ক, নির্ভীক। উদয়াদিত্য অন্তর্বিহারী মানুষ, আপন অন্তরের বেদনা ইনি নীরবে বহন করেন। 'সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে' তার প্রতি কবির নিত্যকালের আগ্রহ। কাঁচা-হাতে কম্পিত রেখায় এখানে যাকে অঙ্কিত করেছেন সে মানুষই পরে 'গোরা'র পরেশবাবু, 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ হয়েছে, হয়েছে 'যোগাযোগ'-এর বিপ্রদাস।

'রাজর্ষি'র কাহিনীকে বাদ দিলে এর পরে প্রায় কুড়িবছর কাল কবি উপন্যাসে হাত দেন নি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে আবার যখন অবতীর্ণ হলেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। জীবনের পরিধি অনেকখানি বেড়েছে। এই কুড়িবছরে কবির জীবনপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে,—স্নেহে প্রেমে বাৎসল্যে সমুজ্জ্বল। একে একে সন্তান এসে ঘর আলো করেছে, আবার একদিন পত্নীবিয়োগে সেই ঘর অন্ধকার হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে হর্ষে বিষাদে, আনন্দে-বেদনায় জীবনের সমৃদ্ধি বেড়েছে বই কমে নি। উচ্ছলিত জীবনপাত্র উপচে পড়েছে অজস্র গানে, কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে। সৃষ্টিলীলা অজস্র ধারায় প্রবাহিত। 'মানসী', 'সোনার তরী' 'চিত্রা' 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য' প্রকাশিত হয়েছে। 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' সমাপ্ত হয়েছে আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, 'গল্পগুচ্ছে'র চৌষট্টি গল্প ইতিমধ্যে লেখা

হয়েছে।

জমিদারি পরিদর্শনকালে পদ্মায় বোটে বসে কেবলমাত্র দুই তীরের নিসর্গ শোভাই নিরীক্ষণ করেন নি, তীরবাসী জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন, মানব চরিত্রে অপরে বৈচিত্র্যের কথা ভেবেছেন মানুষের মনের অলিগলির সন্ধান নিয়েছিলেন। খাঁটি 'উপন্যাস' রচনার পক্ষে এই প্রস্তুতি অত্যাবশ্যক ছিল। মানুষের মনের মত গহন বন আর নেই—আবার অসংখ্য গুপ্ত এবং হিংস্র রিপু সেই বনকে শ্বাপদসঙ্কুল করেছে। গল্পগুচ্ছের গল্পরচনাকালে মানব মনের সেই গুহায়িত রহস্য ধীরে ধীরে তাঁর চোখের সুমুখে উদ্ঘাটিত হচ্ছিল। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'চোখের বালি'র মধ্যে তা পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। এর পূর্বে মানব-মনের এমন নিরাবরণ ছবি বাংলাসাহিত্যে আর কেউ আঁকেননি। ব্লাস্টফার্নেসের তরল আগুনে যেমন তৈরী হচ্ছে এই লৌহযুগের আধুনিক সভ্যতা তেমনি মানব-মনের অন্তর্গূঢ় কারখানায় কামনার আগুনে তৈরী হয়েছে আধুনিক সাহিত্যের উপকরণ। আধুনিক মন স্বভাবতই নির্মম। শোভনতা বা শালীনতার খাতিরে কুশ্রীকে সে সুশ্রী প্রতিপন্ন করে না। 'চোখের বালি' এই অর্থে নির্মম সাহিত্য, মানুষের মনকে একান্ত নির্মমভাবে অনাবৃত করে দেখানো হয়েছে। ঈর্ষার প্রকোপে মাতৃস্নেহ কতখানি বিকৃত হতে পারে, শিক্ষিত মার্জিত আপাতসুস্থ মনও অকস্মাৎ-জাগ্রত রিপুর আঘাতে কতখানি অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে পারে, কোনো পুরুষের ঔদাসীন্য নারীচিত্তকে কি বিপুল শক্তিতে টানতে পারে এবং এই টানাপোড়নের দ্বন্দ্ব কতখানি উত্তাপ এবং জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে 'চোখের বালি, তারই জ্বলন্ত কাহিনী। মানুষের মনের মধ্যে নিত্য যে বিস্ফোরণ ঘটছে তারই প্রজ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ উল্কার মতো পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ জিনিস বাংলা সাহিত্যে সেদিন একেবারেই নতুন ছিল। অনভ্যস্ত বলে অনেক পাঠকের মনেই উত্তাপের ছ্যাকা লেগেছিল। লেখককে গালাগালি খেতে হয়েছে প্রচুর। অথচ রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে কোন অঘটন ঘটাননি যা অনায়াসেই ঘটতে পারত। নরনারীর মনস্তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল, দেহতত্ত্বে ছিল না। স্ত্রীপুরুষে পারস্পরিক আকর্ষণের যে সম্ভাব্য দৈহিক পরিণতি তা এতই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে তার অনাবৃত চিত্র আঁকার মধ্যে তিনি কোনো কৃতিত্ব খুঁজে পান নি। অথচ আজকাল যৌন-জীবনের নগ্ন চিত্রকেই সাহিত্যিক সৎ-সাহসের চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হচ্ছে। স্ত্রী-পুরুষের যেটা আদিমতম সম্পর্ক সাহিত্যে সেটাই দেখছি আধুনিকতম আবিষ্কার। স্থূল মনের একটা লক্ষণ এই যে, যে জিনিস অত্যন্ত obvious তাই তার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। যে

জিনিষ সকল মানুষের জ্ঞানগোচর তার প্রতি কবিমনের আগ্রহ থাকে না। কবির আগ্রহ অগোচরের প্রতি। এই জন্যে গল্পে উপন্যাসে তিনি মনের ছবিই এঁকেছেন। তথাপি বলব যতখানি সাহস রবীন্দ্রনাথ দেখাতে পারতেন ততখানি তিনি দেখাননি। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বটি এক জায়গায় দ্বিধা বিভক্ত। কবি হিসাবে নারীকে তিনি যতখানি অধিকার দিয়েছেন, ঔপন্যাসিক হিসাবে ততখানি দেননি। যেখানে তিনি কবি সেখানে নীতি-দুর্নীতির শাসন তিনি মানেন নি, কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে সমাজের অনুশাসন তিনি মেনে নিয়েছেন, অন্তত সমাজকে বেশ সমীহ করে চলেছেন। ফলে যুবতী বিধবা বিনোদিনীকে তিনি গিলতেও পারেন নি, ফেলতেও পারেন নি। বঙ্কিম-চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এই তিন মহারথীর এক রথীও অবলা বিধবাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। রোহিণী, বিনোদিনী, কিরণময়ী—প্রত্যেকেই যে কোন পুরুষের আকাঙ্ক্ষিতা রমণী, কিন্তু তিনজনই স্ব স্ব সৃষ্টিকর্তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা। মনে প্রশ্ন জাগে—এমন যে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর—বিধবাকে বিবাহের অধিকার দিয়েছিলেন কিন্তু তাকে কি তিনি এমনি ভালবাসার অধিকার দিতেন? বিবাহ এক, ভালবাসা আর। আবার বিধবার বেলায় যে কথা, সধবার বেলায়ও তাই। আসল কথা, ভালবাসার পূর্ণ স্বাধীনতা নারীকে আজ পর্যন্ত আমরা দিইনি, কোন সমাজই দেয়নি। বিনোদিনীর পাড়াগেঁয়ে দিদিশাশুড়ি মহেন্দ্রকে বলেছিল, 'ভদ্রসমাজ বলে একটা ব্যাপার আছে, কাল তুমি মুখ দেখাবে কেমন করে?' একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে আমরা অত্যাধুনিকরাও, মূলত বিনোদিনীর দিদিশাশুড়ি।

ভদ্রসমাজ বলে যে একটা ব্যাপার আছে সেটা শুধু মহেন্দ্র বিনোদিনী নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বিলক্ষণ টের পেয়েছিলেন। 'চোখের বালি'র লেখককে সেদিন প্রচুর গালাগাল শুনতে হয়েছিল। 'নৌকাডুবি'তে রবীন্দ্রনাথ দিব্যি লক্ষ্মীছেলের মতো গোবর খেয়ে, গঙ্গাস্নান করে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, ভয়ঙ্কর রকম বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করেও প্রায় অমানুষিক শক্তিবলে নারীর শুচিতা রক্ষা ক'রে এবং হিন্দুবিবাহের অলৌকিক মন্ত্রশক্তির মাহাত্ম্য প্রমাণ ক'রে সনাতনীদের সন্তোষ বিধান করেছেন।

'চোখের বালি'র মতো এ গ্রন্থেরও মনোবিশ্লেষণের প্রতিই লেখকের ঝোঁক। রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাসেই ঘটনার বাহুল্য নেই—যা কিছু ঘটছে মানুষের মনের মধ্যেই ঘটেছে। আকস্মিক বা রোমাঞ্চকর ঘটনা দ্বারা কাহিনীকে চমকপ্রদ করবার চেষ্টা তাঁর উপন্যাসে বিরল। একমাত্র এই গ্রন্থেই 'নৌকাডুবি'র

মতো একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটেছে এবং তার ফলে কাহিনীর শুরুতেই একটা অত্যন্ত জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হয়েছে। কাহিনীতে রোমাঞ্চ আছে, বিশ্লেষণের কৌশল অনস্বীকার্য, ভাষামধুর্যে বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী—তথাপি কাহিনীর দুর্বলতা ঢাকা পড়েনি। 'চোখের বালি'তে মানুষের দেহ এবং মনের ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন, এখানে তা মানেন নি। আপন স্বভাবকে না মানলে মানুষের সব কাজকর্মই অস্বাভাবিক হয়। একান্তভাবে রমেশগত-প্রাণ কমলার প্রতি রমেশের ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত হলেও স্বভাবসম্মত হয়নি। ব্যাপারটা সার্কাসের টাইপ-রোপ্-ডান্সিং এর মতো রোমাঞ্চকর, কিন্তু আনন্দদায়ক নয়। কসরতের কৃতিত্ব যতখানি পৌরুষ ততখানি নয়। ভুললে চলবে না যে এই রমেশ নামক ব্যক্তিটি হেমনলিনীকে ভালবাসে অথচ অতি লক্ষ্মীছেলের মতো পিতার অনুরোধে একটি গ্রাম্য কন্যাকে সে বিয়ে করেছে। শুধু তাই নয়, ব্যাপারটি হেমনলিনীর কাছে গোপন রেখেছে। এহেন দুর্বলচিত্ত মানুষ কমলা সম্পর্কে দেহের শুচিতা রক্ষার ব্যাপারে এমন সুদৃঢ়চিত্ত ভাবলে একটু অবাক লাগে। অপরপক্ষে মন্ত্রপড়া বিবাহিত স্বামী নলিনাক্ষকে দর্শনমাত্র কমলার মনে প্রেমের উন্মেষ হাস্যকররূপে অবিশ্বাস্য! মানুষের মন বড় বেহিসাবী, তাকে বাঁধা ফরমুলায় ফেলতে যাওয়া ভুল। কমলা বেচারীর জন্য আমাদের দুঃখ—রমেশ তার নারীত্বকে অপমান করেছে, কবি-ঔপন্যাসিক তার প্রতি অবিচার করেছেন। রমেশ নলিনাক্ষ কেউ বড় একটা সুস্থ চরিত্রের মানুষ নয়! একমাত্র সুস্থ চরিত্র হেমনলিনীর। তাকে অনেক দুঃখ পেতে হল। তার অনেক দুঃখটিই গ্রন্থটিকে খানিকটা সজীবতা দিয়েছে।

'চোখের বালি'তে যে বিপ্লবাত্মক মনোভাবের সূচনা দেখা গিয়েছিল 'নৌকাডুবি'তে তার ভরাডুবি হয়েছে। 'নৌকাডুবি'র প্রকাশ ১৯০৬ সালে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ—দেশময় হিঁদুয়ানির খুব একটা বন্যা এসেছিল। বোধকরি 'নৌকাডুবি'র আসল দুর্ঘটনাটা ঐ বন্যার ফলেই ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে বন্যার জলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কিঞ্চিৎ নাকানি-চুবুনি খেয়েছেন।

'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'র প্রকাশকালের মধ্যে মাত্র চার বৎসরের ব্যবধান! স্বদেশীর স্রোত তখনও পূর্ণবেগে প্রবাহিত। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে দেশ এবং সমাজ সম্পর্কে তার মনে যে নব অভিজ্ঞানের সঞ্চয় হয়েছিল তারই প্রত্যক্ষ ফল 'গোরা' উপন্যাস। বাংলাদেশের সবচেয়ে যে প্রাণচঞ্চল যুগ—'গোরা' সেই যুগের জীবন্ত ইতিহাস। এরূপ বৃহৎ পটভূমিকায় আর কোন উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়নি। স্বদেশী উন্মাদনায় দেশে যে নতুন

চেতনা দেখা দিয়েছিল তা দেখে কবি কখনো আশায় উল্লসিত, কখনো ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়েছেন, দেশবাসীর মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যেমন বেড়েছে তেমনি পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ অনুরাগও বেড়েছে। শিক্ষিত হিন্দুরাও সনাতনী হয়ে উঠেছে। অবশ্য বলে রাখা ভাল, গোরার গোঁড়ামি পুরোপুরি সনাতনী হিন্দুর গোঁড়ামি নয়। গোরার মধ্যে বিচার বুদ্ধির অভাব ছিল না। নন্দর শোচনীয় মৃত্যুতে গোরার আক্ষেপোক্তি উল্লেখযোগ্য—'দেবতা অপদেবতা, পেঁচো হাঁচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ—সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে রেখেছে'। মোটামুটি হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু ঐতিহ্যকেই সে মেনে নিয়েছে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি তার বিশেষ কৌতূহল নেই। নিজ মুখেই সুচরিতাকে বলছে, 'তুমি জানতে চাও আমার মন কোনদিন ঈশ্বরকে চেয়েছে কিনা। না, আমার মন ওদিকেই যায়নি।' এদিক থেকে গোরা ঈশ্বরে উদাসীন আধুনিক যুবকদেরই একজন। তথাপি তার মধ্যে যে গোঁড়ামি দেখছি এ হচ্ছে একজাতীয় 'মডার্ন' গোঁড়ামি। এটা স্বদেশীয়ানার বাই-প্রোডাক্ট। অর্থাৎ বিলিতিয়ানার এ হচ্ছে একটা সদম্ভ প্রত্যুত্তর! অসহযোগ আন্দোলনের যুগেও আমরা এ জিনিষ দেখেছি।

যে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করবে, ভাবা গিয়েছিল, তারও গায়ে একটি কঠিন আস্তরণ দেখা দিয়েছে, ব্রাহ্মসমাজেও গোঁড়ামি প্রবেশ করেছে। পানুবাবু তার দৃষ্টান্ত স্থল। ব্রাহ্ম সমাজের যে উদার এবং সত্যদৃষ্টি তাঁর অভিপ্রেত ছিল পরেশবাবু তার প্রতীক। অপরপক্ষে হৃদ্‌গত সহজ বুদ্ধির গুণে আনন্দময়ীর নির্মল দৃষ্টি হিন্দুসমাজেও সম্ভব। এখানে বলে নেওয়া ভাল যে আনন্দময়ী গোরা উপন্যাসের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য চরিত্র। এই চরিত্রের মধ্যে কবি ভারতবর্ষের সমগ্র জীবনদর্শনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। হিন্দুধর্ম যে দেবদেবীতে নয়, মন্দিরে নয়, পূজার্চনায় নয়, শাস্ত্রগ্রন্থে নয়—এযে এক ধরনের জীবনধারা মাত্র,—এই কথাটি আনন্দময়ী-চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন। আনন্দময়ী ভারতবর্ষের প্রতীক। 'মা তুমিই আমার ভারতবর্ষ'—গোরার মুখের এই উক্তি মিথ্যা নয়।

হিন্দুধর্মে না হলেও হিন্দুসমাজের মূলে একটা নির্মমতা আছে। জন্মাধিকারে যে হিন্দুত্বলাভ করেনি হিন্দুসমাজ তাকে হিন্দু বলে গ্রহণ করতে নারাজ। গোরা মনেপ্রাণে হিন্দু, এমনকি হিঁদুয়ানির আতিশয্যে নিজেকে অল্পাধিক পরিমাণে হাস্যকরও করেছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুধর্মের জন্মদাতা ভারতবর্ষকে সে যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে এ-কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে

না। কিন্তু জন্মরহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ামাত্র হিন্দুগত প্রাণ গোরা একমুহূর্তে আবিষ্কার করল,—এই বিরাট হিন্দুসমাজে সনাতন ভারতবর্ষে তার এতটুকু দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। ইংরেজ ডাক্তার কৃষ্ণদয়ালকে পরীক্ষা করছে, অদৃষ্ট বিড়ম্বিত গোরা মনে মনে ভাবছে, এই লোকটাই আজ তার সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়। সমস্ত কাহিনীর মধ্যে এটিই করুণতম মুহূর্ত।

হ্যামারগ্রেন নামে একজন সুইডিস যুবক ভারতীয় সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এদেশে এসেছিলেন। এখানে অকালে তার মৃত্যু হয়। হিন্দু প্রথানুযায়ী তাঁর দেহ দাহ করা হয়, 'মৃত্যুর পূর্বে এই ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। যিনি অহিন্দু, হিন্দুমতে তাঁর দেহ সৎকার হবে এই প্রস্তাবে হিন্দুসমাজে তুমুল বিতর্কের শুরু হয়। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অতিশয় লজ্জিত এবং ব্যথিত বোধ করেছিলেন। নিবেদিতাও মনে প্রাণে হিন্দু ছিলেন কিন্তু হিন্দুসমাজ তাঁকে অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করেছিল কিনা সে বিষয়ে হয়তো রবীন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ ছিল। বলা যায় না, গোরার চরিত্রসৃষ্টিতে এসব প্রশ্ন তাঁর মনের অন্তরালে হয়তো কিঞ্চিৎ ক্রিয়া করেছে।

'গোরা' উপন্যাস বাংলাদেশের এক যুগের ইতিহাস তো বটেই,—তাছাড়াও নানা দিক থেকে এই গ্রন্থ আমাদের সাহিত্যে এক ঐতিহাসিক স্থান অধিকার করে আছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে আমাদের পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। হিন্দু সমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত; ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, এ তিনি চাননি। হিন্দু-ব্রাহ্ম বিবাহ প্রবর্তনের প্রস্তাব এই গ্রন্থেই উত্থাপিত হয়েছে। ব্রাহ্ম-কুমারীর পাণিগ্রহণ করতে হলে হিন্দু যুবককে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, এ ব্যবস্থাকে তিনি স্বীকার করেন নি। তাঁর নির্মল দৃষ্টিতে আগামী দিনের সমাজকে তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

প্রবলের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের গোড়া থেকেই করে এসেছেন। নানা প্রবন্ধে নানা ভাষণে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার কথা নিরন্তর বলেছেন। কাব্যেও বহুবার এ-কথা ঘোষণা করেছেন—'যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে।' গল্পে উপন্যাসেও বাদ যায়নি। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে জেলেদের হয়ে শশীভূষণের প্রতিবাদ, ফলে—লাঞ্ছনা; চর ঘোষপুর প্রজাদের পক্ষে গোরার প্রতিবাদ, ফলে তারও লাঞ্ছনা এবং কারাবাস। এ সূত্রে স্মরণ রাখা কর্তব্য গোরা আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিল নিযুক্ত করেনি। বলেছিল, সুবিচার

করবার গরজ রাজার। ন্যায় বিচার পয়সা দিয়ে কিনতে সে রাজি হয়নি। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে আত্মপক্ষ-সমর্থনের পালা গান্ধীজী তুলে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির এটি আরেকটি নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের আবহাওয়ায় লালিত; কিন্তু শেষ জীবনে দেখা যায় তিনি কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে নি। পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্ম 'মানুষের ধর্ম'কেই তিনি মেনে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এ জিনিসটি হঠাৎ একদিনে হয় নি। কয়েকটি বিশেষ আদর্শকে তিনি আজীবন মনের মধ্যে লালন করেছেন। তাঁর শেষ জীবনের মানুষের ধর্ম এই উপন্যাসের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। যে দুজন মানুষ—পরেশবাবু ও আনন্দময়ী সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে সকল সমস্যাকে দেখেছেন—তাঁরা হিন্দু বা ব্রাহ্ম কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। পরেশবাবু এবং আনন্দময়ী দুজনেই বলতে গেলে স্বজনপরিত্যক্ত। এঁদের দুজনেরই ধর্ম মানুষের ধর্ম। হিন্দুসমাজে লালিত হিন্দু মহিলা আনন্দময়ীর উক্তি—যেদিন তোকে (গোরাকে) কোলে নিয়েছি সেদিনই জেনেছি জাত নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না—অত্যন্ত বিস্ময়কর হলেও যে কোন মাতৃজাতীয়ার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক উক্তি। 'গোরা' রচনারও আগে 'রাজর্ষি'র কাহিনীতে বিল্বন ঠাকুর নামে সেবাব্রতী যে মানুষটিকে আমরা দেখেছি তাঁর কোন জাতবিচার নেই দেখে হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। বিল্বন বলেছিলেন, আমার কোন জাত নেই, আমার জাত মানুষ। দেখা যাচ্ছে, শেষ বয়সে তিনি যে নিরন্তর বলেছেন, পৃথিবীতে একটিমাত্র জাতি আছে, তার নাম মানুষ জাতি, একটিমাত্র ধর্ম আছে, তার নাম মানুষের ধর্ম—এই বিশ্বাস তিনি অকস্মাৎ একদিন স্বপ্নযোগে লাভ করেননি। যৌবনকাল থেকেই এই আদর্শ তাঁর চিন্তা এবং ধর্মকে প্রভাবিত করে এসেছে।

ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, পৃথিবীময় খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছে। ঘরের কাছে উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে 'সবুজপত্রে'র জন্ম। লক্ষ্য করবার বিষয়, 'সবুজপত্রে'র জন্ম ১৩২১ সালের ২৫শে বৈশাখ। 'সবুজপত্র'র জন্মের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যেও একটি নতুন সুরের জন্ম হয়েছে। এই সুরটি প্রধানত যৌবনের সুর। কাব্যে গানে গল্পে প্রবন্ধে—দেশের নবীন যৌবনকে তিনি উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন। 'গোরা'তে তিনি যে যুবক সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন—গোরা এবং বিনয় যাদের মুখপাত্র—তারা স্বদেশগত প্রাণ, স্বদেশের ধর্মে, স্বদেশের ঐতিহ্যে তাদের আস্থা। ইতিমধ্যে দেশে আরেকটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে

অত্যুগ্র যুক্তিবাদী এদের মন, প্রচলিত বিশ্বাসে এরা সম্পূর্ণ আস্থাহীন। 'চতুরঙ্গ'র কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ এই নতুন যুবক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদিগকে পরিচিত করেছেন। জ্যেঠামশায় এই যৌবনের দীক্ষাগুরু—বয়সে প্রাচীন, অন্তরে নবীন। শচীশ জ্যেঠামশায়ের চ্যালা। যে সব ধ্যান ধারণা জ্যেঠামশায় তাঁর মনে মজ্জার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছিলেন সে সব জিনিস শচীশের মনে পাকা হয়ে বসবার আগেই জ্যাঠামশায় গত হয়েছেন। এদিকে শচীশের মনে তিনি যে অগ্নিশিখাটি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছেন তার দাহন ক্রিয়ায় সে নিয়ত দগ্ধ আর সেই প্রজ্বলন্ত শিখায় আত্মাহুতি দিয়েছে দামিনী। আগুনের মোহনরূপে সে মুগ্ধ।

জ্যেঠামশায়ের মতে ভক্তির চাইতে যুক্তি, ধর্মের চাইতে কর্ম এবং ভগবৎ-প্রেমের চাইতে মানবপ্রেম বড়। শচীশ যুক্তির অন্তহীন পথে দিশেহারা হয়ে ভক্তির পথ ধরেছে। দামিনী ভক্তির যূপকাষ্ঠে বাঁধা বলেই ধর্মবিমুখ। ভগবানকে চায়না, মানুষকে চায়, পুরুষকে চায়। শচীশ মানুষের সেবা ছেড়ে ভগবৎ সেবায় মন দিয়েছে। কামনা বর্জনীয় অতএব কামিনী। দুই ভিন্নমুখী পথে শচীশ আর দামিনীর নিত্য আবর্তন। একজনের মনে সাধ, আরেকজনের সাধনা। দু'এর পথ ভিন্ন কিন্তু মনের গড়ন এক। দুজনেই অগ্নিগর্ভ। দুই দাহ্য পদার্থের সান্নিধ্য বিপজ্জনক, প্রতিমুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা। তার ছ্যাকা লাগে বেচারী শ্রীবিলাসের মনে। জ্যেঠামশায়, শচীশ দুজনেই সৃষ্টিছাড়া মানুষ। শ্রীবিলাস অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ, অতএব নিরাপদ। দামিনী মেয়ে-মানুষ। তার আশ্রয় প্রয়োজন—হয় স্বামী, না হয় গুরু। শ্রীবিলাস তার নিরাপদ আশ্রয়। বলা বাহুল্য, শ্রীবিলাসের মধ্যে সে শচীশকেও পেয়েছে। সে যাকে বিয়ে করেছে সে কেবলমাত্র শ্রীবিলাস নয়। শ্রীবিলাস এবং শচীশকে মিলিয়ে যে তৃতীয় এক ব্যক্তিসত্তা, তাকেই সে বিয়ে করেছে। তার নীড়ও চাই, আকাশও চাই—শ্রীবিলাস তার নীড়, শচীশ তার আকাশ।

কয়েকটি অনন্যসাধারণ চরিত্রের সমাবেশে 'চতুরঙ্গ'র রঙ্গমঞ্চে এক অভিনব জীবননাট্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে পরিণত হলে এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের সবচাইতে শক্তিশালী উপন্যাসের গৌরব লাভ করতে পারত। 'ঘরে বাইরে' এবং 'চতুরঙ্গ'র রচনাকাল এক। স্বদেশী যুগের বাঙালী জীবনে অকস্মাৎ যে আলোড়ন এসেছিল সেটিকেই বলা চলে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের পটভূমিকা। সেদিন দেশে যে রাজনৈতিক ঝোড়ো হাওয়া উঠেছিল তা শিক্ষিত বাঙালী-গৃহের সদর অতিক্রম করে অন্দরমহলের পর্দাগুলোকে উড়িয়ে খুঁড়িয়ে নেবে তাতে আর বিচিত্র কি? মেয়েরা সবে চিকের আড়াল থেকে স্বদেশী

বক্তৃতা শুনতে শুরু করেছিল। স্বামীর বন্ধু এসেছেন স্বদেশী প্রচার করতে। সভায় যখন অগ্নি-উদ্‌গিরণ শুরু হয়েছে, সমস্ত সভাকক্ষ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, উত্তেজনা বশে বিমলা কখন চিক সরিয়ে দিয়ে বক্তার মুখের উপরে তার বিস্মিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে বক্তার দুই চোখ এসে পড়েছে সেই অনাবৃত মুখের উপরে। মুখ সরিয়ে নেয় বিমলার এখন হুঁশ ছিলনা। বক্তার ভাষার আগুন আরো উঠল জ্বলে, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চমকানি। বিমলার পক্ষে এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা! এখানেই জমল নবযুগের নাট্য। নিখিলেশের বিয়ে হয়েছে আজ ন'বছর, কিন্তু বনেদি ঘরের সদরে অন্দরে অনেক ব্যবধান। ন'বছরেও বন্ধুপত্নীর সঙ্গে সন্দীপের সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। নিখিলেশ হাল আমলের মানুষ—বাইরের সঙ্গে ঘরের যোগ হয় এই ইচ্ছা তার মনে ছিল। বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে অন্দর মহলে যে স্ত্রীকে সে পুরে রেখেছে তাকে সে যেন চুরি করে পেয়েছে। দশের সঙ্গে মিশে দশের মধ্য থেকে বিমলা তাকে বেছে নিক—সেটিই হবে সত্যিকারের পাওয়া, বীরের মত পাওয়া। মন্ত্রপড়া বিয়ের ফাঁকিতে তার মন ওঠেনি। বিমলাকে এসব কথা সে বলেছে। শুনে বিমলা রাগ করত। তাদের দুজনের স্বামী স্ত্রী সম্পর্কের মধ্যে কোথাও ফাঁকি আছে। এমন কথা সে স্বীকার করত না। মুখে বললে তো হয়না, পরীক্ষায় প্রমাণ চাই। নিখিলেশ যখন নিজেকে বীরের আসনে বসিয়ে স্বয়ম্বৃতা পত্নী হিসাবে পেতে চেয়েছে। আর বিমলা যখন ভেবেছে স্বয়ম্বৃতা না হয়েও সে একান্তভাবে পতিব্রতা তখন দুজনের একজনও জানতনা যে সংসারের অগ্নি পরীক্ষায় ভাববিলাসিতা কত সহজে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সব চেয়ে হাস্যকর এই যে বহির্জগতের প্রথম পুরুষটির সংস্পর্শমাত্রই পাতিব্রত্যে ফাটল দেখা দিল। আর নিখিলেশ? যে অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা বলতে গেলে সে নিজেই করেছে তার অগ্নিদাহন যে কি ভয়ঙ্কর জ্বালাময় সে কি তা জানত?

নিখিলেশ অন্তর্বিহারী মানুষ, মনের অন্তঃপুর বড় দুর্গম স্থান। শুধু পত্নী হলেই স্বামীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করা যায় না, তাকে সহধর্মিনী হতে হয়। বিমলা কোনকালেই নিখিলেশের সহধর্মিনী ছিলনা। প্রকৃতপক্ষে নিখিলেশই তার কাছে পরপুরুষ। শাস্ত্রে বলে, স্বধর্মে নিধন শ্রেয়ঃ। সন্দীপ এবং বিমলার পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ, সেটা ওদের দুজনের পক্ষেই স্বধর্ম ওতে বরং নিধনও শ্রেয়ঃ ছিল অর্থাৎ এ আকর্ষণের যে যৌক্তিক পরিণতি তাতে একটা ভয়ঙ্কর রকমের সামাজিক কেলেঙ্কারি ঘটতে পারত। জীবনে অনেক কিছু ঘটে—সমাজ যাকে মানতে চায়না। যিনি আর্টিস্ট তিনি মনে মনে জানেন

যে সমাজের চাইতে জীবনের দাবি বড়। রবীন্দ্রনাথ মনে যা জেনেছেন লেখনীর মুখে তা স্বীকার করতে পারেননি। জীবনের দাবিকে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। এমন যে সন্দীপ তারও ব্যবহার অস্বাভাবিক। গোড়ার দিকে বলেছে, 'যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেটুকুই আমার, এ কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটিই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।' সেই মানুষই পরে বলেছে, 'এক একটা মুহূর্ত এসেছে যখন বিমলার হাত চেপে ধরে তাকে আমার বুকের উপর টেনে আনলে সে একটি কথা বলতে পারতনা। সেই মুহূর্তগুলোকে বয়ে যেতে দিয়েছি।' এই যে দ্বিধা এবং সংকোচ এটা সন্দীপের প্রকৃতিতে নেই এই দ্বিধাটুকু লেখকের নিজের। আপন সৃষ্ট চরিত্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ভাব অবলম্বন করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অনেক সময়েই সম্ভব হয়নি।

যাক, শেষ পর্যন্ত লঙ্কাকাণ্ড ঘটল কিন্তু সীতা-উদ্ধার যত সহজ, সীতাকে ঘরে এনে প্রতিষ্ঠিত করা তত সহজ নয়। সীতা-উদ্ধারের পর সীতার বনবাস। আসল ট্র্যাজিডিটা ঐখানে। বিমলাকে কি নিখিলেশ সত্যি সত্যি ফিরে পেয়েছে? ভাঙা মন কি জোড়া লাগে? বিমলা এখন নিখিলেশকে পুজো করতে শিখেছে; কিন্তু পুজো কি ভালবাসার স্থান পূরণ করতে পারে!

হিন্দুসমাজে সহধর্মিনী হওয়ার দায় স্ত্রীর অর্থাৎ স্ত্রীকেই স্বামীর যোগ্য হতে হয়। শাস্ত্রে কেবল উমার তপস্যারই বিধান আছে। শিবতুল্য স্বামীরা পত্নীলাভের জন্য তপস্যা করেন না, তাঁরা সংসারের অন্যান্য কামনীয় পদার্থ অর্থাৎ ধনমান পদগৌরব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির তপস্যায় লিপ্ত থাকেন। স্ত্রীরা এসে পাছে তাঁদের স্বভাবসুলভ তরলতা বশতঃ স্বামীদের তপোভঙ্গ করেন সেইজন্যই বোধ করি তাদের সহধর্মিনী হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বহু শতাব্দী এইভাবে কেটেছে, বিংশ শতাব্দীতেই প্রথম কথা উঠল স্বামীকেই নারীরত্ন লাভের জন্য যোগ্যতা অর্জনা করতে হবে। আমরা কেবল পরপুরুষ কথাটাই শিখে রেখেছিলাম। কিন্তু তার আসল তাৎপর্য বুঝিনি। স্বামী স্ত্রী যদি ভাবে স্বভাবে একধর্মী না হয় তবে স্বামীও যে পরপুরুষ হতে পারে আধুনিক সমাজে এই নিয়ে আজ আর তর্ক উঠবে না। 'যোগাযোগ'-এর নায়িকা কুমুদিনী আধুনিকা নয়। মা ঠাকুরমার মত ছেলেবেলায় সেও বোধকরি শিবপূজা করেছে। একালের মেয়েরা জোর গলায় পুরুষের সমান অধিকার দাবি করে। কুমুদিনীর কোন দাবি নেই। সে শুধু চেয়েছে স্বামীকে যেন শ্রদ্ধা করতে পারে, ভালোবাসতে

পারে। সেখানেই বেচারী ধাক্কা খেয়েছে। মধুসূদন মানুষটা মূলত খারাপ নয়। আপন শক্তি-সামর্থ্যে সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আপন পুরুষকারে বিশ্বাসী। সম্ভ্রান্তবংশীয় কুমুদিনীকে সে ভুজবলে অর্জিত সম্পত্তির অংশ বলে মনে করেছে। এদিকে মধুসূদন ফরসাইট সাগার নায়ক সোম্‌স্‌ ফরসাইট-এর জ্ঞাতি ভ্রাতা গল্‌সওয়ার্দি যাকে অ্যাখ্যা দিয়েছেন—ম্যান অব প্রপার্টি। কেবল-মাত্র অর্থবলে যে জিনিস লাভ করা যায় তাতেই অনর্থ ঘটে। সংসারে অনেক কিছু সে জয় করেছে, নারীচিত্তকেও যে জয় করতে হয় সে-কথা কখনও ভেবে দেখে নি।

সংঘর্ষ বেধেছে দুজনের রুচিতে। 'জড়িয়ে গেছে, সরু মোটা দুটো তারে—জীবনবীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে।' মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে তা শুধু যে কুমুকে আঘাত দিয়েছে এমন নয়, ওকে লজ্জা দিয়েছে। ওর অনেক কাজ, অনেক ব্যবহার কুমুর কাছে অশ্লীল মনে হয়েছে। তবে এ-কথাও ঠিক, শুচিবাইগ্রস্ত মেয়েদের মতো কুমু একটু যেন অতিরিক্ত রুচিবাইগ্রস্ত। মনে হয় মধুসূদনের প্রতি ও একটু যেন অবিচার করছে। তাছাড়া বিপ্রদাস ওর মনকে এত অধিক পরিমাণে অধিকার করে আছে যে তাতেও মধুসূদনের লাগছে। মধুসূদনের উষ্মা—'নুরনগরী চাল, দাদার ইস্কুলে শেখা'—রূঢ় হলেও অস্বাভাবিক নয়। মধুসূদন কার্যত যে পাল্টা জবাব দিয়েছে, শ্যামাকে প্রশ্রয় দিয়ে,—সে ব্যাপারটা অত্যন্ত স্থূল বলতেই হবে; কিন্তু একথাও সত্য সেটা শ্যামার আকর্ষণে নয়, কুমুর প্রতি অভিমান এবং আক্রোশবশত।

অসুস্থ দাদাকে দেখতে এসে কুমু ঠিক করেছে স্বামীর ঘরে আর ফিরে যাবে না। কিন্তু ফিরতে হল অপমানে বেদনায়। যে বিপ্রদাস বলেছিল, অসম্মানের চাইতে সর্বনাশও ভালো, তাকেও নতি স্বীকার করতে হল, 'তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করব কোন স্পর্ধায়?' কত বড় পরাজয়! স্বামী পূজার সংস্কার মনের মধ্যে বজায় রেখেও কুমু যে স্বামীকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি তার সঙ্গে রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। নারী যে তার দেহের মধ্যে বায়োলজির একটি অমোঘ বিধানকে বহন করে চলেছে কুমুর বেলায় সেটিই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিনের উল্লেখ। ভোর থেকে আসছে ফুলের তোড়া আর অভিনন্দনের টেলিগ্রাম। আজকের আনন্দের দিনে বহুদিন আগের সেই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির কথাটি কেউ ভাবছে না, সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই এই কাহিনী। এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে রবীন্দ্রনাথ সংসারের

অনেক রূঢ় বাস্তব সত্যের খুব কাছাকাছি এসেছেন।

'গোরা' এবং 'ঘরে বাইরে'র বেলায় যেমন, 'শেষের কবিতা'রও তেমনি একটি পশ্চাদ্‌ভূমিকা আছে। তখনকার দিনের একটি সাহিত্যিক বিতর্ক থেকে এই গ্রন্থের উদ্ভব। নব্যতন্ত্রীরা তখন রবীন্দ্রনাথকে 'সেকেলে' আখ্যা দিয়ে জাতে ঠেলবার উপক্রম করেছেন। তিনি বৃদ্ধ অতএব এখন নবীনদের হাতে ভবিষ্যতের ভার ছেড়ে দিয়ে মানে মানে তাঁর সরে পড়া উচিত। এঁদের যৌবনের আস্ফালন দেখে রবীন্দ্রনাথ বেশ একটু কৌতুক বোধ করেছিলেন। যৌবনের গর্ব করো তোমরা, যৌবনের তোমরা কি জান? এই দেখ যৌবন কাকে বলে—সৃষ্টি হল অমিট্ রায়—তোমাদের মতো বয়স মিলিয়ে কুষ্ঠির প্রমাণে যুবক নয়—বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী যৌবন—বান ডেকে ছুটে চলেছে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে।

স্যাটায়ারের উদ্দেশ্য নিয়ে লিখতে বসেছিলেন, কিন্তু দু'পাতা লিখতে-না লিখতে লেখক আপন গল্পের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। এমন দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে আরো আছে। ফিল্ডিং যেমন রিচার্ডসনকে বিদ্রূপ করতে গিয়ে উঁচুদরের উপন্যাস লিখে ফেললেন—এও তেমনি। এখানে ওখানে যুবক সম্প্রদায়ের প্রতি খোঁচা আছে। রবিঠাকুরকে গাল দিতে চাও, বেশ তো দাও না, তারও একটা ভাষা আছে ভঙ্গি আছে—এই নাও লিখে দিলাম অমিট্ রায়ের জবানিতে রবীন্দ্র-বিরোধী এক বক্তৃতা। আর সাহিত্যে তোমাদের যা দাবি-দাওয়া, রবিঠাকুর যে দাবি মেটাতে পারেন নি, দাঁড়াও তারও একটা ফর্দ করে তৈরি করে দিচ্ছি—'চাই কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো—ন্যুর‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো, খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা ইত্যাদি ইত্যাদি। স্যাটায়ারের প্রথম পরিচ্ছেদেই শেষ। মানুষের যৌবনলীলা কবিমনকে চিরকাল উল্লসিত করে এসেছে। উপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। যে যুবকদের উদ্দেশ্য করে বিদ্রূপ বর্ষণ করবেন ভেবেছিলেন তাদেরই যৌবনরসে মন তাঁর অভিষিক্ত হল। মনের সমস্ত অনুরাগ দিয়ে লিখলেন এদের প্রেম কাহিনী। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে এদের প্রণয়লীলা নিতান্তই একটা পোষাকী ব্যাপার। 'শেষের কবিতা'র কাহিনী আগাগোড়া অবাস্তব। পাঠক মাত্রেরই মনে প্রশ্ন জাগবে, এরা কোথাকার লোক, কোন্ অলকার অধিবাসী? এদের আপিস আদালত নেই, চাকরি-বাকরি নেই, সংসারের চিন্তা-ভাবনা নেই। ব্যাপারটা যেখানে ঘটছে সে কি শিলং পাহাড়ে না মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের

মাঝখানে সেই হাজারক্রোশী খালটার ধারে? কিন্তু যেখানেই হোক, কাহিনীটা যতই অবাস্তব হোক তথাপি বলব জিনিসটা সত্য। মেঘদূতের কাহিনীও অবাস্তব কিন্তু তাই বলে অসত্য নয়। জীবনের সঙ্গে পুরো যোগ নেই কিন্তু যৌবনের সঙ্গে আছে। মেঘদূত যৌবনের কাব্য, প্রেমের ভাষ্য। 'শেষের কবিতা' সেই অর্থে আমাদের নবমেঘদূত। সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে একটি অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সেই পরিবেশটি লাবণ্যময় অর্থাৎ যৌবনময়। যৌবনের অফুরন্ত লাবণ্যের কথা রবীন্দ্রনাথ একাধিক কবিতায় উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই গ্রন্থের মধ্যে শিশুও নেই বৃদ্ধ নেই। একমাত্র বর্ষিয়সী মহিলা যোগমায়া। বোধকরি অমিট্ রায়ের ঘটকালিতে সাহায্য করবার জন্যেই তাঁর অবতারণা, নইলে তাঁকে বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। মজার কথা এই যে, যোগমায়া প্রস্তাব শুনেই বলেছিলেন,—বাবা, ভয় হচ্ছে ব্যাপারটা না শেষ পর্যন্ত—ঠাট্টা হয়ে দাঁড়ায়! বুঝতে পেরেছিলেন, এরা মন-দেয়া-নেয়ার খেলায় মত্ত, বিয়ের দায়িত্ব এদের সইবেনা।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিয়ে হ'ল কিন্তু সে যেন এক খেলাভাঙার খেলা—অর্থাৎ যৌবনলীলা সাঙ্গ হ'ল। সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্থাৎ যৌবন শেষ হলে বুদ্ধিমানেরা ষোলো-আনার আশা ছেড়ে দিয়ে আর্ধেক নিয়েই তুষ্ট থাকে। লাবণ্যর বদলে কেটি মিত্তির এমন কি খারাপ, অমিতের বদলে শোভনলাল? হিসেবে ঠিক আছে দুজন জিতেছে, দুজন হেরেছে। কেটি জিতেছে, কারণ ভালোবাসা ওকে কাঁদিয়েছে, তাই ও পেয়েছে। শোভনলাল জিতেছে কারণ তার প্রেম অমৃত। প্রতিদান না পেয়েও প্রেমের শিখাটি কতকাল মনের অন্তরালে সে জ্বালিয়ে রেখেছে। কিন্তু শোভনলালকে গ্রহণ করেও লাবণ্যর মুখে একী অশোভন উক্তি—হেথা মোর তিলে তিলে দান—এই যদি মনে ছিল তবে ওকে গ্রহণ করা কেন, ওর প্রেমকে অপমান করবার অধিকার তাকে কে দিল? বরঞ্চ অমিতের ব্যবহার ঢের বেশি শোভন, তার কেটি-ও রইল, লাবণ্যও রইল—একজনের চাই সঙ্গ, আরেকজনের আসঙ্গ।

আগেই বলেছি, 'শেষের কবিতা' যৌবনের কাব্য। ভয়ঙ্কর রকমের আধুনিক—অক্সফোর্ড-কেম্বিজে পড়া চকচকে ঝকঝকে স্ত্রী-পুরুষের মেলা। তথাপি মনে হয় কোথাও যেন এই কাহিনীর সঙ্গে আমাদের রূপকথার একটা আদল আছে। আধুনিক উপন্যাসের তৌলদণ্ডে বিচার করতে গেলে ওর প্রতি অবিচার হবে। উপন্যাস হিসেবে নিঃসন্দেহে দুর্বল কিন্তু কাব্যগুণে ও মুহূর্তে বাংলাদেশের হৃদয় হরণ করেছিল। একযুগ গিয়েছে যখন 'শেষের কবিতা'

আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের বাইবেল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভাষায় এবং ভঙ্গিতে এর বহু-অনুকরণ আমাদের গল্পে উপন্যাসে হয়েছে। 'চতুরঙ্গ' থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতিতে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার সবচাইতে মহিমান্বিত রূপের প্রকাশ 'শেষের কবিতা'য়। ভাষার দীপ্তি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মনকে যেমন চকিত করে, মনোযোগকে তেমনি বিক্ষিপ্ত করে। হয়তো তাতে কাহিনীর গতিতে বাধারও সৃষ্টি করে। কিন্তু সব মিলিয়ে স্বীকার করতেই হবে—তীক্ষ্ম তির্যক বাক্যভঙ্গির প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের গল্প উপন্যাস বাংলা গদ্যে অমিত শক্তির সঞ্চার করেছে।

'শেষের কবিতা'র পরে রবীন্দ্রনাথ যে তিনটি উপন্যাস লিখেছেন তার প্রত্যেকটিই অতিশয় ক্ষীণ-কলেবর। এদের উপন্যাসে আখ্যা দিলে 'নষ্ট নীড়' কেন উপন্যাস নয় তা আমি বুঝতে পারিনে। 'নষ্টনীড়'কে যদি উপন্যাস অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহলে উক্ত কাহিনীকে আমি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে গণ্য করব।

'দুই বোন' এবং 'মালঞ্চ' যমজ গ্রন্থ। আখ্যানবস্তু এক—স্ত্রী বর্তমানে অপর রমণীর প্রতি আকর্ষণ। নতুন কিছুই নয়, সংসারে ঘটেই থাকে কিন্তু নির্বিবাদে ঘটে না। এই নিয়ে গার্হস্থ্যাশ্রমে ভয়ঙ্কর সংঘাত ঘটতে পারে। 'দুই বোন' এ ব্যাপারটা অতিশয় নিঃশব্দে ঘটছে, সেটাই অস্বাভাবিক। এত দিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় এতবড় একটা পরিবর্তন এসেছে, শশাঙ্কর মনে তাই নিয়ে যথেষ্ট দ্বন্দ্ব নেই। যেখানটায় হাত পড়লে দাম্পত্যজীবনের শিকড়সুদ্ধ টান পড়ে, বেদনায় টনটন করতে থাকে বুকে সবগুলো পাঁজর, শর্মিলার মধ্যেও বেদনার সেই তীব্র অনুভূতি নেই। মা যেমন অবুঝ শিশুর আবদারে প্রশ্রয় দেয়, শর্মিলার মনে শশাঙ্কর প্রতি সেই প্রশ্রয়। যে তাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করছে সে তার আপন সহোদরা,—তাতে সান্ত্বনা থাকবার কোনই কারণ নেই, বরং সেই কারণেই ব্যাপারটা আরো বেশি মর্মান্তিক। কিন্তু শর্মিলা যেন নিজেই দু'হাত মিলিয়ে দিতে চাইছে। তোমরা সুখী হও, তোমাদের সুখেই আমার সুখ। ব্যাপারটা অমানুষিক। নিখিলেশ যেমন রক্তমাংসের মানুষ নয়, একটা যেন আইডিয়া, শর্মিলাও তেমনি একটা আইডিয়া মাত্র। এমনকি নিখিলেশের মনে যেটুকু বেদনাবোধ, শর্মিলার মনে সেটুকুও নেই।

'দুই বোন' রচনায় রবীন্দ্রনাথের হিসেবে ভুল হয়েছিল। একে আর একে দুই হয়, এইটুকুই শুধু দেখেছেন কিন্তু একের থেকে এক বাদ দিলে যে শূন্য হয়, সে কথাটা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। 'মালঞ্চে' সেই হিসেবটাই শোধরাবার

চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ একই সমস্যাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এবারে দেখেছেন। শর্মিলা আর নীরজা দুজনেই অসুস্থ—শর্মিলা দেহে এবং মনে উভয়ত অসুস্থ। নীরজার দেহ অসুস্থ, মন সুস্থ। সে জানে তার মন কি চায়। তবু দুর্বল মুহূর্তে মনে মনে খুব বড় রকমের একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। আয়ুর শেষ সীমায় এসে পৌছেছে, তার ক্ষীণ মুঠিতে আয়ুকে সে আর ধার রাখতে পারবে না, আর আয়ুর চাইতেও অ-স্থির যে স্বামীর মন তাকেই বা সে ধরে রাখবে কেমন করে? ভেবেছিল যাকে সে কোনমতেই রাখতে পারবে না, যাবার আগে তাকে প্রসন্ন মনে দিয়ে যাবে, যে রমণী তার সর্বসুখের হন্তা তারই হাতে। পারলে অবশ্যই আমাদের সমাজে দেবী আখ্যা নিয়ে মরতে পারত। কিন্তু নীরজা একেবারে নির্ভেজাল মানুষ, তায় মেয়েমানুষ—'অল্প লইয়া থাকে'—স্বামী আর তার বাগান, এই নিয়ে তার জগৎসংসার। সে পারেনি—'পারলুম না পারলুম না—দিতে.পারব না, পারব না'—এই তার শেষ আর্তনাদ। মৃত্যুর আগে কেউ জ্ঞাতসারে মিথ্যা কথা বলে না। নীরজা মরেছে, কিন্তু মরেও জীবনের সত্য রক্ষা করে গিয়েছে। শর্মিলা বেঁচে আছে, বেঁচে থেকেও জীবনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেনি কারণ সে জীবন্মৃত!

'চার অধ্যায়' রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদের পটভূমিকায় লেখা। ১৯৩০-এর আগে আর পরে কয়েকবছর ধরে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল। বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয়, মেয়েরাও এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। দেশের বহু নির্ভীক চরিত্রবান তরুণের আত্মবলি কবির কাছে মর্মান্তিক অপচয় বলে মনে হয়েছিল। সেই মর্মবেদনা এই কাহিনীর মধ্যে মিশে আছে। কাহিনীর সূত্রপাতে দেখছি দলপতি ইন্দ্রনাথ জেনেশুনেই মেয়েদের এই অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে ডেকে এনেছেন। তাঁর মতে দেশ অর্ধনারীশ্বর—মেয়ে-পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি। এলাকে বলেছেন, 'কেমন করে তুমি বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেটুকু বাদ দিয়ে কেবল শুখো মাইনেয় কাজ করাতে গেলে পুরো কাজ পাব না।'

অন্তু এই দলে এসে জুটেছে দেশের টানে নয়, এলার টানে। সত্যি বলতে কি, এলা-ই ওকে টেনে এনেছে। এরা দেশের কাছে বাগ্‌দত্তা, পণ করেছে বিয়ে করবে না। পণ করা সহজ, মনকে বাগানো সহজ নয়। এক দিনের আকস্মিক সাক্ষাতের ফলে এলা তার মন বিকিয়ে দিয়েছে অন্তুকে। কে জানত একদিন মনের মানুষ এসে দেখা দেবে তখন দল দেশ ধর্ম সব যাবে ভেসে।

সেই বন্যা এসেছে জীবনে কিন্তু এলার পায়ে পণরক্ষার বেড়ি বাঁধা। অন্তু আর্টিস্ট মানুষ, সে সাহিত্যিক। দেশোদ্ধারের রক্তে লেখা বীররস তার মনকে সিক্ত করেনি। দেশমাতৃকাকে যে অর্ঘ্য জোগাতে পারেনি সে-অর্ঘ্য এসে দিয়েছে এলার পায়ে। দলের হয়ে পলিটিক্যাল ডাকাতিতে যোগ দিয়েছে। ও স্বধর্ম-চ্যুত, আপন স্বভাবকে ও হত্যা করেছে। নিজেকে ভেঙে মুচড়ে দুমড়ে নিজের লক্ষ্মীছাড়া দশাই ও করেছে—এলা দেখে আর তার বুক ফেটে যায়। কিন্তু এখন আর ফিরবার পথ নেই। হয় পুলিশের হাতে না হয়তো আপন দলের হাতে সদ্গতি অনিবার্য। অন্তু কবি, সেই প্রথম সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে বলেছিল—"তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ'। আজ সেই সর্বনাশের মুহূর্ত উপস্থিত। পাছে অন্তু-এলার প্রেম দলের মধ্যে ভাঙন ধরায়—অতএব এদের অপসারণ প্রয়োজন হয়েছে। এলার অন্তিম প্রার্থনা—অন্তুর হাতেই তার মরণ হোক, অন্তুর জন্মদিনে তাকে উপহার দিয়েছিল তার প্রথম চুম্বন, আজ দিল শেষ চুম্বন। শেষ চুম্বন অফুরন্ত হোক এই তার শেষ প্রার্থনা।

'চোখের বালি' এবং 'ঘরে বাইরে' কে বাদ দিলে ইংরেজিতে যাকে বলে প্যাশন্ সে-জিনিসটি তাঁর গল্প-উপন্যাসে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। এবং এই দুই গ্রন্থেও তিনি প্যাশন্‌কে স্বীকার করেছেন মাত্র কিন্তু তাকে দোরের বাইরের দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। 'চার অধ্যায়'-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে দেহের জিজ্ঞাসা উগ্র হয়ে উঠবার অবকাশ পায়নি কিন্তু প্যাশনের বিদ্যুৎস্ফুরণ ক্ষণে ক্ষণেই আমরা দেখতে পেয়েছি এবং তাতেই 'চার অধ্যায়'-এর কাহিনী প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে আবেগ সঞ্চিত হতে থাকে শানিত বাক্যের আঘাতে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। 'শেষের কবিতা'র মতো এখানেও শানিত বাক্যের উল্কাবৃষ্টি। একটু কম হলেই হয়তো ভাল হত। তাহলেও হৃদয়াবেগের অপমৃত্যু এ গ্রন্থে হয়নি, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

মহাকবির গদ্য

ভাষা আগে, সাহিত্য পরে। আবার ভাষার ইতিহাসে গদ্য আগে, পদ্য পরে। মানুষ চিরকাল তার নিত্যদিনের খাওয়া-পরা কাজকর্মের কথা গদ্যেই বলেছে। গদ্য হল কাজের ভাষা, পদ্য শখের। কখনো সখনো শখ করে লোকে ছড়া কেটে কথা বলেছে। সাহিত্যও শখের জিনিস; কাজেই সাহিত্যের যখন সৃষ্টি হল তখন ধারাটি গেল পাল্‌টে। সেখানে পদ্য আগে গদ্য পরে। সাহিত্য পদ্যকে নিয়েই তার শখ মিটিয়েছে। সে-ই সুয়োরানী, গদ্য দুয়ো। বহুকাল কেটেছে অনাদরে অবহেলায়। ভারবাহী জীবের মতো ওকে নেহাৎ মোটা রকমের কাজের লাগানো হয়েছে। সেই আদি যুগে যখন ভাষা বলতে শুধুই গদ্য তখন সেই গদ্যের দেহটি ছিল মেদ-বহুল, চলনটা গদাই-লস্করী। সামান্য কথা বলতে গিয়েই সে হাঁপিয়ে পড়ত। মস্ত বড় ভারি জিনিসকে নড়ানো বা তাকে দিয়ে কোন কাজ করানো বড় সহজ নয়। কিন্তু জিনিসটাতে যদি চাকা জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে অতি সহজে তাকে গড়গড় করে টেনে নেওয়া চলে। একসময়ে ভাষার গায়ে সত্যি সত্যি চাকা লাগিয়ে দেওয়া হল। চাকাটা হচ্ছে ছন্দ মিলের চাকা; সঙ্গে সঙ্গে পদ্যের জন্ম হল। পদ্য সেই চাকার জোরে দিব্যি ঘুরে ঘুরে নেচে বেড়াতে লাগল। ক্রমে সুরের ডানা মেলে গান হয়ে উঠতেও শিখল।

সাহিত্যের আসরে গদ্যের প্রবেশ বহুকাল একরকম নিষিদ্ধই ছিল। এ শুধু আমাদের সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সব সাহিত্যে। হিসেব করলে দেখা যাবে বাংলা কাব্যের বয়স প্রায় হাজার বছর হতে চলেছে। কিন্তু বাংলা গদ্যের বয়স দু-শ' বছরও পূর্ণ হয়নি। ইংরেজি সাহিত্যের প্রসার প্রতিপত্তি আমাদের সাহিত্যের চাইতে ঢের বেশি। সেখানে গদ্যের জন্ম বলা চলে পঞ্চদশ শতকে কিন্তু সাহিত্যে তার আসন পাতা হয়েছে অষ্টাদশ শতকে। তিন শ'বছর লেগে গিয়েছে সাবালক হতে। সে তুলনায় বাংলা গদ্যের বিকাশ আশ্চর্যরকম দ্রুতগতিতে। এর কারণ ওর শৈশব পরিচর্যাটা হয়েছে মহামনস্বী ব্যক্তিদের হাতে। স্বয়ং বিদ্যাসাগর বাক্যের গঠন প্রণালী খুব মজবুত করে বেঁধে দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে কাব্য কথা বলে মনের খুশিতে, তার দায় দায়িত্ব কম; কেননা তার কোন প্রতিপাদ্য বিষয় নেই। কিন্তু গদ্য যা বলতে চায় যুক্তি সাক্ষ্য দিয়ে তা প্রমাণ করতে হয়। সেজন্যে গদ্যের ভাষাটি হবে

আঁটসাট। ঠাস্‌বুহুনি। ঐটিই গোড়ার কথা। কাব্য হল রসের ভাষা, গদ্য যুক্তির।

বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় যে আমাদের দেশে আধুনিক যুক্তিবাদের প্রসার এবং গদ্য ভাষার জন্ম একই লগ্নে হয়েছে। রামমোহন রায়কে বলা চলে এদেশে যুক্তিবাদের প্রবর্তক, আবার তিনিই বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের ন্যায় মনীষী ব্যক্তিদের চিন্তার বাহন হওয়া সহজ কথা নয়। শিশুর মুখে আধ-আধ বুলি ফুটবার আগেই ও পাকা কথা বলতে শিখেছে। অকালপক্কই বলতে হবে। এর কারণ শিশুকালেই ওকে দিয়ে নানা কঠিন কাজ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। রামমোহন বেদান্তসূত্র বাংলায় অনুবাদ করে দিলেন। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের অনুকূলে প্রবন্ধাদি লিখতে লাগলেন। বিষয়টি যে শাস্ত্রবিরোধী নয় যুক্তি তর্কের দ্বারা তা প্রমাণ করলেন। এসব দুরূহ কার্য সম্পাদন করতে গিয়েই বাংলা গদ্যের দেহটি হাড়ে মাংসে মজ্জায় দিব্যি সবল হয়ে উঠেছিল।

বিদ্যাসাগর গদ্যের যে বুনিয়াদ তৈরি করে দিয়েছিলেন তারই উপরে বঙ্কিম তাঁর সৌধ রচনা করলেন। গদ্যের স্বভাবটা কেজো; এ যাবৎ সে বেশির ভাগ কাজের কথাই বলে এসেছে। বঙ্কিম তার মুখে রসের কথা ফোটালেন। বলে নেওয়া ভালো যে বঙ্কিমও যুক্তিবাদী মানুষ। প্রমাণ করে দিলেন যে যুক্তির সঙ্গে রসের কোন বিরোধ নেই। যুক্তি-যুক্ত কথাও রসমণ্ডিত করে বলা যায়। বঙ্কিমের প্রবন্ধে তার প্রমাণ। এইসূত্রে উল্লেখযোগ্য যে তিনি যেসব চিত্ত-চমৎকারিণী কাহিনী রচনা করেছেন তাতেও তাঁর গদ্য আবেগের আতিশয্যে গদগদ হয়ে ওঠেনি। বঙ্কিমের ভাষায় জলীয় পদার্থ অতি কম। রসের জন্য যেটুকু আর্দ্রতার প্রয়োজন তার বেশি কোথাও নেই।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলা গদ্যের সূচনা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস রচনার মধ্যে কালের ব্যবধান মাত্র পঁয়ষট্টি বৎসরের। ইংরেজি সাহিত্যে এই ব্যবধানটি তিন শ' বৎসরের। বাংলা গদ্যের বিদ্যুৎগতি সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে এই তিন মহা মনস্বী—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র—প্রতি পদক্ষেপে যোজন পথ অতিক্রম করেছেন। বিকাশপ্রাপ্ত ভাষার একটা মস্ত বড় গুণ হল তার সাবলীল ভঙ্গি বা স্বচ্ছন্দ ভাব যাতে অবলীলাক্রমে তার দেহটিকে সে হেলাতে দোলাতে পারে। ভাষা যখন এরূপ flexibility অর্জন করে তখনই মানুষের বিচিত্র মনোভাব ভাষার মুখে স্পষ্টত ফুটে ওঠে—কখনো উৎফুল্ল কখনো বিষণ্ন, কখনো রাগত কখনো সলজ্জ, কখনো কুঞ্চিত ভ্রূ কখনো

অপাঙ্গ দৃষ্টি। বঙ্কিম বাংলা গদ্যে এই সাবলীল ভঙ্গিটি এনে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন বালক বাংলা গদ্য তখন কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছে, পুরোপুরি সাবালক হয়েছে, প্রেমের কথা বলতে শিখেছে। এই সাবালক গদ্যের উত্তরাধিকারী হলেন নাবালক রবীন্দ্রনাথ। মনে রাখতে হবে যে উত্তরাধিকার বলতে শুধু যেটুকু হাতে এসে পড়ল সেটুকুই নয় এবং উত্তরাধিকার রক্ষা করার অর্থ শুধু অনুসরণ বা অনুকরণ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যের যে শক্তি সম্ভাবনাকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই সম্ভাবনাটিকেই উত্তরাধিকার হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে উত্তরাধিকার রক্ষা করাই যথেষ্ট নয় তার শক্তি বৃদ্ধি এবং শ্রীবৃদ্ধিই সর্বতোভাবে কাম্য। প্রতিভার স্বভাবই এমন যে নকলনবিসি তার পছন্দ নয়। সে নিজের তাগিদেই নিজের পথ বেছে নেয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'। বয়স সতরো কিংবা আঠারো। ঐ বয়সে এবং বিশেষ করে ঐসময়ে যখন বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে একচ্ছত্র অধিপতি তখন বঙ্কিমী ছাঁদে লেখাটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ধরেই সাধু ভাষা ছেড়ে লিখলেন কথ্য ভাষায়। বলতে পারেন টেকচাঁদ এবং হুতোম এ ব্যাপারে আগেই পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে টেকচাঁদ এবং হুতোম-এর ভাষা প্যারীচাঁদ মিত্র বা কালীপ্রসন্ন সিংহ কারোরই ভাষা নয়। তাঁরা নিতান্তই কৌতুকবশে কলকাতার সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের কথ্য ভাষায় বলা যেতে পারে কলকাতার 'ককনি' ভাষায় তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, পরোক্ষভাবে বাংলা গদ্যের বিকাশে সাহায্যও করেছেন, কিন্তু সে ভাষা সাহিত্যের ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন কলকাতার ভদ্র শিক্ষিত সমাজ যে ভাষায় কথা বলত সে ভাষায় অর্থাৎ তাঁর নিজের অভ্যস্ত ভাষায়। এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর গদ্য রচনার সূচনায় তিনি সে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তার ক্রমোন্নত রূপটিই আজ বাংলা গদ্য সাহিত্যের সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া ঐ বয়সেই তিনি ভাষা প্রয়োগে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে—'আমাদের দেশে যেমন স্তরে স্তরে মেঘ করে, এখানে আকাশ সমতল—মনে হয় না যে মেঘ করেছে। মনে হয় কোনো কারণে আকাশের মুখটা ঘুলিয়ে গিয়েছে। সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবর জঙ্গমের যে কী একটা অবসন্ন মুখশ্রী দেখা যায় তা বর্ণনা করা যায় না। লোখের মুখে সময়ে সময়ে শুনতে পাই বটে যে কাল বজ্র হয়েছিল।

কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর নেই যে তাঁর মুখ থেকেই খবরটা পাই—এখানকার বজ্রধ্বনি শুনতে গেলে বোধহয় মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে হয়।' কে বলবে আঠারো বছরের ছেলের রচনা। এই রচনাভঙ্গিরই পরিণত রূপ 'ছিন্নপত্রে'র পাতায়।

ভাষার শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে প্রয়োজন দুটি জিনিসের—মননশক্তি এবং কল্পনাশক্তি। রবীন্দ্রনাথ দুটি গুণেরই নিঃসংশয় অধিকারী। তিনি একাধারে মহামনস্বী এবং মহাকবি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অতুল গুপ্ত মশায় রবীন্দ্রনাথের গদ্যকে বলেছেন মহাকবির গদ্য। খাঁটি কথাই বলেছেন। তবে কথাটাকে নিতান্ত literally বা আপাত-বোধ্য অর্থে গ্রহণ করলে একটু ভুল বোঝার আশংকা থাকে। মনে হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যে কাব্য গুণটাই বড় কথা। শুধু তাই নয়, মহাকাব্যের স্বভাবটা যেমন একটু গুরু-গম্ভীর, সাজ-সজ্জা রাজসিক অর্থাৎ বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গিতে একটা জমকালো ভাব, রবীন্দ্রনাথের গদ্যও বুঝি একটা শব্দবহুল অতিরঞ্জিত ব্যাপার। অতুলবাবু কথাটা সে অর্থে বলেননি। তিনি শুধু বলতে চেয়েছেন যে মহাকবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে কবিকল্পনার অধিকারী ছিলেন গদ্য রচনার বেলায়ও তিনি সেই কল্পনাশক্তির যথোচিত ব্যবহার করেছেন। বলা বাহুল্য, কল্পনাশক্তির সাহায্য ছাড়া কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের জোরে কোন রচনাই খাঁটি সাহিত্যের স্তরে উঠতে পারে না। যাঁরা সার্থক গল্প উপন্যাস রচনা করেন তাঁরা কবি না হলেও কবি-কল্পনার অধিকারী। উঁচুদরের প্রবন্ধ সাহিত্যও কল্পনার প্রসাদ গুণে প্রসন্ন। কল্পনাশক্তি ব্যতিরেকে কোন ক্ষেত্রেই কোন রস সৃষ্টি সম্ভব নয়। শিল্প সাহিত্যের ব্যাপারে রসের বিচারই শেষ বিচার।

বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের গদ্যে কাব্য গুণ আছে কিন্তু কাব্যিয়ানা নেই। কাব্য রচনার বেলায় বরং একটু মাত্রাধিক্য ঘটেছে—পদ-লালিত্যের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি লক্ষণীয়। গদ্য রচনায়ও ভাষার লালিত্যের প্রতি কিঞ্চিৎ ঝোঁক, কিন্তু সেটা মাত্রাতিরিক্ত নয়। ভাষা যেখানে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত সেখানেও একটু ভেবে দেখলে সেটা অসঙ্গত মনে হবে না। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। শিক্ষা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধে বলছেন—'বালকদের হৃদয় যখন নবীন, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলায় খেলা করিতে দাও।···তরুলতার শাখা পল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানা রস বিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায়

দাঁড়াইয়া দেখুক, নব বর্ষা প্রথম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজল নিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দে গর্জনে চির-প্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানা বর্ণে বিচিত্র, দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও।' এ গদ্য নিঃসন্দেহে কবির গদ্য। কিন্তু একে আমি কাব্যিয়ানা বলব না। কারণ কাজের কথা বলতে গিয়েও ভাষাকে যে এতখানি উদ্বেলিত করেছেন তার খুব সঙ্গত কারণ আছে। দিনের পর দিন প্রকৃতির যে বিচিত্র সমারোহ আমাদের চোখের সম্মুখে উদঘাটিত হচ্ছে আমাদের অভ্যাস-জীর্ণ চোখে তা ধরা পড়ে না। সৌন্দর্যের এক বিরাট ভোজ থেকে আমরা বঞ্চিত। ঋতুর পর ঋতুর যে বিচিত্র শোভাযাত্রা—তার grandeur টি ধরিয়ে দেবার জন্যেইভাষার এই splendour। এটা ভাষার কারিগরি বা Craftsmanship। কোন কিছুর মহিমা প্রকাশ করতে গেলে মহিমান্বিত ভাষাতে করাই মানানসই। এই সূত্রে অতুল গুপ্ত মশায়ের অপর একটি উক্তিও স্মরণীয়। বলেছেন—মহাকবির গদ্য হলেও ভুলেও কোথাও পদ্যগন্ধী নয়।

স্থান কাল পাত্র ভেদে যেমন মানুষের ব্যবহারের বদল হয় তেমনি বিষয়ভেদে ভাষারও বদল হওয়া স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করেছেন তখন শব্দবহুল গুরু-ভার ভাষা মন্দাক্রান্তা তালে ধীর পদে চলেছে, কখনো শার্দুল-বিক্রীড়িত চালে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়েছে। সংস্কৃতের ভারিক্কি চালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নিজের ভাষাকে ওজনে একটু ভারি করে তুলেছেন। আধুনিক সাহিত্য, আধুনিক কাব্যের আলোচনা যেখানে করেছেন সেখানে হাল আমলের ভাষা দিব্য লঘু পদেই চলেছে।

গদ্য এবং পদ্য—এ দু'এর স্বভাব আলাদা। এদের প্রকাশভঙ্গিও আলাদা হওয়াই বিধেয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই আলোচনা করেছেন। বলেছেন —'যেমন রমণীর তেমন পদ্যেরও অলংকারের প্রতি টান বেশী, গদ্যের সাজ-সজ্জা স্বভাবতই কর্মক্ষেত্রের উপযোগী। তাহাকে তর্ক করিতে হয়, অনুসন্ধান করিতে হয়, ইতিহাস বলিতে হয়, তাহাকে বিচিত্র ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয় —এই জন্য তাহার বেশভূষা লঘু, তাহার হস্ত পদ অনাবৃত।' গদ্যকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু যাঁরা কাজের মর্যাদা বোঝেন তাঁরা কখনো দায়সারা ভাবে কাজ সমাধা করেন না। গদ্য রচনার বেলায় রবীন্দ্রনাথ সর্বক্ষণ সে কথাটি স্মরণ রেখেছেন। প্রচুর যুক্তি তর্ক বিচার-বিবেচনা

সত্বেও তাঁর গদ্যের মেজাজ কখনো বিগড়ায়নি। সমাজ সাহিত্য শিক্ষা ধর্ম রাজনীতি—সকল বিষয়েই কথা বলেছেন এবং যুক্তি প্রমাণ সহকারেই বলেছেন, কিন্তু কথায় শোভন শ্রী কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

আমরা রসাত্মক বাক্যকে বলি কাব্য। আমি বলি গদ্যে হোক পদ্যে হোক রসাত্মক না হলে কোন বাক্যই সাহিত্য পদবাচ্য হবে না। গদ্য যদিচ প্রধানত যুক্তির বাহন তাহলেও বলব যুক্তির সঙ্গে রসের কোন বিরোধ নাই। খুব যুক্তিযুক্ত কথাও রসযুক্ত করে বলা যায়। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনা করেছেন আশ্চর্যরকম সরল ভাষায়। 'বিশ্ব পরিচয়' খাঁটি বিজ্ঞান প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা। এমন রসিয়ে লিখেছেন যে মনে হতে পারত যে বিজ্ঞানের সঙ্গে বুঝিবা কিছু ভেজাল মিশিয়েছেন। সে দুর্দৈব ঘটেনি। তত্ত্ব বা তথ্যের কোন বিকৃতি ঘটেছে বলে বিজ্ঞানীদের মুখে শুনিনি। রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে সাহিত্য এবং বিজ্ঞান দুই ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসী নয়। দুয়ের সহাবস্থান সম্ভব। অতিশয় সরস ভাষায় লেখা বিজ্ঞান প্রসঙ্গ ইংরেজি ভাষায়ও যথেষ্ট আছে।

উপমা উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি কাব্যের মস্ত বড় হাতিয়ার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যেও উপমার ব্যবহার করেছেন একটু উদার হস্তে। একটু কম করলেই বোধ-হয় ভালো হত। অবশ্য অতুল গুপ্ত বলেছেন—'বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ান্তরের স্পর্শে অদ্ভুত ঐক্যের আলোর চমক পথ আলো করে দিল।' তাহলেও বলব কাব্যের ভাষায় অতিরঞ্জনের দিকে যেমন একটু ঝোঁক ছিল তাঁর গদ্যের ভাষাও সেই প্রবণতা থেকে একেবারে মুক্ত নয়। দেশ এবং সমাজ সম্বন্ধে প্রবন্ধের ভাষা (বিশেষ করে গোড়ার দিকের) আরেকটু সংক্ষিপ্ত এবং সংহত হলে বক্তব্যের জোর আরো বাড়ত। ভাষাটাকে হাত-পা বেশি ছড়াতে দিলে বক্তব্যটার মেদ বৃদ্ধি হয় কিন্তু বল খুব বাড়ে না। পরে ক্রমেই তাঁর ভাষা অধিকতর সংহত এবং জোরালো হয়ে উঠেছে। ভার কমে গিয়ে ধার বেড়েছে। একেবারে অন্তিম পর্বে তাঁর শাণিত বাক্যের চকচকে ঝকঝকে রূপ যৌবনকালে আমাদের চোখ ঝলসে দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা সম্পর্কে যে জিনিসটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় সেটি হল এর বিস্ময়কর বিষয়বৈচিত্র্য। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের জীবনের এমন কোন দিক নেই যা নিয়ে তিনি ভাবেননি এবং আলোচনা করেননি। সকল কথা ভেবেছেন সকলের কথা ভেবেছেন। ছোট বড় কেউ বাদ পড়েনি। সাংসারিক সামাজিক, আর্থিক পারমার্থিক কোন বিষয়ই বাদ যায়নি। দেশের স্বাধীনতার

কথা যেমন বলেছেন তেমনি আবার দেশ গঠনের কথা। অপরদিকে সর্বমানবের ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের কথা তিনি যেমনভাবে বলেছেন এমন আর কেউ নন। বলবার ভঙ্গিটি অপূর্ব—'আমাদের একটি মাত্র দেশ আছে, তার নাম বসুন্ধরা; একটি মাত্র জাতি আছে, তার নাম মানুষ জাতি।' যেমন তাঁর চিন্তার বিস্তার তেমনি তাঁর চিন্তার গভীরতা। এই যে বিস্তারের কথা বলছি সেটি একেবারে আক্ষরিক ভাবে সত্য। আমরা রবীন্দ্রনাথকে মহাকবি বলে জানি কিন্তু তিনি যে একাধারে মহা গদ্যরচয়িতা সে কথা আমাদের মনে থাকে না। কারণ তাঁর গদ্য রচনার পরিমাণ যে কী বিপুল সে হিসাব আমরা রাখি না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র রচনাবলী' পনেরো খণ্ডে সমাপ্ত। এর মধ্যে তিন খণ্ড কবিতা, এক খণ্ড গান (গীতবিতান), কাব্যনাট্য গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য মিলিয়ে আরো এক খণ্ড। এই পাঁচ খণ্ড বাদ দিয়ে বাকী দশ খণ্ডই গদ্য রচনা। এর মধ্যে চিঠিপত্র সিরিজ ধরা হয়নি, কারণ রচনাবলীতে এ সবের স্থান হয়নি। বলে রাখা ভালো যে চিঠিপত্র সিরিজে ইতিমধ্যেই এগারো খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এখনও বহু চিঠি প্রকাশের অপেক্ষায়। চিঠিপত্রের সাহিত্যিক মূল্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয়েছে 'ছিন্নপত্রে'র পাতায়।

বিপুল পরিমাণ এবং বিশাল বিস্তারের পক্ষে চাক্ষুষ প্রমাণই যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার প্রকৃত মাহাত্ম্য তার চিন্তার গভীরতায়। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য নানা বিচিত্র চিন্তার এক খনি বলা যেতে পারে। অবশ্য চিন্তার চলৎশক্তি নির্ভর করে প্রকাশভঙ্গির উপর। কথায় যদি মাধুর্য না থাকে তাহলে একের চিন্তা অপরের মনে প্রবেশ পথ পায় না। চিন্তাশীলতার সঙ্গে প্রসাদগুণের মিলনে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসমূহ আমাদের সাহিত্যে তুলনাবিহীন। দেশ সমাজ দেশের শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে এত গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন যে, বহুদিন পূর্বে বলা কথার Relevance বা যৌক্তিকতা আজও বিনষ্ট হয়নি। সেই স্বদেশী যুগে বলেছিলেন এ দেশে যুগ যুগ ধরে শাসনব্যবস্থার চাইতে সমাজ ব্যবস্থা ঢের বেশি কার্যকরী। রাজশক্তি রাজধানীতে বসে শাসন কার্য পরিচালনা করত কিন্তু গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীরাই সমাজ-জীবনের যাবতীয় ব্যবস্থাদি করতেন। সেখানে শাসন-কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ ছিল না। সেই সমাজ ব্যবস্থাই ছিল স্বরাজ ব্যবস্থা। এবার রবীন্দ্রনাথের মুখেই শুনুন—'আমাদের দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্য রক্ষা এবং বিচার কার্য রাজা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যা দান হইতে জল দান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ অতি সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে।

…রাজায় রাজায় লড়াই-এর অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্মরায়মান বেণুকুঞ্জে আমাদের আম কাঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভঙ্করী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ পাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লী প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।' ইংরেজ আমলে এই স্বয়ং-সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পল্লী সংগঠন প্রস্তাব ঐ সমাজ ব্যবস্থারই পুনরুজ্জীবন প্রয়াস।

দেশের এবং বিদেশের রাজনৈতিক সমস্যাদির আলোচনায় তিনি যে অন্তর্দৃষ্টির এবং দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তাও বিস্ময়কর। হিটলার মুসোলিনির ক্ষমতা যখন তুঙ্গে তখনই লিখেছিলেন—'পৃথিবীতে যে দেশেই যে কোন বিভাগেই ক্ষমতা অতি প্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে সেখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ-বিষ উদ্ভাবিত করে। ইম্পিরিয়ালিজম বল, ফ্যাসিজম বল অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। কংগ্রেসেরও অন্তঃ-সঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠছে বলে মনে সন্দেহ করি।' দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিজম এবং আমাদের কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন।

ধর্মকথা লোকে পারতপক্ষে শুনতে চায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মকে বলেছেন—Religion of an artist. ভাষা শিল্পের গুণে ধর্মকথাও কথামৃতে পরিণত হয়েছে। দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্য যদিচ রসের সৃষ্টি, সাহিত্যের আলোচনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নীরস। যুক্তিসম্বলিত সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাও কতখানি হৃদয়গ্রাহী হতে পারে রবীন্দ্রনাথই হাতে কলমে তা দেখিয়ে দিলেন। 'সাহিত্যের পথে' 'সাহিত্যের স্বরূপ' ইত্যাদি গ্রন্থে তার নিদর্শন।

যা কিছু লিখেছেন—বিষয় নির্বিচারে তারই মধ্যে সাহিত্যর রস এবং স্বাদ গন্ধ অতি অনায়াসে এনে দিয়েছেন। অবশ্য তাই বলে বলব না যে সকল বিষয়ে সর্বপ্রকারে রবীন্দ্রনাথের গদ্যই আদর্শস্থানীয়। কোন কোন ব্যাপারে তাঁর ভাষায় কিছু ঘাটতি আছে। জীবনের শেষ পঁচিশ বৎসরকাল তিনি কথ্য ভাষাতেই সব কিছু লিখেছেন। আমাদের সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের মুখের ভাষায় কিছু কিছু expression বা বাক্যাংশের ব্যবহার আছে যা খুবই Appropriate বা লাগসই। এসব কথা ভাষার তথা জাতির প্রাণশক্তির মধ্যে নিহিত।

রবীন্দ্রনাথ এটির সুযোগ গ্রহন করেননি। শালীনতা বোধটি ছিল একটু অত্যধিক, তাতেই একটু শুচিবাই-এর সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রাম্য ইডিয়ামকে তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন। বহুদিন পূর্বেই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। ছেলে ভুলানো ছড়ায় আছে—বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে/সেই যে বোন গাল দিয়েছে ভাতারখাকী বলে। 'ভাতারখাকী' কথাটি রবীন্দ্রনাথের অশালীন মনে হয়েছে। ভাতারখাকী স্থলে তিনি স্বামীখাকী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। গ্রাম্য ইডিয়াম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে তিনি বুঝতে পারতেন যে ভাতারখাকী শব্দটি এখানে সর্বোতোভাবে প্রযোজ্য। শেষ দিকের গল্প উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাও আদৌ স্বাভাবিক ভাষা নয়। এমন চকমকে ঝকঝকে ক্ষুরধার তীক্ষ্ম ভাষা অমিট রায় কিংবা ইন্দ্রনাথের মুখে যদিবা মানায়, পুলিশের দারোগা কানাই গুপ্তর মুখে তা নিতান্তই বেমানান শোনায়।

তাহলেও বলব দোষে গুণে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্য অতুলনীয়। এর সর্বাঙ্গে রবীন্দ্র মনের ছাপ। মনের যে নবীনতা সজীবতা সৃজনশীলতা তাঁকে মহাকবি করেছে সেই সৃজনশীল এবং চিন্তাশীল মনের দৌলতেই তিনি মহান গদ্য রচয়িতা হতে পেরেছেন। আমরা বাংলা ভাষাভাষীরা কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে অধিকতর ঋণী, কেন না তিনি বাংলা গদ্যকে এমন জায়গায় এনে দিয়েছেন যেখানে ক্রমবিকাশের সকল পথই আমাদের সুমুখে উন্মুক্ত। জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন সকলেরই প্রকাশমাধ্যম গদ্য। বাংলা গদ্যের পক্ষে আজ কোন সাধনাই আর অসাধ্য নয়।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও রবীন্দ্রনাথ

'ইন্দ্রজিতের খাতা' গ্রন্থকারে প্রকাশিত হবার পরে জনৈক পাঠক আমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন। তিনি যে জিজ্ঞাসুমনের পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য আমি পাঠক বন্ধুটির কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর প্রশ্নটি হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখেছেন কিনা এবং না-লিখে থাকলে তার কারণ কি? এ প্রশ্নটি যে বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য সে কথা বলাই বাহুল্য। পত্র-প্রেরক নিজেই এ-প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় প্রবন্ধ কোনো কালে লেখেন নি। তার কারণও তিনি নির্দেশ করেছেন। তিনি বলতে চান কবির মেজাজ এ-জাতীয় প্রবন্ধের অনুকূল ছিল না। মেজাজ কথাটির উল্লেখ করে পাঠক রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ-জাতীয় লেখার মূলে এক ধরনের মেজাজ আবশ্যক। ব্যক্তিগত প্রবন্ধকার মাত্রই মেজাজী মানুষ। এঁরা ঝোঁকের মাথায় লেখেন—কখনো খুশির ঝোঁকে, কখনো রাগ বিরাগের ঝোঁকে। মেজাজ জিনিসটার জন্ম বায়ু পিত্ত কফের তারতম্য থেকে। যে মানুষের মধ্যে এই তিন বাস্তব সমতা রক্ষা হয়েছে সে মানুষ অতিশয় শীতল মস্তিষ্ক। তার মেজাজের বালাই নেই। অত্যন্ত শীতল মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছাড়া আর কোনো কিছু রচনা করা সম্ভব বলে আমি মনে করিনা। কাব্য রচনায় এবং কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মেজাজী মনের নিতান্ত প্রয়োজন। ইদানীং অবশ্য এলিয়ট এবং এলিয়টপন্থী সমালোচকরা জোর গলায় বলতে শুরু করেছেন যে, কাব্য রচনা করতে হলে নির্বিকার এবং নিরাসক্ত (impersonal and dis-pasionate) মন চাই। সে জিনিসটা আদৌ সম্ভব কিনা এলিয়টের কাব্য পাঠ করেও আমি নিঃসন্দেহ হতে পারিনি। কবিগুরু বাল্মীকি সম্পূর্ণরূপে নির্বিকার এবং নিরাসক্ত ব্যক্তি ছিলেন; তা না হলে তাঁর সর্বাঙ্গ বল্মীকে আচ্ছন্ন হতে পারত না। কিন্তু এমন নির্বিকার ব্যক্তিরও ব্যক্তিত্ব কাব্যে ধরা পড়েছে। বর্তমানে যাঁরা নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্য রচনায় লিপ্ত আছেন তাঁরা এ যুগের বাল্মীকি। অবশ্য এঁরা দেহ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সজ্ঞান। কিন্তু মনটা পাছে লেখকের ব্যক্তিত্বকে জাহির করে বসে সে জন্য তাঁরা নিজের মনকে বল্মীক আচ্ছন্ন করে

রেখেছেন। সে বল্মীক দুর্বোধ্য এবং দুর্ভেদ্য ভাষার আস্তরণ। আমরা যে শেক্সপীয়রকে নৈর্ব্যক্তিক কবি বলে আখ্যা দিয়েছি তার কারণ এই নয় যে, তিনি নিজের মনকে পাঠকের চোখ থেকে স্বেচ্ছায় আড়াল করে রেখেছেন। তাঁর জীবনের অত্যাবশ্যক তথ্য সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলেই তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাদের কাছে অত অস্পষ্ট। শেক্সপীয়র তাঁর বহুসংখ্যক সনেটে যে কৃষ্ণকুন্তলা সুন্দরীর কথা বারম্বার উল্লেখ করেছেন প্রয়োজনীয় তথ্য জানা থাকলে উক্ত সুন্দরীকে অতি সহজেই আমরা আবিষ্কার করতে পারতুম। আর যে অভিজাত নন্দনের প্রেম লাভ করে কৃষ্ণকুন্তলা সুন্দরী কবির প্রেমকে উপেক্ষা করেছিলেন সেই প্রেমিককেও খুঁজে বের করা কঠিন হত না। তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তথ্য আমাদের কাছে অজ্ঞাত। আমাদের নিজের অজ্ঞতাকেই নৈর্ব্যক্তিকতা আখ্যা দিয়ে শেক্সপীয়রের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করেছি।

যাক্ যে কথার আলোচনা করব বলে লিখতে বসেছি স্বভাবদোষে তা ছেড়ে দিয়ে অবান্তর কথায় এসে পড়েছি। এখানে বলে রাখা ভালো যে, আমি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে বসিনি; আমার এ-লেখাও একটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য হচ্ছে অবান্তর কথা অর্থাৎ বাজে কথা।

রবীন্দ্রনাথ মহাপুরুষ ছিলেন। তাই বলে এমন কথা বলব না যে, তিনি বাজে কথা কথা কক্ষণো বলতেন না কিংবা বলতে পারতেন না। বাজে কথা হচ্ছে সেই কথা যা কাজের লোকেরা কক্ষণো বলেন না, কিন্তু ভাবুক লোকেরা অনায়াসে বলেন। খুব সুখের কথা যে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন অজস্র বাজে কথা বলেছেন। বাজে কথার আরেক নাম রসের কথা। লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কাজের কথা নিংড়ালেও রস বেরোয় না। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে অকাতরে বাজে কথা বলেছেন এমন নয়—'বাজে কথা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও লিখেছেন ('বিচিত্র প্রবন্ধ' দ্রষ্টব্য)। বাজে কথাকে রবীন্দ্রনাথ কতখানি মূল্য দিতেন তাঁর নিজের জবানিতেই তা প্রকাশ করছি। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-নামক গ্রন্থটির ভূমিকায় কবি স্বয়ং বলছেন—'এই গ্রন্থের পরিচয় আছে 'বাজে কথা' প্রবন্ধে। ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুর গৌরবে নয়, রচনা রস সম্ভোগে।'

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মূল রহস্যটি এই কথার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ জিনিসটা বস্তুনিরপেক্ষ, কেবলমাত্র রসের মুখাপেক্ষী। যিনি এই রহস্য এত সহজে আবিষ্কার করেছেন তিনি এ-জাতীয় প্রবন্ধ লিখবেন না একথা

অবিশ্বাস্য। তিনি লিখেছেন কি না লিখেছেন সে কথা আলোচনা করবার আগে তাঁর মেজাজ যে এর প্রতিকূল ছিল না সে কথাটা প্রমাণ করা প্রয়োজন। আমি গোড়াতেই বলে নিয়েছি, যে ব্যক্তি অতিশয় শীতল মস্তিষ্ক এবং স্থিতধী তাঁর দ্বারা এ-জাতীয় প্রবন্ধ রচনা কখনো সম্ভব নয়। ডক্টর জনসন-এর মতে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হচ্ছে—an irregular indigested piece, not a regular and orderrly performance.

নির্জলা বাংলা করে বলতে গেলে কথাটা দাঁড়ায় যে এ-জাতীয় প্রবন্ধ হচ্ছে এক ধরনের আবোল তাবোল কিংবা হ য ব র ল। অবশ্য এতে আপত্তি করবার কিছু নেই। তাল পরিমাণ আবোল তাবোলের মধ্যে তিল পরিমাণ method প্রকাশ পেলেই তা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হতে পারে। কবিদের যেটা সবচেয়ে বড় গুণ, শেক্সপীয়র যাকে বলেছেন Fine frenzy সেই frenzy-কে method-এর শাসনাধীনে আনতে পারলেই গীতি-কবিতা কিংবা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সৃষ্টি হতে পারে।

ইদানীং সকলে মিলে রবীন্দ্রনাথকে ঋষি এবং গুরুদেব আখ্যা দিয়ে ওঁকে বড় বেশি ভারিক্কি করে ফেলছে। এ আমার একেবারে পছন্দ নয়। তিনি যে কবি সেকথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। কবিমাত্রই অত্যন্ত খেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে খামখেয়ালীপনা ছিল তাঁর কবিতায় তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। তিনি যদি নিতান্ত শীতল মস্তিষ্ক ব্যক্তি হতেন তবে প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র হয়ে কক্ষণো লিখতেন না—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন' বিম্বা নব বঙ্গে নব যুগের চালক না হয়ে ব্রজের রাখাল বালক হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতেন না। নব্য বাঙলার জন্ম হয়েছে যে পরিবারের আবহাওয়ায় সে-বংশের সন্তান হয়ে কিনা বলছেন—'নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলোক।' ভাবুন দিখিনি কি সব্বনেশে কথা। আমার তো মাঝে মাঝে ভয় হয় একবিংশ শতাব্দীর গবেষণাকারীরা এসব উক্তি থেকে না সিদ্ধান্ত করে বসেন যে, রবিঠাকুর নামক ব্যক্তিটি ঠাকুরবংশের একটি কলঙ্ক ছিলেন।

বুঝতেই পারছেন এসব হল গিয়ে আসলে মেজাজের কথা। আমি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সম্বন্ধে অন্যত্র এক প্রবন্ধে বলেছি যে ও জিনিসটা লেখকের খেয়ালী চিত্তের ক্ষণকালীন বহিঃস্ফুরণ! এদিক থেকে গীতি কবিতা এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধ খুব নিকট আত্মীয়। কবিতা যে প্রবন্ধ হতে পারে পোপ-এর Essay on Man তার প্রমাণ। অপরপক্ষে ল্যাম লিখিত Dream Children

পাঠ করলে প্রবন্ধ এবং কবিতার বিবাদভঞ্জন হবে। যিনি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লেখেন তিনি ইচ্ছে করলেই লিরিক রচনা করতে পারেন একথা আমি বলছিনে কিন্তু লিরিক রচয়িতা যে ইচ্ছে করলে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনা করতে পারেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

রবীন্দ্রনাথের মেজাজ গীতি কবিতার মেজাজ। অতএব তাঁর মনের আবহাওয়া যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অনুকূল ছিল একথা একরকম ধরেই নেওয়া যায়। এবার তবে আসল কথাটাই বলি। আমার পত্রপ্রেরক বন্ধুটি শুনে হয়তো অবাক হবেন যে, রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রবন্ধপুস্তক ষোল আনা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পুস্তক। আমি যে বইয়ের উল্লেখ করছি সে বইয়ের অস্তিত্ব অনেকের কাছেই বহুদিন অজ্ঞাত ছিল। ১৮৮৩ সনে 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশিত হয়। তারও দু-বছর আগে ১৮৮১ থেকে ১৮ ৮২ সনের মধ্যে ঐ প্রবন্ধগুলি ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কুড়ি থেকে একুশ। উক্ত গ্রন্থে মোট উনচল্লিশটি প্রবন্ধ আছে। তার প্রত্যেকটি রচনা যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ তা গুটিকতক প্রবন্ধের নাম করলেই সকলে বুঝতে পারবেন, যথা—মাছধরা, জমাখরচ, স্ত্রৈণ, নৌকা ইত্যাদি।

প্রত্যেকটি প্রবন্ধ অতিশয় সংক্ষিপ্ত—কোনো কোনোটি এক পাতায় সমাপ্ত। কুড়ি বছর বয়স অপরিণত বয়স—লেখার হাত তখনো পাকেনি। সুতরাং ঐ সব রচনা সম্বন্ধে কবির মনে স্বভাবতই কুণ্ঠা বোধ ছিল। সেই কারণে উক্ত গ্রন্থের আর পুনঃ প্রকাশ হয় নি। বহুদিন পর্যন্ত ঐ লেখা লোকচক্ষুর অন্তরালেই পড়েছিল। ইদানীং রবীন্দ্ররচনাবলীর অচলিত সংগ্রহে (প্রথম খণ্ড) ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের ভার যাঁদের উপরে ন্যস্ত তাঁরা যে কবির অভিপ্রায়কে একরকম অগ্রাহ্য করেই ঐ সমস্ত রচনা পুনঃ প্রকাশিত করেছেন সেজন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ রবীন্দ্র প্রতিভার ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয়ে এসব লেখার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। যাহোক এই থেকে পাঠকমাত্রই দেখতে পাচ্ছেন যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার প্রথম সুসম্বদ্ধ চেষ্টা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের খাতেই প্রকাশ পেয়েছিল।

উক্ত পাঠকবন্ধুটি ছাড়া সুধীজনদের মুখেও অনেক সময় শুনেছি রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ জিনিসটাকে অবহেলা করেছেন। তাঁর কৃপাদৃষ্টি পেলে এই জাতীয় প্রবন্ধ যথোচিত সৌষ্ঠব লাভ করত। আমি বলতে চাই, তিনি ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে অবহেলা করেননি। 'ছিন্নপত্র' যাঁরা ভালো করে

পড়েছেন তাঁরাই বলতে বাধ্য হবেন যে, ওটিও একটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পুস্তক। কেউ যদি এতে আপত্তি করেন আমি সে আপত্তি গ্রাহ্য করতে রাজি নই। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনায় আমি যদি কিছুমাত্র কৃতিত্ব অর্জন করে থাকি তবে একথা গোড়াতেই কবুল করব যে 'ছিন্নপত্র'-র কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। Self-portrayal-এর এমন সুসম্পূর্ণ চিত্র রবীন্দ্রনাথের খুব কম গ্রন্থেই আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনে Amiel's Journal কতখানি স্থান পেয়েছে জানি না, কিন্তু আমার সাহিত্যজীবনে 'ছিন্নপত্র' বাইবেলের স্থান অধিকার করেছে। এই সূত্রে বলা সঙ্গত যে 'পত্রধারা' কিংবা 'চিঠিপত্র'-এর অনেক চিঠিকে আলাদা করে দেখলে এক একটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

'পঞ্চভূতের ডায়েরী'-র প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আমেজ সুস্পষ্ট। গ্রন্থটি এ-জাতীয় প্রবন্ধের এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'মন' নামক অংশটি পাঠ করলেই সকল সন্দেহের নিরসন হবে। এছাড়া 'গল্পগুচ্ছ'-র কোনো কোনো গল্পকে গল্প না বলে অনায়াসে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। কারণ তাতে গল্পাংশ অতিশয় শীর্ণ। বেশির ভাগ সময় লেখক আপন মনে কথা বলে চলেছেন। গল্প এক, খোশ গল্প আর এক। এসব রচনায় কথা বলাটাই লক্ষ্য, গল্পটা উপলক্ষ। আমার এই যুক্তি যে অযৌক্তিক নয় তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'অসম্ভব কথা' নামক গল্পটি যেমন 'গল্পগুচ্ছে' স্থান পেয়েছে তেমনি আবার রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বাছা বাছা প্রবন্ধের যে পুস্তক 'বিচিত্র প্রবন্ধ' তার মধ্যেও স্থান পেয়েছে। এরূপ গল্প আরো আছে, যথা—ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প ইত্যাদি। এ গল্পগুলি উভচর। গল্পের রাজ্যেও বিচরণ করে, প্রবন্ধের রাজ্যেও।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে আর একটি কথা বলবার আছে এবং এইটিই সবচেয়ে বড় কথা। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনার জন্য ভাষার যে সমৃদ্ধি প্রয়োজন সেটি প্রধানত রবীন্দ্রনাথের দান। মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশের জন্য ভাষার যে nuance বা বর্ণবৈচিত্র্যের প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথই আমাদের ভাষায় সেই বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করেছেন। আর দিয়েছেন ভাষার flexibility—ভাষার দেহটিকে যথেচ্ছভাবে হেলাতে-দোলাতে না পারলে ব্যক্তিগত প্রবন্ধকারের পক্ষে মনের ভাব প্রকাশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ভাষাকে সব সময়ে সুশব্দ হতে হবে এমন নয়। স্বল্পতম শব্দ সংযোগেও গভীরতম ভাব প্রকাশ সম্ভব। সেইজন্য ভাষার ভ্রূকুঞ্চন চাই, ব্রীড়াভঙ্গি চাই, আনত অপাঙ্গ দৃষ্টি চাই, আতপ্ত নিঃশ্বাস চাই, তবে তো ছাপার হরফ মুখ ফুটে কথা কইবে।

রবীন্দ্র-ব্যবসায়ী

গোড়াতেই বলে নেওয়া ভালো, আমি একজন রবীন্দ্র-ব্যবসায়ী। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কখনো সখনো লিখে থাকি। সে সব লেখার গুণগত মূল্য যাই হোক, পণ্যগত মূল্য কিছু আছে। ঐ সব লেখার দরুন কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য ঘরে আসে। বলা বাহুল্য এই দুর্মূল্যের বাজারে তার সাংসারিক মূল্য আমার কাছে যথেষ্ট। আমার বিদ্যার দৌড় বেশি নয়। যৎসামান্য পুঁজি নিয়ে কারবার চালাতে হয়। পুঁজিপাটা না থাকলে আর উপায় কি, পরের ধনেই পোদ্দারি করতে হয়। অনন্যোপায় হয়ে মুরুব্বি ধরেছি রবীন্দ্রনাথকে। যখন তখন তাঁর কাছেই হাত পেতেছি। তিনি কাউকেই বিমুখ করেন না। লেখার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথই আমার প্রধান অবলম্বন। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে আমি প্রধানত রবীন্দ্রজীবন বা রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়েই আলোচনা করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে নিছক রবীন্দ্র-বিষয়ক আলোচনা আমার লেখায় খুব বেশি নেই। নিজেকে রবীন্দ্র-ব্যবসায়ী বলেছি এই কারণে যে যা কিছু লিখতে গিয়েছি তার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে টেনে এনেছি। কোন বিষয়েই বিশেষজ্ঞ নই; অজ্ঞতা সত্ত্বেও নানা বিচিত্র বিষয়ে বিজ্ঞের মতো নিজস্ব মতামত জাহির করেছি। অজ্ঞতাবশতই কোন বিষয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করিনি তত্ত্বকথা বলিনি। বলেছি রসের কথা। রবীন্দ্রনাথ রসের ভাণ্ডার। অনেক সময়েই রসদ সংগ্রহ করতে হয়েছে তাঁর ভাণ্ডার থেকে। লোকে যেমন শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে, আমি তেমনি রবীন্দ্রবাক্য উদ্ধার করেছি। আমার লেখায় যুক্তিতর্কের বালাই নেই, তেমন প্রয়োজন হলে কখনো রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষ্য মেনেছি। নানা বিষয়ে আমার জ্ঞানগম্যির অভাব আমি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে ঢেকে রেখেছি, যুক্তি তর্কের ফাঁকগুলো রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বুজিয়েছি। আজকের বাজারে ব্যবসা করতে গেলে এক-আধটু ভেজাল না হলে চলে না। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ভেজালটা সমস্তই আমার, উপরে শুধু আদি এবং অকৃত্রিম। রবীন্দ্রনাথের লেবেল বা ছাপটা লাগিয়ে দিয়েছি। এতেই ব্যবসা মোটামুটি ভালই চলছে।

ইংরেজি সাহিত্যে রস রচনা বা রম্য রচনায় যাঁর আসন সর্বোপরি সেই চার্লস ল্যাম বলেছিলেন—এত সামান্য জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে বিদ্যে ফলিয়ে বেড়াচ্ছি! কি করে যে শিক্ষিত সমাজে মান বাঁচিয়ে জীবন কাটিয়ে দিলাম ভেবে অবাক হই। ইস্কুলে কলেজের বিদ্যা অবশ্যই ল্যাম-এর ছিল না। কিন্তু

তাঁর অধ্যয়নের সীমাহীন বিস্তার পাঠকমাত্রকেই বিস্মিত করবে। ল্যাম বিনয়ের অবতার। আমি আবার মানুষটা বিনয়ী নই। আমি এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি যে কত সামান্যটুকু জেনে আর শুনে কত কত বিদ্বান পণ্ডিতকে আমি ভাঁওতা দিয়ে বেড়াচ্ছি।

আমার ব্যবসায়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে পরোক্ষভাবে আমাকে সাহায্য করছেন এমন নয়, প্রত্যক্ষভাবেও এ ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। অল্প বয়সে তাঁর 'বাজে কথা' নামক প্রবন্ধটি পড়েছিলাম। আমার সারা জীবনের সাহিত্য কর্মে ঐ প্রবন্ধটিই প্রধানত প্রেরণা জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাজে কথাকে বাজে বলে উড়িয়ে দেননি। মনোজ্ঞ করে বাজে কথা বলাটাকে তিনি মস্ত বড় একটা আর্ট হিসাবে দেখেছেন। বলেছেন, এর সঙ্গে বিদ্যা বা সাহিত্যের খুব একটা যোগ নেই বরং পরিহাস করে বলেছেন—পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনো বাজে কথা বলেন না। 'তাঁরা বলেন তো একেবারে বেদবাক্য বলেন, না হয় তো কিছুই বলেন না।' যাঁরা বাজে কথা বলেন না, তাঁরা যে বাজে কথা লিখছেন না সে তো জানা কথাই। লক্ষ করে দেখেছি পণ্ডিত ব্যক্তিরা লেখেন তো একেবারে থীসিস লেখেন, না হয় তো কিছুই লেখেন না।

ঐ দেখুন আমি আমার ব্যবসাটার কথা বলতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথের দোহাই পাড়ছি। কোন জিনিস অভ্যাসগত হয়ে গেলে যা হয়, সেটা মুদ্রাদোষে দাঁড়ায়। আমার লেখায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ এক প্রকার মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে বলা চলে। আমার রবীন্দ্র-ব্যবসাটাও আপনারা একটা মুদ্রাদোষ হিসাবেই গণ্য করতে পারেন। আমি অবশ্য একে মুদ্রাদোষ বলি না, বলি মুদ্রা গুন—।

আমার লেখায় রবীন্দ্রনাথ সর্বব্যাপী কিন্তু শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনা যদি খুঁজতে যান তাহলে খুচরো খাচরা কিছু মিললেও ধারাবাহিক কিছু পাবেন না। তার কারণ রবীন্দ্রনাথকে মুখ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে লিখতে গেলে যে পরিমাণ শ্রম এবং অধ্যবসায় প্রয়োজন সে আমার সাধ্যে কুলোবে না। লেখা জিনিসটা আমার কাছে একটা অতি আনন্দের ব্যাপার, সেটাকে ইংরেজিতে যাকে বলে making a pain of pleasure অর্থাৎ একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার করে তুলতে আমার মন কিছুতেই রাজি হয় না। সেজন্য আমার লেখায় অনেক সময় তথ্যের ফাঁকি এবং যুক্তির ফাঁক থেকে যায়। সুখের বিষয় সকলে আমার পথের পথিক নন—বিরল হলেও ব্যতিক্রম আছে।

অধিকাংশ বঙ্গ সন্তান যদিচ আমার মতোই শ্রমবিমুখ তথাপি এই আমাদের মধ্যেই দেখেছি শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নিরলস অধ্যবসায়ের সঙ্গে

আজীবন রবীন্দ্রচর্চায় ব্যাপৃত আছেন। অক্লান্ত সাধনার দৃষ্টান্তস্থল বলতে হবে। ইদানীং অধ্যাপক প্রশান্তকুমার পাল পরম নিষ্ঠার সঙ্গে বিরাট আকারে রবীন্দ্র-জীবনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ যে কী শ্রমসাধ্য ব্যাপার, কি পরিমাণ অধ্যবসায় এবং অভিনিবেশের প্রয়োজন, ভেবে বিস্মিত হতে হয়। তবে জীবনী-কারকে একটি সংকট এড়িয়ে চলতে হবে—দলিলপত্র-জাত তথ্যের ভারে জল-জ্যান্ত মানুষটা যেন চাপা পড়ে না যায়। কীর্তির চাইতে কর্তা বড়, এ কথাটি ভুললে চলবে না। সকল জীবনীকারকে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন বসওয়েল। যা হোক, এ কথা নিঃসংশয়ে বলব যে প্রভাতবাবুর রবীন্দ্রজীবনী এবং প্রশান্তবাবুর রবিজীবনী বঙ্গদেশের মস্ত বড় সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে। দেশবাসী তাঁদের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবেন।

তাঁরা যে বিরাট বহরের কাজ করেছেন সে জাতীয় কাজ আমার সাধ্যাতীত। নিজেকে বলেছি রবীন্দ্র-ব্যবসায়ী। ব্যবসার ভাষায় বলতে গেলে তাঁরা যদি হন আড়তদার, আমি খুচরো ব্যবসায়ী মাত্র। আমার মতে খুদে ব্যবসায়ীদের পদে পদে তাঁদের দোরে ধর্না দিতে হবে। জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্যই তাঁরা আমাদের হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন। খুব বড় কাজ, তাহলেও বলব নিছক তথ্যের মধ্যে জীবনের মর্মার্থ সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। তথ্যকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়। জীবনচরিতে তথ্য বিশ্লেষণের প্রশস্ত অবকাশ নেই। এ কাজটি করতে হবে আমি যাঁদের বলছি—খুচরো ব্যবসায়ী তাঁদের। জীবনীকারদের দেওয়া উপাদান থেকে যে অসামান্য ব্যক্তিত্বটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় এদের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায়। তবে মনে রাখতে হবে ঘটা করে যে সব জিনিস ঘটে মানুষের জীবনে, তার চাইতে ঢের বড় জিনিস অতি নিঃশব্দে ঘটে তাঁর মনে। সেই মনকে জানলে তবে মানুষটিকে পুরোপুরি জানা যায়। বলা বাহুল্য সে কাজে আমাদের মতো খুচরো ব্যবসায়ীদেরও অনেক কিছু করবার আছে। কর্মী মানুষকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া সহজ, ভাবুক মানুষকে পাওয়া বড় সহজ নয়। ইংরেজ কবির ভাষায় বলা যেতে পারে—hidden in the light of thought অর্থাৎ চিন্তার ঔজ্জ্বল্যই মানুষটিকে ঢেকে রাখে। অসাধারণ মানুষের চিন্তাও অসাধারণ, সে চিন্তার নাগাল পাওয়া সকলের সাধ্যে কুলোয় না। সেখানে ভাষ্যকারের প্রয়োজন হয়। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ' নামে যে গ্রন্থটি লিখেছেন তাতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে। এটিকে আমি একটি অতি মূল্যবান কাজ বলে মনে করি। যেখানে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্লোকে

প্রবেশের প্রয়াস আছে, সে জাতীয় কাজের প্রতি আমার স্বাভাবিক আকর্ষণ।

এ ছাড়া রানী চন্দ, মৈত্রেয়ী দেবী, সীতা দেবী, অমিতা সেন প্রভৃতিরা রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবনের যে ছবি আমাদের চোখের সুমুখে তুলে ধরেছেন তাতে তাঁর জীবনের ছন্দটিই তাঁরা ধরে দিয়েছেন। গতানুগতিক জীবন কাহিনীতে ঐ ছন্দটা ধরা পড়ে না। একে মস্ত বড় কাজ বলতে হবে। মানুষ রবীন্দ্রনাথকে বোঝার পথে এর মূল্য অপরিসীম। এঁদের কাছে আমরা বিশেষ ভাবে ঋণী। এঁরা ছাড়া এমন লেখকও দু-চার জন আছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বেশি লেখেননি কিন্তু দুটি চারটি প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরেই রবীন্দ্র-জীবনের একটা সুবৃহৎ অংশকে আলোকিত করে দিয়েছেন। দৃষ্টিটা ঠিক জায়গায় ঠিক ভাবে ফেলতে পারলে অতি বিরাট জিনিসেরও সারমর্মটুকু গোচরে এসে যায়। অন্নদাশংকর রায় রবীন্দ্রনাথকে 'জীবন-শিল্পী' আখ্যা দিয়ে অনতি-দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঐ জীবন-শিল্পী কথাটির মধ্যেই গোটা মানুষটির পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কাব্যশিল্পী, সুরশিল্পী, চিত্রশিল্পী কিন্তু সর্বোপরি তিনি জীবন-শিল্পী। তাঁর শিল্পায়িত জীবনটিই কাব্যে সংগীতে, সুরে, রসে' রঙে রেখায় শিল্প হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর সংগীত এবং সাহিত্যচিন্তা তো বটেই, এমন কি তাঁর ধর্মচিন্তা, সমাজচিন্তা শিক্ষাচিন্তা—সমস্তই ঐ জীবনশিল্পের অভিব্যক্তি। তাঁর নিত্যদিনের জীবনটিকেই তিনি একটি শিল্পের রূপ দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট নেতা হীরেন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'Himself a Poem' নামক গ্রন্থে এই বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সুন্দরের সাধনা শুধু কাব্যের প্রয়োজনে শিকেয় তোলা শখের বস্তু ছিল না। সৌন্দর্যচর্চা নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় তাঁর প্রতি মুহূর্তে জীবনধারণ এবং জীবন-যাপনের অঙ্গ ছিল। এই কথাটির তাৎপর্য ঠিকভাবে বুঝতে পারলে তবেই রবীন্দ্র-জীবনের আলোচনা সুসম্পূর্ণ এবং সার্থক হবে।

ভাবলে অবাক লাগে, জীবনশিল্পী রূপে এমন স্নিগ্ধ শান্ত মহিমান্বিত যাঁর রূপ সেই মানুষই কখনো জ্ঞাতসারে কখনো অজ্ঞাতসারে জনসমাজে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন। সে আলোড়ন ঢেউ-এর বেগে কোথায় গিয়ে আছড়ে পড়েছে, কোথায় কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তিনি নিজেও তা ভাবতে পারেননি। গীতাঞ্জলির কথাই ধরুন। গীতাঞ্জলি কেবলমাত্র একটি কাব্যগ্রন্থ নয়, এটি রবীন্দ্র-জীবনের এক বিরাট ঘটনা। তাঁর সমস্ত জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে ঐ একটি গ্রন্থ। এনে দিয়েছে বিশ্বখ্যাতি, সেই সঙ্গে ঈর্ষা-বিদ্বেষজনিত অখ্যাতিও। এটি তাঁর জীবনের এক নাটকীয় অধ্যায়। সে নাটকের সমাপ্তি

এখনও ঘটেনি। কিছুদিন পরে পরেই ঐ বিষয়টি নিয়ে অল্পবিদ্যার ভয়ঙ্করী আলোচনা এ-দেশের এবং ও-দেশের পত্র পত্রিকায় প্রচারিত হয়। কিছুকাল আগে অধ্যাপক সৌরীন্দ্র মিত্র রচিত 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে' নামক যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে ঐ বহু আলোচিত এবং বহু বিতর্কিত অধ্যায়টির উপরে কিঞ্চিৎ আলোকপাত হয়েছে। ইংরেজি গীতাঞ্জলি সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণ সহযোগে কিছু ভ্রান্ত ধারণার তিনি অপনোদন করেছেন। এই কারণে গ্রন্থকার আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। ঐ কাজে যেমন প্রচুর পরিশ্রম তেমনি প্রচুর বিদ্যাবত্তারও প্রয়োজন হয়েছে। এ জাতীয় কাজ আমার দ্বারা কখনো সম্ভব হত না।

নিজের সম্বন্ধে কিছু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ নিজেই করেছেন। সারাক্ষণ বলে বেড়িয়েছেন, তিনি ইস্কুল কলেজে পড়েননি, লেখাপড়া ভালো শেখেননি। ইংরেজিটা তেমন রপ্ত করতে পারেননি। এটা বলতে গেলে তাঁর মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছিল। আর আমাদের পণ্ডিতম্মন্যরা অনেকে তাঁর ঐ কথাকে একেবারে literally গ্রহণ করেছেন। আমাদের একজন সাহিত্যিক বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের অধ্যয়নটা যদি আরেকটু বিস্তৃত হত তাহলে তাঁর লেখায় আরো জোর ধরত। সাহিত্যের উৎকর্ষ পুঁথিগত বিদ্যার উপরে নির্ভর করে এমন কথা যিনি বলেন বা ভাবেন তিনি কখনো উঁচু দরের সাহিত্যিক হতে পারেন না। যাহোক এসব সত্ত্বেও বলব বঙ্গদেশ রসজ্ঞের দেশ। রবীন্দ্রনাথ যে কাব্য রচনা করেছেন, যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, ধর্ম সমাজ রাজনীতি বিষয়ে যে সব মতামত ব্যক্ত করেছেন, দেশের প্রচলিত চিন্তাধারা থেকে তা এতই স্বতন্ত্র যে যতখানি প্রতিকূলতার সৃষ্টি হতে পারত তা হয়নি। নিন্দা এবং কুৎসা প্রচার অবশ্যই হয়েছে কিন্তু সে নিন্দা যতখানি ব্যাপক এবং তীব্র আকার ধারণ করতে পারত তা করেনি। তার কারণ অতিশয় শিক্ষিত রুচিবান সংস্কৃতিবান একটি গুণগ্রাহী সম্প্রদায়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং সমর্থন লাভে তিনি সমর্থ হয়েছেন। রুচিহীন এবং শিক্ষাহীনের নিন্দা শিক্ষিত মনের উপরে খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সকল সমাজেই নিন্দুকেরা সংখ্যাগুরু, কিন্তু সমাজ যদি উন্নত হয় তাহলে লঘুচিত্তের নিন্দাকে সে গুরুত্ব দেয় না। যথার্থ শিক্ষিত সমাজে রবীন্দ্র-নিন্দা লঘুচিত্ততার লক্ষণ বলে পরিগণিত হয়েছে। এটাকে সেদিনকার বঙ্গ সমাজের কৃতিত্ব বলেই মনে করব।

নিন্দাবাদ মানুষের জীবদ্দশাতেই হয়, মৃত্যুর পরে নিন্দুকের কণ্ঠও নীরব হয়ে আসে। শেক্সপীয়ার-এর নিন্দাবাদ হয়েছিল তাঁর জীবদ্দশাতেই; কিন্তু

মৃত্যুর পরে স্তুতিবাদ ক্রমে বেড়েই চলেছে। রচনাশৈলী বা চরিত্র চিত্রণ নিয়ে দোষক্রটির আলোচনা অবশ্যই হয়েছে এবং এখনও হয় কিন্তু তাও যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে। শেক্সপীয়ার-এর ভাষায় আজ কেউ লেখেন না, তাঁর ভঙ্গিতেও না। কিন্তু তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে কেউ তাঁকে বঞ্চিত করেনি। এ কথা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে তিনি অতুলনীয়, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। এ যুগটা শ্রদ্ধাহীনের যুগ, কেউ কারো মান রেখে কথা কয় না। তা সত্ত্বেও ইংরেজ জাত কিন্তু শেক্সপীয়ার সম্পর্কে কোন অভব্যতা বা অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করেনি। এই বুদ্ধিটুকু তাদের আছে যে শেক্সপীয়ারকে ছোট করতে গেলে তারা নিজেরাই ছোট হয়ে যাবে। সেজন্যে শেক্সপীয়ারকে নিয়ে তাদের গর্বের অন্ত নেই। উনিশ শতকে ইংরেজের যখন দারুণ দবদবা তখনই কার্লাইল ইংরেজ জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—ভেবে দেখ, তোমার জগৎজোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বড়, না তোমার শেক্সপীয়ার বড়। ভবিষ্যতে জগৎসভায় কার পরিচয় নিয়ে দাঁড়াবে? আজ সেই প্রশ্নের জবাব সুস্পষ্ট। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ বিলুপ্ত কিন্তু শেক্সপীয়ার-এর সাম্রাজ্য অটুট।

রবীন্দ্রনাথও একটি গোটা সাম্রাজ্য আমাদের হাতে দিয়ে গিয়েছেন। আজকের বাঙালীর সে বোধ নেই। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে বাঙালী সমাজ যে সুবুদ্ধি এবং গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছিল, আজকের সমাজ সে কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না। রুচিবিকার ঘটলে যা হয়—ইদানীং আমাদের পত্র পত্রিকায় এমন কি গ্রন্থাদিতেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে ধরনের আলোচনা দেখা যায় তা আদৌ রুচিসম্মত নয়। ভাষায় সৌজন্য এবং শালীনতার অভাব, বক্তব্যে অনেক সময় সত্যের অপলাপ। তথাপি বাঙালী শিক্ষিত সমাজকে যদি নিন্দুকের সমাজ বলে অভিহিত করা হয় তাহলে তার প্রতি অবিচার করা হবে, কেননা আগেই বলেছি বাঙালী সমাজ রসজ্ঞের সমাজ। নিন্দুক যেমন আছে, তেমনি গুণগ্রাহীও আছে এবং আমি বলব তাদের সংখ্যাই বেশি। কলকাতা শহরে অত্যল্প কালের মধ্যে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে বাঙালী গুণগ্রাহিতার সেটি একটি মস্ত বড় প্রমাণ (প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান পরিচালক সোমেন্দ্রনাথ বসুর অকাল বিয়োগ অতিশয় শোকাবহ)। প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। কলকাতার বাইরে ছোটখাট শহরে গঞ্জেও রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে কিছু সংস্থা গড়ে উঠেছে। সেখানে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা হয়, পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এঁরা দয়া করে তাঁদের পত্রিকা আমাকে পাঠান। এঁদের নিষ্ঠা অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগ

দেখে চমৎকৃত হই। বাঙালী যে মরে যায়নি এসব তার লক্ষণ।

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্। জ্ঞান যদি নাও চাই, আনন্দ লাভ হবে নিঃসন্দেহে। সেও বড় কম লাভ নয়। অশ্রদ্ধার দ্বারা ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হয় না। অনেক মূল্যবান জিনিসকে হারাতে হয়। স্বীকার করব যে শ্রদ্ধা ভক্তির মধ্যেও কিছু অন্ধতার মিশ্রণ থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে অশ্রদ্ধাটাও খুব একটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় চটুল প্রকৃতির ব্যক্তিরাই চটকদার কথা বলে শস্তায় চমক লাগাবার জন্যে শ্রদ্ধেয়কে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে। এ জিনিসটা প্রধানত চিন্তাশক্তির অভাবেই ঘটে, কোন জিনিস তলিয়ে দেখবার এবং বুঝবার ক্ষমতা বা ধৈর্য এদের নেই। অবশ্য ব্যবসায়ের পক্ষে এই চটকদারি মস্ত বড় সহায়। ভেজাল এবং চোরাই মালের সাহায্যে আজকের ব্যবসা যেমন দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠছে এও তেমনি। রবীন্দ্র-ব্যবসায়েও ইদানীং কালে প্রচুর ভেজাল প্রবেশ করেছে। নানা অবান্তর ও অবিশ্বাস্য কথার আমদানি করে চমক লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে। সাহিত্যের বাজারে রবীন্দ্র-বিদূষণ বেশ একটা লাভজনক ব্যবসায় দাঁড়িয়েছে।

এই যেমন একদিক তেমনি আবার অন্য দিকও আছে। রবীন্দ্রভক্তরা তাঁকে বিশ্বকবি বিশ্বপ্রেমিক ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে থাকেন। এটাও হাস্যকর ব্যাপার। কোন কবি তিনি যতই বড় হউন, বিশ্বকবি কিনা তা সারা বিশ্বের লোক বললে তবেই তা গ্রাহ্য। দেশের ক'জন লোক বললে তো কেউ তা মেনে নেবে না। এদিকে আবার একদল যাঁকে বলছে বিশ্বপ্রেমিক, অপর একদল তাঁকেই যদি বলে অত্যাচারী জমিদার তাহলে ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। এর দু-এর মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? তাহলে জমিদার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটা একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। লোকমুখে তো শুনেছিই, কারো কারো লেখায়ও এরূপ ইঙ্গিত আছে যে জমিদারি খুব শক্ত হাতে পারচালনার জন্যেই মহর্ষি জমিদারির ভার তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটির হস্তে অর্পণ করেছিলেন। প্রকৃত তথ্যটি হল—জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল আত্মভোলা দার্শনিক মানুষ, সদা বিদ্যাচর্চায় রত, সাংসারিক ব্যাপারে আদৌ নির্ভরযোগ্য মানুষ নন। দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ আই সি এস, জজিয়তি করেন, জমিদারি দেখার প্রশ্নই ওঠে না। তৃতীয় হেমেন্দ্রনাথ অকালে লোকান্তরিত; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিপত্নীক নিঃসন্তান—সুতরাং সংসারে উদাসীন, সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলার চর্চায় কালাতিপাত করেন; বীরেন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ উভয়েই বিকৃত মস্তিষ্ক। এ অবস্থায় কনিষ্ঠ পুত্রের উপরে নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কাজেই রবীন্দ্রনাথের উপরে

জমিদারীর ভার অর্পণটা আদৌ একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু শস্তায় কিস্তি মাৎ করবার জন্যে এই সামান্য ঘটনাকেও খুব একটা রহস্যজনক ব্যাপার বলে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। রঙচঙ মাখিয়ে খুব জবরদস্ত জমিদার প্রতিপন্ন করার জন্য বলা হয়েছে খাজনা খুব কড়ায় গণ্ডায় উশুল করতেন, পাই পয়সাটি রেহাই দিতেন না। অথচ তখনকার ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ম্যানির বিবরণে দেখা যায় একবার এক বছরেই ৫৭,৫৯৫ টাকা খাজনা মুকুব করা হয়েছিল। অন্ধ খঞ্জের জন্যে মাসোহারার ব্যবস্থা ছিল। পতিসরে একটি হাই স্কুল এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় করে দিয়েছিলেন, এজন্যে বাৎসরিক ব্যয়-বরাদ্দ ছিল ১২৫০৲ টাকা। এই সূত্রে ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন—It must not be supposed that a powerful landlord is always oppressive and uncharitable. A striking instance to the contrary is given in the setllement officers account of the estate of Rabindranath Tagore the Bengali poet whose fame is world-wide. (রাজসাহী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ১৯১৬ দ্রষ্টব্য)।

দানধ্যান সম্পর্কেও অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন। বলা বাহুল্য দানবীর হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কোন নাম নেই। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দান খয়রাতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কিছু ধ্যান ধারণা ছিল। তিনি মনে করতেন যে দান গ্রহণের ফলে মানুষ নিজের কাছেই ছোট হয়ে যায়। যিনি দান করেন তিনি উপকারের জন্যেই করেন কিন্তু তার ফলে মানুষটা যদি নিজের চোখেই হেয় হয় তাহলে উপকারের চাইতে অপকারই হবে বেশি। বলতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরোতেন। কিন্তু সেটা নিজের জন্যে নয়, বিশ্বভারতীর জন্যে। বিশ্বভারতীটা নিজের ততখানি নয় যতখানি দেশের। যাহোক, দান তিনি করেননি এমনও নয়; করেছেন, কিন্তু দানের রীতিটা অন্যবিধ। তাঁর দানটা এক তরফা নয়। বলতেন, তুমিও কিছু দাও, আমিও কিছু দিই। আমাদের দু পক্ষের দানে একটা কিছু করা যাবে, তাতে আমাদের দু-এরই উপকার হবে। প্রজাদের বলতেন খাজনার সঙ্গে তোমরা প্রতি টাকায় আমাকে দুটি করে পয়সা দাও, আমিও দেব প্রতি টাকায় দু পয়সা। যে পাঁচ টাকা খাজনা দেয় সে দেবে দশ পয়সা, জমিদার রবীন্দ্রনাথ দেবেন দশ পয়সা। এভাবেই একটি তহবিল গড়ে উঠত। সমস্ত মহল্লা মিলিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে যদি আদায় হত হাজার টাকা তাহলে জমিদার দিতেন হাজার টাকা। ঐ তহবিল থেকেই রাস্তাঘাট তৈরি হত, মজা দীঘি পুষ্করিণীর সংস্কার

হত, অন্যবিধ কাজও কিছু হত। এক ধরনের সমবায় প্রথা বলা যেতে পারে। কেউ দাতা নয়, কেউ গ্রহীতা নয়—সকলে সমান, কারোই মান খোয়া যেত না।

আর দানের কথাই যদি ওঠে তাহলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাণও কিছু কম নয়। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকালে তিনি তদবধি প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ বিশ্বভারতীকে দান করেছিলেন। গত পঁয়ষট্টি বৎসর ধরে ঐ সব গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিশ্বভারতী পেয়ে আসছে। হিসাব করে দেখলে সে অর্থের পরিমাণ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। বঙ্গদেশে ক'জন লোক কোটি টাকা দান করছেন? রবীন্দ্রনাথকে দানবীর বললে কিছুই অন্যায় হত না, তবে দাতা পরিচয়টা কোনকালেই তার মনঃপূত ছিল না। এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে নোবেল প্রাইজের এক লক্ষ টাকা তিনি তাঁর প্রজাদের উপকারের জন্যে একটি গ্রাম্য সমবায় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখেছিলেন। আত্মীয়বন্ধুরা একে স্রেফ পাগলামি বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু তিনি কারো কথায় কর্ণপাত করেননি। বছর আটেক পরে ব্যাঙ্কটি উঠে যায়, টাকাটাও মারা যায়। কিন্তু তাই নিয়ে কখনো তাঁকে আফসোস করতে শোনা যায়নি। প্রজারা কয়েক বছর যে সুবিধাটুকু ভোগ করেছে তাতেই তিনি খুশি। একটা এক্সপেরিমেণ্ট করতে গিয়ে যে ধাক্কা খেলেন, এটাও জীবনের একটা অভিজ্ঞতা, একে তিনি মূল্য দিতে জানতেন। এক সময়ে ব্যবসা করতে গিয়ে অনেক লোকসান ঘটেছিল, তাও গ্রাহ্য করেননি। পরিহাস করে বলতেন, ব্যবসায়ে লোকসান দেওয়াটা ব্যবসার lyrical elements. নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গেই ইয়ুরোপ আমেরিকায় বই-এর বিক্রি হতে লাগল দেদার। সব চাইতে বেশি হয়েছিল জার্মানীতে। ঠিক সেই সময়টিতেই প্রথম মহাযুদ্ধ বেধে গেল। যুদ্ধশেষে জার্মেনী ধনে প্রাণে বিধ্বস্ত। জার্মান মার্কের মূল্য কর্পূরের মতো উবে গেল। রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য অর্থ—বহু সহস্র মার্ক মাঠে মারা গেল। তখনও পরিহাস করে বলেছিলেন—মার্কের অধঃপতনের দরুণ miliionaire বা কোটিপতি হবার একটা মস্ত বড় সুযোগ নষ্ট হল। অর্থের ব্যাপারে যিনি এতখানি নির্লোভ নির্মোহ তাঁকেও অর্থলোলুপ হিসাবে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। একজন এমন কথাও লিখেছেন যে একবার নাকি রবীন্দ্রনাথের নৌকো ডুবে গিয়েছিল, তিনি ক্যাশ বাক্সটি কোমরে বেঁধে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—এবং বহু কষ্টে সাঁতার কেটে তীরে পৌঁছোতে সক্ষম হয়েছিলেন। লেখক বলতে চেয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রাণের চাইতেও টাকার মায়া ছিল বেশি! রবীন্দ্রনাথের জীবনে কখনো নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছিল এমন কথার উল্লেখ আমি কোথাও দেখিনি, কারো মুখেও কখনো

শুনিনি। একবার গোয়াই নদীর ব্রিজ-এ বোটের মাস্তল ঠেকে গিয়ে নৌকো ওল্টোবার আশংকা দেখা দিয়েছিল। কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার, মাঝি মাল্লারা সামলিয়ে নিয়ে বিপদ কাটিয়ে দিয়েছিল। এ ঘটনাটির একটি চাঞ্চল্যকর বিবরণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছেন 'ছিন্নপত্রে'র পাতায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে নৌকাডুবি একবারই ঘটেছে, সেটা তাঁর উপন্যাসে। পূর্বোক্ত লেখক ভদ্রলোকও একটি কাল্পনিক নৌকাডুবির কাহিনী উদ্ভাবন করে একটি উপন্যাস রচনা করেছেন।

আজকের বাজারে ভেজাল সর্বব্যাপী, রবীন্দ্র-ব্যবসায়েও ভেজাল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। রবীন্দ্রচরিত্রে মনুষ্যজনোচিত নানা দোষ ত্রুটি দুর্বলতা ছিল, থাকাই স্বাভাবিক এবং সে সব নিয়ে আলোচনা এবং বিরূপ সমালোচনা করতেও কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সেই আলোচনা যুক্তিসহ হওয়া একান্ত আবশ্যক। যুক্তি প্রমাণ ব্যতিরেকে বিরূপ সমালোচনা কুৎসা রটনার নামান্তর। নোবেল প্রাইজের ব্যাপারে কোন লেখক যখন বলতে আসেন কাকে ধরে, কাকে খোশামোদ করে, কার মুরুব্বিয়ানার জোরে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজটি করায়ত্ত করেছিলেন তখন আসল প্রতিপাদ্য ব্যাপারটা হল নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্যতা রবীন্দ্রনাথের ছিল না, সেজন্যেই তাঁকে নানা মুরুব্বির আশ্রয় নিতে হয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশের নানা ভাষার একশতের কাছাকাছি কবি সাহিত্যিক এ যাবৎ নোবেল প্রাইজ লাভ করেছেন। তাঁদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত অপাঙ্‌ক্তেয় কিনা কিংবা কোন্ অংশে হীন সে বিচার করবার মতো বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকের সম্পর্কে তুলনামূলক জ্ঞান ক'জনের আছে সে কথা আমার জানতে ইচ্ছা করে (আমার নিজের তো কণামাত্রও নেই)। না জেনে, না বুঝে কথা বলতে যাওয়া কতখানি হাস্যকর তা আমরা ভেবে দেখি না।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। কোন কোন লেখকের মতে তাঁর অদম্য ভ্রমণ-পিপাসা বালকসুলভ চাঞ্চল্য ছাড়া আর কিছুই নয়। বোধকরি তাঁদের ধারণা রবীন্দ্রনাথ কর্তব্যকর্মে অবহেলা করে দেশে দেশে ঘুরে অযথা কালক্ষেপ করেছেন। তাঁরা এ কথা ভাবেননি যে রবীন্দ্রনাথ অক্লান্তকর্মা ব্যক্তি ছিলেন। দেশেই থাকুন আর বিদেশেই থাকুন তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কাজ অব্যাহত থাকত। রবীন্দ্ররচনাবলীর একটি সুবৃহৎ অংশ বিদেশে বসে রচিত। তারও চাইতে বড় কথা, দেশ ভ্রমণ—বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষকে দেখবার জানবার ইচ্ছা

রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্মের এবং মননধর্মের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে কবি বলেছেন,—আমি সুদূরের পিয়াসী—তিনি কি আমার মতো ঘরের কোণে বসে থাকবার মানুষ? আমাদের ন্যায় কোটরবাসী জীবের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিহারী মনকে বোঝা সম্ভবই নয়।

মানুষটিকে বুঝবার চেষ্টা না করে আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন কোন ঘটনাকে অবলম্বন করে অপপ্রচারের চেষ্টা ক্রমাগতই বেড়ে চলছে। তাতে রবীন্দ্রনাথের খুব যে একটা ক্ষতি হচ্ছে এমন নয়। ক্ষতি হচ্ছে বাঙালী সমাজের। যে সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এতখানি নিন্দা-লোলুপ, মানীর মানহানিতে এতখানি উল্লাস সে সমাজকে ঘরে বাইরে কেউ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না।

বৎসর কাল পূর্বে দেশ পত্রিকায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটির লেখক সুভো ঠাকুর। খুব দুঃখের বিষয় অল্পদিন পূর্বে সুভো ঠাকুর লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর জীবদ্দশায় আমার এই লেখাটি প্রকাশিত হলে ভালো হত; প্রয়োজনবোধে তাঁর বক্তব্য তিনি পেশ করতে পারতেন। এই সূত্রে মনে পড়ছে অধ্যাপক সুশোভন সরকার মশায়ের 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ' নামক বইটি রিভিয়ু করেছিলাম আমি। কিন্তু রিভিয়ুটি প্রকাশের মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে সুশোভনবাবু চলে গেলেন। তিনি রিভিয়ুটি দেখে গেলে এবং তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে পারলে আমার মনে কোন দুঃখ থাকত না।

সুভো ঠাকুর গুণী ব্যক্তি ছিলেন। একাধারে কবি সাহিত্যিক চিত্রকর। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির শিল্পানুরাগী ঐতিহ্যের অন্যতম ধারক এবং বাহক হিসাবে তিনিও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তবে উল্লেখযোগ্য যে আলোচ্য প্রবন্ধটি ঠাকুর পরিবার সম্পর্কে হলেও রবীন্দ্রনাথই প্রধান বিষয়বস্তু। কিন্তু নিজে একজন সাহিত্যিক হয়েও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিলমাত্র আলোচনা করেননি। শুধু সাহিত্য নয়, রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা, ধর্মচিন্তা, শিল্পচিন্তা, রাষ্ট্র-বিষয়ক-চিন্তা—কোন বিষয়েই একটি কথাও বলেননি। নিতান্তই পারিবারিক ব্যাপার—পারিবারিক কিছু ঘটনা, নানা ব্যাপারে বিবাদ বিসংবাদের আভাস, বিষয় সম্পত্তির বিভাগ নিয়ে বিরোধ ইত্যাদি। এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা। বলতে পারেন, তাঁদের একান্ত নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে হাটের মাঝখানে আলোচনার সার্থকতা কি? আমি বলব, কিছুই অসঙ্গত নয়, অসার্থকও নয়। ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস বঙ্গদেশের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বাঙালী মাত্রেরই সে ইতিহাস জানবার অধিকার আছে। আবার সুভো ঠাকুরের যেমন

বলবার অধিকার আছে, তেমনি পাঠকদেরও অধিকার আছে তাঁর কথা কতখানি গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য তা ভেবে দেখবার।

সমগ্র ঠাকুর পরিবার সম্পর্কেই সুভো ঠাকুরের বহু অভিযোগ। যেহেতু সুবৃহৎ পরিবারে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রধান ব্যক্তি সেই হেতু তাঁর প্রধান অভিযোগই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। ধনে জনে পূর্ণ—বহু মহলে বিভক্ত বিরাট পরিবারে নানা রকমের শরিকী বিরোধ থাকা কিছুই বিচিত্র নয়, নানা কারণে ঈর্ষা বিদ্বেষের সৃষ্টিও অসম্ভব নয়। সুভো ঠাকুরের প্রবন্ধটিতে ঐ সব বাদ বিসংবাদের প্রচুর উল্লেখ আছে। বাস্তবিক পক্ষে পারিবারিক বিরোধই প্রবন্ধটির মূল বিষয়বস্তু। মলিন বস্ত্র প্রকাশ্যে ধোয়াধুয়ি ব্যাপারটা শিক্ষিত সমাজের দস্তুর নয়, অন্তত এক সময়ে ছিল না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সেটাই দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং পাঠক সমাজেও এ জাতীয় জিনিসের সমাদর ক্রমেই বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে জড়ানো হয়েছে বলে প্রবন্ধটি পাঠক সমাজে প্রচুর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। সেজন্যই প্রবন্ধটি সম্পর্কে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

তবে বাদ বিসংবাদ নিয়ে আলোচনার আগে বলে নিতে বাধা নেই যে সুভো ঠাকুর মানুষটি সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। বহুদিন পূর্বে তাঁর কবিতায় পড়েছিলাম—

টুটুন Tagore
Poet Tagore কে হন তোমার,
    জোড়াসাঁকোতেই থাকো ?
বাপের খুড়ো হন শুনিয়াছি—
    মোর কেহ হন নাকো।

বেশ লেগেছিল পড়তে। তেজিয়ান ছেলে বটে, রবি ঠাকুরেরও recognise করেননি। পাকামো আছে বৈকি; কিন্তু যাই বলুন, প্রতিভার ছাপও যে আছে সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ঐ উদ্ধত যৌবনের বাক্যচ্ছটা সেদিন সত্যই উপভোগ করেছিলাম; সেই কারণেই পরিণত বয়স্ক সুভো ঠাকুরের রবীন্দ্রবিরোধী নানা বক্তব্য আমি যথাসম্ভব সহানুভূতির সঙ্গেই ভেবে দেখবার চেষ্টা করেছি।

সুভো ঠাকুরের প্রবন্ধটি মূলত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব স্মৃতিচারণ। নাম দিয়েছেন বিস্মৃতিচারণ—অর্থাৎ বলতে চেয়েছেন, ঐ গৃহ এবং পরিবারের বহু কথা আজ বিস্মৃত; অতএব সে সব বিস্মৃত তথ্য লোকের স্মৃতিপথে এনে দেবার প্রয়োজন আছে। সে উদ্দেশ্যেই সুভো ঠাকুর লেখনী ধারণ

করেছেন। লেখার ভঙ্গিটি একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব—আমি সুভো ঠাকুর বলছি। জার্মেন দার্শনিক নীট্সের ভঙ্গিকে স্মরণ করিয়ে দেয়—Thus spake Zarathustra। নিজ মুখের উক্তিকে তিনি জেন্দ-আবেস্তার ঋষি জারাথুষ্ট্রার মুখ-নিঃসৃত বাণীর ন্যায় অভ্রান্ত মনে করতেন। সুভো ঠাকুরও খানিকটা সে ভাবেই কথা বলেছেন। আমি সুভো ঠাকুর বলছি, অতএব এর উপরে আর কথা নেই। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ভঙ্গিটার মধ্যে একটু ছেলেমানুষি ভাব আছে।

সুভো ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের পৌত্র। হেমেন্দ্রনাথ মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে লোকান্তরিত। দেখা যাচ্ছে হেমেন্দ্রনাথের পরিবারে—তাঁর পুত্র পৌত্রাদির মনে বহুদিন লালিত একটি ক্ষোভ থেকে গিয়েছে। তাঁদের প্রধান অভিযোগ হল, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসে মহর্ষির অন্যান্য পুত্ররাই—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথেরই প্রাধান্য। তাঁরাই বাজার মাৎ করে রেখেছেন। সুভো ঠাকুর বলছেন—তাঁর পিতামহ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস থেকে বাদ পড়ে গিয়েছেন। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যক্ত এবং অবহেলিত। ফলে আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। ভাবটা যেন ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য ভ্রাতারা চক্রান্ত করে হেমেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গকে কোণঠাসা করে রেখেছেন। ভ্রাতাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হলেও রবীন্দ্রনাথই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত, পারিবারিক ইতিহাসে তাঁরই প্রাধান্য। সেজন্য হেমেন্দ্রনাথের প্রতি তথাকথিত অবহেলার জন্য রবীন্দ্রনাথকেই প্রধানত দায়ী করা হয়েছে। অভিযোগটি সুভো ঠাকুরের স্বকপোলকল্পিত। সুভো ঠাকুরের ন্যায় প্রখর-বুদ্ধি মানুষের না বোঝার কারণ নেই যে ইতিহাসে স্থান করে নিতে হয় নিজ গুণে, নিজ নিজ achievement-এর জোরে। হেমেন্দ্রনাথ নির্গুণ ব্যক্তি ছিলেন না, বেঁচে থাকলে হয়তো তিনিও স্মরণীয় কিছু করে যেতে পারতেন। কিন্তু স্বল্পকালের জীবনে সে সুযোগ তিনি পাননি। স্মরণীয় কিছু করে যাননি বলেই স্মরণযোগ্য ইতিহাসে স্থান পাননি। পরিবারের অপর দুই ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ এবং সোমেন্দ্রনাথ বিকৃত মস্তিষ্ক, ইতিহাসে তাঁদেরও স্থান হয়নি—একই কারণে। achievement-এর অভাবে। জার্মেন দার্শনিক নীট্সে, ইংরেজ সাহিত্যিক সুইফ্ট, কবি কুপার মস্তিষ্ক বিকৃতিতে ভুগেছেন, কিন্তু প্রত্যেকেই স্থায়ী কীর্তি রেখে গিয়েছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে অতি অল্প বয়সে। কিন্তু তিনিও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নাম রেখে গিয়েছেন। জোড়াসাঁকো গৃহের অপর দুই সন্তান গগনেন্দ্র অবনীন্দ্র অশেষ কীর্তির অধিকারী। তাঁদেরই ভ্রাতা সমরেন্দ্রনাথের তেমন নাম নেই।

কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনিনি, সমরেন্দ্রনাথকে অপর দুই ভ্রাতা চেপে রেখেছিলেন। যাঁর যেটুকু প্রাপ্য ইতিহাস তাঁকে সেটুকুই দেয়, তার বেশী নয়। বাড়ির ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার ছিল হেমেন্দ্রনাথের উপরে। সে কাজটি তিনি অতিশয় দক্ষতার সঙ্গেই সম্পন্ন করেছেন। 'জীবনস্মৃতি'তে তার উল্লেখ আছে। তিনি যে সমস্ত বিষয়ই মাতৃভাষার মাধ্যমে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ তার যথাযোগ্য প্রশংসা করেছেন। বিদ্যা বুদ্ধি গুণগ্রাম কোনটাতেই খাটো ছিলেন না; কিন্তু ইতিহাসের চোখে শুধু গুণবান হলে চলে না, কীর্তিমান হতে হয়। নইলে সে কাউকে আমল দেয় না।

সুভো ঠাকুরের অপর এক অভিযোগ, বাড়ির সব চাইতে ওঁচা অংশটি দেওয়া হয়েছে, তাঁদের জমিদারি ভাগের বেলাতেও তাই। প্রকৃত পক্ষে মহর্ষির জীবৎকালেই হেমেন্দ্রনাথের জন্যে বাড়ির যে মহল নির্দিষ্ট ছিল সে মহলেই তাঁর পরিবারবর্গ শেষ পর্যন্ত বাস করেছেন। হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে মহর্ষির নির্দেশেই উড়িশার জমিদারিটি হেমেন্দ্রনাথের অংশ বলে গণ্য হয়। অবশ্য সমগ্র জমিদারি পরিচালনার ভারই ছিল রবীন্দ্রনাথের উপরে। উড়িশায় জমিদারিও তিনিই তদারকি করতেন। কিন্তু জমিদারি ভাগ বাটোয়ারায় রবীন্দ্রনাথের কোন হাত ছিল এমন প্রমাণ নেই। সুভো ঠাকুর বলেছেন, বাড়ির সব চাইতে ওঁচা অংশটি তাঁদের দিয়ে জোড়াসাঁকো বাড়ির সব চাইতে ভালো অংশটি রবীন্দ্রনাথ নিজে দখল করে বসেছিলেন। অন্যান্য উক্তির ন্যায় এটিও ধোপে টেঁকে না। রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারির ভার গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বৎসর। দশ বৎসরকাল একাদিক্রমে জমিদারি পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন। সেই দশ বৎসর জমিদারির বিভিন্ন কাছারি বাড়িতেই—প্রধানত শিলাইদহ কখনো পতিসর এবং শাজাদপুরে সপরিবারে বাস করেছেন। প্রত্যক্ষ-ভাবে জমিদারির তত্ত্বাবধান ছেড়ে শান্তিনিকেতনে এসে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন চল্লিশ বছর বয়সে। সেই থেকে শান্তিনিকেতনই তাঁর আবাসস্থল। তাহলে দেখা যাচ্ছে আশি বছরের জীবনে পঞ্চাশ বছরই তিনি জোড়াসাঁকোর বাইরে কাটিয়েছেন। কলকাতায় অবশ্যই মাঝে মাঝে গিয়েছেন, কিন্তু ঐ পঞ্চাশ বছরে জোড়াসাঁকোয় বাসের কাল সব মিলিয়ে বোধ করি একটি বছরও হবে না। কয়েক বছর পরে পুত্র, পুত্রবধূও চলে এলেন এবং সেই থেকে শান্তিনিকেতনেই বসবাস করেছেন। কাজেই অপরকে বঞ্চিত করে সব চাইতে ভালো অংশটি রবীন্দ্রনাথ নিজে দখল করে বসেছিলেন—এ কথা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বাস করবে না। কারণ, বালক বয়সে যেমনই হোক্ পরবর্তীকালে

জোড়াসাঁকো গৃহের প্রতি রবীন্দ্রনাথ কোন আকর্ষণই প্রকাশ করেননি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জোড়াসাঁকো গৃহে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও একটা মহল ছিল। তিনি কর্মজীবন বাংলাদেশের বাইরে কাটিয়েছেন, অবসরজীবন দক্ষিণ কলকাতায় নিজ গৃহ নির্মাণ করে বাস করেছেন। পৈত্রিক ভিটে বা জমিদারির অংশ নিয়ে সত্যেন্দ্র ঠাকুর বা সুরেন ঠাকুর কাউকেই উচ্চবাচ্য করতে শোনা যায়নি। বড় চিন্তা বড় ভাবনা নিয়ে থাকলেই এক—ছোট কথা মনে আসে না। ক্ষুদ্র চিন্তা মনে বিষের ক্রিয়া করে। পূর্বে যে ক্ষোভটির কথা বলেছি পরে সেটি সুভো ঠাকুরের মনে আক্রোশে পরিণত হয়েছে। ঐ প্রবন্ধটির মুখ্য বিষয়বস্তু হল—আপনারা রবীন্দ্রনাথকে মস্ত বড় কবি বলে জানেন, কিন্তু আমি তাঁকে একটি মস্ত বড় ঠক এবং প্রবঞ্চক বলেই জেনেছি। সমস্ত প্রবন্ধটি পাঠ করলে ঐ একটি ধারণাই জন্মায়। লোভের বশে জমিদারির ওঁচা অংশটি অপরকে গছিয়ে দিয়ে লাভের অংশটি নিজে নিয়েছেন এবং পৈত্রিক ভিটের সেরা অংশটি অপরকে বঞ্চিত করে নিজে দখল করে বসেছেন। বলেছেন, জমিদারির এবং বসতবাটির ভাগ বাটোয়ারায় মহর্ষির কোনই হাত ছিল না। ব্যাপারটি তাঁর জীবদ্দশায় হলেও মহর্ষি তখন অতিশয় বৃদ্ধ জরাজীর্ণ, সুভো ঠাকুরের ভাষায় 'সাইফারে পরিণত'। এই অবস্থায় সম্পত্তি বিভাগে উদ্যোগী হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এবং মহর্ষি কনিষ্ঠ পুত্র স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অতঃপর সুভো ঠাকুর বলছেন—"মহর্ষির এইরূপ শারীরিক অবস্থার 'সুবর্ণময় সুযোগে সহজেই তাঁরা মহর্ষির অনুমোদন লাভ করেন এবং আবশ্যক অনুযায়ী একটি উইল প্রস্তুত দ্বারা হয়ত বা তাঁর স্বাক্ষর সংগ্রহ করতেও সমর্থ হন।" 'হয়ত বা' কথাটি লক্ষণীয়। প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ ব্যাপারে সুভো ঠাকুর সঠিকভাবে কিছুই জানেন না; এসব তাঁর অনুমান মাত্র। এজন্যে আগেই বলেছি যে তাঁর অভিযোগ বেশির ভাগই স্বকপোলকল্পিত।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা, সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা এবং তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক মতামত নিয়ে নানা বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। কিছুই অস্বাভাবিক নয়, মতবিরোধ হতেই পারে। রবীন্দ্রনাথের সকল কথাই অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে হবে এমন কথা অন্ধ ভক্ত ছাড়া কেউ বলবে না। নানা সময়ে নানা ব্যাপারে যে তীব্র বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছে সেটাও একটা সুলক্ষণ; তাতে সমাজের প্রাণশক্তিই প্রমাণিত হয়েছে। বিরোধ যা নিয়েই হোক, শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেনি। একদিন যা হয়নি, আজ তাই হল। আক্রমণ নানাভাবেই হয়েছে, কিন্তু মানুষটাকে ঠক প্রবঞ্চক প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা ইতিপূর্বে কেউ

করেন নি। সুভো ঠাকুর সেই কাজটি করেলন। তবে তিনি যদি মনে করে থাকেন বাঙালী পাঠক সমাজটি নিতান্তই একটি অপোগণ্ড সমাজ—মুখের কাছে যা ধরা যাবে তাই নির্বিবাদে তারা গিলবে। তাহলে তিনি বাঙালী শিক্ষিত সমাজকে শুধু যে ভুল বুঝেছেন এমন নয়, তাদের ঘোরতরভাবে অপমানও করেছেন।

সুভো ঠাকুরের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হল হেমেন্দ্রনাথ এবং হেমেন্দ্রনাথের বংশধরগণ জোড়াসাঁকো বাড়ির অন্যান্য শরিক দ্বারা উপেক্ষিত। সোজা কথায় তাঁরা জোড়াসাঁকো কাব্যের উপেক্ষিত। এখানেও অভিযোগটি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেই কেন না দেশ সুদ্ধ মানুষের দৃষ্টি তাঁর উপরেই নিবদ্ধ,—তিনিই বাকি সকলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। সুভো ঠাকুর ভুলে যাচ্ছেন যে, শক্তি প্রতিভা থাকলে সকলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন—গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র যেমন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তো রাহুর ন্যায় তাঁদের গ্রাস করতে পারেন নি। এমন কি সীমিত পরিসরের মধ্যে হলেও সুভো ঠাকুর নিজেও আপন শক্তিবলেই কিছু সমাদর লাভ করেছেন এবং তা রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই।

হেমেন্দ্রনাথের সন্তানরা যে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা আদৌ উপেক্ষিত হননি, বরং তাঁর অতিশয় স্নেহের পাত্র ছিলেন তার বহু প্রমাণ রবীন্দ্র জীবনেই পাওয়া যাবে। হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাকন্যা প্রতিভাই 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সরস্বতীর ভূমিকায় অবতীর্ণা। পরম যত্নে পরম স্নেহে সংগীত এবং অভিনয় কৌশল রবীন্দ্রনাথই তাঁকে শিখিয়েছেন। এই কন্যাটির বিবাহের ব্যবস্থা আশুতোষ চৌধুরীর (পরে স্যার আশুতোষ) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন। সে কথা সুভো ঠাকুরও উল্লেখ করেছেন। হেমেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা অভিজ্ঞা সংগীতে অতিশয় পারদর্শিনী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে গত হয়েছেন। নতুবা বাংলার সংগীত ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকত। রবীন্দ্রনাথ যে একে কী ভালোবাসতেন সে বলবার নয়। শিলাইদহ থেকে লিখছেন যে অভির গান শুনবার জন্যে মনটা ছটফট করছে। চিঠিপত্র খুঁজলে সুভো ঠাকুর আরো অনেক কথা জানতে পারতেন। সোনার তরী কাব্যের 'বিম্ববতী' নামক কবিতাটি অভি-র 'প্রেরণায়' রচিত। এটি একটি রূপকথার কাহিনী। সত্য কার মুখে গল্পটি শুনে শিশু অভি রবিকাকার কাছে এসে খুব মিষ্টি করে সে গল্পটি তাঁকে শুনিয়েছিল। অভির মুখে শোনা সেই গল্পটিই 'বিম্ববতী' কবিতায় রূপান্তরিত। সেই চিঠিতেই লিখছেন, 'একদিন কি এক কারণে আমার খুব রাগ হয়েছিল, অভি এসে আমার চৌকির পিছনে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আপন মনে

যা-তা বকে যেতে লাগল, এক মুহূর্তে আমার সমস্ত রাগ জুড়িয়ে গেল।'

সুভো ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকিবহাল নন। মনে বরাবর একটা তিক্ততা পোষণ করার দরুন রবীন্দ্রনাথকে জানবার চিনবার খুব একটা চেষ্টাও করেননি। জোড়াসাঁকো গৃহের সকলে মিলে হেমেন্দ্রনাথের পরিবারকে দূরে ঠেলে দিয়ে কোণঠাসা করে রেখেছিলেন এ অভিযোগের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। বরং উল্টোটারই প্রমাণ আছে—এঁরাই দূরে সরে গিয়েছেন, অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন নি। সরলা দেবীচৌধুরাণী বলছেন, হেমেন্দ্রনাথের কন্যারা কেউ কেউ তাঁদের সমবয়স্কা ছিলেন। ইচ্ছে থাকত একসঙ্গে বসে গল্প-গুজব করেন। সেটা সম্ভব হত না, কারণ ঐ কন্যাদের এদিকে খুব একটা আনাগোনা ছিল না। ওঁদের মহলে গেলে দেখা যেত দরজা জানালা বন্ধ। মনে হত কর্তৃপক্ষ মেলামেশাটা খুব পছন্দ করতেন না। সুভো ঠাকুর এর জবাবে বলেছেন—হেমেন্দ্রনাথ আদিযুগের পিউরিটেন ব্রাহ্ম, হাল্কা ধরনের আমোদ আহ্লাদ, গান বাজনা, নাটক থিয়েটার তিনি খুব পছন্দ করতেন না। অপর পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঐ সব ব্যাপারে অত্যুৎসাহী। সে জন্যেই বোধ করি হেমেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের পত্নী কন্যাদের একটু কড়া পাহারায় রাখতেন। যুক্তিটা খুব টেকসই বলে মনে হয় না। হেমেন্দ্রনাথের কন্যারা সংগীতে পারদর্শিনী ছিলেন। অনুমান করা যেতে পারে যে, পিতার উৎসাহেই তাঁরা সংগীত-চর্চায় এতখানি পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঠাকুর পরিবারের কন্যাদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন তিনি হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা।

কে দূরে সরে গিয়েছেন কিংবা কে কাকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন আজ এতকাল পরে সে প্রশ্নের সমাধান খুব সহজ নয়। তবে যেটুকু খবর বার্তা আমাদের নাগালের মধ্যে আছে তাতে সুভো ঠাকুরের মতের সমর্থন মেলে না। বরং উল্টোটাই প্রমাণিত হয়। সরলা দেবীচৌধুরাণী তাঁর আত্মচরিত্রে যে কথা বলেছেন তার উল্লেখ করেছি। ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীও সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর স্মৃতিকথা লিখে গিয়েছেন। এটি এখনও অপ্রকাশিত, বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত। ইন্দিরা দেবী লিখছেন—'সেজ হেমেন্দ্রনাথ বিদ্যাবুদ্ধিতে কম ছিলেন না, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অকালে মারা গিয়েছিলেন এবং ওঁদের পরিবার কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া একলষেঁড়েভাবে থাকতেন বলে বাইরের লোকের কাছে তেমন নামডাক ছিল না।…বড় ঠাকুরের (আশু চৌধুরী) সঙ্গে এক জাহাজেই রবিকা একবার বিলেত যান। সেই সময়েই আলাপ পরিচয় হয় এবং তখন থেকেই

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভার সঙ্গে বিয়ে দেবার কল্পনা রবিকার মনে উদয় হয়…।'

আশু চৌধুরী মশায় বিলেত থেকে ফিরে এসে প্রথম যেদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন সেদিন একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। ইন্দিরা দেবী সে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন—"ছোটবেলায় রবিকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সভা-সমিতিতে চলে যেতুম। সেদিনও গিয়েছি আর বড় ঠাকুরও দৈবক্রমে সেই গাড়িতেই ছিলেন। আর যাবে কোথায়? সেজকাকিমা একটু সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। তখনি ধরে নিলেন আমার মা বুঝি আমার বিয়ে দেবার চেষ্টায় এই সব ষড়যন্ত্র করছেন, তাঁদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছেন। বলা বাহুল্য, ঘুণাক্ষরেও সে অভিসন্ধি তাঁর মনে আসেনি। আর আমার তখন বিয়ের চেষ্টা করবার বয়সও হয়নি। কিন্তু এই তুচ্ছ সন্দেহের উপর দুই পরিবারের মধ্যে একটু মনোমালিন্য বেশ কিছুদিন ধরে চলেছিল।"

অপ্রকাশিত এই তথ্যটি কেউ জানেন না, সুভো ঠাকুরও জানতেন না। না জেনে, অযথা অনুমানে কত ভুল ধারণা নিয়ে আমরা বসে থাকি। তাহলেও বলব, সুবিশাল পরিবারে ছোটখাটো ব্যাপারে, বাদ-বিসংবাদে নানাভাবে ক্ষোভ সঞ্চিত হতে থাকে, পরে এক সময়ে বিস্ফোরণ ঘটে। এক্ষেত্রে তৃতীয় পুরুষ অর্থাৎ পৌত্র সুভো ঠাকুরের মুখে কিঞ্চিৎ বিষোদ্গার হয়েছে। তথাপি মেনে নিতে বাধা নেই যে কোন কারণে তাঁর ক্ষোভের কিছু Justification হয়তো থাকতেও পারে। কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে সুভো ঠাকুর মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি না হতে পারেন কিন্তু তিনি একজন মহা ঠক, একথা বাঙালী সমাজের কাছে আজ প্রমাণ করতে যাওয়া আমার মতে—A bit too late in the day.

দেশের চোখে বিশ্বের চোখে রবীন্দ্রনাথ যে স্থান লাভ করেছেন সে স্থান থেকে তাঁকে আর উৎখাত করা যাবে না। মানুষ বড় হন নিজ গুণে, নিজ ক্ষমতায়। নিন্দুক নিন্দা করে তাঁকে ছোট করতে পারে না, নিজেই ছোট হয়ে যায়। আগেই বলেছি সুভো ঠাকুর যে নিন্দাবাদ করছেন তার কার্যকারণ কিছু হয়তো খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু ইদানীং একদল সমালোচক দেখা দিয়েছেন তাঁরা নিছক নিন্দাবাদেই প্রচুর আনন্দ লাভ করছেন। অনেক সময়েই দেখা যায় নতুন কিছুই বলবার নেই; বহু পুরাতন এবং বহুবার আলোচিত কোন বিষয়কে খুঁচিয়ে তুলে বিদ্যা ফলাতে যান। এঁরা ভুলে যান যে, বিদ্যাটা ফলাবার জিনিস নয়। বিদ্যা ফলাতে গেলে অনেক সময়ই বিদ্যা ফাঁস হয়ে যায়। এ মুহূর্তেই দেখা যাচ্ছে 'জন-গণ-মন' গানটি নিয়ে আরেক দফা আলোচনা শুরু হয়েছে।

সেই 'অতি পুরাতন তথ্য, নব আবিষ্কার'। এটি নাকি ব্রিটিশ রাজের বন্দনা গান। এ গানটি যখন লেখা হয়েছে তখন এদেশে ইংরেজ রাজত্বের বয়ঃক্রম মাত্র দেড়শ' বছর। গানটিতে যাঁর বন্দনা উচ্চারিত তিনি পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগ যুগ ধরে অর্থাৎ হাজার হাজার বছর ধরে ভারত রথচক্রের পরিচালক। সেই ভারত রথের যিনি চির সারথি, কবি তাঁকেই বলেছেন ভারতভাগ্যবিধাতা এবং তাঁরই জয়গান করছেন। যাঁরা দেড়শ' বছরের ইংরেজ রাজকে ভারত বিধাতা আখ্যা দিতে চান তাঁদের শুধু যে ভাষাজ্ঞান নেই এমন নয়, কাণ্ডজ্ঞানও নেই। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন কোন আত্মীয় বন্ধু ব্রিটিশ সম্রাটের আগমন উপলক্ষে কবিকে একটি বন্দনা-গীতি রচনা করে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ সে অনুরোধ রক্ষা করেননি। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করেও নিই যে ঐ উপলক্ষেই তিনি গানটি রচনা করেছিলেন, তাহলেও কার্যত দেখা যাচ্ছে রাজ সংবর্ধনায় ঐ গানটি গীত হয়নি। তাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, গানটির মর্ম ইংরেজ রাজপুরুষরা আমাদের স্বদেশী পণ্ডিতদের চাইতে ভালো বুঝেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটি ইংরেজ রাজের বন্দনা গান নয় এবং সেজন্যেই এটিকে তাঁরা বরবাদ করে দিয়েছিলেন। এই সূত্রে একথা অনুমান করা যেতে পারে যে, ঐ আত্মীয়-বন্ধুটির অনুরোধ শুনেই রবীন্দ্রনাথের মনে এ জাতীয় একটি ভারত সংগীত রচনার কথা মনে হয়েছিল এবং ঘটনার অনতিকাল পরেই সংগীতটি রচিত হয়েছিল।

অলমতিবিস্তরেণ। বেশি বলে লাভ নেই, নিন্দা বন্ধ হবে না। যিনি বড় তাঁর নিন্দার ভাগও তত বড়। অবশ্য সে নিন্দায় তাঁর যশ বাড়ে বই কমে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে কথা বলেছেন—'নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ/এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।' হিমালয়ের উন্নত শিরে নিত্য ঝঞ্ঝাবাত্যার আঘাত তথাপি উন্নত শির উন্নতই আছে। বড়কে ছোট করা যায় না। বড়কে যে ছোট করতে যায় সে যে নিজেই ছোট হয়ে যায় সে কথাটি মনে থাকলে নিন্দুকের স্পর্ধা আপনি স্তব্ধ হয়ে যেত। 'স্পর্ধা' নামক একটি কাব্য-কণিকায় রবীন্দ্রনাথ এ কথাটি বড় সুন্দর করে বলেছেন—

হাউই কহিল মোর কী সাহস, ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই!
কবি কহে, তার গায়ে লাগে নাকো কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু।

একবিংশ শতকে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথকে আমরা সাধারণভাবে বিংশ শতাব্দীর কবি বলেই জানি: কিন্তু ভুললে চলবে না যে রবীন্দ্রনাথের আশি বছর জীবনের অর্ধেকটাই কেটেছে উনবিংশ শতকে। কলোসাস্-এর ন্যায় দুই শতাব্দীতে দুই পা রেখে তিনি দণ্ডায়মান। তাঁর বিরাট সৃষ্টিকর্মের ঠিক অর্ধেক না হলেও অন্তত চল্লিশ শতাংশ উনিশ শতকে রচিত। এরমধ্যে আবার এমন সব জিনিস আছে যা রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম রচনার মধ্যে নিঃসংশয়ে স্থান পাবে। 'গল্পগুচ্ছ'র গল্প প্রথম প্রকাশে যতখানি চমক লাগিয়েছিল আজও ততখানি চমক লাগায়। 'ছিন্নপত্র'র ন্যায় গ্রন্থ পৃথিবীর সাহিত্যে অদ্যাবধি বিরল। 'গল্পগুচ্ছ' (প্রথম পর্ব) এবং 'ছিন্নপত্র'— দু'এরই শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে। অগ্নিপরীক্ষার ন্যায় এরা শতাব্দীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভবনে / মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'—এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে— ১৮৮৬ সালে। শতবর্ষ পরে আজকের মানুষও যেমন ঐ কথা ভাবে, বলে, আজ থেকে বহু শত বর্ষ পরেও মানুষ ঠিক ঐ কথাই বলবে—মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। রসের বয়স নেই, সে চির নবীন। কবি রসস্রষ্টা, কবিরও বয়স নেই, তিনিও চির নবীন। প্রাণের চাইতে গুণের আয়ু ঢের বেশি। মানুষ প্রাণে বাঁচে যতদিন, গুণে বাঁচে তার শতগুণ।

বেশ দেখা যাচ্ছে যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে, আজ বিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসেও তা অব্যাহত। জ্ঞানী গুণীরা সশরীরে বিরাজ না করলেও স্বমহিমায় বিরাজ করেন শতাব্দীর পর শতাব্দী। রবীন্দ্রনাথ ইহলোক ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তাও অর্ধ শতাব্দী হতে চলল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে জীবৎ-কালের চাইতে এখন ঢের বেশি সমারোহের সঙ্গে বেঁচে আছেন। প্রমাণিত হচ্ছে যে গুণবানের আয়ু ক্রমবর্ধমান।

মহামানব, মহাপুরুষ ইত্যাদি কথাগুলো বড় বেশি সস্তা হয়ে গিয়েছে। এর চাইতে লিটারেল অর্থে যদি তাঁদের বলি মহাপ্রাণ তাহলে কথাটা অনেক বেশি অর্থবহ হয়। মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন। সেজন্যে মহাপ্রাণ ব্যক্তি প্রাণত্যাগের পরেও ঐসব অনুপ্রাণিত মানুষদের মনে প্রাণ ধারণ করেন। ভগবদ্-ভক্ত ব্যক্তিরাও স্বীকার করবেন যে অমরতা-ভগবানের দান

নয়, মানুষের দান। অমরতা লাভে অমর ব্যক্তির কৃতিত্ব যতখানি, যাঁরা তাঁকে অমরতা দিয়েছেন তাঁদেরও ততখানি। মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী কালে আজও রবীন্দ্রনাথ যে এতখানি জীবন্ত, সে কৃতিত্ব তাঁর দেশবাসীর। যে সমাজে গুণের আদর নেই, সে সমাজে গুণী ব্যক্তিরা জীবৎকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন অর্থাৎ তাঁরা জীবন্মৃত হয়ে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে অ-মৃতের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন, সে কথা বহুবার বহুভাবে তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন। তের শ' দুই সালে (১৩০২) রচিত একটি বিখ্যাত কবিতায় ১৪০০ সালে পাঠক পাঠিকাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন—আজকের এই বসন্ত দিনের যে আনন্দ শিহরণ আমার কাব্যে সংগীতে ধরা দিয়েছে—'আজি হতে শত বর্ষপরে' এর কিছু কি আমি তোমাদের মনের দোরে পৌছে দিতে পারব? শতাব্দীকাল পরে আমার আনন্দে আর তোমাদের আনন্দে কি কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে? শুধু তো আনন্দ নয়, আনন্দ বেদনা সুখ দুঃখ মিলিয়ে মানুষের জীবন। বলতে চেয়েছেন কালের ব্যবধানে মানুষের অনুভূতি কি এমন ভাবে বদলে যাবে যে আজকের হর্ষ তোমাদের যুগে বিষাদে পরিণত হবে কিংবা আমাদের বিষাদ তোমাদের মনে হর্ষের উদ্রেক করবে?

সময়কে লোকে বিশ্বাস করে না। সময় চলার নেশায় চলে, থামতে জানে না। যেতে যেতে অনেক জিনিস পথে ফেলে ফেলে যায়। পেছন ফিরে তাকায় না, কোন জিনিসের প্রতি ওর মায়া নেই। সকলকে সব কিছুকে সে ভুলিয়ে দেয়। দেখলে মনে হবে পুরাতনকে সে আমলই দেয় না। নিত্য নূতনের পিয়াসী। আসলে কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যতখানি চঞ্চল-মতি মনে হয়, কার্যত ততখানি নয়। কালের পরিবর্তন যেটা আমাদের চোখে পড়ে সেটা যতখানি বাহ্যিক ততখানি আন্তরিক নয়। বলি বটে ভাবেভঙ্গিতে পরিবর্তন কিন্তু কার্যত পরিবর্তনটা ভঙ্গিতে যতটা, ভাবে ততটা নয়। ইন্ডাস্ট্রিয়েল রিভলিউ-শানের আগের তুলনায় পরে মানুষের অশনে আসনে, বসনে ভূষণে, আবাসে পরিবেশে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তাকে শতাব্দীর মাপে দেখলেও ঠিক আন্দাজ করা যাবে না। তাকে বলতে হবে যুগান্তর, মানুষের ইতিহাসে এক যুগ গিয়ে আরেক যুগ এল। প্রচণ্ড পরিবর্তন, স্বীকার করতেই হবে। তাহলেও একটু শান্তমনে চিন্তা করলে দেখা যাবে পরিবর্তনটা বাইরে যতটা অন্তরে ততটা নয়। অবয়বে যতখানি অনুভূতিতে ততখানি নয়। মন চলে মন্দাক্রান্তা তালে। মনের উপরে জবরদখল চলে না। প্রত্যেক দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি

এবং জীবনধারা থেকে সে দেশের মানুষ কিছু মূল্যসঞ্চয় করে। শতাব্দীর অবসানে, এমন কি যুগের অবসানেও সে মূল্যবোধ জাতির জীবন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না।

সোজা কথায় সময় বাইরে যত সহজে ভাঙচুর ঘটায়, মনে তত সহজে নয়। কালিদাসের যুগে আর রবীন্দ্রযুগে সহস্রাধিক বৎসরের ব্যবধান। কিন্তু কালের ব্যবধান যতখানি মনের ব্যবধান ততখানি নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কালিদাসের কালের নিপুণিকা চতুরিকারা এখনো অন্য নামে মর্ত্যলোকে বিরাজ করছেন। কিছুই মিথ্যা বলেননি। হঠাৎ দেখে চেনা কঠিন, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়ে যাবেন কেন না আজও 'সেই কটাক্ষ আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য। যেমনটি ঠিক দেখা যেত কালিদাসের কালে।' অর্থাৎ চালচলন বদলেছে বটে কিন্তু মেয়েদের মেয়েলিপনা যায়নি। বলাবাহুল্য, ছেলেদেরও ছেলেমানুষি কিছুমাত্র কমেনি।

রবীন্দ্রনাথ যে শতবর্ষ পরের ১৪০০ সালের কথা বলেছিলেন সেই চৌদ্দশ' সালে পৌছোতে আর পাঁচটি বছর মাত্র বাকী। আর আজকের এই বিংশ শতক বারো বছর পরেই গিয়ে পৌছোবে একবিংশ শতকে। কালান্তরে একাল হয়ে যায় সেকাল। দেখতে হবে ক'বছর পরেই একবিংশ শতকের মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথ সেকেলে হয়ে যাবেন কি না। মনে হয় কোন কোন মহলে এরূপ দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। কারণ অবশ্যই আছে, সময়ের গতিবেগ গিয়েছে বিষম বেড়ে। প্রাচীন কালে সময় চলত হেলেদুলে। অফুরন্ত সময়। কারোই কোন ব্যাপারে তাড়া ছিল না। কালিদাসের কাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন 'জীবনটাতে থাকত নাকো একটু মাত্র ত্বরা।'—সেটা খুবই খাঁটি কথা। এ যুগে ঠিক তার উল্টো। সবার মুখেই এক কথা –জলদি কর, জলদি কর সময় নেই। বিদ্যুৎ যুগ এসে অবধি সময় চলেছে বিদ্যুৎগতিতে। সে গতি ক্রমেই বাড়ছে 'নিমেষে শতেক যুগ মানি'—কথাটা কবিসুলভ অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগে এমন সব ব্যাপার ঘটছে, দেখে কিছুই আর অসম্ভব মনে হয় না। বৎসরান্তে মনে হয় যুগান্তে এসে পৌচেছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটি ছ'বছর ধরে চলেছিল। কিন্তু ঐ যুদ্ধপূর্ব পৃথিবীতে এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অন্তত ছ'শ বছরের ব্যবধান। একেকটি বৎসর একেকটি শতাব্দীর ন্যায়। যুদ্ধের অন্ত্যপর্বে এমন এক অস্ত্রের ব্যবহার হল যা কবি কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। দুটি বোমার আঘাতে দুটি নগর ধ্বংস, লক্ষাধিক

মানুষের প্রাণনাশ। ব্যবহার করেছেন পৃথিবীর 'সভ্যতম' দেশের সর্বোত্তম পুরুষ (ফার্স্ট সিটিজেন) প্রেসিডেন্ট ট্রুমান (সার্থকনামা সাচ্চা মানুষ)।

পৃথিবীতে এক নতুন যুগের সূচনা হল। রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের আরম্ভটা দেখে গিয়েছিলেন। শেষ দেখে যাননি। এটম যুগ আসবার আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। সারা পৃথিবীর কথা ছেড়ে দিলেও, নিজ দেশেরই অনেক জিনিস তিনি দেখে যাননি। দেশের স্বাধীনতা নিয়ে অনেক ভেবেছেন, অনেক বলেছেন, এক সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশও নিয়েছিলেন। সেই স্বাধীনতা এল তাও তিনি দেখে যাননি। যে ভারতবর্ষকে তিনি দেখে গিয়েছিলেন সে ভারতবর্ষ ভেঙে তিন খানা হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ এমন কথা ভাবতেও পারতেন না—'মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তার ছবি।' যে মহা-ভারতকে তিনি মহামানবের সাগরতীর বা মিলনস্থান হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন সে ভারতে পাকিস্তানের পরে খালিস্থান, তেলেগুস্থান, আহমস্থান এবং গোর্খাস্থানের দাবি উঠেছে। আজকের এই দেশকে চেনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যতখানি কঠিন, দেশবাসীর পক্ষেও রবীন্দ্রনাথকে চেনা ততখানিই কঠিন হতে পারে—বোধকরি ঐ কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, একবিংশ শতকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি কতখানি বজায় থাকবে। দুশ্চিন্তা আমাদেরই। আত্ম-বিশ্বাসের অভাবে আমরা সদা শঙ্কিত। দিনকাল যা পড়েছে তাতে আজ আছি তো কাল কি হবে ভেবে সন্ত্রস্ত। নিজের পরে বিশ্বাস নেই বলে অপরের উপরেও আমরা ভরসা রাখি না। এখন থেকেই আমাদের ভাবনা হয়েছে একবিংশ শতকের মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাঁই পাবেন কি না। প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে কবি ভাবুকরা কি আর তেমন আমল পাবেন? আশঙ্কাটা অমূলক। কবি দার্শনিকরা এমন অক্ষম বা অসহায় নন যে নতুন যুগে নতুন পরিবেশে একেবারে অথৈ জলে পড়ে যাবেন। আজকের নিউক্লিয়ার বিপ্লবের তুলনায় পূর্বে উল্লেখিত ইনডাসট্রিয়েল বিপ্লবটি কিছু ছোটখাটো ব্যাপার ছিল না। মানবসভ্যতার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে বিপ্লব কি শেক্সপীয়রকে ভাসিয়ে নিতে পেরেছে? শিল্প বিপ্লবের পরে দু'দুটি মহাযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ঘটেছে তাতেও শেক্সপীয়র অক্ষত থেকেছেন। গ্যোটের জন্ম ঐ শিল্প বিপ্লবের যুগে। বিপ্লবের যা কিছু দান তার সমস্তই তিনি আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। দুই মহাযুদ্ধ গ্যোটেকেও কাবু করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথও দুই মহাযুদ্ধের পরে বহাল তবিয়তেই আছেন। এক্কেকটি মহাযুদ্ধ যদিচ একেকটি মহাবিপ্লব তথাপি সে বিপ্লব কোন মহাকবিকে কাবু করতে পারে না। কারণ মহাকবিরা নিজেরাই

একেকটি বিপ্লব অর্থাৎ বিপ্লবের উৎস। রাষ্ট্রবিপ্লবে, সমাজ বিপ্লবে যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাতে বিষ এবং অমৃত দুই-ই উৎক্ষিপ্ত হয়। মহাকবি আপন সৃষ্টির মাধ্যমে অমৃতটুকু জনসমাজে বিতরণ করেন, বিষটুকু নীলকণ্ঠের ন্যায় আপন কণ্ঠে ধারণ করেন অর্থাৎ বিশেষ বিষক্রিয়া সাধ্যমত লাঘব করবার চেষ্টা করেন।

কালের গতি শক্তিমানদের যেমন সহজে উৎপাটিত করতে পারে না তেমনি সাধারণ মানুষদেরও খুব যে সহজে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এমন নয়। আগেই বলেছি সময়ের পিছুটান নেই, সে ছুটে চলে অন্ধ বেগে। সাধারণ মানুষও চলে অন্ধের ন্যায়, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির অভাবে সে চলে ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে। নতুনকে বিশ্বাস করে না। পুরোনোকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। ওদিকে শিক্ষিতরাও ভেবেচিন্তে ধীরে-সুস্থেই চলেন। কাজেই শিক্ষিত মনকেও খুব দ্রুতগামী বলা চলে না। সময়ের গতি এবং মানুষের মনের গতি যে এক নয় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের চোখের সম্মুখে। আজকের পৃথিবীতে দেশে দেশে সমাজের এবং রাষ্ট্রের যে কাঠামো দেখতে পাচ্ছি তা সাধারণ দ্বিবিধ—পার্লামেণ্টারি সাধারণতন্ত্র এবং মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র। কোনটিই আনকোরা নতুন নয়। মার্কসীয় দর্শনের জন্ম উনিশ শতকে, পার্লামেণ্টারি ডিমক্রেসির জন্ম তারও আগে। রাজতন্ত্র এখনো যেখানে যেখানে আছে সেখানেও রাজমহিমা খর্ব হয়েছে। কিন্তু এখনো যে রাজা এবং রাজতন্ত্র লোপ পায়নি তাতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষের মন অতি ধীরগতিতে চলে। কাজেই বর্তমান শতাব্দীর অবসানে এবং নতুন শতাব্দীর আগমনে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন ঘটবে, সমাজ জীবনে ওলট পালট হবে এমন ভাববার কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। সেইসঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, যে সব শক্তিমান পুরুষের কর্ম এবং চিন্তা আজকের সমাজগঠনে সহায়তা করেছে, এবং আজকের মানুষের মনকে প্রভাবিত করেছে সেই সব মানুষ অচিরে বিস্মৃত হবেন এমন মনে করবার কিছুমাত্র কারণ নেই। বিংশ শতকের ভারতীয় জীবনে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ যে প্রভাব বিস্তার করেছেন, সাময়িক বিভ্রান্তি সত্ত্বেও তার ছাপ সহজে মুছে ফেলা যাবে না। মানুষের মন রক্ষণশীল। পুরাতনকে ছাড়তে সময় লাগে, নতুনকে গ্রহণ করতেও সময় লাগে। মার্কসীয় মতবাদকেই আমরা সমাজ জীবনের আধুনিকতম মতবাদ বলে মনে করি। কিন্তু কার্ল মার্কস পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন ১৮৮৩ সালে অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে চার বছর আগে। মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে ১৮৪৮ সালে তাঁর জগৎ বিখ্যাত কমিউনিস্ট

ম্যানিফেস্টোতে পৃথিবীর সকল শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের ন্যায্য অধিকার দাবি করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। আজকের পৃথিবীর সকল দেশই সে আহ্বানে অল্পবিস্তর সাড়া দিয়েছে। কিন্তু ঐটুকু সাড়া জাগাতেই দেড়শ বছর লেগে গিয়েছে। সে আহ্বানে যথার্থ ফল লাভ করতে কত শত বৎসর লেগে যাবে কে জানে। আজও পৃথিবীর বারো আনা মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। কোন নতুন আইডিয়ার প্রচারে এবং প্রয়োগে কত সময় লেগে যায় এটি তারই দৃষ্টান্ত।

কমিউনিজম্-এর দৃষ্টান্ত এই কারণে দিচ্ছিলাম যে এর একটি অতি সহজ আবেদন আছে। কেন না এটি আমাদের নিত্যদিনের সংসারযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত, এর মধ্যে মানুষের অন্নবস্ত্র বাসস্থান সংস্থানের আশ্বাস আছে। অথচ ঐ সহজ আবেদনে সাড়া দিতেও শতাব্দীকাল লেগে গিয়েছে। এই সূত্রে একটি কথা মনে পড়ছে। এক সময়ে দেশে যখন ম্যালেরিয়ার খুব উপদ্রব তখন বাংলাদেশে অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটি নামে একটি সংস্থা ছিল। উক্ত সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় আমি ম্যালেরিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনেছিলাম। বলছিলেন, অনেক বড় বড় বিষয় আছে, নানা জটিল তত্ত্ব আছে যা আমরা সকলে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে কিন্তু মশার কামড় বোঝে না এমন মানুষ এ দেশে একটিও নেই। কেন না সেটা বুঝবার জন্যে বিদ্যেবুদ্ধি মস্তিষ্কের ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না, গায়ে পিঠে সর্বাঙ্গে সেটা টের পাওয়া যায়। অর্থাৎ বলতে চেয়েছেন, ব্যাপারটা সর্বব্যাপী এবং অতিশয় সহজবোধ্য।

কিন্তু আমি যে বিষয়ে বলতে বসেছি—কবি এবং কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে—সেটি কমিউনিজমে এবং ম্যালেরিয়া এ দু'এর কোনটির মতোই সহজবোধ্য নয়। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে সাহিত্য মানুষের নিত্য দিনের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের সুখ দুঃখের কথা নিয়েই সাহিত্য। কিন্তু সে সুখের কথা শোভাযাত্রার মাধ্যমে উদ্দাম উল্লাসে প্রকাশ পায় না: দুঃখের কথাও মাঠে ময়দানে মাইক্রোফোন যোগে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হয় না।

সাহিত্য মৃদুভাষী, সে চেঁচিয়ে কথা বলে না, রসিয়ে বলে। মানুষের সুখ-দুঃখ সেখানে রসের মধ্য দিয়ে ফিলটার্ড বা পরিস্রুত হয়ে আসে। রস মানুষের অনুভূতিকে তীব্রতর করে, হৃদয়কে স্পর্শ করে। কবিরা বলেন বটে—কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—সেটা কবির পক্ষে সহজ হলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে তত সহজ নয়। কথা কর্ণে যত সহজে প্রবেশ করে মর্মে তত সহজে নয়। মর্মে প্রবেশ করতে হলে কথাকে শুধু শুধু সরব হলেই চলে না, তাকে সরস হতে

হয়। রসের স্বাদ পেতে সময় লাগে। সে স্বভাবতই ধীরগতি, নীরবে পা টিপে টিপে মনের দোরে দাঁড়ায়। এজন্যে তেমন তেমন কবিকেও চিনতে জানতে সময় লেগেছে। অনেক কবিই জীবৎকালে রসগ্রাহী পাঠক পাননি, রসস্রষ্টা হিসাবে স্বীকৃতিও পাননি।

শেক্সপীয়ারকেই বলা চলে এর জলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রাচীনকালের কবি নন, আধুনিক যুগেরই কবি। ষোড়শ শতকের শেষ দশক এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক—এই কুড়ি বাইশ বছরই মোটামুটি তাঁর নাটক রচনাকাল। বাহান্ন বছরের জীবন, অর্ধেকের বেশি কাটিয়েছেন লণ্ডন শহরে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা তার লণ্ডন বাসের ইতিবৃত্ত কিছুই কারো জানা নেই। দু একজন সমব্যবসায়ী যাঁরা তাঁর মতোই নাটক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন তাঁরা বোধকরি ঈর্ষাবশত কখনো শেক্সপীয়ারকে উদ্দেশ করে কিছু বক্রোক্তি করে থাকবেন। ঐ কটি উক্তি বাদ দিলে মহাকবির অস্তিত্ব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য নিদর্শন বড় একটা মেলে না। মৃত্যুর সাত বছর পরে ১৬২৩ সালে শেক্সপীয়ার রচিত সব কটি নাটক এক সঙ্গে প্রকাশিত হল। তখনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বেন জনসন। শেক্সপীয়ার সম্পর্কে একটি বন্দনাগীতি রচনা করে দিয়েছিলেন। সেটি ঐ রচনাবলীর মুখবন্ধরূপে তাতে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। ঐ কবিতাটিতে বেন জনসন বলেছিলেন —এ কবি কোনও এক বিশেষ যুগের কবি নন, তিনি সর্বকালের কবি। ইংলণ্ডে সেই প্রথম শেক্সপীয়ার বন্দনা উচ্চারিত হল। খুব আশ্চর্যের কথা যে বেন জনসন একেবারে গোড়াতেই মোক্ষম কথাটি বলে দিয়েছিলেন। নিজে খুব বড় দরের কবি ছিলেন বলেই এরূপ নির্ভুল মূল্যায়ন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তথাপি ভাবলে অবাক লাগে যে এরূপ স্তুতিবাক্যের পরেও সারা সপ্তদশ শতকে শেক্সপীয়ার সম্পর্কে তেমন উচ্চবাচ্য কিছু শোনা যায় না। মিল্টনের কবিতায় শেক্সপীয়ার-এর উল্লেখ মাত্র আছে, তা এটুকুই তৃপ্তিদায়ক। এর একমাত্র কারণ ইংলণ্ডে তখনো শিক্ষার প্রসার হয়নি। অধিকাংশ লোক তখন নিরক্ষর। শেক্সপীয়ার সম্পর্কে সর্বপ্রথম কৌতূহল দেখা দিল অষ্টাদশ শতকে। শিক্ষার প্রসার সেই সবে শুরু হয়েছে। ঐ কৌতূহল শিক্ষা বিস্তারেরই ফলশ্রুতি বলতে হবে। তবে কৌতূহলের সৃষ্টি যতখানি হয়েছে সমাদর ততখানি হয়নি। শেক্সপীয়ার পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন উনবিংশ শতাব্দীতে। তাহলেই দেখুন মহাকবির প্রতিভাকে জানতে বুঝতে দু শতাব্দীরও বেশি সময় লেগে গিয়েছে। তাই বলে তাঁকে জানার কি আজও শেষ হয়েছে?

শেক্সপীয়ার-এর দৃষ্টান্ত এই কারণে দিচ্ছি যে একজন মহাকবির জীবন এবং

সৃষ্টিকর্মের পর্যালোচনা একটি Voyage of discovery-র ন্যায়। অল্পদিনে এবং অনায়াসে একাজ সম্পন্ন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন জেনারেশন তাঁকে ভিন্ন ভিন্নরূপে আবিষ্কার করে। 'বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নতুন।' কাব্যলক্ষ্মী অনন্তরূপা, তিনি চিরনবীনা। শেক্সপীয়ার-এর ভাষায়—Age can not wither her nor custom stale her infinite variety.' ঐ infinite variety-র দরুনই কাব্যরস পুরোনো হয় না; ভিন্ন ভিন্ন যুগের মানুষ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে বলে নতুন রসের সঞ্চার হয়।

শেক্সপীয়ার-এর তুলনায় তো বটেই, পরবর্তীকালের অনেক খ্যাতনামা কবিদের চাইতেও রবীন্দ্রনাথ অধিকতর ভাগ্যবান। জীবদ্দশাতেই কবিপ্রতিভা দেশে বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে, স্বকর্ণে জয়ধ্বনি শুনেছেন। নিন্দা হয়নি এমন নয়, তবে নিন্দাবাদ যেটুকু হয়েছে, সে তুলনায় সাধুবাদ হয়েছে ঢের বেশি। জীবৎকালে যা পাওয়া যায় সেটা নগদ বিদায়ের মতো সস্তা, স্থায়ী নয়। নগদের অতিরিক্ত কিছু যদি পাওনা থেকে যায় তবে সেটা গিয়ে জমা হবে অনাগত কালের খাতায়। অনাগত কাল যদি সে ঋণ স্বীকার করে নেয় তবেই কীর্তিমানের কৃতিত্ব স্থায়িত্ব লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ ইহলোক ত্যাগ করেছেন এই সেদিন। অনাগত কালে তাঁর যাত্রা এই সবে শুরু। তাহলেও যাত্রা শুভ বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় একবারই খুব ঘটা করে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর পর থেকে প্রতি বৎসর দেশময় মহাসমারোহে রবীন্দ্রজন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগে শুধু শান্তিনিকেতনে ঐ দিনটি পালন করা হত। এখন রবীন্দ্রজন্মোৎসব বঙ্গদেশের অন্যতম বৃহত্তম উৎসব। পৃথিবীর কোন দেশে কোন কবির জন্মদিন একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়নি। এটি বাঙালীর মূল্যবোধের এক মহৎ দৃষ্টান্ত।

অপর একটি শুভ উদ্যমের কথাও বলব। অনেকেই বোধকরি স্বীকার করবেন যে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টিকর্মের মধ্যে তাঁর রচিত সংগীত অন্যতম লিরিক এবং মিউজিক-এর অপূর্ব সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলতেন, তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তিনি রেখে দিয়েছেন তাঁর গানের মধ্যে। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় সে গানের তেমন সমাদর তিনি দেখে যাননি। ক্ষুদ্র একটি রবীন্দ্রানুরাগী সম্প্রদায়-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙালীর সুখে দুঃখে, উৎসবে ব্যসনে, সকল ক্রিয়াকলাপে বর্ষায় বসন্তে ঋতুতে ঋতুতে কত গান লিখে দিয়েছেন। বাঙালী সে গানের মর্ম বোঝেনি—এই নিয়ে তাঁর মনে গভীর দুঃখ ছিল এবং

ঐ দুঃখ নিয়েই তিনি চলে গিয়েছেন। কিন্তু বাঙালী তার দোষস্খালন করেছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই কলকাতায় রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠানটি গীতবিতান স্থাপিত হল। ক্রমে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তন স্থাপিত হয়েছে। এখন অনুরূপ সংগীতালয় কলকাতার বাইরে নানা স্থানে, এমন কি বঙ্গদেশের বাইরেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কবির জীবৎকালে রবীন্দ্রসংগীত নামটাও চালু হয়নি। রেডিওতে 'লাইট মিউজিক' নামে একটি পাঁচমিশালি বিভাগ ছিল। সপ্তাহে দুটি একটি সিটিং-এ লাইট মিউজিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গান শোনানো হত। এখন সেই রেডিওতে সারা দিনমান রবীন্দ্রসংগীত। এ ছাড়া শহরের নানা প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রসংগীতের জলসা, নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান। তাঁর প্রিয়কার্য সাধনেই তাঁর আকাঙ্ক্ষাপূরণ। রবীন্দ্রসংগীতের এই ক্রমবর্ধমান প্রসার রবীন্দ্রনাথের জয়যাত্রার নিঃসংশয় প্রমাণ।

সরকারী উদ্যোগে সারা ভারতবর্ষেই প্রধান প্রধান নগরে রবীন্দ্রভবন স্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্র-জীবন এবং সাহিত্যালোচনা ছাড়াও ঐ ভবন একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে, এই ছিল উদ্দেশ্য। কোথায় কি কাজ হচ্ছে আমি জানি না। এইটুকু জানি যে সরকারী উদ্যমের দম বেশি দিন থাকে না। দম রাখতে হবে সংগীত-সাহিত্য-শিল্পানুরাগী যুব সম্প্রদায়কে। তাঁদের উৎসাহ এবং নিষ্ঠার উপরেই এসব প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা নির্ভর করে। আপাতত এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে নগরে নগরে রবীন্দ্রভবনের প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের জয় ঘোষণা করছে।

এ মুহূর্তে যে জিনিসটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো সেটি হল, আমাদের নিত্য দিনের জীবনে আমাদের দৈনিক সংবাদপত্রে, রেডিওতে, টেলিভিশনে, সভাসমিতিতে নানা পত্রপত্রিকায় কত বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা হয়—দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছেন। কাব্যসাহিত্য বাদ দিয়েও বহু বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষ্য মানা হয়, না হয় তো রবীন্দ্রনাথের দোহাই পাড়া হয়। পত্রপত্রিকার পাতা ওলটালে, রেডিওর কথন ভাষণ শুনলে বোঝা যাবে আমাদের চিন্তাজগৎ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা কতখানি প্রভাবিত। আমাদের দেশে কথা ছিল—কানু ছাড়া কীর্তন নেই, এখন দেখছি রবি ছাড়া রা নেই।

জনকসাধারণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে এঁরা এত বিরাট বহরে তৈরি যে দেশকালের সীমানায় এঁদের সমস্তটা ধরে না। এজন্যে তাঁদের ব্যক্তিত্বের সীমানা দূর দেশে এবং দূর কালে প্রসারিত।

তাঁদের দূরাভিসারী মন এবং ব্যক্তিত্ব ক্রমশ প্রকাশ্য। কোন বিশেষ যুগের এবং কালের নন বলে সমকালীনরা তাঁদের পুরোপুরি বোঝেন না। বুঝবেন পরবর্তী কালের লোকেরা। পরবর্তী শতকে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় স্পষ্টতর এবং বিস্তৃততর হবে। কাছে থেকে দেখলে অনেক ছোট জিনিস বড় হয়ে দেখা দেয়, আবার বড় জিনিসকে ছোট করে দেখা হয়। কালের ব্যবধান থেকে দেখলে ঐ সব অসঙ্গতি দূর হয়ে মানুষটি স্পষ্টতর হয়ে দেখা দেবেন। কবির সঙ্গে পরিচয় যে অধিকতর বিস্তৃত হবে, এ তো স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এখন দেশের শতকরা সত্তরজন মানুষ নিরক্ষর। তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অপরিচিত। আশা করব আগামী পঞ্চাশ বছরে নিরক্ষরতা দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর হবে। রবীন্দ্রনাথ তখন দেশের ঘরে ঘরে স্থান পাবেন। শুধু বাঙালীর ঘরে নয় প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে রবীন্দ্ররচনাবলী সহজলভ্য হবে। শেক্সপীয়ার-এর বেলায় যেমন হয়েছিল, শিক্ষায় দীক্ষায় যোগ্য হলে তবেই সমগ্র জাতি কবিকে যথাযোগ্য সমাদরে গ্রহণ করতে পারে।

অনাগত ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের কি দশা হবে তাই নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আপন শক্তিবলেই বহুকাল তিনি তাঁর আধিপত্য বজায় রাখতে পারবেন। একটু ভাবলেই দেখা যাবে, দেশে আজ যে সব কাজ জোর কদমে চলছে, তার অনেক কিছুর সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায়। ভূমিক্ষয় নিবারণের উদ্দেশে এবং পরিবেশ শোধনের জন্য বৃক্ষ রোপণের আহ্বান সেই কতকাল আগের। আজ দেশময় বনমহোৎসব লেগে গিয়েছে। গ্রামের বহু শিল্প ছোটখাটো কারিগরি ব্যবসা উঠে যাচ্ছিল। কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতী, মুচি সকলকে নিয়ে ঐ সব কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্যে শ্রীনিকেতনে শিল্পভবন স্থাপন করেছিলেন। আজ সরকারী উদ্যমে সেই উজ্জীবন চেষ্টা চলছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই বলে আসছিলেন, শহরে, বন্দরে বক্তৃতার দ্বারা দেশের মুক্তি আসবে না। দেশকে পেতে হবে গ্রামাঞ্চলে, সেখানেই জাতির বাস। রাজনৈতিক নেতারা তখন সে কথায় কর্ণপাত করেননি। আজ নেতৃবৃন্দ বুঝেছেন যে শহরে শুধু মন্ত্রিত্ব, রাজত্ব গ্রামে অর্থাৎ রাজত্ব হাতে পেতে হলে গ্রামে গ্রামে হাত পাততে হবে পেটের জন্য।

এই যে কথা কটির উল্লেখ করলাম, এ সবই অতি সহজে দৃষ্টিগোচর, এমন আরো অনেক কাজের উল্লেখ করা যেতে পারে তিনিই যার পথিকৃৎ এবং যার ফল সুদূরপ্রসারী। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে হিন্দু-মুসলমান ছাত্র

এক ঘরে বাস করেছে, এক রান্নাঘরে খেয়েছে। আজ থেকে সত্তর বাহাত্তর বছর আগে একথা লোকে ভাবতেও পারত না। ঐ সময় থেকেই ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে ক্লাশ করেছে—এদেশে কো-এডুকেশানের শুরু শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে। এ-সব কিছুই বিনাবাধায় বিনা বিরোধে হয়নি। পরে যখন মেয়েদের নৃত্যশিক্ষা এবং নৃত্যানুষ্ঠানের প্রবর্তন হল, তখন সেদিনের আধুনিক ভাবাপন্নরাও তা খুব সুনজরে দেখেননি। দেখা যাচ্ছে অনেকদিন থেকেই তিনি তাঁর সমকালীনদের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর ছিলেন। এ সমস্তই তাঁর কর্মজীবনের কথা—দৃষ্টিগোচর এবং সহজবোধ্য।

কিন্তু কবি মানুষের কর্মজগতের চাইতে চিন্তাজগৎটা ঢের বেশী বিস্তীর্ণ। সেখানে যা ঘটে সেটা চর্মচক্ষে দেখা যায় না, মনশ্চক্ষে দেখতে হয়। মনশ্চক্ষে দেখা বড় সহজ নয়। চিন্তাকে চিন্তার দ্বারাই উপলব্ধি করতে হয়। সে কাজ সকলের সাধ্যে কুলোয় না। রবীন্দ্রনাথ অনেক বিষয়েই আমাদের ভাবিয়েছেন, মনকে জাগাবার চেষ্টা করেছেন। একটি কথার উল্লেখ করছি যা বোঝা খুব কঠিন নয় এবং তার কিছু আমরা চোখের উপরে দেখতেও পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ ধর্মকথা অনেক বলেছেন। —সে সব হল প্রচলিত ধর্মসমূহকে আশ্রয় করে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিতে সত্যের অনুসন্ধান। জীবনের শেষদিকে ধর্মকথা ক্রমে ক্রমে এসেছে। তাই বলে ধর্মে আস্থা হারিয়েছিলেন এমন নয়। লক্ষ্য করছিলেন যে, ধর্ম-বিরোধে দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠছিল। ধর্মবোধের চাইতে নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসটাই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছিল। ধর্মবোধ এবং ধর্মবিশ্বাস এক নয়। দ্বিধাহীন বিশ্বাস অন্ধতার আশ্রয়স্থল। মানুষের ধর্মান্ধতা তাকে পীড়িত করেছে। এজন্যে শেষ জীবনে তিনি নিজেকে কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী বলেই পরিচয় দেননি। ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান; পিতা দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আদি সমাজের সেক্রেটারি ছিলেন দীর্ঘকাল। তথাপি এক সময়ে স্পষ্টত বলেছেন, তিনি ব্রাহ্ম নন, প্রচলিত কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্তই নন। বলেছেন, আমার ধর্ম মানুষের ধর্ম। মানুষের বাইরে আমার কোন দেবতা নেই। এই মানুষের ধর্মই পৃথিবীর উদারতম ধর্ম। সকল মানুষ একই মানব পরিবারভুক্ত, সকলেই আপন, কেউ পর নয়। মানুষে মানুষে আত্মীয়তাবোধই সকল ধর্মের মূল। সকলের ইষ্ট চিন্তাই ধর্ম, অনিষ্ট চিন্তা অধর্ম। মানুষ মানুষের মতো ব্যবহার করবে, এই মানুষের ধর্ম। মানুষ যদি স্বধর্ম পালন করে তাহলেই মানুষের ধর্ম পালন করা হয়। আমরা সেই ধর্ম পালন না করে হিন্দুধর্ম মুসলমান ধর্ম শিখধর্ম পালন করছি। তার ফলটা তো চোখের সামনেই

দেখতে পাচ্ছেন।

দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে বিরোধ পৃথিবীর শান্তি এবং মানুষের সভ্যতাকে বিপন্ন করছে—একথা তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ক্রমাগত বলে আসছিলেন। আজকের এই অশান্ত পৃথিবীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দূরপ্রসারী দৃষ্টিতে সত্তর বছর পূর্বেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অনাগত কালকে তিনি বেশ খানিকটা আঁচ করে নিয়েছিলেন। কাজেই ভবিষ্যৎকালে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ খুব একটা অপ্রস্তুত বোধ করবেন বলে মনে হয় না। তাঁর চিন্তা যেখানে গিয়ে পৌঁচেছে, সেখানে পৌঁছোতে মানুষের আরো দু-চার শতাব্দী লেগে যাবে। বিংশ শতকের জ্ঞান-বিজ্ঞান ষোড়শ শতকের শেক্সপীয়ারকে সেকেলে বলে উপেক্ষা করতে পারেনি, একবিংশ শতকের প্রযুক্তিবিদ্যাও রবীন্দ্রনাথকে বরবাদ করতে পারবে না। মনে পড়ছে বৎসরকাল পূর্বে জাতি-সঙ্ঘের মহাসচিব দ্য কুইলার তাঁর একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করে—'যেথা গৃহের প্রাচীর/আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী / বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি'—বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সেই আকাঙ্ক্ষিত পৃথিবী এখনো আমাদের নাগালের বাইরে—বহু বহু দূরে।

কাজেই দুর্ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নয়, দুর্ভাবনা এই আমাদেরকে নিয়ে। আমাদের বলতে বাঙালীদের কথা বলছি। বাঙালী চতুর জাতি; কিন্তু বলতে বাধা নেই, আমাদের স্বভাবে চাতুর্য যতখানি, চাতুরী তার চাইতে বেশি। এটি ইদানীংকালের পলিটিক্সের দান। আজকের বাঙালী জীবন পলিটিক্স জর্জরিত। পলিটিক্স সব দেশেই আছে কিন্তু এমন সর্বগ্রাসী (সর্বনাশীও বলতে পারেন) পলিটিক্স আর কোথাও নেই। কিন্তু পলিটিক্সের এই ডামাডোলের মধ্যে যে এত ঘটা করে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করা হয়, তা দেখে একটু অদ্ভুত ঠেকে। মনে সন্দেহ হয়, এটা একটা লোক-দেখানো ব্যাপার নয় তো? এক সময়ে রবীন্দ্র-সান্নিধ্য বাঙালী সমাজে একটা Status Symbol হয়ে দাঁড়িয়েছিল; এখন আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথকে একটি Cultural Cloak হিসাবে ব্যবহার করছেন। না তো! এ সন্দেহটা গত বছরটিতে বিশেষভাবে মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ১২৫ বছর পুর্তিকে উপলক্ষ্য করে কংগ্রেস এবং লেফট ফ্রন্ট উভয়পক্ষ রবীন্দ্র-ভক্তি প্রকাশে যে দ্বৈরথে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সেটি যে সদ্য সমাপ্ত ইলেকশানকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছিল, তা অনেকেই বুঝেছেন এবং কৌতুকটি উপভোগ করেছেন। ১২৫ বছর পুর্তির যে বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই, নেতৃবৃন্দ সেটা খুব ভালো করেই জানেন এবং বোঝেন। তথাপি

জনগণের মন ভজাবার জন্যে জননেতাদের লোকদেখানো অনেক কিছু করতে হয়। রাজনৈতিক নেতারা সকলেই চতুরানন, চার দিক সামলিয়ে কথা বলেন, কাজ করেন।

এবারে শেষ কথাটি বলি। একবিংশ শতকের মানুষকে রবীন্দ্রনাথ কতখানি কী দিতে পারবেন, এ প্রশ্নটা আজ যেমন অনেকের মনে এসেছে, তেমনি আরেকটি প্রশ্নও খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে জেগেছে। প্রশ্নটি হল, একবিংশ শতকের বাঙালী কী রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কিছু নিতে পারবে? দেওয়াটা যেমন শক্তির পরীক্ষা, নেওয়াটাও তেমনি শক্তির পরীক্ষা। খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের পূর্বগামীদের তুলনায় মস্তিষ্কের ক্ষমতায় এবং চরিত্র মহিমায় আমরা আজকের বাঙালীরা নিঃসন্দেহে হীনবল। রুচি বোধে এবং শুভবুদ্ধিতে আমরা তাঁদের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরে। আগেই বলেছি একবিংশ শতকের মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথ অপ্রস্তুত হবেন না; কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সুমুখে আমাদের বাঙালী সন্তানরাই না অপ্রতিভ এবং অপ্রস্তুত বোধ করে।

সাহিত্য প্রসঙ্গে

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মধুসূদন যখন বলেছিলেন—'রচিব মধুচক্র,' তখন তিনি একক ভাবে আপন প্রয়াস, আপন সাধনা এবং আপন প্রতিভাবলেই মধুচক্র রচনার কথা ভেবেছিলেন। অথচ সাধারণ ভাবে আমরা সকলেই জানি যে, একটি মাত্র মক্ষিকা দ্বারা মৌচাক রচনা সম্ভব নয়। বহু মক্ষিকা মিলে মধু সংগ্রহ করলে তবেই মৌচাকটি পূর্ণ হয়। অনেকেই অবশ্য জানেন যে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও মধুসূদনের উক্তিটি উল্লেখ করে বলেছিলেন, সাহিত্যের মধুচক্রটি বড় নির্জন, সেখানে একটিমাত্র মক্ষিকার আনাগোনা। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলতে চেয়েছেন যে, দল বেঁধে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। সেটি শুধু একলার সাধনাতেই সম্ভব।

কাব্য-সাহিত্য তো বটেই, যে-কোন সৃষ্টিমূলক কাজই যে একান্তভাবে স্রষ্টার নিজস্ব প্রতিভাজাত এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু মৌচাকের মধু যেমন আপনি এসে সঞ্চিত হয় না, তাকে ফুলে ফুলে আহরণ করতে হয়, তেমনি শিল্প-সাহিত্যের বেলায়ও প্রত্যক্ষভাবে সৃজনকার্যে না হলেও সঞ্চয়নকার্যে অপরের সাহায্য সাহিত্য শিল্পীরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেক সময়েই গ্রহণ করে থাকেন। আসল কথা, সাহিত্যিকের মনটিই একটি মৌচাক। যাঁদের নিত্য সাহচর্যে তিনি বাস করেন, যাঁদের সঙ্গে তাঁর রসালাপ, ভাবের আদানপ্রদান, এমন কি যাঁদের সঙ্গে নিতান্ত হাসি-মস্করা, গল্প গুজবের সম্পর্ক তাঁরাও সকলেই ঐ মৌচাকটিতে মধুর যোগান দিচ্ছেন। মৌচাকের মালিকটিরও খেয়াল থাকে না, মক্ষিকাদের তো থাকেই না কিন্তু মধুটুকু ঠিক জায়গায় গিয়ে সঞ্চিত হয় এবং ভবিষ্যতে একদিন সাহিত্যের ভোজে লেগে যায়। এছাড়া সৃষ্টিকার্যে প্রেরণা বলে একটা জিনিস আছে। সেটা সবসময় যে উর্ণনাভের উর্ণার মত একটা আত্মজ বা স্বয়ংসৃষ্ট বস্তু এমন নয়। অনেক সময় প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করেন অপর কোন মানুষ। সে মানুষ সাহিত্যিক হলে তো কথাই নেই, না হলেও কোনো ক্ষতি নেই। সাহিত্যের সমজদার হলেই হল।

নির্জন সাধনার কথা রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন না কেন, সঙ্গ-সাহচর্য উৎসাহ উদ্দীপনা যে কতখানি প্রেরণা যোগায় তা রবীন্দ্রনাথ যেমন জানেন এমন আর কে? ভাগ্যক্রমে কবিজীবনের সূচনা থেকেই এ জিনিসটি তিনি প্রচুর পরিমাণে

পেয়েছেন। এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, কাব্যের স্বভাবটা লাজুক, একটু মুখ-চোরা ভাব আছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রচার-লোভী। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"গুণদাদা আমার ভাবগতিক দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেন যে, আমার পকেটের মধ্যে একটা খাতা লুকানো আছে। একটুখানি প্রশ্রয় পাইবামাত্র খাতাটি তাহার আবরণ হইতে নির্লজ্জভাবে বাহির হইয়া আসিত।" বালক কবির সবচাইতে বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দাদা সোমেন্দ্রনাথ। কাছারি বাড়িতে প্রবেশ করে সোমেন্দ্রনাথ সকলকে ডেকে বলতেন, শুনুন, শুনুন, রবি একটি কবিতা লিখেছে। কবিত্ব ঘোষণার এরূপ উৎপাত কাছারি বাড়িতে প্রায়ই ঘটত। এ সব ছেড়ে দিলেও কবিজীবনের প্রারম্ভে প্রকৃত প্রেরণা যুগিয়েছেন নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবী। জীবনস্মৃতিতে তাঁকেই বলেছেন সাহিত্যের সঙ্গী। তাঁর সঙ্গেই কাব্যালোচনা, তাঁর জন্যেই কাব্য রচনা। গোড়ার দিকের পাঁচখানা কাব্যগ্রন্থ তাঁকেই উৎসর্গ করা। মধুচক্র এ যাবৎ নির্জনই বলা যেতে পারে, তা হলেও কাদম্বরী দেবী সে মধুচক্রের মক্ষিরানী। নতুন বউঠানের মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম পর্ব সমাপ্ত। ক্রমে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, গুণগ্রাহীর সংখ্যা বেড়েছে, কবিকে ঘিরে প্রকৃত রসিকজনের একটি রসচক্র গড়ে উঠেছে। এঁরা হলেন প্রিয়নাথ সেন, মোহিত সেন, লোকেন পালিত, প্রমথ চৌধুরী, জগদীশ বসু, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ। এঁরা ছিলেন তাঁর নিত্য প্রেরণার উৎস। প্রিয়নাথ সেন সম্পর্কে কবি যা বলেছেন তাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। বলেছেন, "তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত···তাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো অমার কাব্য রচনার বিকাশ চেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল।"

প্রিয়নাথ সেন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সকল কবির গুণগ্রাহীদের সম্পর্কেই তা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বসে লিখেছেন কিন্তু বড় কিছু লেখা হলেই কলকাতায় ছুটে এসেছেন, বন্ধুদের শোনাবার জন্যে। মধুলোভেই ছুটে এসেছেন, কারণ এরূপ একটি আড্ডাচক্রকে মধুচক্র বলতে কোনই বাধা নেই। আসল কথ', কাব্য জিনিসটা সৃষ্টির মুহূর্তেই বিজন কিন্তু আগে পরে সজন। সজন অর্থাৎ স্বজন-পরিবৃত। সমধর্মী সহমর্মী অর্থে স্বজন—ইংরেজীতে যাকে বলে Kindred Spirits.

কবি সাহিত্যিক মাত্রেরই আড্ডার প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। অনেকেই বোধ করি জানেন না যে, রবীন্দ্রনাথ একজন মস্ত বড় আড্ডাধারী ব্যক্তি ছিলেন। জোড়াসাঁকো বাড়িটিই ছিল একটি সুবৃহৎ আড্ডা। গান-বাজনা, অভিনয়, সাহিত্যালোচনা তাঁদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তর্গত ছিল। পরে যখন খামখেয়ালী সভার প্রতিষ্ঠা হয় তখন পরিবারের বন্ধুবর্গও এসে যোগ দিলেন। খামখেয়ালীর বৈঠক বেশির ভাগ জোড়াসাঁকো বাড়িতেই বসত, মাঝে মাঝে অন্যান্য সভ্যরাও নিজ নিজ বাড়িতে সভা ডাকতেন। বহিরাগত সভ্যদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সাহিত্যিক কিংবা সাহিত্যরসিক—প্রধানদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে—চিত্তরঞ্জন দাশ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, মনমোহন ঘোষ, মহিমচন্দ্র বর্মা প্রভৃতি। প্রত্যেক বৈঠকেই গল্প কবিতাদি পাঠ হত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ক্ষুধিত পাষাণ', ইত্যাদি গল্প খামখেয়ালীর বৈঠকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকটিও খাম-খেয়ালীতে পড়ে শোনানো হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির কনিষ্ঠদের মধ্যে—বলেন্দ্র-নাথ, সুধীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাঁরা সাহিত্য রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের উপরে এই খামখেয়ালী সভার প্রভাব বিশেষভাবে ক্রিয়া করেছে, কারণ এঁরা তার বিশেষ উৎসাহী সভ্য ছিলেন। এর বেশ কিছুদিন পরে বিচিত্রা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। এখানে সংগীত, সাহিত্য, চিত্র—তিনটি শিল্পেরই সমান সমাদর ছিল। অধিবেশন বসত জোড়াসাঁকোর লাল বাড়িতে। গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্রের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনার ভার ছিল কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপরে। প্রত্যেক অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথ কিছু না কিছু লেখা পাঠ করে শোনাতেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক অধিবেশনে যোগদান করতেন। বলা আবশ্যক যে, এই বিচিত্রা ক্লাব-এর সঙ্গে বিশ্বভারতীর একটি গৌণ সম্পর্ক আছে। বিচিত্রার উদ্যোগে জোড়াসাঁকোয় একটি চিত্রবিদ্যা শিক্ষার ক্লাস খোলা হয়েছিল। শেখাতেন অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর। প্রথম যিনি ছাত্রী হিসাবে ভরতি হলেন তিনি রথীন্দ্রনাথের পত্নী প্রতিমা দেবী; বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকরা একে একে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন। বিচিত্রার কলাভবন কার্যত শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত হল। বিচিত্রার উদ্যোগে বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চল থেকে কারুশিল্পের নানা নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছিল; সে-সব এখন বিশ্বভারতী কলাভবনে স্থান পেল। বিচিত্রার প্রধান উদ্যোক্তা রথীন্দ্রনাথও অবশেষে শান্তিনিকেতনে এসে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব

পদে অধিষ্ঠিত হলেন। বিচিত্রার আড্ডা ভেঙে গেল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিচিত্রার প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন আচার্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা দিবসেও পৌরোহিত্য করেছেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ। বিচিত্রার আড্ডা যতদিন স্থায়ী ছিল কলকাতার জ্ঞানী-গুণী সমাজের অনেকেই তার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর নানা দেশের জ্ঞানী-গুণীকে শান্তিনিকেতনের আড্ডায় এনে জড়ো করেছিলেন।

খামখেয়ালী সভা এবং বিচিত্রা ক্লাবে বহিরাগতদের আনাগোনা থাকলেও এর মধ্যে একটা ঘরোয়া ভাব ছিল। একে ঠিক মুক্ত-দ্বার বা পাবলিক ক্লাব বলা চলে না। ইয়ুরোপীয় প্রথামত ক্লাব লাইফ তখনও আমাদের সমাজে চালু হয় নি। পারিবারিক বেষ্টনী ছাড়িয়ে দিশী মতে রুচিপূর্ণ আবহাওয়ায় পাবলিক ক্লাব স্থাপনের চেষ্টা সে যুগে যাঁরা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে সংগীত সমাজ নামে একটি মিলনকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল—বলা বাহুল্য, এ-সব বিচিত্রা ক্লাবের ঢের আগের কথা। সংগীত-সমাজের বৈঠক বসত কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট-এ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সন্নিকটস্থ কোন গৃহে। গান, বাজনা এবং নাটক অভিনয়ই ছিল সংগীত-সমাজের প্রধান কর্মকাণ্ড। 'গোড়ায় গলদ' নাটকখানা এঁদের জন্যেই লেখা হয়েছিল এবং এঁরাই প্রথম এটি অভিনয় করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বা-বধানেই নাটকের রিহার্সেল হত। মহড়া শেষ করে বাড়ি ফিরতে রোজই রাত বারোটা একটা বেজে যেত। এই সূত্রেই বন্ধুদের কাছে রসিকতা করে বলেছিলেন, রোজ বাড়ি ফিরে দেখি ভাত ঠাণ্ডা, গিন্নী গরম। পরে এটি সংগীত সমাজের একটি স্থায়ী রসিকতায় দাঁড়িয়েছিল।

এত কথার পর সন্দেহ থাকে না যে, রবীন্দ্রনাথ মানুষটি ছিলেন আড্ডাপ্রিয়। সৃজনধর্মী মানুষ মাত্রই আড্ডাধর্মী। মননক্রিয়াকে সজীব এবং সচল রাখতে হলে সমধর্মী মানুষের সঙ্গে সংযোগ চাই। রাজনীতিতে যেমন গণসংযোগ, সাহিত্যে তেমনি গুণীসংযোগ। এজন্যে সকল দেশের সকল সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজলেই সাহিত্যিক আড্ডার সন্ধান মেলে। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সকলেরই অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। ইংরেজ চরিত্র আমরা যতটুকু দেখেছি তাতে ওদের খুব একটা মিশুকে স্বভাবের বা আড্ডা-বিলাসী বলে মনে হয় নি। কিন্তু ইংরেজ সাহিত্যিকরা এর ব্যতিক্রম। এঁরা প্রচুর পরিমাণে আড্ডা দিয়েছেন, অর্থাৎ এরা ইংরেজ ধর্ম পালন না করে সাহিত্যের ধর্ম পালন করেছেন। ইংরেজী

সাহিত্যের ইতিহাসে কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডা একটি অতি চিত্তাকর্ষক অধ্যায়। অতি প্রাচীন দিনের কথা বলতে পারিনে, কিন্তু এলিজাবেথ-এর যুগ থেকেই দেখা যায় আড্ডা দিব্যি জমে উঠেছে। শেক্সপীয়ার, বেন জনসন এবং তাঁদের সমগোত্রীয়রা—'other choice spirits of the age', আড্ডা জমিয়েছেন Mermaid Tavern-এ। কীট্‌স্‌-এর কবিতায় মারমেড ট্যাভার্ন অমর হয়ে আছে। বলেছেন, মর্ত্যধাম ছেড়ে স্বর্গধাম গিয়ে তোমরা কি এর চাইতে লোভনীয় স্থান খুঁজে পেয়েছ? নন্দনকানন কি এতখানি আনন্দ দিতে পারছে? মারমেড ট্যাভার্ন যে পানীয় পরিবেশন করেছে স্বর্গের অমৃত কি সে তৃপ্তি দিতে পেরেছে? অষ্টাদশ শতকে ডক্টর জনসনকে ঘিরে লণ্ডনে যে আড্ডা জমে উঠেছিল সে যে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসেই স্মরণীয় এমন নয়, সমগ্র ইংরেজ জাতির ইতিহাসেই স্মরণীয় ঘটনা। সে যুগের ইংলণ্ডে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরাই ছিলেন খ্যাতনামা তাঁরা সকলেই সে আড্ডায় এসে জুটেছিলেন—প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ এডমাণ্ড বার্ক, শিল্পীশ্রেষ্ঠ স্যার জস্থয়া রেনলডস্‌, কবি গোল্ডস্মিথ, শেক্সপীয়ার, অভিনেতা গ্যারিক এবং আরো অনেকে। তাঁর আড্ডার চেয়ারটিতে বসে তিনি ইংলণ্ডের সমগ্র জীবনটিকে মন্থন করেছেন। দেশে এমন কিছু ঘটেনি যার সম্বন্ধে তিনি তাঁর স্থচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন নি, এমন কোন চিন্তা জাতির জীবনকে আন্দোলিত করেনি যার সঙ্গে ডক্টর জনসন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। আড্ডায় বসে নানাবিধ আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব মতামত ব্যক্ত করেছেন বসওয়েল-এর কল্যাণে তাও সাহিত্যে সামগ্রী হয়ে রয়েছে। 'র‍্যামলার' এবং 'আইডলার' নামে দুটি প্রবন্ধ সাময়িকী তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। সে পত্রিকার লেখক তিনি একক। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, দুটি নামই আড্ডাগন্ধী। আড্ডায় বসে যেমন সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে আলোচনা হত, এ সব প্রবন্ধাবলীতেও তাই। সে যুগের নাগরিক জীবনের উপরে এ-সব প্রবন্ধ প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ইংরেজীতে Blue stocking বলে একটা কথা আছে। সাধারণত ব্লু স্টকিং বলতে আমরা বুঝি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহিলা—বিশেষ করে যাঁদের একটু সাহিত্য-ভিমান আছে, অর্থাৎ যাঁরা নিজেদের সাহিত্যানুরাগী বলে পরিচয় দেন। এ কথাটিরও উদ্ভব হয়েছে অষ্টাদশ শতকে। লণ্ডনের একদল শিক্ষিতা মহিলা এক জায়গায় মিলিত হয়ে কাব্যসাহিত্যের আলোচনা করতেন। সে যুগের বিদুষী মহিলা মিসেস মণ্টেগুর গৃহে বেশিরভাগ সময়ে তাঁদের আড্ডা বসত। সে

আড্ডায় পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না; তাঁরাও যোগদান করতেন। এঁরা সকলেই নীল রঙ-এর মোজা পরতেন। তাই থেকে আড্ডাটির নাম হয়েছিল —'ব্লু স্টকিং ক্লাব'।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, সাদে—এই তিন কবি লেক-পয়েট্স্ নামে খ্যাত। একসময় এঁরা তিনজনে ইংলণ্ডের লেক অঞ্চলে বাস করতেন। পরস্পর কাছাকাছি থেকে আলাপ-আলোচনায় মত বিনিময় এবং কাব্য রচনা চলত। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ—দু'জনের যেমন অনেক বিষয়ে মতের মিল ছিল তেমনি আবার অমিলও ছিল প্রচুর। দু'জনের কাব্যরচনার ধারা দুই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত অথচ দু'জনেই একে অন্যের গুণগ্রাহী এবং একজন অপরজনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত।. দু'জনের মিলিত প্রয়াসে ক্ষীণ কলেবর যে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল তারই উদ্দীপনায় ইংলণ্ডের কাব্য-জগতে এক বিপ্লব ঘটে গেল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ যখন লণ্ডনে থাকতেন তখন সেখানেও তাঁদের ঘিরে আড্ডা জমে উঠত। সে আড্ডার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন চার্লস ল্যাম এবং হ্যাজলিট।

আমাদের এই ব্যস্তসমস্ত যুগেও সাহিত্যিকদের আড্ডায় ভাঁটা পড়ে নি। গত শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বর্তমান শতাব্দীতে ইংলণ্ডের দুটি সাহিত্যিক আড্ডা—রাইমার্স ক্লাব এবং ব্লুম্স্বারী গ্রুপ—সাহিত্যজগতে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা এবং চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করেছিল। লণ্ডনের ফ্লীট স্ট্রীট অঞ্চলে চেশায়ার চীজ্ নামে একটি রেস্তরাঁ আছে। এটি একটি অতি পুরাতন আড্ডাস্থল। দেখা যায় এলিজাবেথ-এর যুগেও এটির অস্তিত্ব ছিল, বেন জনসন্-এর নাম এর সঙ্গে জড়িত। তিনি মাঝে মাঝে এখানে এসে খানাপিনা করতেন। আড্ডা এখানে বরাবরই চলে এসেছে। মাঝে একবার প্রাচীন জীর্ণ গৃহটির সংস্কারসাধন করতে হয়েছে। ডাবলিয়ু, বি. ইয়েটস্ এবং আর্নেস্ট রীজ্—দুই বন্ধুতে মিলে চেশায়ার চীজ্-এ একটি আড্ডার পত্তন করলেন। উৎসাহী সভ্যদের মধ্যে লায়নেল জনসন্, আর্নস্ট ডাওসন, জন ডেভিডসন, আর্থার সাইমনস্ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ উৎসাহীরা প্রতি সন্ধ্যাতেই মিলিত হতেন, বাকীরা মাঝে মাঝে। কখনো সখনো কোনো সভ্যের গৃহে যখন মিলিত হয়েছেন তখন ওসকার ওয়াইল্ডও এসে যোগ দিয়েছেন। তিনি রাইমার্স ক্লাব-এর নিয়মিত সভ্য ছিলেন না। রাইমার্স ক্লাব বলতে গেলে কবি সম্মেলন, নামেই তার প্রমাণ। সেদিক থেকে ব্লুমস্বারী গ্রুপ ছিল মুক্ত অঙ্গন, এটিকে বলা যেতে পারে গুণী সম্মেলন। কবি-

সাহিত্যিক-শিল্পী বিজ্ঞানী সকল ক্ষেত্রের খ্যাতনামারাই সেখানে মিলিত হতেন। সংখ্যায় অবশ্য সাহিত্যিকদেরই প্রাধান্য ছিল। প্রধানদের মধ্যে ছিলেন ই. এম. ফরস্টার, লিটন স্ট্র্যাচি, ক্লাইভ বেল, বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌ কীন্‌স, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এবং তাঁর স্বামী লেনার্ড উল্‌ফ। এ ছাড়া বারট্রাণ্ড রাসেল, অলডাস হাক্সলি এবং টি. এস. এলিয়টও মাঝে মাঝে এঁদের আড্ডায় যোগদান করেছেন।

ইংরেজদের চাইতে ফরাসীরা আড্ডাচর্চায় অধিকতর পারদর্শী বলে আমার ধারণা। তবে ফরাসী সাহিত্যিকদের আড্ডার বৃত্তান্ত খুব একটা আমার জানা নেই। অবশ্য সাহিত্যের ছাত্ররা সকলেই জানেন যে, কবি মালার্মের গৃহে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি জমাট আড্ডা বসত। এও আজ প্রায় শতবর্ষ পূর্বের কথা—গত শতাব্দীর '৮০-র দশকে শুরু হয়ে বেশ কিছুকাল চলেছিল। নিয়মিতভাবে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আঁদ্রে জীদ, পল ক্লদেল এবং পল ভালেরী। এ ছাড়া সিম্বলিস্ট কবিদের মধ্যে গুস্তাভ কান্‌ সমেত আরো কয়েকজন নিয়মিত আসতেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মালার্মের 'টিউজডে ইভনিংস'-এর অনুকরণে একসময়ে ইয়েটস্‌ লণ্ডনে 'মানডে ইভনিংস' নাম দিয়ে একটি আড্ডা বসিয়েছিলেন। সরোজিনী নাইডু ইংলণ্ডে বাসকালে এ আড্ডায় মাঝে মাঝে গিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইয়েটস্‌ তাঁর স্মৃতিকথায় তাঁকে 'লিটল সরোজিনী অব হায়দরাবাদ' বলে উল্লেখ করেছেন।

সরোজিনী নাইডুর নামটি উল্লেখ করা মাত্র খেয়াল হল যে, আড্ডার খোঁজে কখন আমি দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছি। বাংলা দেশে থাকতে আড্ডার জন্য অন্যত্র যাবার প্রয়োজন কি? আড্ডার ব্যাপারে পৃথিবীর অন্য কোন জাতি বাঙালীর সমকক্ষ বলে আমি মনে করি না। আর সাহিত্যের আড্ডার কথাই যদি বলেন তাতেও বাঙালী কারো তুলনায় পিছিয়ে নেই।

ইংরেজীয়ানার যুগ ছিল বলে মধুসূদন তাঁর সাহিত্যসাধনায় সঙ্গী সাথী তেমন পান নি। তাঁর মধুচক্রে মক্ষিকা বলতে তিনি ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু অনতিকাল পরে বঙ্কিমের যুগেই দেখা যায় সাহিত্যের অঙ্গনে ভিড় জমতে শুরু করেছে! বঙ্কিমের কাঁঠালপাড়ার বাড়িতেই মাঝে মাঝে বড় রকমের আড্ডা বসত। সে আড্ডার প্রাণপুরুষ ছিলেন সঞ্জীববাবু; তিনি মজলিসী স্বভাবের মানুষ ছিলেন। যৌবনকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সে মজলিসে যাতায়াত ছিল। সাহিত্যকে তখনও কেউ পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন নি, নেশা হিসাবেই নিয়েছেন। নেশা যে জিনিসেরই হোক, একা একা ঠিক জমে

না। নেশাখোরদের সঙ্গী চাই, চেলা চাই, দল চাই। ক্রমে এখানে ওখানে দল বা আড্ডা গড়ে উঠতে লাগল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে কোন সাহিত্যপত্রিকাকে ঘিরে এ সব আড্ডা গড়ে উঠেছে। বাস্তবিক পক্ষে সাহিত্যিক আড্ডা বলতে যা বোঝায় এদেশে তার জন্ম ভারতী পত্রিকাকে ঘিরে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে অনেক হাত ঘুরে ভারতী এল অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্ক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে। অল্প দিনের মধ্যেই মণিলালকে ঘিরে জমে উঠল তাঁর কান্তিক প্রেসে এক জমাট আড্ডা। এ আড্ডার প্রধান প্রধান পাণ্ডারা ছিলেন সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু রায় (আর্টিস্ট), অমল হোম, সৌরীন মুখার্জি (অন্যতম সম্পাদক), হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি। পুরোনো দিনের প্রবাসীর সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাঁদের স্মরণ থাকতে পারে যে, প্রবাসীতে বেতালের বৈঠক নামে একটি বিভাগ ছিল ; উপরে একটি ছবি থাকত—জনকয়েক ব্যক্তি বসে আড্ডা দিচ্ছেন। একটু অনুধাবন করে দেখলে আড্ডাধারীদের চেনাও যেত। ছবিটি এঁকে দিয়েছিলেন ভারতী আড্ডার আর্টিস্ট চারু রায়। ফলে ভারতীর বৈঠকটিই প্রবাসীর পাতায় বেতালের বৈঠক হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভারতী একদিন উঠে গেল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সত্যেন দত্ত উভয়েরই অকাল মৃত্যুতে আড্ডাও গেল ভেঙে। ইতিপূর্বে সবুজ পত্রের জন্ম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথই প্রধান সহায়, সত্যেন দত্তও আছেন উৎসাহী সভ্য হিসাবে। তা হলেও প্রমথ চৌধুরী কিছু নতুন প্রতিভা আবিষ্কার করেছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুলেখক সুপণ্ডিত অতুল গুপ্ত, নবীন যুবক প্রতিভাধর সত্যেন বসু এবং বহু অধ্যয়নে সমৃদ্ধ ধূর্জটি মুখোপাধ্যায়। ওমর খৈয়ামও-এর অনুবাদক কান্তি ঘোষকেও তিনি পাঠক সমাজে পরিচিত করিয়েছিলেন। আর ছিলেন হারীতকৃষ্ণ দেব। কিরণশঙ্কর রায়কে যাঁরা কেবল রাজনৈতিক নেতা হিসাবেই জানেন তাঁরা শুনে অবাক হবেন যে, এক সময় তিনি সবুজ পত্রের বৈঠকে একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন, গল্প লিখতেন। তাঁর একটি গল্পগ্রন্থ পরে প্রকাশিত হয়েছিল। সকলেই জানেন স্বয়ং ইন্দিরা দেবী সবুজপত্র লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

সাহিত্যের আসরে লোক সমাগম শুরু হয়েছে কিন্তু আসর তখনো সরগরম হয় নি। সবুজ পত্রের দল মনে-প্রাণে সবুজ এবং সজীব হলেও তাঁরা বয়সে অপেক্ষাকৃত পরিণত, বুদ্ধিতে শাণিত, বাক্যে সংযত। এজন্তে তাঁরা দলে তেমন ভারী হতে পারেন নি। সবুজ পত্রের পরে তাঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন তাঁরা বয়সে নিতান্তই নবীন—অধিকাংশই কুড়ির কোঠায়। এঁরা সব জমায়েত

হলেন কল্লোল, কালি কলম-এর আসরে। নবীনের স্বভাবে উত্তাপ উত্তেজনা একটু বেশিই থাকে। এঁরা যখন সরবে সদর্পে যৌবন ঘোষণা করেছেন সেদিনের প্রবীণেরা অনেকেই তখন হেসেছেন। নবীনকে যৌবনকে সহজে আমরা মেনে নিই না। কিন্তু যৌবনের শক্তি মানা না-মানার ধার ধারে না, নিজের জয়ধ্বনি নিজেই করতে থাকে। কাজেই কল্লোলের কলরোল সেদিনের অন্য সব সাহিত্যিক কণ্ঠকে ছাপিয়ে উঠল। আতিশয্য অবশ্যই ছিল ; কিন্তু এ-কথা মানতেই হবে যে, কল্লোল একটা প্রচণ্ড শক্তিকে release করে দিয়েছিলেন। সে শক্তি সেদিনের পাঠকসমাজে ছিল অচেনা, অজানা। লেখকেরা প্রায় সকলেই অজ্ঞাতকুলশীল ; তখনকার পরিচিত প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকায় সহজে এঁদের ঠাঁই হত না, বহুদিন বহির্দ্বারে অপেক্ষা করতে হত। কল্লোল সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ এবং তাঁর সহযোগীরাও সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা নেই। এর প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে চল্লিশের দশকে দেখা গেল তখন যাঁরা আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁরা অধিকাংশই কল্লোল ঘরানার লেখক। তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, নজরুল, প্রেমেন মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, মনীশ ঘটক—এঁরা সকলেই কল্লোল গোষ্ঠীভুক্ত। অমিট রায়ে একটি মাত্র নিবারণ চক্রবর্তী[কে] লোকসমক্ষে এনে হাজির করেছিলেন। দীনেশ-রঞ্জন বহু প্রতিভাকে পাঠকসমাজে পরিচিত করেছেন এবং কেউ নিবারণ চক্রবর্তীর ন্যায় অলীক নয়। প্রকৃতপক্ষে দীনেশরঞ্জনের ন্যায় সম্পাদককেই বলা চলে অনাগত বিধাতা, তাঁর মুখেই শোভা পায়—আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে/পরিচিত জনতার সরণীতে। এ যাবৎ যত আড্ডা জমেছে তার মধ্যে কল্লোলের আড্ডাটিই ছিল সর্ববৃহৎ। সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে এঁরা সত্যি সত্যি প্রাণ ভরে আড্ডা দিয়েছেন। হইচই করেছেন, অপরপক্ষে লোকগঞ্জনা সয়েছেন ; কিন্তু আনন্দে ছিলেন, সে আনন্দই সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে। আগেই বলেছি, আতিশয্য ছিল। তাতে কিছু এসে যায় না, যা ঝরবার তা আপনি ঝরে যায়, যা খাঁটি সেটুকুই টিঁকে থাকে। আজ পর্যন্ত যা টিঁকে আছে তারও পরিমাণ—কিছু কম নয়।

ঐ যে আতিশয্য বলেছি তারই জন্যে একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। বিষয়বস্তু তো বটেই, লেখার ঠাটঠমকও অনেকের পছন্দ হয়নি। এঁরা কয়েকজন মিলে শনিবারের চিঠি নামে একটি ক্ষুদ্রকায় পত্রিকা প্রকাশ করলেন। তাতে রঙ্গব্যঙ্গ করে নব্য লেখকদের লেখা নিয়ে নানা মন্তব্য করা হত। লেখার ধার

ছিল, শনিবারের চিঠিও জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ওদিকে কল্লোল-এর কলরব যত বাড়তে লাগল শনিবারের চিঠির কলেবর সে পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। শনি-মণ্ডলের প্রধান ছিলেন সজনীকান্ত দাস। সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন যোগানন্দ দাশ, অশোক চট্টোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি, প্রায় সকলেই ছদ্মনামে লিখতেন। কিছুকাল পরে এসেছেন প্রমথনাথ বিশী। বনফুল দূরে থেকেও এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বেশ বড় রকমের একটি আড্ডা জমে উঠেছিল। আড্ডাধারীরা কেবল যে সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের নিয়ে রঙ্গরসিকতাই করতেন এমন নয়, এঁদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই সুসাহিত্যিক ছিলেন। লোকে বলে কাকে কাকের মাংস খায় না; কিন্তু সাহিত্যিকরা একে অন্যকে ছিঁড়ে খেতে পারেন। দুই বিরুদ্ধ শিবিরে সাহিত্যিক লড়াই খুব জমে উঠল। এতে ক্ষতি কিছুই হয়নি—কল্লোল গোষ্ঠীও তাঁদের স্বধর্ম ত্যাগ করেননি, শনিবারের চিঠির আক্রমণাত্মক লেখনীও নিষ্ফল হয়নি। বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ার রচনার শক্তি এর ফলে অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। শনিবারের চিঠির কোন কোন রচনা সাহিত্যিক প্রসাদগুণে অতিশয় উপভোগ্য হত। সুখের বিষয়, পরে দেখেছি উভয় পক্ষের প্রধানরা যখন স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তখন পুরোনো দিনের তিক্ততা খুব একটা তাঁরা মনে রাখেননি।

এর পর উল্লেখযোগ্য সমাবেশ পরিচয়-এর আড্ডায়। সকলেই সাহিত্যিক এমন নয়, কিন্তু প্রত্যেকে সাহিত্যরসিক। একটি অতি বিদগ্ধ বন্ধুমণ্ডলী, সবুজপত্রের আড্ডাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পরিচয় নামের মধ্যেই পত্রিকার পরিচয়। উদ্দেশ্য ছিল পাঠক সমাজের দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করা, বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে তাকে পরিচিত করা। শুধু সাহিত্য নয়—সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি সকল ক্ষেত্রে পৃথিবীর যেখানে যে নতুন চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে তারই সঙ্গে বাঙালী মনের যোগসাধনের অভিপ্রায় ছিল। কেন্দ্রব্যক্তিটি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—বিশ্বসাহিত্যে তার অবাধ সঞ্চরণ। সুযোগ্য সহচর ছিলেন—গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, প্রবোধচন্দ্র বাগচি, নীরেন রায়, হিরণ সান্যাল, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, সুশোভন সরকার, বসন্তকুমার মল্লিক, তুলসী গোস্বামী, অপূর্ব চন্দ এবং আরো অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। শুনেছি সাহেদ সুরাবর্দী মাঝে মাঝে আসতেন। এঁরা সকলেই বিদ্বান, বিদগ্ধ ব্যক্তি। সকলেরই অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধিৎসা সুবিস্তীর্ণ। আমার এক বন্ধু-মুখে শুনে রোমাঞ্চিত বোধ করেছি যে, সরোজিনী নাইডু কখনো সখনো এ আড্ডায় এসে যোগ দিয়েছেন। নাইডু প্রথম শ্রেণীর আড্ডাধারী, রাজনীতিতে আকণ্ঠ নিমগ্ন, কিন্তু সাহিত্যিক আড্ডায় আহ্বান পেলে লোভ সংবরণ করতে

পারতেন না আর উপস্থিত হলে তিনি একাই একশো। বাক্যচ্ছটায় সভাকক্ষ চমকিত, আলোকিত, উদ্ভাসিত হত।

দেশ পত্রিকার অনুরোধে আড্ডাকাহিনী লিখতে বসেছি। ভাবছি, দেশ-পত্রিকার জন্মাবধি ওখানেই তো অবিশ্রান্ত একটি আড্ডা চলে আসছে। আমি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সে আড্ডার সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের অনেকের সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎপরিচয় নেই, কিন্তু লেখক হিসাবে তাঁরা সকলেই আমার জ্ঞাতিভ্রাতা। আমি নিজেকে 'দেশ' ব্রাদারহুড-এর অন্যতম সভ্য বলে গর্ব অনুভব করি। ইদানীং দেখছি সাহিত্যপত্র ছাড়াও আমাদের সবকটি সংবাদপত্র জাল পেতে সাহিত্যিক ধরছেন। আজকের সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকই সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে সাংবাদিকতার যদি শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহলে সুখের কথা। কিন্তু একটু আশংকাও আছে। সংবাদপত্র স্নায়ুউত্তেজক রোমাঞ্চ এবং চাঞ্চল্যের কারবারী। খবর মাত্রই তার কাছে জবর খবর। চঞ্চলা যদি দিনের পর দিন চোখ ধাঁধাতে থাকেন তাহলে সাহিত্যিকেরও মতিভ্রম হতে পারে; মুনিদেরই মতিভ্রম হয়। তবে সংবাদপত্রের সঙ্গে একটি করে যে সাহিত্যপত্র যুক্ত হয়েছে, এটা একটা বাঁচোয়া। তাঁদের পক্ষে এটি একটি সচ্ছন্দ বিচরণভূমি। যাক, কথায় কথায় অবান্তর কথা এসে গেল। তা আড্ডার কথা বলতে গেলে এমন এক-আধটু হবেই।

পত্র-পত্রিকার আড্ডা সম্বন্ধে আমি প্রধান প্রধান কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করেছি। এছাড়াও আরও কত ছোট বড় পত্রিকার দপ্তরে হয়তো কত আড্ডা জমেছে আমি যার খবর রাখি না। আমি না জানলেও এ-সব আড্ডা যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা-ভবনে একসময়ে নব্য কবিরা অনেকেই জমায়েত হতেন এবং সে আড্ডা কতখানি উপভোগ্য হত তা অনুমান করা কঠিন নয়।

পত্রপত্রিকার আস্তানা ছাড়াও কিছু কিছু আড্ডা হয়েছে বা একসময়ে বাঙালী জীবনকে বহুল পরিমাণে শ্রীমণ্ডিত করেছে। বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে এদের স্থান অবিস্মরণীয়। দু-একটির কথা বলছি। সুকুমার রায়, বিলেত থেকে ফিরে এসে একটি ক্লাব স্থাপন করেছিলেন—নাম 'মানডে ক্লাব'। সভ্যবৃন্দ সকলেই সুপরিচিত—সত্যেন দত্ত, অজিত চক্রবর্তী, অতুলপ্রসাদ সেন কালিদাস নাগ, প্রশান্ত মহলানবিশ, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, অমল হোম, সুবিনয় রায়, শিশিরকুমার দত্ত প্রভৃতি। মাঝে মাঝে আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথও মানডে ক্লাবের বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন। একবার সভালেখা

'পয়লা নম্বর' গল্পটি ক্লাবের বৈঠকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। আমি পূর্বে যে ডাবলিউ. বি. ইয়েট্‌স্‌-এর 'মানডে ইভনিংস'-এর কথা বলেছি, জানি না সে নামের সঙ্গে সুকুমার রায় এর 'মানডে ক্লাব'-এর কোন যোগ আছে কি না। সুকুমার রায় অবশ্য রগড় করে বলতেন মণ্ডা ক্লাব। সত্যেন দত্ত কবিতা লিখেছিলেন—আমাদের এই মণ্ডা সম্মিলন। বেশ বোঝা যায় আড্ডা যতখানি উপভোগ্য ছিল, আহারের ব্যবস্থা ততখানি। এ জাতীয় আরেকটি আড্ডাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আড্ডাটি বসত পার্শিবাগানে গিরীন্দ্রশেখর বসুর বাড়িতে। এটির নাম ছিল উৎকেন্দ্র সমিতি। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন রাজশেখর বসু, গিরীন্দ্রশেখর বসু, যতীন্দ্রকুমার সেন, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা ছাড়াও হয়তো অনেকে ছিলেন। সকলের কথা আমার জানা নেই। বিরিঞ্চি বাবার কাহিনীতে রাজশেখরবাবু পরোক্ষভাবে এ আড্ডাটির উল্লেখ করেছেন। শুধু ১৪ নম্বর পার্শিবাগান বদলে ১৪ নম্বর হালসিবাগান করে দিয়েছেন।

এম. সি. সরকারের দোকানে সুধীর সরকারের আড্ডায় অনেকে আসতেন। এক সময়ে শরৎ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং তখনকার দিনের অন্যান্য সাহিত্যিকরা সেখানে আড্ডা জমাতেন। শুনেছি সেখানকার আড্ডা এখনও অব্যাহত আছে। প্রবাসীর কেদার চট্টোপাধ্যায় জীবনের শেষ পর্বেও আসা-যাওয়া করেছেন। যাক্, অনেক আড্ডার কথা বলা হল, কিন্তু আরেকটি আড্ডার কথা না বললে আমার ঠিক তৃপ্তি হবে না, সেটি শান্তিনিকেতনের আড্ডা। রবীন্দ্রনাথ যখন কলকাতা এবং শিলাইদহ ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন তখন সঙ্গে পার্থিব উপকরণ বিশেষ কিছুই আনেন নি। খড়ের ঘরে গাছের তলায় বিদ্যালয় বসালেন। কিন্তু একটি জিনিস সঙ্গে আনতে ভোলেন নি, সেটি তাঁর স্বভাবগত আড্ডাপ্রিয়তা। তরুণ অধ্যাপকদের নিয়ে আড্ডা জমালেন। নিজে যে রসসৃষ্টির কাজে লিপ্ত ছিলেন, সেই রসের ভোজে তরুণদের নিত্য ডেকে নিতেন। রসবোধ জিনিসটা ছোঁয়াচে, একবার জাগিয়ে দিতে পারলে ভেতরে ভেতরে ক্রিয়া করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এরা অনেকেই নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী লেখার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। সতীশ রায়, অজিত চক্রবর্তী, জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার রায়—কম বেশি সকলেই কিছু করেছেন এবং খ্যাতি-লাভও হয়েছে। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার যুগে আড্ডা আরও বেশিই জমেছিল। সে আড্ডা বিদ্যাবুদ্ধির চর্চায় যেমন সমুজ্জ্বল, রঙ্গে রসে, সুরে তালে

তেমনি ঝলমলে এবং সে কারণে রসসৃষ্টির সহায়ক। শান্তিনেকেতন ঠিক এ সময়েই খাঁটি সাহিত্যকদের জন্ম দিয়েছে। এঁরা হলেন সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রমথনাথ বিশী এবং রাণী চন্দ। তিনজনেরই সাহিত্যকৃতি শান্তিনিকেতনের আড্ডাজাত। তিনজনই বাংলা সাহিত্যে নিজ নিজ আসন পাকা করে নিয়েছেন। এর কিছু পরেই অধ্যাপনার কাজে এসেছেন লীলা মজুমদার। তাঁর সাহিত্য-কর্মেও একটি আড্ডার আমেজ আছে; এর খানিকটা তিনি নিঃসন্দেহে শান্তিনিকেতন থেকে পেয়েছেন। আজ তিনিও বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কয়েকটি সুবিখ্যাত সাহিত্যিক আড্ডার কথা বলা হল। আমি অতি সংক্ষেপে রূপরেখাটুকু মাত্র বর্ণনা করেছি। পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। যাঁরা এসব আড্ডার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন আদ্যন্ত ইতিবৃত্ত তাঁরাই লিখেছেন। এটুকু বলতে পারি এ-সব আড্ডার পূর্ণ বৃত্তান্ত পরপর জুড়ে দিলে রবীন্দ্রযুগ থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বহু সুখ-স্মৃতি-বিজড়িত একটি অতি আনন্দোজ্জ্বল প্রতিকৃতি পাওয়া যাবে। ছাত্রপাঠ্য সাহিত্য-ইতিহাসের তুলনায় এটি ঢের বেশি উপভোগ্য হবে। আমি যে অতি সংক্ষেপে বলতে গিয়েছি তার অসুবিধা হল বহু নামজাদা নাম হয়তো বাদ পড়ে গিয়েছে, পূর্ণ বিবরণে সকলকে পাবেন। এমনও হতে পারে এক আড্ডার মানুষকে আমি অপর আড্ডায় জুড়ে দিয়েছি; তাতে তথ্যের ত্রুটি থাকলেও তত্ত্বের হিসাবে কোন ভুল হবে না, এঁরা সকলের আড্ডাধারী সাহিত্যিক। এ প্রবন্ধের সেটিই আসল প্রতিপাদ্য বিষয়। আর এক-আধটু ভুল হলই বা, নইলে আর আড্ডা কি? আড্ডার স্বভাবই ঐ; সে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবে, উল্টো-পাল্টা, আবোল-তাবোল বকবে তবে আড্ডা জমবে, রসসৃষ্টি তাই থেকেই হবে। আড্ডার কাহিনী আমি আড্ডার মেজাজেই বলেছি।

সাহিত্যের আড্ডাকে ঠিক বুঝতে হলে সাহিত্যের স্বভাবটিকে বুঝতে হবে। শিল্প-সাহিত্যের স্বভাবটা মিশুকে ধরনের। সাহিত্য কথাটির উৎপত্তি থেকেই বুঝতে হবে যে, অপরের 'সহিত' সে মিলনপ্রত্যাশী। প্রকাশের ব্যগ্রতা সকল শিল্পের স্বভাবগত। চিত্রশিল্প নিজেকে প্রকাশ করে রেখায়, রঙে; সংগীত আপনাকে প্রকাশ করে সুরের আলাপে, সাহিত্য কথার আলাপে। চিত্রশিল্প চায় দর্শক, সংগীত সাহিত্য চায় শ্রোতা। তিনজনেরই সঙ্গ চাই, সংসর্গ চাই। নইলে কাকে দেখাবে, কাকে শোনাবে? শিল্প-সাহিত্যের প্রাণবস্তু বলতে আমাদের রস কথাটি যেমন অর্থবহ, অন্য কোন ভাষায় ঠিক এমনটি আছে কি না আমি জানি না। রস বলতে আমরা এমন কিছু বুঝি যার মধ্যে একটা টলটলে

তরলতার ভাব আছে। যে জিনিস তরল সে জিনিস স্বভাবতই সচল। এক জায়গায় স্থির থাকে না। সে চলতে থাকে একের কাছ থেকে অপরের কাছে। যিনি সুর সৃষ্টি করেন, তিনি সুরটি অপরের গলায় তুলে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। যিনি কবিতা রচনা করেন কিংবা কোন প্রকারের রসরচনা—সেটি অপরের কানে তুলে দিতে পারলে তবে তাঁর তৃপ্তি। একেই বলে রসের সচলতা। এক মন থেকে অপর মনে তার গতি এবং এটিই তার সদ্‌গতি।

অনেক আড্ডার কাহিনী বললেও আমি আড্ডার ইতিহাস লিখতে বসিনি, আমি বলতে চেয়েছি আড্ডার ফিলজফি, অর্থাৎ আড্ডার প্রকৃত ধর্ম এবং মহিমা বর্ণনাই আমার উদ্দেশ্য। মানুষ ঘর-সংসার করে—আপিস-আদালত, হাট-বাজার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে দিন কাটে। এ হল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, এর মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। দিনের পর দিন একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি। সেখানে মানুষটা আটপৌরে। কিন্তু যে মানুষ শৌখিন, সে নিত্যকার আবেষ্টন থেকে মুক্তির অবকাশ খোঁজে। সে গল্প-গুজব করে, তাস-পাশা খেলে গান-বাজনা করে, নাটকের মহড়া দেয়। শুধু প্রয়োজন সাধনের দ্বারা তার মনের খিদে মেটে না। মানুষটার মধ্যে কিছু একটু উদ্‌বৃত্ত আছে, সেই উদ্‌বৃত্তটুকু প্রকাশের জন্যে সে ব্যাকুল। আমরা যাকে মানুষের গুণ হিসাবে গণনা করি, তার সবটুকুই সেই উদ্‌বৃত্তের প্রকাশ। কাব্য-সাহিত্য, শিল্প-সংগীত সমস্তই মানুষের উদ্‌বৃত্তের সাধনা। সকল মানুষ শিল্পী-সাহিত্যিক হয় না। কিন্তু আড্ডা মানুষের নিজ নিজ গুণপনা প্রকাশের একটা ক্ষেত্র। সেজন্য উন্নত এবং বিদগ্ধ সমাজে আড্ডার মস্তবড় স্থান।

আড্ডা জিনিসটা grease এর কাজ করে। মনের চাকাটা ঘোরে সহজে, সচ্ছন্দে। যে কোন সৃজনশীল কাজে মনের flexibility চাই, মনটাকে যেমন ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা ঘোরান ফেরানো চাই, নইলে ক্যাঁচম্যাচ শব্দ যতখানি হবে, চাকা ততখানি ঘুরবে না। মনের মধ্যে মরচে ধরে যায়, সে মন নিয়ে সৃষ্টির কাজ চলে না। আড্ডার আসরে যে আলোচনা সেটা শিল্পসাহিত্যের হোক, রাজনীতির হোক, তার মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত সহজের আমেজ আছে। সে জিনিসই যখন অধ্যাপনার আওতায় আসে তখন তার কি গলদঘর্ম মূর্তি। তাকে তখন বাংলা মতে বলা যায় হয়রানি আর ইংরেজি মতে অদৃষ্টের আয়রনি। সাহিত্যের আড্ডা এবং সাহিত্যের অধ্যাপনা দুটির সঙ্গেই আমার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। একটির পরিবেশ যতখানি সরস, অপরটি ততখানি নীরস। একটি বলে, আরো পাই তো আরো শুনি, অপরটি বলে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

সাহিত্যের আড্ডাকে আমি বলি সাহিত্যের লেবরেটরি। কত রকমের গল্প

গুজব, হাসিতামাশা, আবোল-তাবোল আলোচনা হয়। কিন্তু এরই মধ্যে-একটা আচমকা-বলা কথা হয়তো কোন কবিতার ভ্রূণ হিসাবে কাজ করে কিংবা কোন গল্পের খেই ধরিয়ে দেয়। বিদগ্ধজনের আড্ডায় লঘুগুরু কত বিষয়ের আলোচনা হয়। পরে কোন রসিকজনের হাতে সেটিই সুলিখিত প্রবন্ধের আকার ধারণ করে। আড্ডা বহু লেখককেই কাঁচা মালের যোগান দিয়েছে। আড্ডায় বসে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক নানা কথাই চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়েই বলেছেন, "প্রাপ্য জিনিসের চেয়ে 'ফাউ' যেমন বেশি ভালো লাগে তেমনি অধিকাংশ সময়েই অপ্রাসঙ্গিক কথাটায় বেশি আমোদ পাওয়া যায়।" তবেই দেখুন, আড্ডার ধন কিছুই যাবে না ফেলা। অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলো বুনো হরিণের মত চঞ্চল, দেখা দিতে না দিতেই প্রসঙ্গের তাড়নায় চকিতে পালিয়ে যায়। ওদিকে আবার প্রসঙ্গত ভব্য-শান্ত কথাগুলির মধ্যে বন্য হরিণের সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিকতা থাকে না। কাজেই সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে ঐ চঞ্চলা বন্য হরিণীকেই ধরতে হয়।

সাহিত্যের ইতিহাস ঘেঁটেঘুঁটে যেটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় যে সমাজ আড্ডা দিতে শিখেছে সে সমাজেই উঁচুদরের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালী যে সাহিত্যে কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে তার মুল কারণ আড্ডায় তার স্বাভাবিক প্রবণতা। শুধু প্রবণতা বললে ছোট করে বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে আড্ডার মধ্য দিয়েই বাঙালীর প্রতিভা বিশেষভাবে বিকাশলাভ করেছে। সকল জাতির মধ্যে এ প্রতিভা নেই, এ গুণের চর্চাও নেই। প্রাচীন গ্রীস-এ এর চর্চা যথেষ্ট হয়েছিল। সক্রেটিসকে বলা হয় এর আদিগুরু। একদা এথেন্স নগরে সক্রেটিসকে ঘিরে যে আড্ডা জমেছিল প্লেটোর সাহিত্য সে আড্ডাজাত। সভ্যতার ইতিহাসে প্লেটো লিখিত সুসমাচার মথীলিখিত সুসমাচারের চাইতেও ঢের বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাঙালীর বহু দোষ থাকতে পারে কিন্তু তার মহৎ গুণ সে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এ গুণটির চর্চা করে এসেছে। বাঙালীকে লোকে বলে চাকুরীজীবী—শুনে আমার হাসি পায়। দেশের কটি লোক চাকুরি করে? বেশির ভাগই তো বেকার। তারা কি করে? তারা আড্ডা দেয়, ভাগ্যিস দেয়। চোখ মেলে ভালো করে একটু তাকালেই দেখবেন বাঙালী চাকুরিজীবীও নয়, কৃষিজীবীও নয়, শ্রমজীবীও নয়—সে আড্ডাজীবী। আড্ডা বিহনে জীবনধারণ তার পক্ষে সম্ভবই নয়। আজ কত শতাব্দী ধরে সে তার চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা জমিয়েছে। মনে পড়ছে আগে কখনো একটি প্রবন্ধে বলেছিলাম যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের

চাইতে ঢের বড় বাঙালীর চণ্ডীমণ্ডপ কাব্য। এখন গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ ক্রমে নীরব হয়ে আসছে, এটি ভালো লক্ষণ নয়। পল্লীমঙ্গল আসর যদি বেতারে হয় তাহলে তাল রক্ষা হবে কেন, চণ্ডীমণ্ডপই বা বাঁচবে কেমন করে? গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপের স্থান গ্রহণ করছে আজ নাগরিক জীবনের চা-এর দোকান এবং কফি হাউস। চণ্ডীমণ্ডপে আর কফি হাউস-এ যে তফাৎ পূর্বতন সাহিত্যে আর আধুনিক সাহিত্যে সেই তফাৎ। চণ্ডীমণ্ডপে দুনিয়াদারি ছিল কিন্তু দুনিয়ার আয়তন ছিল ক্ষুদ্র। কফি-হাউস-এর দুনিয়া বিশ্বব্যাপী কিন্তু দুনিয়াদারি শিথিল, আলোচনা বেশির ভাগ অনভিজ্ঞ উচ্ছ্বাস। চণ্ডীমণ্ডপ নারী-বর্জিত; কিন্তু নারীঘটিত ব্যাপারে বিচার নিষ্পত্তির দায় তার। কফি-হাউস-এ নরনারীর অবাধ গতিবিধি। সেখানে কেউ কারো বিচার করে না; কিন্তু একে অন্যের আচার আচরণকে প্রভাবিত করে। সমাজে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হয়।

যাক্ আড্ডাতত্ত্ব এখানেই শেষ করছি। বাঙালী-জীবন আজ নানা অভাবে পীড়িত। দিয়েথুয়ে বেশিকিছু আর অবশিষ্ট নেই। এই একটি জিনিসই এখনও আছে। আড্ডার মন মেজাজ এখনও অক্ষুণ্ণ আছে; কিন্তু নিষ্ঠার অভাব দেখা দিয়েছে। অতিরিক্ত রাজনীতি আমাদের আড্ডাঅন্ত চিত্তকে নিরন্তর বিক্ষিপ্ত করছে। তাতেই নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। পূর্ববৎ আড্ডার প্রতি একাগ্রচিত্ত হতে পারলে আমাদের বহু সমস্যার সমাধান আপনিই হয়ে যাবে। অতএব আমি বলি কি, সর্বধর্মান্ (রাজনীতিও) পরিত্যজ্য, আসুন আমরা একমাত্র আড্ডার আশ্রয় গ্রহণ করি। যা দেবী সর্বভূতেষু আড্ডারূপেন সংস্থিতা—একমাত্র সেই দেবতাই আমাদের উপাস্য দেবতা হউক।

শিশুতীর্থ

আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, যে সমাজে নারীর পুজো হয় অর্থাৎ যেখানে নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় সেখানে সর্বদেবতা তুষ্ট থাকেন। পুরুষের তুলনায় নারীর প্রতি দেবতাদের এই বিশেষ আনুকূল্য কেন তার কোন হেতু আমি খুঁজে পাইনি, বিশেষ কোনো হেতু আছে বলেও আমি মনে করি না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝতে পারছেন যে, দেবতারা কখনো এ-জাতীয় কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেননি। এটি যে আসলে শাস্ত্রকারের একটি কৌশলমাত্র একথা বুঝতে কারো বাকী থাকে না, আর এই শাস্ত্রকারটি যে যথার্থই একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি এ বিষয়েও কারো সন্দেহ থাকে না। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, নারী অবলা বলেই সকল সমাজে অল্পবিস্তর অবহেলার পাত্রী। আদিকাল থেকেই এই অবহেলা সমাজে চলে আসছে এবং আরো বহুকাল চলতে থাকবে। পুরুষশাসিত সমাজের মন গলাবার জন্যে এই জাতীয় শাস্ত্রীয় অনুশাসনের প্রয়োজন ছিল। অবশ্য শাস্ত্রবাক্যের খুব যে একটা মূল্য আছে এমন মনে করবার কোন কারণ নেই, যেহেতু শাস্ত্রের নির্দেশ সত্ত্বেও নারীর লাঞ্ছনা এদেশে কম হয়নি। তথাপি উক্ত শাস্ত্রকার যে সেই প্রাচীন যুগে মানুষের সুবুদ্ধির উদ্রেক করবার চেষ্টা করেছিলেন সেজন্যেই তিনি এ যুগের নারী-পুরুষ সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ যুগে সব দেশে, সব সমাজেই নারীর মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা বেড়েছে, অবশ্য সেটা দেবতার তুষ্টি লাভের জন্য হয়নি, স্বয়ং দেবীদের তুষ্ট করবার জন্যেই পুরুষ স্বেচ্ছায় অনেক অধিকার তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। কিছু কিছু অধিকার তাঁরা নিজেরাই জোর করে আদায় করেছেন। অবলা নারী অধুনা সবলা হয়েছে, অতএব নারী সম্পর্কে অবলা বান্ধবদের এখন আর কোনো উদ্বেগের কারণ নেই। আমার এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের উদ্দেশ্য অন্য। সেদিন আমার এক শাস্ত্রজ্ঞ বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম শিশুদের সম্বন্ধে অনুরূপ কোন উক্তি আমাদের শাস্ত্রে আছে কি না। শিশু পূজা কিংবা সম্মাননা সম্পর্কে আমাদের শাস্ত্রে কোন নির্দেশ আছে বলে আমি শুনিনি। আমার শাস্ত্রজ্ঞ বন্ধুটিও এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলতে পারলেন না। এইটুকু শুধু বললেন যে এককালে আমাদের দেশে বাল গোপালের পুজো প্রচলিত ছিল, দেবতাকে শিশুর মূর্তিতে পুজো করা হয়েছে। আমি অবশ্য এ ধরনের পুজোতে বিশ্বাসী

নই। নারীকে দেবী হিসাবে পুজো করলে খুব যে একটা লাভ হয় এমন আমি মনে করি না। নারী হিসাবে নারী কতখানি মর্যাদা লাভ করেছে সেটাই বিবেচ্য। শিশুর বেলাও তাই। তা ছাড়া, নারী চেষ্টা করলে নিজের সম্মান নিজেই রক্ষা করতে পারে, কিন্তু শিশু পারে না। শিশু যথার্থই অক্ষম, সেজন্যে শিশুর মর্যাদা রক্ষার ভার সমগ্র সমাজের।

কোন্ সমাজ কতখানি উন্নত নির্ধারণ করতে হলে সমাজে নারীর স্থান কোথায় তাই নির্ণয় করতে হবে—এই জাতীয় একটা মতবাদ প্রচলিত আছে। আমার মতে এই উক্তিটিও উপরোক্ত শাস্ত্রবাক্যের ন্যায় এক-দেশদর্শী। নারী সমাজের অর্ধেকাংশ। অর্ধেকের উন্নতি দিয়ে গোটা সমাজের উন্নতির পরিমাপ সম্ভব নয়। কথাটা অনেক বেশী ব্যাপক হয় যদি বলি সামাজিক উন্নতির যথার্থ মাপযন্ত্র শিশু কারণ শিশুর মধ্যে নারী পুরুষ উভয় অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, শিশু-পরিচর্যা একটি অত্যাবশ্যক এবং সর্বব্যাপী সামাজিক কর্তব্য, কারণ সে কার্যে স্বামী-স্ত্রী নারী পুরুষ সকলকে হাত মিলাতে হয়। অতএব অনায়াসেই বলা যেতে পারে, সমাজে শিশুর মর্যাদা যতখানি সমাজ ঠিক ততখানি উন্নত।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশ অধিকতর অগ্রসর—অন্তত কিছুকাল পূর্বেও ছিল—একথা সর্বত্র স্বীকৃত। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বেশির ভাগ লোককে বলতে শুনেছি আধুনিক বা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বাংলা দেশেই প্রথমে এসেছিল। সেই যে সর্বপ্রথমে স্টার্ট পেয়েছিল তার ফলেই বাংলা দেশ অগ্রগামী হয়ে আছে। কথাটা আংশিকভাবে সত্য হলেও পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ অনতিকাল মধ্যেই ইংরেজি শিক্ষা সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয় একই বৎসরে স্থাপিত হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা ঐসব অঞ্চলে অনু-প্রবেশ না করলে অপর দুটি বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতার সঙ্গে একই সময়ে স্থাপিত হতে পারত না।

কোন বিষয়ে অগ্রণী হওয়া সহজ কিন্তু অগ্রগতি রক্ষা করা বড় সহজ নয়। বাংলা দেশ সর্বাগ্রে নতুন পথে পা বাড়িয়েছিল সেটাই বড় কথা নয়, হয়তো খানিকটা আকস্মিক কারণেই সে সুযোগ ঘটে গিয়েছিল ; কিন্তু তার পরে প্রায় এক শতাব্দীকাল বাংলা দেশ যে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের পুরোভাগে আসন গ্রহণ করতে পেরেছে সেটাই তার সব চাইতে বড় গৌরবের কথা। সেটা কি করে সম্ভব হল ? শুধু যদি ইংরেজি শিক্ষার কল্যাণেই এমন ব্যাপার ঘটে থাকে তবে ভারতবর্ষের জ্ঞানী, গুণী, মনীষী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্ম প্রধানত

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজেই হওয়া উচিত ছিল। কার্যত তা হয়নি, প্রকৃতপক্ষে সব চাইতে কম হয়েছে উক্ত সমাজে। তার কারণ, প্রকৃত অর্থাৎ দেশজ মাতৃভাষার অভাবে এমন শিক্ষার বুনিয়াদ কোনোকালে পাকা হয়নি। তাছাড়া, দেশের জীবন এবং চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন বলে ছিন্নমূল লতার মতো এই সম্প্রদায় ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে। অথচ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজে ট্যালেণ্ট-এর অভাব আছে এমন কথা নিশ্চয় কেউ বলবে না। কথাটা যদিচ বর্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত তথাপি এই সূত্রে বলে রাখছি যাঁরা সম্প্রতিক আলোচনায় ইংরেজি ভাষাকে আমাদের শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বজায় রাখবার সপক্ষে মত প্রচার করেছেন তাঁরা যেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের শিক্ষার মান এবং অবস্থা সম্বন্ধে একবার বিবেচনা করে দেখেন।

বাংলা দেশের উন্নতির মূল কারণ ইংরেজি শিক্ষা—এই কথা বললে কথাটা স্পষ্ট হয় না। ইংরেজি শিক্ষা না বলে আরো ব্যাপকভাবে একে যদি শুধু শিক্ষা বলি, তাহলে কথাটা স্পষ্টতর তো বটেই অধিকতর সত্য বলেও প্রমাণিত হবে। বাংলা দেশ যে এতটা এগিয়ে যেতে পেরেছিল তার একমাত্র কারণ তার শিক্ষার বুনিয়াদ বা ভিত্তি কোন দেশেই বিদেশী ভাষার মারফতে গড়ে ওঠে না। সেটা মাতৃভাষার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে।

বাংলা দেশের মহা সৌভাগ্য যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে দেশ যেদিন নতুন করে জেগে উঠল, সেদিন আমাদের শিক্ষার বুনিয়াদ গড়বার ভার যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা আমাদের সমাজের উজ্জ্বলতম মনীষী। শিশুশিক্ষার দায়িত্ব সমাজের প্রধানতম কর্তব্য। একমাত্র বাংলা দেশ গর্ব করে বলতে পারে যে, তার প্রধানতম ব্যক্তিরা প্রথমতম কর্তব্যটি পালন করেছেন। এক শতাব্দী পূর্বে বাংলা দেশের বিদ্যারম্ভের ভার নিয়েছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। তাঁর বর্ণপরিচয় দিয়ে এ যুগের সমগ্র বাঙালী জাতির বিদ্যারম্ভ হয়েছে। প্রপিতামহ থেকে প্রপৌত্র পর্যন্ত বাংলা দেশের চার পুরুষের হাতে খড়ি হয়েছে বিদ্যাসাগরের হাতে। বিদ্যারম্ভ তো বটেই, বোধের উদয়ও হয়েছে তাঁর দৌলতেই। বর্ণপরিচয়ের পরের ধাপের জন্যে লিখে দিয়েছিলেন বোধোদয়। শিশুমনের সদ্যজাগ্রত কৌতূহল নিবৃত্তির কোনো মালমশলাই সেকালে ছিল না। বিদ্যাসাগরকৃত ঈশপের অনুবাদ—কথামালা—বোধকরি এইদিক থেকে আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। সে যুগের আরেকজন মহারথী মদনমোহন তর্কালঙ্কার লিখেছিলেন শিশুশিক্ষা। বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ, দ্বিতীয় ভাগ এবং শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ শেষ করে শিক্ষার প্রথম পর্ব শেষ হত। এই তিনটি পাঠ্যপুস্তক বাংলা দেশকে শুধু

শিক্ষা দেয় নি, শিক্ষার ডিসিপ্লিন দিয়েছে। প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকে অর্থাৎ শিক্ষারম্ভে এই ডিসিপ্লিন খুব একটা বড় জিনিস। গোড়ার দিকটা ঢিলে ঢালা থাকলে ওপরটা নেতিয়ে পড়তে বাধ্য। বিদ্যারম্ভে লঘুক্রিয়া কোনো কাজের কথা নয়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্তি রেখে গিয়েছেন। শিশুদের বর্ণপরিচয়ের ভাবনা তাঁকে না ভাবলেও চলত। তথাপি তিনিও লিখেছেন বর্ণপরিচয়; আমাদের শিশুশিক্ষায় তিনি নতুন পদ্ধতি আমদানি করেছিলেন। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষা প্রচারকে তিনি জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও শুরু করেছেন বর্ণপরিচয় থেকে। 'সহজ পাঠ' দিয়ে বিদ্যারম্ভ। প্রথম দুই ভাগ সহজে পাঠ-এর মধ্যে তিনি পূর্বোল্লিখিত ডিসিপ্লিন তো দিয়েছেনই, আরো কিছু বেশি দিয়েছেন। এখানে ডিসিপ্লিন তার গুরুগম্ভীর কঠোর মূর্তি ত্যাগ করে এক আনন্দ রূপ পরিগ্রহ করেছে। অজস্র ছড়ায় কবিতায় বঙ্গসরস্বতী নূপুর পায়ে নৃত্যছন্দে শিশুমনের দোরে এসে ধরা দিয়েছেন। সদ্য বর্ণপরিচয় হয়েছে এমন শিশুদের জন্য অবনীন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছেন 'ক্ষীরের পুতুল'। যে অবন ঠাকুর এক হাতে ছবি এঁকেছেন সেই অবন ঠাকুর আরেক হাতে গল্প লিখেছেন। প্রতিভাবানের কীর্তি। উপেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরীর 'টুনটুনির বই' এবং 'ছেলেদের রামায়ণ' যে-কোনো দেশের শিশুসাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। যোগীন সরকারের 'হাসিখুশি' এবং 'হাসিরাশি' বাংলা দেশের ঘরে ঘরে শিশুর মুখে হাসি ফুটিয়েছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের 'ঠাকুরমার ঝুলি' আমাদের শিশুসাহিত্যে অবিস্মরণীয় কীর্তি। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' এবং 'হ য ব র ল' শিশুসাহিত্যের ক্লাসিক।

আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা দেশ যে সৌভাগ্য লাভ করেছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ তো দূরের কথা পৃথিবীর কোনো দেশের ভাগ্যে তা ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিশু' এবং 'কথা ও কাহিনী'র কবিতায় যে অপূর্ব সম্পদ দিয়ে গিয়েছেন বাংলা দেশের শিশুমনকে সে রস যুগ যুগ ধরে সঞ্জীবিত রাখবে। ঠিক এই শ্রেণীর এবং এই দরের শিশুপাঠ্য কবিতা জগতের সাহিত্যে বিরল। ইংরেজি সাহিত্যের বিরাট ঐশ্বর্য কিন্তু উইলিয়াম ব্লেক্ এবং আর. এল. স্টীভেনসন্ ছাড়া তেমন উঁচুদরের কোনো সাহিত্যিক শিশুদের জন্যে সজ্ঞানে কিছু লেখেননি। বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য ব্যক্তি শিশুশিক্ষাকে জীবনের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছেন, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলেও এর দৃষ্টান্ত মেলে না। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা একমাত্র বাংলা দেশেই ঘটেছে এবং বাংলা দেশ যে তাঁদের মহৎ কর্মের পুণ্যফল থেকে

বঞ্চিত হয়নি বাংলা দেশের অগ্রগতিই তার নিদর্শন। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের ন্যায় মানুষ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁদের অসামান্য প্রতিভা যে আমাদের শিশুমনের গঠনে, পরিচর্যায় এবং বিনোদনে ব্যবহৃত হয়েছে, এই সৌভাগ্যের পরিমাপ করা বড় সহজ নয়।

আমি শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে বসিনি। বাংলা দেশের অগ্রগতিতে উপরোক্ত শিশুপাঠ্য বই ক'খানা যে কতখানি সাহায্য করেছে সেই কথাটি শুধু বলতে চেয়েছি। এমন আরো কিছু বই-এর নাম করা যেতে পারত, কিন্তু সেটা খুব জরুরী ব্যাপার নয়। আমার আসল বক্তব্য এই যে, জাতি গঠনের ব্যাপারে—শিশুর প্রয়োজনকে বাংলা দেশ বিশেষ একটি স্থান দিয়েছে। সে প্রয়োজন মেটাবার জন্যে এতখানি আয়োজন খুব কম দেশই করেছে। নব্য বাংলার ইতিহাস নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের কাউকে একথার উল্লেখ করতে শুনিনি। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজারাজড়ার কাহিনীতেই ইতিহাসের পাতা ভর্তি। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে ঠাট্টা করে বলেছেন—'শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি' অর্থাৎ আমাদের ইতিহাস বেশির ভাগই ছেলে-ভোলানো গালগল্পের সামিল। খুব খাঁটি কথা। বাংলা দেশের যথার্থ ইতিহাস ইস্কুল কলেজে পাঠ্য ইতিহাসের বইতে খুঁজে পাবেন না। পাবেন এই শিশুপাঠ্য বই ক'খানার মধ্যে। নব্য বাংলার আসল শক্তির উৎস ঐখানে।

বাংলা দেশের অগ্রগতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে শিশুকে পূর্বের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। পূর্ববর্তী যুগের জ্ঞানী-গুণীরা অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন। এ যুগের নেতৃ-স্থানীয়দের কাছ থেকে বাংলা দেশ অনুরূপ নিষ্ঠা আশা করে। সুখের বিষয়, রাজশেখর বসু মহাশয়, শিশুদের একেবারে বঞ্চিত করেননি। এ যুগের পরশুরাম সে যুগের বিষ্ণুশর্মার গল্প শিশুদের উপযোগী ভাষায় লিখে দিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে আরেকটু নজর দিলে দেশের অধিকতর কল্যাণ হত। খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মধ্যে কয়েকজন নিতান্ত শিশুদের জন্যে না লিখলেও কিশোরদের উপযোগী ভালো ভালো বই লিখেছেন, এটি অতিশয় আনন্দের কথা। দেশের বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে তেমন তৎপরতা দেখাননি। কিশোরদের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের কাহিনী এই মুহূর্তে লেখা প্রয়োজন।

শিশুর মর্যাদা সম্বন্ধে একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রায় ষাট বছর আগে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব ছিল শিশুর মর্যাদা। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি কার্যত

দেখিয়েছেন যে, শিশু শুধু আদর এবং স্নেহের পাত্র নয়, রীতিমতো সম্মানের পাত্র। শিশুরা সভা করে তাদের গান আবৃত্তি, নিজের নিজের লেখা পড়ে শোনাচ্ছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এসে সে সভায় সভাপতিত্ব করেছেন। শিশুরা নাটক করবে তো স্বয়ং নন্দলাল বসু এসে তাদের মঞ্চ সাজিয়ে দিয়েছেন। এ সম্মান শিশুকে কে কোথায় দিয়েছে ?

প্রত্যক্ষভাবে এই প্রবন্ধে অন্তর্গত না হলেও এই সূত্রে আরেকটি কথার উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করব। আমাদের পূর্ববর্তী যুগের জ্ঞানী-গুণীরা সকলেই জাতি-গঠনকে জীবনের প্রধান ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। আবার জাতি-গঠনের ব্যাপারে শিক্ষাকেই তাঁরা সর্বোচ্চ আসন দিয়েছেন। তার ফলে সেই যুগে আমরা এমন কিছু শিক্ষক পেয়েছিলাম বহু যুগের পুণ্যফল না থাকলে কোন জাতি ঠিক এই দরের শিক্ষক লাভ করে না। দেবচরিত্র রাজনারায়ণ বসু—যিনি নব্য বাংলার অন্যতম স্রষ্টা—তিনি ইস্কুল মাস্টার ছিলেন। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'—উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজের ইতিহাস। এর কেন্দ্রীয় ব্যক্তিটি ইস্কুল মাস্টার। এই গ্রন্থের রচয়িতা শিবনাথ শাস্ত্রী সে যুগের একজন মনীষী, তিনিও ইস্কুলের শিক্ষক। ভূদেব মুখোপাধ্যায় নর্ম্যাল স্কুলের মাস্টার, বিবেকানন্দ মেট্রোপলিটান স্কুলের। এঁরা প্রত্যেকেই দিকপাল। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই। বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে সে যুগের বহু মনীষী জ্ঞানে এবং চরিত্রবলে বিদ্যার্থীমণ্ডলীর জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। তবেই দেখুন, বাংলা দেশ ফাঁকি দিয়ে বড় হয়নি। আজ যে অধঃপতন দেখা দিয়েছে তাও বিনা কারণে ঘটেনি। শিক্ষা এবং শিক্ষকের অধঃপতনই এইজন্য দায়ী।

জীবন ও সাহিত্য

সকলেই জানেন যে জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান অথচ ভাবলে অবাক লাগে যে জীবনের উপর সাহিত্যের প্রভাব যৎসামান্য। বাস্তবিকপক্ষে জীবন সাহিত্যকে যতখানি প্রভাবিত করে সাহিত্য জীবনকে ততখানি প্রভাবিত করে না। ভারতবর্ষের মতো যেসব দেশে বেশিরভাগ মানুষ অক্ষর-পরিচয়হীন সে সব দেশের জীবনে সাহিত্যের মস্ত বড় একটি প্রভাব দেখা যাবে এমন আশা করাও অবশ্য অস্বাভাবিক। যে কালে কাব্য কাহিনী গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে গেয়ে কিংবা পড়ে শোনানো হতো সে কালে জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্যের পসার তবু কিছু ছিল, এখন তাও নেই। বলা বাহুল্য কোন জিনিসের প্রচার হলেই তার পসার হয় না। সিনেমা এবং রেডিও মারফত সাহিত্য পরিবেশনের ব্যবস্থা এখনও রয়েছে—বেশ প্রচুর পরিমাণেই রয়েছে—কিন্তু জনসাধারণের কাছে সহজপাঠ্য করবার জন্য তাতে এত অধিক পরিমাণে জল মেশানো হচ্ছে যে সেটা শেষ পর্যন্ত আর সাহিত্য থাকে না। সাহিত্যের সাধ সিনেমায় মেটে না। আমি যে চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ মহাভারত পাঠের কথা বলেছি সেখানে নির্জলা কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসই পড়ে শোনানো হতো। সেখানে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হতো না। এ তো গেল নিরক্ষর অশিক্ষিত দেশের কথা কিন্তু যে সব দেশে শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার, সেখানেও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সাহিত্যের খুব একটা ছাপ পড়েছে এমন কথা জোর করে বলা চলে না। সাহিত্যপাঠের প্রধান যে ফলশ্রুতি—মার্জিত রুচি এবং রসজ্ঞান—মানুষের আচার ব্যবহারে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। কাব্য সাহিত্য সব দেশেই খানিকটা যেন পোশাকী জিনিস হয়ে আছে।

অনেক প্রকার প্রভাব মিলে জাতীয় চরিত্রের সৃষ্টি হয়। ভৌগোলিক অবস্থান, জলহাওয়ার, গুণাগুণ, দীর্ঘকালীন জীবন-ধারা—এসব তো আছেই, এ ছাড়াও অনেক রকমের প্রভাব জাতীয় চরিত্রের ওপরে ক্রিয়া করে। আজকের বাঙালী চরিত্রে কত রকমের প্রভাব মিশে আছে—আর্য অনার্য হিন্দু বৌদ্ধ রীতি নীতি আচার বিচার তো আছেই, এছাড়াও আছে কিছু বৈষ্ণব সাধনা, কিছু শাক্ত আরাধনা, কিছু-বা আউল বাউল। পরবর্তী যুগে এসেছে ইংরেজি শিক্ষা—সেই আমলে আবার কিছু রামমোহন, কিছু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, কিছু বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ, আর সর্বভারতীয় নেতারূপে গান্ধীজী। সব মিলিয়ে ধর্মীয় প্রভাবই প্রধান। স্বদেশী

আন্দোলনের শুরু থেকে সাম্প্রতিক ইতিহাসে রাজনীতির প্রভাব ক্রমে প্রবল হয়ে এসেছে। রাজনৈতিক প্রভাবের মধ্যে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের দান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রাজনীতি বাদ দিয়ে যদি কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক প্রভাব হিসাবে দেখা যায় তাহলে স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বাঙালী জীবনে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যৎসামান্য। অর্থাৎ সাহিত্যের প্রভাব সব চাইতে কম। শুধু বাংলা দেশে নয়, সব দেশের বেলাতেই একথা প্রযোজ্য। যে ব্রিটিশ চরিত্র—বলা বাহুল্য অনেক গুণ সেই চরিত্রে, সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না—যে চরিত্র একদিন পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল কে তার প্রতিভূ—শেক্সপীয়ার মিল্টন না ক্লাইভ হেস্টিংস? বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, সব জাতির চরিত্রেই সূক্ষ্মের চাইতে স্থূলের প্রভাবটাই বেশি।

আদিকাল থেকে ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ গড়বার চেষ্টা চলেছে। ধর্ম জিনিসটা মূলত কিছু খারাপ নয়, মানুষের ভালো করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। ভালো যেটুকু করেছে তার চাইতে বিপত্তি ঘটিয়েছে বেশি। ধর্মের বিরোধ পৃথিবীময় অশান্তির সৃষ্টি করেছে। সমাজকে ভেঙেছে, গড়তে পারেনি। মানুষের জীবনে ধর্ম যতখানি ব্যর্থ হয়েছে সাহিত্য ততখানি। ধর্মের মতো সাহিত্যও অনেক বড় বড় আদর্শ মানুষের চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছিল, সব আদর্শেরই অপমৃত্যু ঘটেছে। অবশ্য নীতি প্রচার করাটা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, সে সুন্দরের প্রচার করে। সাহিত্যের জন্মকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত সৌন্দর্য সৃষ্টি সে করেছে আজকের জীবনে তার ছাপ কোথায়? সত্যি কথা বলতে গেলে আজকের জীবন যতখানি কুৎসিত আকার ধারণ করেছে সভ্যতার ইতিহাসে এমনটা বোধ করি কোনকালে দেখা যায়নি। সাহিত্য রসের ভাণ্ডার, সেই রসই বা গেল কোথায়? মানুষের জীবন আজ নীরস নিরানন্দ। এই বঞ্চিত খণ্ডিত আনন্দ-বর্জিত জীবনের চিত্রই এলিয়ট এঁকেছেন তাঁর কাব্যে। দেখা যাচ্ছে সাহিত্য জীবনকে প্রভাবিত করে না কিন্তু জীবন সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। এই যে অসুন্দর জীবনের চিত্র, সাহিত্যের মাপকাঠিতে তাও আবার সুন্দর অর্থাৎ জীবনের সুন্দর আর সাহিত্যের সুন্দর এক জিনিস নয়। বাস্তব জীবনের দুঃখকষ্ট নৈরাশ্য হিংসা বিদ্বেষ কুটিলতা হিংস্রতা আমাদের দৃষ্টিতে কুৎসিত বলেই মনে হয়, সেই দৃশ্য মনকে ক্লিষ্ট করে। কিন্তু সাহিত্যিক যখন সেই কুৎসিত জীবনেরই সার্থক চিত্র আঁকেন তখন তা মনকে রসাপ্লুত করে। এর কারণ আমাদের সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে আমরা জীবনের

সবটুকু দেখি না। ভাসমান বরফস্তূপের ন্যায় জীবনের অতি সামান্য অংশই প্রত্যক্ষ, বৃহত্তর অংশ অপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ বা দৃষ্টিগোচর যে জীবন আমরা তাকে বাস্তব আখ্যা দিয়েছি, আমি একে বলব জীবনের বাহ্যরূপ। সাহিত্যিক এই আপাতদৃষ্টি রূপটিকে আশ্রয় করে জীবনের যে অপ্রত্যক্ষ বা গভীরতর রহস্যকে উদ্ঘাটন করেন সেটি হল জীবনের স্বরূপ। জীবনের রূপ এবং স্বরূপে তফাত আছে। প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়ে জীবনের মধ্যে অপ্রত্যক্ষের যে সম্ভাবনা আছে সাহিত্যিক তাঁর কল্পনার দৃষ্টিতে সেটি দেখতে পান। দৃষ্ট এবং অ-দৃষ্ট—এই দুইকে মিলিয়ে দেখাই সত্যিকারের দেখা। কবি. সাহিত্যিকের সেই সত্যদৃষ্টি আছে। তিনি আপাতদৃষ্ট, রূপকে ছাড়িয়ে জীবনের গভীরতর রূপকে দেখতে পান। আমি একেই বলেছি জীবনের স্বরূপ। মনে রাখতে হবে যে ফ্যাক্টকে ছাড়িয়ে গেলেই ফিকশান হয় না। সাহিত্যে আমরা যাকে ফিকশান বলি তা অবিশ্বাস্য, আজগুবি জিনিস নয়। আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে যে সম্ভাবনা লুক্কায়িত আছে তার আবিষ্কারকেই বলে ফিকশান। ফিকশান ফ্যাক্টেরই পরিশ্রুত সংস্করণ। বাস্তব যখন কল্পনাপ্রবণ মনের মধ্যে দিয়ে filtered বা পরিশ্রুত হয়ে আসে তখনই তা সাহিত্যরসে পরিণত হয়। সকল কাব্য সাহিত্যই মূলত সার্থক ফিকশান।

সাহিত্যরসের মর্ম গ্রহণ করতে হলে পাঠকের পক্ষেও অল্পবিস্তর কল্পনাশক্তির অনুশীলন প্রয়োজন। সেই জিনিসটিরই একান্ত অভাব। সাহিত্য যে মানুষের চিত্তমার্জনায় সক্ষম হয়নি তার কারণ বেশিরভাগ পাঠকই কল্পনাশক্তির অভাবে সাহিত্যের মধ্যে জীবনের সেই স্বরূপটিকে খুঁজে পায় না। সাহিত্যপাঠ সেই কারণে ব্যর্থ হয়। সাহিত্যের ছোঁয়া সোনার কাঠির ছোঁয়ার মতো। যে অতি অল্পসংখ্যক পাঠকের মনে এর রসটি লাগবে তার সর্ব অঙ্গে মনে তার ছাপ পড়বে, তার মুখের বাক্য, মনের চিন্তা, নিত্যদিনের কর্ম রুচিসম্মত হবে, সমস্ত জীবন শ্রীমণ্ডিত হবে। এঁদের সংখ্যা যদি বৃহৎ হত তবে সমগ্র সমাজে সেই শ্রী সৌন্দর্য বিস্তৃত হত। সাহিত্যের প্রভাব তবেই সমাজ জীবনে স্পষ্টত লক্ষ্যগোচর হত। সাহিত্যই সভ্যতার সব চাইতে বড় বাহন। দুঃখের বিষয় সেই বাহন সর্বত্রগামী হয়নি। রবীন্দ্রনাথের যে দুঃখ সকল কবিরই সেই দুঃখ—আমার কবিতা, জানি আমি, গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

মোটামুটি দেখা যাচ্ছে সাহিত্য এ যাবৎ জীবনকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি; কিন্তু জীবন যে সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। সে প্রভাব দিনে দিনে বাড়ছে। অতি প্রাচীনকালে জীবন

ছিল সাদাসিদে, সে জীবনে উপকরণ বাহুল্য ছিল না। কবিরা প্রচুর পরিমাণে কল্পনার রং মিশিয়ে তাকে সাজাতেন। বীরপুরুষরা লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হতেন; গোটা পাহাড় কাঁধে করে বয়ে আনতেন, পুষ্পক বিমানে আকাশ পাড়ি দিতেন। এককালে আজগুবি মনে হত কিন্তু কবি কল্পনা যে বাস্তবকে ছাড়িয়ে মানুষের শক্তির সম্ভাবনাকে রূপ দিতে পারে এসব তারই দৃষ্টান্ত। আজকের বিজ্ঞান তা প্রমাণ করে দিয়েছে। এই সেদিনও চাঁদে হাত দেওয়াকে লোকে হাস্যকর আস্পর্ধা বলে মনে করত কিন্তু তোড়জোড় যা চলছে তাতে মনে হয় চন্দ্রলোকে মানুষের পায়ের ধুলো পড়তে আর বিলম্ব নেই। আজকের দিনে নিছক বাস্তব কবিকল্পনাকে হার মানিয়েছে। কবি সাহিত্যিককে এখন আর কল্পনার রং চড়িয়ে কিছু বানিয়ে বলতে হয় না। অবশ্য তাতে কবিকল্পনা হ্রাস পেয়েছে কিংবা পাবে এমন মনে করবার কোন হেতু নেই। এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, আজগুবি কথা বানিয়ে বলার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই, কারণ তার মধ্যে খাঁটি কল্পনাশক্তির প্রকাশ নেই। কবিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস, সে জিনিস কখনো সম্ভাব্যতার সীমাকে লঙ্ঘন করে না। বাস্তবের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক কিন্তু এমনি তার মোহিনী শক্তি যে অতি পরিচিত বস্তুর মধ্যে অপরিচয়ের মোহ সঞ্চার করতে পারে, পুরাতনকে নতুন করে, সাধারণকে অসাধারণ। নিছক বাস্তবকেও চোখের সুমুখে জাজ্জ্বল্যমান করে তুলতে হত কল্পনা শক্তির প্রয়োজন। ইস্পাতকে যেমন বারংবার তাপ এবং শৈত্যের স্পর্শ দিয়ে temper করে নিতে হয় কবি সাহিত্যিকরাও বাস্তবকে ঠিক একই প্রক্রিয়ায় আপন মনের শীতাতপ স্পর্শে কাব্যের উপযোগী করে নেন। ইমাজিনেশন বা কবিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে আর কিছুই নয়—সাহিত্যের উপকরণকে temper করে নেওয়ার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া সকলের আয়ত্তাধীন নয়। যে উপকরণ অনেকের হাতে নেতিয়ে পড়বে সেই উপকরণই যোগ্য পাত্রে পড়লে অর্থাৎ যে মানুষের কল্পনা সিদ্ধিলাভ করেছে সেইসব মনের স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

এ যুগের সাহিত্যে আজগুবির স্থান সংকুচিত হয়েছে কিন্তু তাই বলে কল্পনার পথ রুদ্ধ হয়নি। বিজ্ঞানের যুগে যুক্তির প্রতি মানুষের আগ্রহ স্বাভাবিক। পূর্বকালের সংশয়হীন মুগ্ধ বিস্ময়ের ভাব কমে আসতে বাধ্য। বল্গাহীন অবাধ কল্পনার প্রশ্রয়ও কমে এসেছে। তবে জলের গতি যেমন রোধ করা যায় না, একদিকে বন্ধ হলে অন্যদিকে পথ করে নেয়, মানুষের কল্পনাও তেমনি—অপ্রতিহত তার গতি। যে বিজ্ঞান আমাদের যুক্তিহীন কল্পনাকে সংযত

করছে সেই বিজ্ঞানই আবার নতুন নতুন অজ্ঞাত বিস্ময়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে মানুষের কল্পনাকে নতুন পথে পরিচালিত করেছে। অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কবি সাহিত্যিকরা অনেকে প্রত্যক্ষ জগৎকে ছেড়ে মানুষের অপ্রত্যক্ষ মনের জগতে প্রবেশ করেছেন। মানুষের মনের গহনে অন্ধকার অলিতে গলিতে কবিমনের কৌতূহলী সঞ্চরণ। ফ্রয়েড সেই মনোজগতের পথ ঘাট বাৎলে দিয়েছেন। এ ছাড়াও বিজ্ঞানের নানা বৈচিত্র্য এ যুগের সাহিত্যকে নানাভাবে সঞ্জীবিত করেছে। এইচ. জি. ওয়েলস আধুনিক বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে মনোহারী নানা উদ্ভট কাহিনী রচনা করেছেন। অগণিত মানুষ পাঠ করে আনন্দ পেয়েছে, পৃথিবীর নানা ভাষায় সে সব গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। আবার এই সূত্রেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ওয়েলস পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য উগ্র স্বাদেশিকতার নিন্দা করে বিশ্বমৈত্রীর জয়গান করেছেন। তাঁর রচিত বিশ্ব ইতিহাস একই মানব পরিবারের ইতিবৃত্ত হিসাবে লেখা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কে পূর্বাহ্ণে ভবিষ্যদ্বাণী করে মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। মানবপ্রেমিক সাহিত্যিক হিসাবে ওয়েলস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। সমাজজীবনে সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের প্রভাব যে কত সামান্য এখানে তার প্রমাণ।

দেখা যাচ্ছে সাহিত্যের দান সমাজ বেশির ভাগই বর্জন করেছে, গ্রহণ করেছে যৎসামান্য; ওর প্রভাবকে সে মোটামুটি অস্বীকার করেছে। কিন্তু সাহিত্য সমাজকে বা জীবনকে এড়িয়ে চলতে পারেননি, কোন কালে পারবেও না। নদীর স্রোতে আর সাহিত্যের স্রোতে সাদৃশ্য আছে। নদী তার দুই তীরবর্তী প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিকে বহন করে চলে, সেজন্য নদীর অন্য নাম চিত্রবহা। সেদিক থেকে কাব্যসাহিত্যকে বলা চলে চিত্রবহা, কারণ প্রত্যেক যুগের সাহিত্য আপন যুগের ছবিকে বহন করে চলে। এ যুগের কাব্যসাহিত্যের ওপরে একালের ছাপ পড়বে তাতে আর বিচিত্র কি? কলকারখানার যুগ—কলকারখানার কালিঝুলি ধোঁয়া সাহিত্যের গায়েও লেগেছে। লোহা ইস্পাতের যুগ—ইস্পাতের ধার এবং কাঠিন্যও বেশ কিছুটা এসেছে আজকের সাহিত্যে। আবার চিমনির ধোঁয়া ছাড়া আরো আছে বারুদের ধোঁয়া। যুদ্ধের আতঙ্ক সর্বত্র। পৃথিবীর কোন না কোন অংশে ছোটখাট দ্বন্দ্ব লেগেই আছে, যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। এই নিয়ে মানুষের মনে গভীর অস্বস্তি। অ্যাটম বম নিয়ে ঘর করার বিপত্তি মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

এই যুগের সব চাইতে বড় ব্যাধি মানসিক উদ্বেগ—এগজিস্টেনশিয়ালিস্টরা যাকে বলেছেন Angst সেই সর্বব্যাপী উদ্বেগের নিঃসংশয় ছায়া পড়েছে আজকের সাহিত্যে। পর পর দুই মহাযুদ্ধের পরে পশ্চিম মহাদেশে জীবন সম্বন্ধে মানুষের মনে আর নিশ্চয়তার নিশ্চিন্ত ভাবটি নেই। যুদ্ধ প্রমাণ করে দিয়েছে যে মানুষের জীবন যৌবন ধনমান আজ আছে তো কাল নেই। আবার যুদ্ধই উদ্বেগের একমাত্র কারণ নয়। আজকের ভারতবর্ষের কথাই ভেবে দেখুন—নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিসের অভাবে মানুষের প্রতি দিনের সংসারযাত্রা বিপর্যস্ত। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানুষের মনে গভীর উদ্বেগ এবং হতাশা, জীবন সম্বন্ধে মানুষ বীতস্পৃহ। জীবন দর্শনের গভীরতর উপলব্ধি থেকে যদি এই নিস্পৃহতার জন্ম হত তাহলেও না হয় এর কিছু মূল্য থাকত। কিন্তু এর জন্ম নিছক তিক্ততা থেকে। এই কারণে এটি যেমন অস্বাভাবিক তেমনি অস্বাস্থ্যকর।

যুদ্ধ এবং আর্থিক দুর্গতি—এই দুই স্থূল কারণ ছাড়াও আরো অনেক কারণ রয়েছে এই উদ্বেগ ও হতাশার মূলে। একথা নিশ্চিত যে আজকের জীবনে নানা অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। অনেক ব্যাপার ঘটছে যা আপাতদৃষ্টিতে একরকম কিন্তু একটু খুঁটে দেখলেই মনে হবে ঠিক তার উল্টো। দৃষ্টান্ত—দেশের পর দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করছে কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। এক কালে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা অনেক বেশি ছিল। এই যে বৃহৎ মানবসংসার প্রত্যেক মানুষের না হলেও বহুসংখ্যক মানুষের তাতে অল্পবিস্তর হাত ছিল, নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করবার খানিকটা অধিকার তার ছিল। রাজশক্তি চিরকালই বীরবাহু কিন্তু সব কিছুতে হস্তক্ষেপ করবার মত এমন দীর্ঘবাহু কোনকালে ছিল না। রাজা রাজস্ব আদায় করতেন, প্রজাপালনের জন্যে তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতেন, বহিঃশত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করতেন। সমাজ বলে একটা ব্যাপার ছিল—বাকী সব করণীয় সমাজের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হত। এখন রাজশক্তি যত হাত বাড়াচ্ছে সমাজ তত হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। রাষ্ট্র এখন সর্বগ্রাসী, রাষ্ট্রের শক্তি ক্রমেই এত বাড়ছে যে কোন মানুষেরই জীবন এখন পুরোপুরি তার আয়ত্তের মধ্যে নেই। সেজন্য মনে তার সুখ নেই, শান্তি নেই, জীবনে আনন্দ নেই। অতি অল্প সংখ্যক মানুষ সমস্ত পৃথিবীর রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। জনকয়েক রাষ্ট্রনায়ক সেনানায়ক আর শিল্পনায়ক পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে বসে আছেন। কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রনায়কের হাতে ঝুলছে। পশ্চিম মহাদেশে

দুই মহাযুদ্ধের পর সাধারণ মানুষ আর ভবিষ্যতের কথা ভাবছে না। আমেরিকার বিট্ সম্প্রদায়, ইংলণ্ডের অ্যাংরি ইয়াং মেন ভবিষ্যতে বিশ্বাস করেন না। 'এক লহমা সময় আছে সর্বনাশের মধ্যে তোর'—অতএব বর্তমান মুহূর্তটিই তোমার একমাত্র ভরসা।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়ছে অভাবনীয় গতিতে। সীমাবদ্ধ আয়ে সুবৃহৎ পরিবার পালনের যে সংকট সুজলা সফলা শস্যশ্যামলা ধরিত্রীমাতা আজ সেই সংকটের সম্মুখীন। সারা পৃথিবীতে অন্নসংকট। মাতা বসুন্ধরা তাঁর বিরাট পরিবার, অগণিত পোষ্য নিয়ে নাজেহাল। এত বড় পরিবার প্রতিপালনের উপকরণ, আয়োজন তাঁর হাতে নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বহ। প্রত্যেকে নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত, কেউ কারো কথা ভাববার সময় পায় না, স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই চাকরী করতে হয়, দুজনেই ক্লান্ত, ক্লান্ত দেহ মনের একমাত্র আশ্রয় গৃহ, সেই গৃহ ছত্রভঙ্গ। আমাদের গৃহ ওদের হোম জীবনযুদ্ধে বিধ্বস্ত। পূর্বে যে অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করেছি এখানেও সেই অসঙ্গতি—লোকসংখ্যা যত বাড়ছে মানুষও তত বেশী নির্জনবোধ করছে। অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে থেকেও মানুষ নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ নিঃসহায় মনে করে। টি. এস. এলিয়ট তাঁর কাব্যে এই নির্বান্ধব, নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ মানুষের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা আজ ৩০০ কোটির চাইতেও বেশী, যে হারে বাড়ছে তাতে আর পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে লোকসংখ্যা এর দ্বিগুণ হয়ে যাবে। শুধু এই কারণেই পৃথিবীতে যুদ্ধ অনিবার্য হবে। মাও সে-তুঙ নেহরুকে অত্যন্ত নির্বিকার চিত্তে বলেছিলেন, আণবিক যুদ্ধ যদি বাধে তো তাঁই দেশের পঁচিশ ত্রিশ কোটি লোক অবশ্যই মারা যাবে, তাহলেও আরো পঁচিশ ত্রিশ কোটি বেঁচে থাকবে, কাজেই সেটা এমন কিছু একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার নয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি যে শেষ পর্যন্ত লোকক্ষয়কর ব্যাপার দাঁড়াবে এসব তারই আভাস। লোকসংখ্যা বিস্ফোরণ এবং নানাদেশ আণবিক বিস্ফোরণ নিতান্ত নিঃসম্পর্ক ব্যাপার নয়।

লোকসংখ্যা হ্রাসের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এর প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু এর ফলে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে ঘোরতর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। যৌন সম্পর্কের সঙ্গে একটি মৌন সম্পর্ক—নীরব মনের যোগ বিদ্যমান। কনট্রাসেপসনের ফলে দেহ এবং মনের বিচ্ছেদ ঘটেছে। নানা কারণে আমাদের যাবতীয় মানবিক সম্পর্ক—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, পিতাপুত্রের সম্পর্ক, গুরুশিষ্যের সম্পর্ক, বন্ধুতে বন্ধুতে সম্পর্ক সমস্তই

খানিকটা অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্য মূলত এই সব মানবিক সম্পর্কেরই ইতিহাস। কাজেই মানুষে মানুষে সম্পর্ক যেমন বদলাচ্ছে সাহিত্যের প্রকৃতিও ঠিক সেইভাবে বদলে যাচ্ছে, এটা খুবই স্বাভাবিক।

আধুনিক সমাজের যে সব লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছি সেগুলো বিশেষভাবে পাশ্চাত্য জগতের সমস্যা। আমাদের দেশে এর সবগুলো সমস্যাই খুব তীব্র' আকারে দেখা দিয়েছে এমন কথা বলা যায় না। কলের দ্বারা পরিচালিত যে কলিযুগ সেটি পশ্চিম মহাদেশে আগেই এসেছে। আমাদের দেশে সেই কলসর্বস্ব যুগ এখনও পুরোপুরি আসেনি, সবে তার সূচনা হয়েছে। যন্ত্র আমাদের আঙিনায় এসে পৌচেছে, অন্দরে ঢোকে নি। আমাদের মনকে এখনও গ্রাস করেনি তথাপি এর ভয়াবহতা আমাদের সাহিত্যে খানিকটা তার ছায়াপাত করেছে। স্বীকার করতেই হবে যে এর খানিকটা এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণ থেকে। এককালে এই অনুকরণ প্রিয়তাকে ঠাট্টা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, হাট নেই ত্রিসীমানায়, কিন্তু হট্টগোল আছে পুরোমাত্রায়। অর্থাৎ কিনা, যে সব সমস্যা আমাদের দেশ এখনও দেখা দেয় নি, জোর করে তার আমদানি করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ যখন একথা বলেছিলেন তখন তাঁর উপহাসবাক্য যতখানি সত্য ছিল আজ আর ততখানি নেই। ওপারের হাট এপারে এসে গিয়েছে। পৃথিবীর সাত সমুদ্র এখন এক সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। অ্যাটলান্টিকের ঢেউ ভারত সমুদ্রের তটে এসে লাগছে। অ্যাটম বম-এর জন্ম পশ্চিমে কিন্তু তার ব্যবহার হয়েছে প্রাচ্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইয়ুরোপের রণক্ষেত্রে যখন লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ ঘটছিল তখন বাংলাদেশে বহু লক্ষ লোক অনাহারে মরেছে। যুদ্ধের চাইতে তার ভয়াবহতা কিছু মাত্র কম ছিল না। আজকে দেশে আবার যে অভাব অনটন অব্যবস্থার সূচনা দেখা দিয়েছে তাতে যুদ্ধপীড়িত ইয়ুরোপে জীবন সম্বন্ধে যে অনাস্থা এবং অনিশ্চয়তা এখানেও সেই অনিশ্চয়ের আশংকা দেখা দিতে বাধ্য। আমাদের সদ্য পাওয়া স্বাধীনতা জনসাধারণের মনে নতুন জীবনের আস্বাদ তো দূরের কথা তার আশ্বাস ও দিতে পারে নি। ফলে আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মনে ব্যর্থতার তিক্ততা। সুতরাং আমাদের ইদানীংকালের সাহিত্যে যদি সেই ব্যর্থতা এবং তিক্ততার ছাপ কিছু পড়ে থাকে জীবনের প্রতি যদি বিমুখতা বা অনাসক্তি প্রকাশ পায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

ভাষা ও সাহিত্য

আমাদের দেশ মূর্তিপূজার দেশ। মূর্তি সম্পর্কে আমরা অতিমাত্রায় সচেতন। আমাদের অগণিত দেবদেবীর মধ্যে একটিকেও আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিনি কিন্তু প্রত্যেকেরই একটি মূর্তি আমরা কল্পনা করে রেখেছি—কেউ চতুরানন, কেউ ত্রিনয়ন, কেউ চতুর্ভুজ, কেউবা দশভুজা—এমন আরো কত। কিন্তু আমাদের স্বভাব বড় বিচিত্র—এই আমরাই আবার কোন কোন ব্যাপারে মূর্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। যার বিশেষ একটি মূর্তি আছে তারও মূর্তি আমরা ভুলে যাই ; যার আকার আছে তাকে ঠিক নিরাকার না করলেও কিম্ভূতকিমাকার করে তুলি। অদৃষ্ট এবং অনির্দিষ্ট কোন জিনিসের মূর্তি আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। কিন্তু যে জিনিস নিত্য দেখছি, শুনছি, হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি তার রূপ এবং স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কাব্য সাহিত্য হচ্ছে সেই জাতীয় জিনিস। সাহিত্য নিয়ে আমরা নিত্য ঘাঁটাঘাঁটি করি কিন্তু তার রূপ এবং স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের সুনির্দিষ্ট কোন ধারণা নেই।

সেদিন আলোচনা প্রসঙ্গে আমি যখন বলেছিলাম যে সাহিত্য জিনিসটা সাকার, সেটা নিরাকার নয়, তখন শ্রোতারা বেশ একটু চমকে উঠেছিলেন। সাহিত্য তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা বাংলা ভাষায় খুব বেশি হয়নি ; যেটুকু হয়েছে তাও অনেকটা নিরাকার ব্রহ্মের আলোচনার মতো। অবশ্য কাব্যরস যে কি বস্তু সেটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যে আদৌ সহজসাধ্য ব্যাপার নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। বস্‌ওয়েল ডক্টর জনসনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, What is poetry? জনসন উত্তরে বলেছিলেন, ও বস্তুটা কি নয় সেটা বরং বলা সহজ (Sir, it is easier to say what it is not)। বাস্তবিক পক্ষে অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে দেশী বিদেশী নানা মুনির নানা মতামত পাঠ করে সাহিত্য কি বস্তু আমি আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি, কি নয় সেটা বরং খানিকটা বুঝেছি। সাহিত্য-তত্ত্বজ্ঞানীরা যা বলেছেন তার বেশির ভাগ কথাই খুব স্পষ্ট নয়। তার কারণ রস-সৃষ্টির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই বলেই শিল্প সাহিত্যের খেয়ালী চরিত্রটি পুরোপুরি তাঁদের কাছে ধরা দেয় নি। অবশ্য পণ্ডিত সমালোচকরা কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে কখনো কখনো খুব সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন কিন্তু সে সব প্রশ্নের তাঁরা যে জবাব দিয়েছেন রসিক সমাজে সব সময় তা গ্রাহ্য হয়নি।

অপর পক্ষে কবি সাহিত্যিকরা যখন কাব্য সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন তখন সব কথা স্পষ্ট না হলেও কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ এমন কিছু বলেছেন যার ফলে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো সংশয়ের অন্ধকার বিদীর্ণ করে বিষয়টি সম্পর্কে অনেকখানি আলোক বিকীর্ণ করেছেন।

সাহিত্যের মূল্য বিচার রূপ ও রসের পরীক্ষায়। রস জিনিষটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়—চক্ষু কর্ণ স্পর্শের গোচের নয়, অনুভূতি সাপেক্ষ অর্থাৎ একে ঠিক সাকার বলা চলে না। তবে জলের যেমন আকার নেই কিন্তু যে আধারে রাখা হয় সেই আধারের আকার গ্রহণ করে, রসও খানিকটা সেইরকম। কাব্যে সাহিত্যে রসের আধার হল ভাষা। চিত্রশিল্পের ভাষা যেমন রেখা এবং রং, সংগীত শিল্পের ভাষা যেমন সুর, তাল, মান, কাব্য শিল্পের ভাষা তেমনি শব্দ এবং ছন্দ। শব্দের সম্পদে, গঠনের সৌষ্ঠবে, ছন্দের গুঞ্জনে কাব্যের রূপ ফুটে ওঠে। এটিই তার মূর্তি। যা গোড়ায় ছিল নিরাকার সে তখন সাকার হয়ে ওঠে। মনের ভাবকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করবার ক্ষমতাকেই বলে শিল্প সৃষ্টির ক্ষমতা। আবার মনের ভাব তখনই যথাযথভাবে ব্যক্ত হয় যখন সেই ভাবটি একটি মূর্তি পরিগ্রহ করে এবং সম্পূর্ণরূপে না হলেও কতক পরিমাণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। অতএব কাব্যস্রষ্টার অন্যতম প্রধান কর্তব্য হবে নিরাকার রসকে আকার দান করা। লক্ষ্য করবার বিষয় যে দ্বিপদী, চৌপদী, চতুর্দশপদী ইত্যাদি নামকরণ আকারের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। রসকে যখন আমরা নিরাকার বলি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা রসের অনির্বচনীয়তার কথাই উল্লেখ করি। অনির্বচনীয়কে বচন দান করার মধ্যেই কবির কৃতিত্ব। যা ছিল অনির্বচনীয় সে যখন বচন লাভ করল তখনই সে মূর্তিও লাভ করল। স্বরূপ তখন রূপ পেল। যে অনুভূতি ছিল অনুমানের ব্যাপার সে অনুভূতি প্রত্যক্ষ হল। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি অতি সুন্দর করে বলেছেন, "রসের অবতারণা সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। তার আর একটা দিক আছে যেটা রূপের সৃষ্টি। যেটাতে আনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, কেবলমাত্র অনুমান নয়, আভাস নয়, ধ্বনির ঝঙ্কার নয়।"

"বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বইয়ের নাম দিয়েছিলেম 'ছবি ও গান'। ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই দুটি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়। ছবি জিনিসটা অতিমাত্রায় গূঢ় নয়—তা স্পষ্ট দৃশ্যমান। তার সঙ্গে রস মিশ্রিত থাকলেও তার রেখা ও বর্ণবিন্যাস সেই রসের প্রলেপে ঝাপসা হয়ে যায় না। এইজন্য তার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর" ('সাহিত্যের স্বরূপ',

'সাহিত্যের মূল্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। আমাদের মনে যে ভাবের আকৃতি তাকে ভাষার বেষ্টনে বাঁধতে হয়। এই কারণে সাহিত্য সৃষ্টিতে ভাব এবং ভাষার সমান মূল্য। ভাবকে যদি বলি কাব্যের আত্মা তবে ভাষা তার দেহ। বাস্তবিক-পক্ষে আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে ভাষাকে বলা হয়েছে 'কাব্য শরীর'। আমরা সাধারণত আত্মাকে দেহের চাইতে উচ্চস্থান দিই। সেটা খুব যুক্তিযুক্ত কথা নয় কারণ দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করা চলে না। মানুষের বেলায় যাই হোক, যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য নেই তার আত্মার সৌন্দর্য আছে এমন কথা কোন সাহিত্যরসিক স্বীকার করবেন না। আধ্যাত্মিক বিচারে কোনটা বড় কোন্‌টা ছোট বলতে পারিনে কিন্তু সাহিত্যিক বিচারে দুই-এর মূল্য সমান তো বটেই বরং দেহের মূল্য খানিকটা বেশী। কারণ অনেক উঁচু দরের কথা, ভালো ভালো কথা আমি পর পর সাজিয়ে যেতে পারি কিন্তু যতক্ষণ না তাকে ভাষার কারুকলায় সৌষ্ঠব বা সুষমা দিতে পারছি ততক্ষণ তা সাহিত্য পদবাচ্য হবে না। অবশ্য কেবলমাত্র ভাষা গৌরবেই সাহিত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় এমন কথা কখনো বলব না। তবে একথা নিশ্চিত যে, বক্তব্য যৎসামান্য হলেও প্রকাশভঙ্গির চমৎকারিত্বেই কোন কোন জিনিস সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে। এমন অনেক গীতি কবিতা আছে যার অর্থ গৌরব অর্থাৎ মাহাত্ম্য বিশেষ কিছুই নেই কিন্তু তার কাঁচা অঙ্গের লাবণি যখন ভাষার রঙে ছবির মতো উজ্জ্বলরেখায় ফুটে ওঠে তখন মন নিঃসন্দেহে মুগ্ধ হয় এবং তাকে খাঁটি কাব্য বলে গ্রহণ করতে কেউ আপত্তি করে না। বোধ করি এই কারণেই কোলরিজ কাব্যকে বলেছেন—the best words in the best order. সাহিত্যিকমাত্রই ভাষার কারিগর। একটি মনোমত শব্দ খুঁজে বের করবার জন্যে কবি মাথা খুঁড়ে মরেন। কীটস্‌ বলেছিলেন, I am a lover of beautiful phrases. প্রকৃতপক্ষে প্রেমিকের স্বভাব আর কবি সাহিত্যিকের স্বভাবে মিল আছে, তেমনি আবার নারীদেহে এবং কাব্যদেহেও মিল আছে। দুটিই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। প্রেমিক যেমন প্রেমাস্পদের রক্তমাংসের দেহটিকে আদর করেন কবি তেমনি শব্দালঙ্কারে কাব্য দেহটিকে মনের মত করে সাজান।

কাব্য সাহিত্যকে আমরা যখন শিল্প বলে উল্লেখ করি তখন মনে রাখতে হবে যে, ঐ শিল্পকলা অনেকাংশে প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাহিত্যের আর্ট প্রধানত ভাষাগত। আমাদের সাহিত্যে গোড়ার দিকে ভাষার কারুকলার প্রতি তেমন নজর দেওয়া হয়নি। কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাস সরল ভাষায় সহজ ছন্দে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী রচনা করেছিলেন। কাব্য-

কাহিনী শোনানোর চাইতে ধর্মকাহিনী শোনানোর প্রতিই তাঁদের অধিকতর আগ্রহ ছিল। ভাষাগত কারুকার্যের দিকে তাঁরা তেমন মনোযোগ দেন নি। বৈষ্ণব কবিরা এ বিষয়ে অধিকতর যত্ন নিয়েছেন। পরবর্তীকালে ভাষার ব্যবহারে সর্বাধিক সচেতনতা দেখিয়েছেন ভারতচন্দ্র। বলতে গেলে তিনিই বাংলা কাব্যে প্রথম আর্টিস্ট। বাকচাতুর্যের যত্নকৃত চর্চা তাঁর কাব্যেই আমরা প্রথম লক্ষ্য করেছি। এলিয়ট যে অর্থে কবিকে craftsman বলেছেন সে অর্থে ভারতচন্দ্রকে বলা যায় ভাষার কুশলী কারিগর।

অবশ্য এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে কেবলমাত্র ভাষার কারুকার্য দিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। ভাবের সঙ্গে ভাষার সাযুজ্যকেই বলে সাহিত্যের আর্ট। দু'য়ে মিলে রসসৃষ্টি। কোন একটিকে প্রাধান্য দিলে শিল্পকলা বিকলাঙ্গ হতে বাধ্য। সকল শিল্পের গোড়ার কথা মাত্রাবোধ। প্রাচীনকালে সাহিত্যচার্যরা এ বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। বিশেষ করে ক্লাসিকেল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠগুণ মাত্রাবোধ। রেনেসাঁস যুগে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত হল। সীমাহীন জগতের বিস্ময়, বসুন্ধরার অন্তহীন বৈচিত্র্য, আপন শক্তির নবলব্ধ চেতনা, এক কথায় Brave new world আবিষ্কারের উল্লাস মানুষকে অসম্বৃত করে তুলেছিল (এখানে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের কথাই বলছি)। ভাবের উন্মাদনায় কাব্যে সাহিত্যে স্বভাবতঃই অতিশয়তা দেখা দিল। দু' শতাব্দী পূর্বে চসার যে কাব্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন তার উচ্ছেদ হ'ল। বহু ভ্রমণে, বহু দর্শনে, বহু শ্রুতিতে চসারের মন ছিল সমৃদ্ধ। কাব্যের যে অঙ্গসজ্জার প্রয়োজন আছে সেটি যেমন তাঁর জানা ছিল, তেমনি অলঙ্করণ বাহুল্য যে অনাবশ্যক তাও তাঁর অজানা ছিল না। এই কারণে চসারকে বিশেষ এক কাব্যাদর্শের স্রষ্টা বলা যেতে পারে। কিন্তু সে আদর্শ স্থিতিলাভ করবার পূর্বেই রেনেসাঁসের প্রবল বন্যা এসে তার ভিত ধ্বসিয়ে দিল।

রেনেসাঁস মানুষের মনে যে উদ্দামতা এনে দিয়েছিল তার ফলে মানুষের ভাষায়ও যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা স্বাভাবিক; সদ্যজাগ্রত মন যখন পক্ষ বিস্তার করে তখন তার দাবি মেটাবার জন্যে ভাষাকে সারাক্ষণ শশব্যস্ত থাকতে হয়। অব্যবহারের মরচে-পড়া শব্দ নতুন ব্যবহারে চকচকে হয়ে ওঠে, অনেক অপোগণ্ড শব্দ সাবালকত্ব লাভ করে—নতুন অর্থগৌরবে গৌরবান্বিত হয়। অনেক নতুন শব্দের জন্ম হয়। রেনেসাঁস যুগে ইংরেজী ভাষার সম্পদ সমৃদ্ধি অনেক বেড়েছে। কিন্তু সে সম্পদের ব্যবহারটা হয়েছে একটু বেহিসেবী, বেপরোয়া রকমে। রোম্যান্টিক সাহিত্যের অনেক গুণ, দোষের

মধ্যে ও অযথা বাক্যবাগীশ। সব সময়ে একটু বাড়িয়ে বলে, এক কথার যায়গায় দশ কথা বলে। ক্লাসিকেল সাহিত্য কমিয়ে বলে এমন নয়। সে স্বভাবত স্বল্পভাষী, যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই বলে, অতিরিক্ত কিছু বলে না। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে কাব্যকে একেবারে চাঁচা-ছোলা হতে হবে, তার কোন প্রকার সাজগোজের প্রয়োজন নেই। মেয়েরা এক-আধটু সেজেগুজে থাকলে আমাদের চোখে ভালই লাগে, কাব্যের বেলায়ও তাই। ওকে আটপৌরে পোষাকে দেখতে আমাদের ভালো লাগে না। কীটস্ যাকে বলেছেন 'fine execess' কাব্যের পক্ষে তা অত্যাবশ্যক। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কাব্যের পক্ষে যা অত্যাবশ্যক গদ্যের পক্ষে তা অত্যাবশ্যক নয়। কাব্যে অল্পবিস্তর অতিশয়তার জন্য সকলেই প্রস্তুত থাকেন কিন্তু গদ্যে অনেকেই সেটা বরদাস্ত করতে পারেন না।

আশ্চর্যের বিষয় যে রোমান্টিক আতিশয্যের ডামাডোলের মধ্যেও বেকন অত্যাশ্চর্য গদ্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন। বাক্যের এমন মেদলেশহীন আঁট-সাট গড়নের কথা সে যুগে ভাবাই যেত না। ক্লাসিকেল রচনারীতির প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছিল। ক্ষুরধার বুদ্ধির রচনা কখনো শিথিল-রসনা, বিস্রস্ত-বসনা, শ্লথ-চরণা হয় না। সে ক্ষিপ্রগতি অথচ সংযত-মতি; ঘনপিনদ্ধ তার কায়া। গদ্যের এটাই স্বাভাবিক মূর্তি। বেকনকে বাদ দিলে সে যুগের অন্যান্য গদ্য রচনা না গদ্য না পদ্য। চসারের কাব্য-রীতি যেমন রেনেসাঁস যুগে ঠাঁই পায় নি, বেকনের গদ্যরীতিও সে যুগে কেউ অনুসরণ করে নি।

কল্পনাপ্রবণ রোম্যান্টিক মনোভাব খানিকটা ইংরেজের স্বভাবগত। ও দেশের ঘন কুয়াশা বেশিরভাগ জিনিসকে চোখের আড়াল করে রাখে। সামান্যই দেখে বাকীটুকু অনুমান করে নেয়। অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে ইংরেজী রোম্যান্টি-কতার বোধ করি এটাও একটি কারণ। অবশ্য আমরা বঙ্গবাসীরাও অতিমাত্রায় রোম্যান্টিক যদিচ এ দেশে সূর্যালোকের অভাব নেই। আমাদের ব্যাধি অন্য রকম, আমরা দেখেও দেখি না। যাক্ আমাদের কথা পরে হবে। ইংলণ্ডের তুলনায় ফ্রান্সকে সূর্যকরোজ্জ্বল দেশ বলা যেতে পারে। ও দেশে রোম্যান্টি-সিজিম এবং আবছা-ভাব স্থিতি লাভ করে নি। ও দেশে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা যতখানি হয়েছে কল্পনাবৃত্তির ততখানি নয়। কল্পনাপ্রবণ অভিনিবিষ্ট মন ইংরেজী কাব্যে যে গভীরতা দিয়েছে, অতিমাত্রায় Sophisticated ফরাসী কাব্যে সে গভীরতার অভাব আছে। অপর পক্ষে ফরাসী মনের যুক্তিবাদী বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি ফরাসী গদ্য ভাষাকে সে ঔজ্জ্বল্য এবং তীক্ষ্ণতা দিয়েছে ইংরেজী

গদ্যে তা নেই। ফরাসী গদ্যের প্রসাদগুণ যে কোন সাহিত্যের ঈর্ষার বস্তু। বাঙালী লেখকরা সকলেই ইংরেজী পাঠশালার ছাত্র। ফলে আমাদের কাব্য, সাহিত্যে অনেকটা ইংরেজীর আদলে গড়ে উঠেছে। তাতে ক্ষতি হয়েছে এমন কথা কেউ বলবে না। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ফরাসী সাহিত্যের চর্চা আমরা করিনি বলে সাহিত্য রচনার, বিশেষ করে গদ্য রচনার কারুকলা এখনো আমরা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারিনি। অথচ বাংলা ভাষার মধ্যে একট স্বভাবজাত প্রসাদগুণ আছে, আর বাঙালী মনের মধ্যেও একটি সূক্ষ্ম রুচি-বোধ রয়েছে। কাজেই ভাষাগত Craftsmanship-এর প্রতি যদি আমাদের যথেষ্ট নজর থাকত তা হলে আমাদের গদ্যরীতির অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি সাধন সম্ভব হত।

প্রধানত আমাদের গদ্য সাহিত্যের কথা মনে রেখেই এই প্রবন্ধ লিখতে বসেছিলাম। ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই বঙ্কিমচন্দ্র তাকে যে বলিষ্ঠতা দিয়েছিলেন খুব কম সাহিত্যের ভাগ্যেই সেটি ঘটেছে। বাংলা গদ্যের জন্ম উনিশ শতকের গোড়ায়। কিঞ্চিদধিক দেড় শ' বৎসরে সে গদ্যের যে উন্নতি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। আধুনিক যুগের গতি স্বভাবতই দ্রুত। যুগের গতি-বেগের দরুণই ভাষার উন্নতি ত্বরান্বিত হয়েছে। বাংলা গদ্য বাংলা সাহিত্যের পরিণত বয়সের সন্তান। বলতে গেলে জন্ম মুহূর্তেই ও দেহে মনে সুগঠিত, আচারে ব্যবহারে সাবালক। শৈশব পরিচর্যা হয়েছে রামমোহন বিদ্যাসাগরের হাতে, তাতেই ওর হাড় মজবুত হয়েছে। আর কৈশোরে পদার্পণ করতে না করতেই বঙ্কিম তার দেহে লাবণ্য এবং মনে বুদ্ধির প্রাচুর্য এনে দিয়েছিলেন, এক কথায় দেহে মনে যৌবনের উদ্গম হয়েছিল।

আমাদের গদ্যসাহিত্য যে জন্মাবধি সাবালক তার কারণ তাকে প্রথমা-বধিই কষ্টসাধ্য কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর দু'জনকেই সে যুগের নানা ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে বাদানুবাদে নিযুক্ত হতে হয়েছে। আমাদের সদ্যোজাত বাংলা গদ্যের সাহায্যেই প্রচলিত ধ্যান ধারণার অযৌক্তিকতা প্রমাণিত করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। সেখানেই বাংলা গদ্য অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ভাষাকে যুক্তিতর্কের উপযোগী বাহন করতে বহু সময় লেগে যায়। বাংলা ভাষাকে ওই জন্যে খুব বেশি সময় কালক্ষেপ করতে হয়নি। রামমোহন বিদ্যাসাগরের ন্যায় যুক্তিবাদী মানুষের পরিচর্যার ফলেই ওই দুঃসাধ্য সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করেছে। সাহিত্যের বাহন হতে হলে ভাষাকে একদিকে যেমন যুক্তিতর্কের টাল সামলাতে

হয় অপরদিকে তেমন মনের নিগূঢ়তম আনন্দ বেদনা প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। কমনীয়তা বলিষ্ঠতা—একযোগে এই দু-এরই চর্চা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা এই উভয় গুণের অধিকারী। মানব হৃদয়ের স্নেহ প্রেম ভক্তি প্রকাশের জন্য ভাষার যেটুকু আর্দ্রতার প্রয়োজন সেটুকু অবশ্যই ছিল কিন্তু অনাবশ্যক ভাবোন্মাদনায় সে ভাষাকে কোথাও তিনি জলো জলো করেন নি। তাঁর ভাষায় জলীয় অংশ নেই বললেই চলে। আমি অন্যত্র এই ভাষাকে dehydrated ভাষা বলে বর্ণনা করেছিলাম।

প্রত্যেক জাতির কতগুলো মূলগত বৈশিষ্ট্য (ethnical characteristics) থাকে। তার ছাপ সে দেশের মানুষের মুখাবয়বে ও দেহাবয়বে প্রকাশ পায়। ভাষার বেলায়ও তাই। তারও কতগুলো মূলগত বৈশিষ্ট্য আছে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই মহামনীষী ব্যক্তি। তাঁর বাংলা ভাষার স্বভাবধর্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে বাংলা গদ্যের ভিত তৈরি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভিতের উপর সৌধ রচনা করেছেন। যতটুকু মজবুত হলে সকল রকম জ্ঞানচর্চা এবং জিজ্ঞাসাপূরণ সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের ভাষাকে সেই স্তরে তুলে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা গদ্য যে অভাবনীয় সমৃদ্ধি লাভ করেছে তারও মূল প্রধানত বঙ্কিম প্রতিভায় নিহিত। এমন কি বাংলা গদ্যে আজ যে কথ্য ভাষার প্রচলন হয়েছে তার বীজ উপ্ত হয়েছিল বঙ্কিমের বহু নিন্দিত গুরুচণ্ডালী দোষ দুষ্ট ভাষার মধ্যে। সাধু ভাষার চরিত্র কেবল মাত্র ক্রিয়াপদের উপর নির্ভরশীল নয়। সাধু ভাষার সাধুতা অবিমিশ্র, প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার সেখানে নিষিদ্ধ। আজ সকলেই স্বীকার করবেন যে ভাষার শক্তিবৃদ্ধির জন্যে অল্পাধিক পরিমানে গুরুচণ্ডালী দোষ (গুণ বলাই বাঞ্ছনীয়) অত্যাবশ্যক। এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সাধুভাষায় এবং চলতি ভাষায় বিরোধ থাকলেও, চলতি ভাষাকে অসাধু ভাষা হলে চলবে না। অসাধু ভাষা কখনও সাহিত্যের বাহন হতে পারে না। ভাষাকে সব সময় সাহিত্যের সম্ভ্রম রক্ষা করে চলতে হয়। হুতোম প্যাঁচার নকশা এবং আলালের ঘরের দুলাল ভাষার অগ্রগতিতে যতখানি সহায়তা করেছে সাহিত্যের অগ্রগতিতে ততখানি নয়। চলতি ভাষায় প্রথম খাঁটি সাহিত্য গ্রন্থ বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'। সতেরো আঠারো বৎসরের বালকের পক্ষে এ এক অত্যাশ্চর্য কীর্তি। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুরা একটি কথা লক্ষ্য করে দেখবেন যে উক্ত গ্রন্থে তিনি গদ্য রচনায় যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন ওই বয়সের কাব্য রচনায় ততখানি শক্তির পরিচয় নেই। কলম ধরেই এ জাতীয়

গদ্য রচনা অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। এই ভাষারই পূর্ণ প্রতিভায় উদ্ভাসিত জল-জলে ঝলমলে রূপ পরে ছিন্নপত্রের পাতায় প্রকাশ পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র না হলে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হত না, একথা বাহুল্যমাত্র। তা হলেও একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কীর্তিকে Explain করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট প্রতিভা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের যখন আগমন তখন বাংলা ভাষার শক্তি সামর্থ্য এতখানি হয়নি যা স্বাভাবিক নিয়মে রবীন্দ্রসাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারে। গদ্যের চাইতে পদ্যের পুঁজি অবশ্যই কিছু বেশী ছিল কিন্তু তার দৌলতে রবীন্দ্রকাব্যের উদ্ভবকে স্বাভাবিক বলা চলে না।

ইতিপূর্বে মধুসূদন মাহাকাব্য রচনা করেছেন; হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রও মহাকাব্যের মহড়া দিয়েছেল। কিন্তু তার ফলে বাংলা কাব্যের শক্তি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়নি। লক্ষ্য করবার বিষয় যে সব সাহিত্যেই মহাকাব্যের জন্ম হয়েছে আগে, গীতিকাব্য বহু পরে। মহাকাব্যের অবমাননা না করেও বলা চলে যে জিনিসটা আকারে বৃহৎ এবং বৃহৎ বলেই ব্যবস্থাপনায় একটু ভুল। বেশীর ভাগ জিনিসেরই আরম্ভ স্থূলাকারে। ওই একই কারণে উপন্যাস আগে, ছোট গল্প পরে। শুধু শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার দেখা গিয়েছে। সেই আদিযুগে মানুষ বাসস্থানের জন্যে বড় বড় পাথর জড় করে গুহা ঘর তৈরি করেছে কিংবা বড় বড় গাছের গুঁড়ি সাজিয়ে মাথা গুঁজবার স্থান রচনা করেছে কিন্তু গাছের পাতা কিংবা খড়ের ছাউনি দিয়ে ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘরের কল্পনা করতে বহুযুগ লেগে গিয়েছে। সূক্ষ্ম জিনিসের কল্পনা সহজে আসে না। অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের কত যুগ পরে এসেছে একটি চতুর্দশপদী কবিতা। বাস্তবিকপক্ষে মেঘনাদবধ কাব্যের বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের চাইতেও বড় দান চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

যুদ্ধ বিদ্রোহ ইত্যাদি বৃহৎ ব্যাপার কিংবা গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা বাদ দিয়েও নিত্যদিনের সামান্য কথা নিয়েই যে গদ্যে পদ্যে অসামান্য রসের সৃষ্টি করা যায়, রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সে দুঃসাধ্য সাধন করেছেন। সাহিত্যের, বিশেষ করে ভাষার আসল পরীক্ষা এখানেই। ভাষার দেহটিকে অতিশয় নমনীয় কমনীয় এবং চিক্কন-ইংরেজীতে থাকে বলে Supple করতে পারলে তবেই ভাষাকে দিয়ে সব কাজ করানো যায়, তাকে ইচ্ছামত যেদিকে খুশি হেলানো দোলানো যায়। লেখার ভাষাকে যতটা সম্ভব মুখের ভাষার কাছাকাছি আনা প্রয়োজন। এই সেদিনও আমাদের ভাষা ছিল লেখায় এক কথায় আর। মানুষ ঘরে বাইরে যখন দুই ভিন্ন মূর্তিতে দেখা দেয় তখন দুটোই খানিকটা

অস্বাভাবিক ঠেকে। বাইরে চোগা চাপকান শামলা আঁটা সুসজ্জিত মূর্তি, ঘরে আদুড় গায়ে হাঁটু-ধুতি পরা আটপৌরে চেহারা। আমাদের ভাষার মূর্তিও ছিল এমনি অস্বাভাবিক। লিখতে গেলে এক, বলতে গেলে আর। ঘরোয়া কথাকে যখন শৌখিন রূপ দেওয়া যায় তখনই ভাষা সাহিত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কারণ সাহিত্য মূলত শখের জিনিস।

রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন তাঁর পূর্বকালীন কিংবা সমকালীন কাব্যের সঙ্গে তার মিল যৎসামান্য। আমাদের পূর্বার্জিত সুকৃতির জোরে রবীন্দ্রকাব্যের মতো বর লাভ করবার সঙ্গত অধিকার আমরা দাবি করতে পারি না। পূর্বকৃতির তুলনায় রবীন্দ্রকৃতি এত বিস্তীর্ণ, এত বিচিত্র, এত বর্ণাঢ্য যে একে একেবারেই বেহিসেবী বলে মনে হয়। প্রতিভা জিনিসটাই বেহিসেবী এবং বেপরোয়া। ওর নিজেরই একটা তাগিদ আছে, সেই তাগিদের চাপেই তাকে পথ করে নিতে হয়। অপরের মুখ চেয়ে থাকলে তার চলে না। রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা রবীন্দ্রনাথকে নিজে তৈরী করে নিতে হয়েছে। পূর্ব-গামীদের কাছ থেকে গদ্যে যাও বা পেয়েছেন কাব্যে তা পান নি। কাব্যের অত্যাবশ্যক কর্তব্য সূক্ষ্মতম অনুভূতিকে তদুপযোগী সূক্ষ্ম সুচারু সপ্রতিভ শব্দের জালে আবদ্ধ করা। ভাব আর ভাষার সারাক্ষণ একটা লুকোচুরি খেলা চলছে। যে ভাষা অপরিণত সে তেমন ঠাসবুননি নয়, তার গায়ে বড় বড় ফাঁক থেকে যায়—মনের অনেক কথা সেই ভাষার জালে ধরা পড়ে না। ভাষা যেখানে ঘনবুনোট সেখানে চুনোপুঁটিটিও পালাতে পারেনা। হেন কথা নেই যা সেই ভাষায় প্রকাশ করা চলে না। আবার প্রকাশ করাটাই একমাত্র কর্তব্য নয়, সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারলে তবেই তা সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে। ভাব বা অর্থগৌরবে সাহিত্য হয় না, ভাষার সৌষ্ঠবেই সাহিত্য। গান যেমন সুরের, ছবি যেমন রেখার, সাহিত্য তেমনি ভাষার শিল্প। অথচ অনেক শক্তিশালী লেখকও ভাষার সম্বন্ধে উদাসীন। তাঁরা ভাবেন ভাব বা অর্থগৌরবেই সাহিত্যের গৌরব। এ যুগের কবিই বলেছেন, Poetry is written with words not with ideas. গদ্য পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। যৎসামান্য বিষয়ও প্রকাশভঙ্গির গুণে সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে।

ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যতখানি সচেতন তাঁর পূর্ববর্তী লেখকরা ততখানি ছিলেন না। তাঁর নিজের প্রয়োজনেই ভাষার শক্তিবৃদ্ধির কথা তাঁকে সারাক্ষণ ভাবতে হয়েছে। এত বিভিন্ন এবং এত বিচিত্র বিষয়ে তাঁকে লিখতে হয়েছে যে বিষয়ভেদে ভাষার বৈলক্ষণ্য এবং শব্দের ধ্বনিগত তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁকে সর্বদা

সজাগ থাকতে হয়েছে। আমাদের শাস্ত্র শব্দকে বলেছে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অরূপ কিন্তু তাঁর নিজের সৃষ্টির মধ্যে তিনি রূপ লাভ করেছেন। শব্দও অরূপ কিন্তু কবি সাহিত্যিক যখন যেভাবে শব্দকে ব্যবহার করেন শব্দ সেইভাবে রূপ গ্রহণ করে। আমি এই অর্থেই গোড়াতে সাহিত্যকে সাকার আখ্যা দিয়েছি। মানবিক প্রেম এবং ভগবৎ প্রেম, ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, পার্থিব সৌন্দর্য এবং অপার্থিব সৌন্দর্য আর্থিক লাভক্ষতি এবং পরমার্থিক লাভক্ষতি অভিন্ন বস্তু নয়। দুই-এর ভেদ শব্দ দ্বারাই প্রকাশ করতে হয়। সেই শব্দভেদী বাণ একমাত্র কবিরাই নিক্ষেপ করতে পারেন।

সুসমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষার অপত্য হিসোবে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় যাত্রা শুরু করে নি। রামমোহন বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই সে মূলধন অল্পাধিক পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। জমানো টাকার সুদটাই সব চাইতে বড় সহায়। মূলধন ভাঙিয়ে খেতে গেলে অল্প দিনেই ফুরিয়ে যায়। সাধু শব্দ থেকে উৎপন্ন যে অপভ্রংশ সেটাই সাধুভাষার সুদ। ভাষার অপভ্রষ্ট রূপ বা অপভাষা যে পরিমাণে লিখিত ভাষার ব্যবহারে আসলে সেই পরিমাণে ভাষার সাবলীলতা বাড়বে। প্রাকৃত ভাষাই প্রকৃত ভাষা এই কথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। মধুসূদন অতিমাত্রায় সংস্কৃতাশ্রয়ী ছিলেন বলে তাঁর ব্যবহৃত ভাষা অনতিকাল মধ্যে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন গতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এই কারণে অসামান্য কবি-প্রতিভা সত্বেও মধুসূদন বাংলা কাব্যে একটি বিচ্ছিন্ন episode. অগ্রজদের সঙ্গে যেমন কোনই মিল নেই, অনুজদের সঙ্গেও খুব একটা নেই।

অনেকের ধারণা সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদ যতখানি exploit করা উচিত বাঙালী সাহিত্যিকেরা তা করেন নি। প্রত্যেক ভাষার বিশেষ একটা ধাত আছে, সেই ধাত অনুযায়ী সে গড়ে ওঠে। বহিরাগত জিনিস যেটুকু স্বাভাবিক নিয়মে অঙ্গীভূত হয়ে যায়, নিজস্ব ধাতের সঙ্গে মিশে যায় সেটুকুই স্থিতিলাভ করে। জোর করে মেশাতে গেলে সত্যিকারের পুষ্টিসাধন হয় না। ইদানীংকালে কবি সুধীন দত্ত সংস্কৃতের দোরে ধর্ণা দিয়েছিলেন। রত্নরাজি খুব যে একটা উদ্ধার করতে পেরেছেন এমন মনে হয় না। আধুনিক বাংলার তুলনায় সংস্কৃত ভাষাটা ওজনে অনেক ভারি। এখন এই দুটিতে মিশ খাওয়ানো কঠিন। সুধীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে যে 'সাংস্কৃতিক' মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছিলেন আধুনিক বাংলার পক্ষে সেটা খুব পুষ্টিসাধক হয়েছে এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে না। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী

ছিলেন, উক্ত সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ ছিল গভীর। অপর পক্ষে তাঁর মন ছিল বৈজ্ঞানিক। ভাষার ব্যাকরণ প্রকরণ বানান সম্প্রর্কে প্রবল কৌতূহল ছিল। বাংলা ভাষার নিজস্ব ধাত, চালচলন, ঢং সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। এ জন্য যখন কাব্য রচনায় হাত দিলেন তখন সংস্কৃত রত্নাগারের দ্বার তাঁর কাছে উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি তার যথেষ্ট ব্যবহার করেন নি। সাহিত্যশিল্পী নিজ প্রয়োজনে যেখানে যা পাবেন তাই হাত বাড়িয়ে নেবেন, এটাই স্বাভাবিক। দ্বিজেন্দ্রনাথ যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই নিয়েছেন, তার বেশি নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরও অনুরাগ এবং অধিকার দুই-ই যথেষ্ট ছিল। সংস্কৃতের ভাণ্ডার হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও তিনি সেখান থেকে নেন নি এমন কথা কেউই বলবেন না। অবশ্যই নিয়েছেন তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নেন নি। আত্মপ্রকাশের তাগিদে এবং নিজস্ব কাব্যরীতির প্রয়োজনে ভাষার যে flexilbility আবশ্যক সেটি আয়ত্ত করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে ভাষার কসরৎ যথেষ্ট করতে হয়েছে। তবে এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে এই কার্যে পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ধন যতখানি সহায়তা করে তার চাইতে ঢের বেশী করে সমকালীন সাহিত্য এবং তারও চাইতে বেশী করে লোকের মুখের নিত্যদিনের প্রচলিত ভাষা।

সকল দেশেই দেখা গিয়েছে গোড়ার দিকে পদ্যের এবং গদ্যের ভাষা ছিল আলাদা। এটা অস্বাভাবিক। পদ্যেই হোক, গদ্যেই হোক সাহিত্যের মধ্যে একটা স্বচ্ছন্দ গতি থাকা প্রয়োজন। প্রথম দিকের গদ্যে পদ্যে কোথাও সেই স্বচ্ছন্দ গতি ছিল না। রণপায়ে চলবার মতো সেটা একটা অস্বাভাবিক গতি। সাহিত্য মানুষের দিবারাত্রির কাব্য, ওর মধ্যে একটা ঘরোয়া ভাব থাকা স্বাভাবিক। ঘরোয়া ভাবকে ঘরোয়া ভাষায় প্রকাশ করতে হয়, সেটা কিন্তু নিজস্ব চলতি ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। সাধারণ মানুষের যে বাক্‌ভঙ্গি তাই থেকে ভাষার ইডিয়াম তৈরী হয়।) সেই ইডিয়াম যতদিন না সাহিত্যের গাঁথুনিতে ব্যবহার হচ্ছে ততদিন তার ভিত পাকা হবে না। চলতি ইডিয়ামের ব্যবহারে ভাষা Strengthened হয়, Vulgarized হয় না। লক্ষ্য করে দেখেছি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর গদ্য পদ্য উভয় ক্ষেত্রে খাঁটি বাংলা ইডিয়াম ব্যবহারে অতিশয় তৎপর ছিলেন।

ভাষাকে বাগ মানানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। বুনো ঘোড়ার মতো ভাষার মধ্যে একটা একগুঁয়ে একরোখা ভাব থাকে। সেই অবাধ্যতাকে ভেঙে দিয়ে তাকে বশ মানাতে হয়। লেখক যত বেশি শক্তিশালী হবেন ভাষা তত বেশি

তাঁর আজ্ঞাবহ হবে। রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে ভাষাকে পোষ মানিয়ে ছিলেন যে তাকে দিয়ে ইচ্ছামত যা খুশি করিয়েছেন, যেমন খুশি বলিয়েছেন। সমকালীন ভাষার উপরে যেমন অধিকার বিস্তার করেছিলেন, প্রয়োজন বোধে সংস্কৃতের ভাণ্ডারেও তেমনি হস্তক্ষেপ করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর লালিত্যকেও পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করেছেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যে পদ্যে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা শিক্ষিত মার্জিত সমাজের ভাষা। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের ভাষাকে তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু ভাষার ইডিয়াম বহুলাংশে ওই অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের ভাষার মধ্যেই নিহিত থাকে। আইরিশ নাট্যকার Synge এক বন্ধুগৃহে ঝি-চাকরদের বিশ্রম্ভালাপ শুনতে পেয়েছিলেন। শুনে তিনি চমৎকৃত। মনে হয়েছিল, তাঁর আপন সমাজে এবং ইস্কুলে কলেজে তিনি যে ভাষা শিখেছেন সে ভাষা এর তুলনায় কিছুই নয়। এদের ভাষা অনেক বেশি তুখোর, অনেক বেশি ভাবব্যঞ্জক। ভাষা শিখতে হলে এদের কাছেই শেখা প্রয়োজন। কার্যত তিনি তাই করেছিলেন। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় নাটক লিখে Synge, O' Casey প্রভৃতি লেখকরা আইরিশ নাট্য সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার সেই সম্ভাবনাকে explore করেন নি। তাঁর পক্ষে করা সম্ভবও ছিল না। আমাদের সাধারণ মানুষদের কথা রবীন্দ্রনাথ যতখানি ভেবেছেন এমন খুব কম লোকেই ভেবেছেন, তথাপি রবীন্দ্রনাথকে ঠিক জনগণের মানুষ বলা চলে না। শিক্ষায় রুচিতে জীবনচর্চায় তিনি অনেক দূরের মানুষ ছিলেন। তিনি এদের মনটাকে জানতেন, এদের ভাষা জানতেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকারের বাইরে কখনো যান নি। তার ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে তিনিই ঠিক পথে চালিত করে দিয়ে গিয়েছেন—কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের বাহন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য তাঁর ব্যবহৃত কথ্য ভাষা, শিক্ষিত ভদ্রসমাজের প্রচলিত ভাষা। অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষের নিত্য ব্যবহৃত ভাষায় যে ইডিয়ামের প্রচলন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়। তা তেমন মর্যাদা পায় নি। প্রমথ চৌধুরী চলতি ইডিয়ামের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রেখেছেন। তবে তারও ভাষা শিক্ষিত বিদগ্ধজনের বৈঠকখানায় ব্যবহৃত মজলিসী ভাষা। সাধারণের ভাষা তারও নাগালের বাইরে ছিল। তা হলেও স্বীকার করতে হবে, যে, তাঁর হাতে ভাষার flexibility খানিকটা বেড়েছে। ভাষার দেহলাবণ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যতখানি নজর প্রমথবাবুর ততখানি নয়। তিনি ভাষার দেহভঙ্গি—অর্থাৎ তার তৎপরতা, চতুরতা, চটুলতার প্রতি

অধিকতর জোর দিয়েছেন। এ ছাড়া ফরাসী ভাষায় প্রমথবাবুর যথেষ্ট অধিকার ছিল। ভাষার কারিগরিতে ফরাসী লেখকরা সর্বাগ্রগণ্য। ফরাসী সাহিত্যের গুণগ্রাহী হিসাবে প্রমথবাবু আমাদের ভাষার প্রখরতা এবং উজ্জ্বলতা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রযুগের অন্যতম প্রধান লেখক শরৎচন্দ্র বোধ করি সব চাইতে জনপ্রিয় লেখক। ভাষা সম্পর্কে তিনি মোটামুটি রবীন্দ্রানুসারী হলেও প্রচুর পরিমাণে লবণাম্বু মিশিয়ে ভাষাকে বেশ খানিকটা জলো জলো করে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের অসাধারণ জনপ্রিয়তার দরুণ সেদিনকার অনেক লেখক ভাবে ভাষায় তাঁর অনুকরণ করেছেন। এর ফল খুব ভাল হয় নি। কোন জিনিসের মধ্যেই অত্যধিক পরিমাণে জলীয় পদার্থ বাঞ্ছনীয় নয়। সহজে পচন ধরবার আশংকা থাকে। ভাষার বেলায়ও তাই। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় (এখানে বিশেষ করে গদ্যের কথাই বলছি) জলীয় পদার্থ নেই বললেই চলে। এ জিনিস Preserve করা সহজ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সঙ্গে আজকের ভাষার মিল নেই, তথাপি ওই ভাষার এমন আঁটসাঁট বাঁধুনি যে আজকের পাঠকও বিস্মিত বোধ করেন। অপর পক্ষে আশংকা হয় অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষিত, পরিণতবুদ্ধি পাঠকের কাছে শরৎচন্দ্রের ভাষা ক্লান্তিকর ঠেকবে।

চিন্তার শিথিলতা ভাষার নানাপ্রকার শিথিলতা সৃষ্টি করে। আজকে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাবান লেখক, সুখের বিষয় তাঁদের ভাষায় জলীয় অংশটা কম। তবে এঁদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত নবীন তাঁদের ভাষায় একটা অনাবশ্যক উগ্রতা দেখা দিয়েছে। যে কথা একটু নিচু গলায় বললে ভালো শোনায় সে কথাও অনর্থক চেঁচিয়ে বলবার দিকে বিশেষ একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে। এঁদের ব্যবহৃত শব্দ অনেক সময় অতিমাত্রায় সশব্দ। দু চার পাতা পড়লেই হাঁপিয়ে উঠতে হয়, মনে হয় কানের কাছে কে যেন তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। অল্পবয়স্ক পাঠক পাঠিকার কাছে এ ভাষা বোধ করি কিছু খারাপ লাগে না। কিন্তু নিবিষ্টমন শ্রোতার কাছে অনাবশ্যক চিৎকার যেমন বিরক্তিকর মনে হয়, এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে এ জাতীয় লিখিত ভাষা ও তেমনি ক্লান্তিকর মনে হবে। মুখরতা ভাষার স্বভাবগত কিন্তু একটু মুখচোরা ভাব থাকলে তারও আকর্ষণ বাড়ে। যাঁদের কথা বলছি তারা অনেকেই শক্তিশালী লেখক, এঁদের ভবিষ্যৎ আছে বলেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁদের অধিকতর অবহিত থাকা প্রয়োজন। ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে সর্বপ্রকারের মডার্ন হবার জন্যে এঁরা এমন আপ্রাণ চেষ্টা

করছেন যে দেখলে কষ্ট হয়। মডার্ন মন অত্যন্ত সুকুমার ভাষাতেও প্রকাশ পেতে পারে।*

আমরা যাকে আধুনিকতা বলি সে জিনিসটা প্রধানত ভাবগত। অবশ্য তার একটা বাহ্যিক রূপও আছে, যেটিকে প্রকাশ করার জন্যে আমাদের লেখকরা ভাষাটাকে মুচড়ে দুমড়ে, নানা আক্ষেপে বিক্ষেপে একটি উত্তেজিত স্নায়ু বিপর্যস্ত কেশ, বিভ্রান্ত মূর্তিতে উপস্থাপিত করেছেন। এর ফলে বাংলা ভাষা তার বহুকালের আচার ব্যবহার এবং অভ্যস্ত রুচি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক ভাষার একটা নিজস্ব genius বা স্বভাবধর্ম আছে, একথা আগেও বলেছি জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে এটি যুক্ত। কাজেই একে সহজে অস্বীকার করা চলে না, এর উপরে জবরদস্তিও চলে না। এই সূত্রে এলিয়টের আরেকটি কথাও মনে পড়ছে—

'Any language, so long as it remains the same language, imposes its own laws and restrictions and permits its own licence dictates its speech rhythms and sound patrens

অন্যত্র বলেছেন, 'eccentricity for its own sake is suspect—and, must be curbed for the sake of order.' লক্ষ্য করে দেখেছি, আমাদের নব্যদের মধ্যে যাঁরা কবিখ্যাতি লাভ করেছেন তাঁরা বরং ভাষা সম্বন্ধে অধিকতর যত্নবান এবং সংযত। ইংরেজ কবি বলেছেন, 'Poetry should be as well-written as prose.' আমাদের বেলায় ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে উল্টো—Our prose should be as well-written as our poetry.

* দৃষ্টান্ত স্বয়ং টি.এস. এলিয়ট। গদ্যে পদ্যে উভয়ত তাঁর ভাষা অনবদ্য। ভাষা ব্যবহার অর্থাৎ শব্দপ্রয়োগে তিনি যতখানি যত্ন নিয়েছেন এ যুগের আর কোন কবি ততখানি নয়, ভাষা সম্পর্কে গদ্যে পদ্যে বহুকথা তিনি বলেছেন। ভাষাকে বলেছেন—a difficult tool to handle. একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করছি—

So here I am, in the middle of the way, having had twenty years—
Twenty years largely wasted,···
Trying to learn to use words

(East Coker : v)

ভাষার মধ্যে দুটি বিপরীত জিনিসের সংঘাত নিরন্তর চলতে থাকে। একটি সুনির্দিষ্ট প্রচলিত ধারা অপরটি যুগধর্মের উৎক্ষেপে উত্থিত নিত্য পরিবর্তনশীল জীবনের একটি নতুন ইডিয়াম। এই দুই-এর সংঘর্ষে মধ্যপথগামী যে ভাষার সৃষ্টি হয় সেটিই যুগোপযোগী ভাষা। ভাষা এইভাবেই অগ্রসর হতে থাকে। ভাষায় একদিকে fixity অপরদিকে flux. ভাষা সম্বন্ধীয় আলোচনায় এলিয়ট এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। Fixity এবং Flux এর মধ্যে সমন্বয় হয়ে যে ভাষা তৈরী হয়, সেটিই প্রত্যেক যুগের আদর্শ ভাষা। এর একটিকে শুধু আঁকড়ে ধরে থাকলে ভাষার অবনতি অবশ্যম্ভাবী। আজকের লেখকদের মধ্যে অনেকে flux এর ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন অর্থাৎ নিজেদের বিপন্ন করছেন। অতিমাত্রায় সমকালীন হতে গেলে ভবিষ্যৎ কালের আশা ছাড়তে হয়। স্বকালের মোহে পরকাল নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় বিশেষ করে যাঁরা যথার্থই শক্তি-শালী লেখক।

সাহিত্য ও শালীনতা

যাহা নাই জীবনে তাহা নাই সাহিত্যে—একথা যদি সত্যি হয় তাহলে আরেকটি সত্যকেও এই সঙ্গে মেনে নিতে হবে যে, জীবনে যার স্থান আছে সাহিত্যেও তার স্থান থাকবে। কাজেই যদি বলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিত্যকার আচার ব্যবহার শালীনতার প্রয়োজন আছে তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, সাহিত্যেও তার প্রয়োজন আছে। অবশ্য আমি যত সহজে প্রশ্নটার মীমাংসা করে দেবার চেষ্টা করছি জানি তত সহজে এর চূড়ান্ত মীমাংসা হবার নয়। কারণ এর সঙ্গে আরো অনেক প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে শালীনতা বলতে আমরা কী বুঝি। একথা বললে বোধকরি কারো আপত্তি না যে, যা শীলতা রক্ষা করে চলে, যা সুস্থ ও সুষ্ঠু, তাই শালীন। যে কথা বা যে ব্যবহার আমার রুচিকে, আমার সৌন্দর্যবোধকে পীড়া দেয় তা অশালীন।

শালীনতা কথাটি মৌলিক অর্থে বোঝায় 'সলজ্জ ভাব'। বর্তমান আলোচনায় এই অর্থটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। শিল্পমাত্রেরই স্বভাব নম্র, সে স্বভাবতই লাজুক প্রকৃতির। যে কথা অপরের মুখে বাধে না তা শিল্পসাহিত্যের মুখে বাধে। কোন প্রকার প্রগল্‌ভতা ওর স্বভাব বিরুদ্ধ। এই অপ্রগলভ সলজ্জ ভাবটুকু শিল্প সাহিত্যের সব চাইতে বড় আকর্ষণ। লজ্জা শরম যার যত বেশি তত সহজে তার সম্ভ্রমহানি হয়; সেই কারণে কাব্য সরস্বতীর সম্ভ্রমহানি অল্পেতেই ঘটতে পারে। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বক্তার যা বলতে বাধে সে জাতীয় কথার মধ্যেই শালীনতার অভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে, যে কথা মুখে বলতে বাধে সে কথা লেখায় লিখতে বাধে না। আগে বলতো—শত কথা মুখে বোলো, লেখায় লিখো না। এখন হয়েছে উল্‌টো—যা খুশি লিখতে পার, মুখে উচ্চারণ কোরো না। ছাপার অক্ষর বোবা, ও চ্যাঁচাতে পারবেনা।

লজ্জা যে কেবল রমণীর ভূষণ এমন নয়, শিল্প সাহিত্যেরও ভূষণ। রমণী স্বভাবের সঙ্গে শিল্প সাহিত্যের স্বভাবে আরো অনেক মিল আছে। রমণীয়তাই রমণীর শ্রেষ্ঠ গুণ শিল্প সাহিত্যেও তাই। রমণীর রমণীয়তা কেবলমাত্র দেহ-সৌষ্ঠবে নয়, শিল্প সাহিত্যেরও আকর্ষণ উপকরণে নয়। উভয়েরই রমণীয়তা তার আচরণে। যে রমণীর দেহসৌষ্ঠব নেই সেও মানুষের মনকে টানে—স্বভাব

মাধুর্যের গুণে। সাহিত্যের দৈহিক রূপ তার বিষয়বস্তুতে এবং ভাষার পরিচ্ছদে। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় না হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত রসস্রষ্টার হাতে পড়লে সেও প্রসাদগুণে প্রসন্ন হয়ে ওঠে। যে রমণীর মুখশ্রী অনিন্দনীয় তারও পোশাক দৃষ্টিকটু, চলন বলন শ্রীহীন হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। লেখক যেখানে মধুর রসের অবতারণা করেছেন সেখানেও ভাষার অসংযমে, ইঙ্গিতের স্থূলতায় সে রস গাঁজিয়ে উঠতে পারে। রস বড় সূক্ষ্ম জিনিস, ওখানে স্থূল জিনিসের ভেজাল চলে না। অনাবশ্যক সামগ্রী মেশাতে গেলে কিছুতেই মিশ খায়না। প্রত্যেক মানুষের যেমন একটা ধাত আছে, কাব্যসাহিত্যেরও তেমনি ধাত আছে, মেজাজ আছে—সব জিনিস তার ধাতে সয়না। শিল্পের সব চাইতে বড় কথা পরিমিতিবোধ—Sense of proportion, ঠিক যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই সে গ্রহণ করে। অতিরিক্ত মশলা মেশাতে গেলে খাদ্য যেমন অখাদ্য হয়ে ওঠে যে কোন রকমের আতিশয্য কাব্যরসকে তেমনি বিরস এবং বিস্বাদ করে তোলে। কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে গৃহিণীপনা চাই। গ্রহণীয়কে গ্রহণ, বর্জনীয়কে বর্জন—এরই নাম সাহিত্যের গৃহিণীপনা। একেই বলে পরিমিতিবোধ—সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হয়েছে ঔচিত্যবোধ। রসবিচারে ঔচিত্যবোধকে খুব উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তু পরিবেশনে সামঞ্জস্য বা স্বাভাবিকতা রক্ষার নামই ঔচিত্য। কাশ্মীরী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র তাঁর ঔচিত্যবিচারচর্চা নামক গ্রন্থে বলেছেন—যে বস্তু যার সঙ্গে সদৃশ অর্থাৎ মানানসই সেই বস্তুই তার পক্ষে উচিত (উচিতং প্রাহুরাচার্যাঃ সদৃশং কিল যস্য যৎ)। যা সদৃশ নয় তাই বিসদৃশ, তাই বেমানান এবং যা বেমানান তাই অসুন্দর। আবার আলঙ্কারিকদের মতে যা অসুন্দর তাই অশ্লীল।

এ হল একেবারে গোড়াকার কথা কিন্তু এখানেও মতান্তরের সম্ভাবনা আছে। আমার চোখে যা মানানসই অপরের চোখে তাই বেমানান হতে পারে আবার অপরের মনকে যা পীড়া দেয়না, আমার মন তাতেই পীড়া বোধ করতে পারে। এখানে সাহিত্যিককে খানিকটা দায়িত্ব বহন করতে হয়। সমাজের রুচি-গঠনে সাহিত্য তথা সাহিত্যিক অনেকখানি সহায়তা করতে পারেন। এখানে বলে নেওয়া ভাল যে সামাজিক রুচি এবং সামাজিক নীতি—এক কথা নয়। যা নীতি-বিগর্হিত তা রুচিবিগর্হিত নাও হতে পারে। সমাজ যে জিনিসে আপত্তি করে রস সে জিনিসে অনেক সময়েই আপত্তি করে না। পরকীয়া প্রেম সমাজের বিচারে দূষণীয়, রসের বিচারে নির্দোষ। তাহলেই দেখা যাচ্ছে সামাজিক ঔচিত্য এবং রসের ঔচিত্য এক জিনিস নয়। সাহিত্য একমাত্র রসের দাবীকেই মানে, নীতির

দাবীকে মানতে সে বাধ্য নয়। রসের রাজ্যে নীতির প্রবেশ অনেক সময়েই অনধিকার প্রবেশ, কিন্তু রুচির প্রবেশ স্বাভাবিক অধিকারে। কারণ রুচি বলতে আমি বুঝি সূক্ষ্ম রসবোধ। সাহিত্য সূক্ষ্ম অনুভূতির জিনিস এবং সেই কারণেই যে কোন প্রকারের স্থূলতা সেখানে বেমানান। স্থূল কথাবার্তা স্থূল রসিকতা স্থূল ব্যবহার রুচিবিগর্হিত এবং রুচিবিগর্হিত বলেই সাহিত্যে বর্জনীয়। সাহিত্যে রসবোধ এবং রুচিবোধ অতি নিকট আত্মীয়তা সম্পর্কে আবদ্ধ। কারণ সূক্ষ্ম রসানুভূতির আনন্দকে উদ্দীপিত করেই সাহিত্য মানুষের রুচিকে মার্জিত করে।

অবশ্য স্থূল এবং সূক্ষ্ম রুচির বিচারেও তর্কের অবকাশ আছে। গ্রাম্য কথা-বার্তা আচার ব্যবহার মাত্রই স্থূল এমন কথা কেউ বলবেনা। (যে যেমন স্তরের মানুষ সে ভাষাতেই সে কথা বলবে। তার মুখে তাই সদৃশ অর্থাৎ মানান সই। সে ভাষা যতই গ্রাম্য হোক তা স্থূলতা দোষদুষ্ট নয়।) রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের একটি গ্রাম্যছড়ায় 'ভাতারথাকী' শব্দের পরিবর্তে 'স্বামীথাকী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন আমার মতে সেটা অহেতুক বাড়াবাড়ি। যার মুখে ঐ শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে তার মুখে 'ভাতারথাকী' কথাটি বেমানান তো নয়ই বরং স্বামীথাকীর চাইতে অনেক বেশি লাগসই। লোকসাহিত্যে লৌকিক ভাষার যদি স্থান না হয় তবে সে সাহিত্য অলৌকিক হয়ে ওঠে। এ সব কথা যে কেবল খিড়কি দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে এমন নয়, সাহিত্যের সদর দরজায়ও এদের প্রবেশাধিকার আছে। একটা খুব সাধারণ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। রাজশেখর বসু মশায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শশিশেখর বসু মশায় একখানা অতি সুখপাঠ্য ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বই লিখেছেন। তাঁর লেখায় মাঝে মাঝে 'বেফাঁস' কথার প্রয়োগ থাকত বলে কেউ কেউ আপত্তি করেছিলেন। তার জবাবে তিনি বলেছেন, "কেন, এতে আপত্তির কি আছে? বঙ্কিমবাবুতে তো 'মাগী' ঢেদার।" ঠিকই বলেছেন—আপত্তির কিছুই নেই। বঙ্কিমবাবুর মাত্রা জ্ঞান অত্যাশ্চর্য। তিনি যেখানে উক্ত শব্দের ব্যবহার করেছেন সেখানে সাহিত্যিক শালীনতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। এমনকি শশিশেখরবাবু যেরূপ কৌতুকের সঙ্গে ঐ প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন, তাও সাহিত্যের প্রসাদগুণ লাভ করেছে। (সাহিত্যের দুই ভঙ্গি—এক দৃষ্টিভঙ্গি আরেক প্রকাশভঙ্গি। প্রকাশভঙ্গিতে গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার আপত্তিজনক নয়। দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি গ্রাম্যতা অর্থাৎ স্থূলতা প্রকাশ পায় সেটি অবশ্যই দূষণীয়। শালীনতা অশালীনতা কেবল ভাষার মধ্যে আবদ্ধ নয়, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে তার আসল পরিচয়।)

দেবী সরস্বতী স্বভাবতই স্নেহশীল। যে দেবী হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক সহ্য করতে পারেন ভাষার ইতর বিশেষ সহ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই দেবী বীণাপানি। একবার সুরে অর্থাৎ রসে লাগাতে পারলে যে কোন ভাষায় যে কোন বিষয় তাঁর বীণায় ঝংকৃত হবে। ভাষার কৌলিন্ত কিংবা বিষয়বস্তুর গুরুত্ব দিয়ে তাঁকে ভোলানো যাবেনা। তিনি একমাত্র রসের নৈবেদ্যটুকুই গ্রহণ করবেন। রসসৃষ্টির আরেক নাম সৌন্দর্যসৃষ্টি। সাহিত্য সৌন্দর্যের উপাসক। সুন্দরের কোন জাত নেই। এজন্ত সাহিত্য বিষয়বস্তুর কোন বাচবিচার করেনা। জীবনে যা মানিয়ে যায় সাহিত্যে তা কখনো তা বেমানান হয় না। অবশ্য সাহিত্যশিল্পীকে একটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে—জীবনের বিভিন্ন স্তরে ভাষার বৈষম্য আছে—জ্ঞান বুদ্ধির বৈষম্য আছে, অভিজ্ঞতারও বৈষম্য আছে। কাজেই কোন্‌খানে কোন্‌টা মানাবে সেই জ্ঞান না থাকলে মাত্রাজ্ঞানের অভাব প্রমাণিত হয়। বলা বাহুল্য যেখানে মাত্রাজ্ঞানের অভাব সেখানে শালীনতারও অভাব।

মাত্রাজ্ঞান শিল্পী সাহিত্যিকের পক্ষে অপরিহার্য। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই শিল্পের অপমৃত্যু ঘটে। সাহিত্যে অনাবশ্যকের কোন স্থান নেই—যা অনাবশ্যক সাহিত্যে তাই অশালীন। সাহিত্যের একটি প্রধান কর্তব্য অপরিচিতকে আমাদের কাছে পরিচিত করা কিংবা এতকাল আমার কাছে যা পরিচিত বলে মনে হতো তারও মধ্যে নতুনত্বের সৃষ্টি করে নতুন পরিচয়ের রোমাঞ্চ সঞ্চার করা। যে জিনিস অতি পরিচয়ের ম্লান, নিত্য অভিজ্ঞতায় জীর্ণ, যা obvious বা স্পষ্টত প্রতীয়মান, যা না বললেও চলে তার প্রতি সাহিত্যের কোন ঔৎসুক্য নেই। কাব্যসাহিত্য শিল্প মাত্রই ইঙ্গিতময়। ইঙ্গিতের দ্বারা অজ্ঞাতের প্রতি পাঠকের দৃষ্টিকে প্রসারিত করাই তার কাজ। যে জিনিস সুপরিজ্ঞাত, নিত্য অভিজ্ঞতার আয়ত্তের মধ্যে তার সুবিস্তৃত বর্ণনা বাহুল্যমাত্র। স্ত্রী পুরুষের যৌন মিলনের সত্যতা কেউ অস্বীকার করেনা, কিন্তু এর যথাযথ বর্ণনা না দিলে এর যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় না এমন কথা যিনি মনে করেন তিনি মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিকে খুব বেশি সম্মান দেন না। ডি. এইচ. লরেন্স প্রণীত লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার নামক গ্রন্থে expurgated edition বা কর্তিত সংস্করণ আর অধুনা প্রকাশিত অবর্জিত (আবর্জনা সমেত) সংস্করণ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন যে, প্রথমোক্ত সংস্করণ অনেক বেশি শিল্পসম্মত। রসিক পাঠকের কাছে পথের ইঙ্গিতই যথেষ্ট—তাকে ঝুরি নামা বট গাছের পাশ দিয়ে বাঁশ ঝাড়ের তলা দিয়ে কাজু বুড়ির আঙিনা দিয়ে একেবারে ঘরের দোরে

পৌঁছে দেবার কোন প্রয়োজন হয়না। মানুষ ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত এবং কামার্ত জীব। আহার নিদ্রা মৈথুন জীবনের মস্ত বড় অংশ, কিন্তু সেটাই মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। এটাকে বলা যায় জীবনের পটভূমিকা, জীবনের কাঠামো। চতুর্দিকস্থ উঁচু পাড়ি, এরই মধ্যে জলাশয়—সেইখানে মানুষের সঞ্চরণ, সন্তরণ, অবগাহন; তার স্নেহ ভালবাসা, দয়া মায়া, অনুরাগ বিরাগ, ঘৃণা বিদ্বেষ, ক্রোধ ক্ষমা, উত্তেজনা নিস্পৃহতা। এই সমস্তটা নিয়ে মানুষের সমগ্র জীবন।

দেহের দাবীগুলো শুধু বড় নয়, প্রচণ্ড। প্রচণ্ড বলেই এর মূর্তি স্বাভাবিক নয়। মানুষ মাত্রই ক্ষুধার্তজীব কিন্তু সারাক্ষণ ক্ষুধার্ত নয়, ক্ষুন্নিবৃত্তি হলেই সে অন্য মানুষ। কামার্ত মানুষেরও কাম নিবৃত্তি হলে সে অন্য মানুষ। সমগ্র মানুষের পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যের কাজ। তাকে খণ্ডিত করে কোন রিপুকবলিত মূর্তিতে দেখতে গেলে তার প্রতি ঘোরতর অবিচার হয়। সব রিপুর মধ্যেই একটা প্রচণ্ডতা আছে কিন্তু সেই প্রচণ্ডতা শান্ত হতেও খুব বেশি সময় লাগে না। প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি—এই দোটানার মধ্যেই মানুষের জীবন। দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারলে তবেই মানুষের সত্য পরিচয় দেওয়া সম্ভব। একটিকে প্রাধান্য দিতে গেলে একদেশদর্শিতার অপরাধ হয়, ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতি স্বাভাবিক, কিন্তু যে মানুষ সারাক্ষণ ক্ষুধা ক্ষুধা করে তার প্রতি সহানুভূতির পরিবর্তে বিরক্তির উদ্রেক হয়। লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার (Unexpurgated-edition)-এর কথা একটু আগে বলেছি। এর মধ্যে এমন একটা অতিশয়তা আছে যা বিরক্তির উদ্রেক করে। কোন কিছু জাহির করতে যাওয়া স্থূল মনের পরিচয়ক, বিদ্যে জাহির করা, টাকার গুমোর দেখানো, মান মর্যাদার বড়াই করা—কোনটাই সুস্থ মনের লক্ষণ নয়। এমন যে ধর্ম, তাও ধার্মিকতা জাহির করতে গেলে হাস্যাস্পদ হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সব চাইতে অসহ্য Spiritual arrogance. ঠিকই বলেছেন। ডি. এইচ লরেন্সের মধ্যে সেই arrogance অন্য আকারে দেখা দিয়েছে—তাকে বলা যেতে পারে Sex সংক্রান্ত arrogance। ভাবটা যেন, এই দেখনা কেমন খোলা-খুলি বলে দিয়েছি। জৈবধর্মে মানুষে আর পশুতে যে তফাত নেই সেই কথাটা একেবারে দিনের আলোয় স্পষ্ট করে দিয়েছি। যেন খুব একটা নতুন তথ্য। এই জাহির করবার প্রবৃত্তি সর্বত্রই দৃষ্টিকটু, শিল্পে সাহিত্যে নিতান্তই বেমানান। অথচ ইদানীংকার সাহিত্যে এরই নাম হয়েছে সাহসিকতা। মানব জীবনের কোন অজ্ঞাত রহস্যের উদ্‌ঘাটনে দুঃসাহসিক কল্পনা, ক্ষিপ্রবুদ্ধি এবং মুক্ত মনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু যে কথা সকলের

জানা, যা উল্লেখ করাও নিষ্প্রয়োজন সে কথা বলার মধ্যে সাহসিকতা কোথায় আমি বুঝে উঠতে পারি নে।

আধুনিক সাহিত্যের বাহন কথ্য ভাষা, কিন্তু বিষয়বস্তু অনেক সময় অকথ্য। আর বিষয় যদি অকথ্য হয় তো ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে অকথ্য হয়ে ওঠে-Lady-Chatterly's Lover তার প্রমাণ। বুৎপত্তিগত অর্থে সাহিত্য সাহচর্যের বাহন। কেবলমাত্র লেখক ও পাঠকের সাহচর্য নয়, পাঠকে পাঠকে সাহচর্য। সাহিত্য আনন্দ দান করে, আলাপ আলোচনায় পাঠকে পাঠকে সেই আনন্দের বিনিময় হয়। পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, বন্ধু-বন্ধুনীর সঙ্গে কি অকথ্য বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা চলতে পারে? এই যে রস বা আনন্দের পরিক্রমা বিদ্যুৎ প্রবাহের সঙ্গে তার তুলনা চলে। গতিরুদ্ধ হলে Short circuit হয়ে দুর্গতি ঘটায়। লরেন্সের পূর্বোক্ত গ্রন্থে রসের শর্ট সার্কিট হয়েছে কারণ ওর গতি ওখানেই রুদ্ধ। রস জিনিসটা সচল—মুখে মুখে পরিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বই-এর পাতায় যেটুকু চলেছে সেটুকুই ওর চলা। বৈঠকখানায় এসে ও অচল। রসের চলৎশক্তি যেই রহিত হলো অমনি তার অপমৃত্যু ঘটল। এই ক্ষেত্রে লরেন্সের অসামান্য প্রতিভাও সেই বিপত্তি রোধ করতে পারে নি।

সাহিত্য সমগ্র মানবজীবনকে, মানবচরিত্রকে অনাবৃত করে দেখাতে পারে, তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মহৎ সাহিত্যে একটি বৃহৎ অনাবরণ আছে। মানুষের মানবত্ব এবং পশুত্ব কিছু সে গোপন করে না। সমগ্র মানুষের পরিচয় আছে বলে সেই অনাবরণ অশ্লীল নয়। কিন্তু আংশিক অনাবরণ—যেখানে মানুষকে খণ্ডিত করে, একপেশে করে দেখানো হয়—সেই অনাবরণ অশ্লীল। শেক্সপীয়ারে যা বৃহৎ, জোলায় তা আংশিক। এই জন্য জোলা অশ্লীল, শেক্সপীয়ার অশ্লীল নয়। ঠিক ঐ কারণেই ভারতচন্দ্র অশ্লীল কিন্তু মহাভারত অশ্লীল নয়।

শ্লীলতা, অশ্লীলতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নীতি দুর্নীতির প্রশ্ন। প্রচার সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয় একথা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে সাহিত্যে নীতি প্রচার অসঙ্গত হ'লেও দুর্নীতির প্রশ্রয় সঙ্গত কিনা। এক প্লেটো ছাড়া প্রাচীন সাহিত্যাচার্যদের মধ্যে আর কেউ নীতির ওপরে খুব একটা জোর দেননি। প্লেটো শিল্প সাহিত্যকে মানুষের সৃজনবিলাসী আনন্দের আয়োজন হিসেবে দেখেননি। তিনি ছিলেন রাষ্ট্র-অন্ত প্রাণ। সব কিছুর ওপরে রাষ্ট্রকে স্থান দিতেন। শিল্প সাহিত্যকে দেখেছেন রাষ্ট্র পরিচালনার সহায়ক হিসেবে। সমাজের বাঁধন বা রাষ্ট্রের কাঠামোকে দুর্বল করতে পারে

এমন কিছু প্রচার করাকে তিনি সমাজবিরোধী কাজ বলে মনে করতেন। এই জন্য কবিদের তিনি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন। গ্রীক মহাকাব্যে দেব-দেবীদের যে বর্ণনা আছে তাতে তিনি আপত্তি করেছেন। আচার ব্যবহারে, পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহে, অবাধ প্রেমলীলায় দেবদেবীরা লোকচক্ষে হাস্যকর প্রতিপন্ন হয়েছেন। দেবলোকে নীতিবোধ শিথিল—এই যদি লোকের ধারণা হয় তবে সমাজে সেই শিথিলতা প্রশ্রয় পেতে পারে এই ছিল প্লেটোর আশঙ্কা। দেবতার মানহানি আমাদের মহাকাব্যেও অল্পবিস্তর ঘটেছে। সমাজে যে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে তারও প্রমাণ রয়েছে সাধারণ প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যে দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছেন মানুষের বেলা। অবশ্য রসিক ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন যে কবিরা কিছু অন্যায় করেননি। সারাক্ষণ দেবতার মান বাঁচিয়ে চলতে হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ কাউকে দেননি। বরং কবিরা দেবলোকের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে রম্যজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়েছেন। অ্যারিস্টটল প্লেটোকে পুরাপুরি সমর্থন করেননি। তাঁর মতে সাহিত্য রসের বিচারেই মুখ্য বিচার—নীতির প্রশ্ন গৌণ। আনন্দদান সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য—কতখানি আনন্দ দিয়েছে তাই দিয়ে তার শেষমূল্য যাচাই হবে। কিন্তু অ্যারিস্টটল এই সূত্রে বলতে ভোলেননি যে, সেই আনন্দকে নির্মল (সেন অ্যাণ্ড হোলসাম) হতে হবে। সাহিত্য ব্যক্তিগত সৃষ্টি কিন্তু সমাজের সম্পদ। সুতরাং সেই আনন্দ সুবুদ্ধি প্রণোদিত এবং সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হওয়া বাঞ্ছনীয় একথা যদি কেউ বলেন তো আপত্তির কোন কারণ দেখিনা।

রমণী স্বভাবের সঙ্গে সাহিত্যের স্বভাবের মিল আছে সে কথা গোড়াতেই উল্লেখ করেছি। রমণীর যেমন খানিকটা আব্রু সব সময়েই প্রয়োজন সাহিত্যেরও সেই আব্রুর প্রয়োজন আছে। কতটুকু অন্দর মহলে প্রবেশের অধিকার পাবে আর কোন জিনিসকে সদর দরজা থেকেই বিদায় করতে হবে লেখকের আপন রসবোধই তার নির্দেশ দেবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রসের নিজেরই একটা আব্রু আছে। বর্তমান সাহিত্যে যে একটা বে-আব্রু ভাব দেখা দিয়েছে সেই আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যরসের স্বভাবজাত আব্রুর কথা উল্লেখ করেছেন। নীতি দুর্নীতির প্রশ্ন তিনি তোলেননি। তাঁর মতে যিনি সত্যিকারের রসিকব্যক্তি তাঁর মনের একটি আভিজাত্য আছে সেই আভিজাত্যই ঐ আব্রু রচনা করে। এককালে সকল দেশের কবির স্থান ছিল রাজ-সভায়, গুণীকে সভার-গুণপনার প্রমাণ দিয়ে তবে সমাদর লাভ করতে হত। সভ্য রসিকতা

দিয়ে সম্মান লাভ সম্ভব ছিলনা। আজকে রাজার স্থান দখল করেছে জনসাধারণ। আপাতদৃষ্টিতে জনসাধারণ নামক জীবটি স্থূল প্রকৃতির বলে মনে হতে পারে, কিন্তু রসগ্রাহিতায় সে খাটো এমন মনে করবার কোন কারণ নেই আধুনিক লেখকদের মধ্যে অনেকে এই ভুলটি করেছেন। অতি সহজে পাঠকের মন পাবার জন্যে খাঁটি রসের পরিবর্তে সস্তা উত্তেজনার পরিবেশন করেছেন। রসের মান রাখেননি বলে সাহিত্যেরও মান রাখতে পারেননি। সাহিত্যের যদি মান যায় তবে সাহিত্যিককে মান দেবে কে?

রম্য রচনা

বহুকাল আগে সবে যখন কাঁচা হাতে রম্যরচনায় একটু আধটু মক্স শুরু করেছি সেই তখনই আমি একে আমার মানস-সুন্দরী আখ্যা দিয়ে রেখেছিলাম। মানস-সুন্দরী বলতে কেবল তো কল্পনায় গড়া একটি রূপসী নারীমূর্তি নয়। ব্যাপক অর্থে আপন মনে গড়া যে-কোনো সৌন্দর্য সৃষ্টিকেই মানস-সুন্দরী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আমার মনের ভাবনা বা কল্পনাকে যখন আমি মনের মতো করে সাজিয়ে পরিয়ে রূপ দিই তখন সেই আমার মানস-সুন্দরীর মূর্তি ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর মানস-সুন্দরীকে 'কবিতা কল্পনালতা' বলে সম্বোধন করেছেন তাতেই প্রমাণ যে তাঁর কল্পিত কাব্যকাহিনীই তাঁর মানস-সুন্দরী। শিল্পী সাহিত্যিক মাত্রই স্বীকার করবেন যে সুন্দর একটি কল্পনা এবং সুন্দরী একটি নারীমূর্তিতে কোনোই তফাৎ নেই। দুয়েরই মোহিনীমূর্তি; ব্যবহারেরও আশ্চর্য মিল। চপলা রমণীর মতো কল্পনাটিও ক্ষণিক ইশারা দিয়ে চকিতে মিলিয়ে যায়। মনের মধ্যে চলতে থাকে এই লুকোচুরি খেলা। পরে কখন এক সময়ে সুন্দরী আপনি এসে ধরা দেয়। এবার তাকে কথার পোশাক পরিয়ে সাজিয়েগুছিয়ে মনের মতনটি করে সর্বসমক্ষে হাজির করলেই হল। রস-সাহিত্যের জন্ম এভাবেই হয়। আর্টিস্টের ছবির বেলায়ও তাই—মনে যে ছবি অঙ্কিত হয়েছে ক্যানভাসে তারই প্রতিচ্ছবি।

কাব্যসাহিত্য তো আর কিছু নয়, মানুষের মনের গভীরতম চিন্তা এবং লাবণ্যময় মূর্তি। নিজের মনের কথাকে মনের মতো সাজিয়ে যে মূর্তি রচনা করেছি তাকে মানস-সুন্দরী বলবনা তো কাকে বলব? লোকে যাকে বলে রম্য রচনা আমি তাকেই বলি আমার মানসী, আমার মানস-সুন্দরী। আমি আপন মনের 'মাধুরী মিশায়ে তোমাকে করেছি রচনা' সে জিনিস রম্য তথা রমণীয় হবে না? রমণীদেহকে পুরুষ যে আদরে সোহাগে সাজায় পরায় ঠিক সেই আবেগ দিয়েই কবি, শিল্পী তাঁর কল্পনাটিকে রঙে রসে ফুটিয়ে তোলেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, আপন সৃষ্টির প্রেমে যে না পড়েছে সে কখনো রসস্রষ্টা হবে না। শিল্পী এবং সাহিত্যিক মাত্রই পিগ্‌মেলিয়ান-এর জ্ঞাতিভ্রাতা। আমাদের কবি তাঁর মানসসুন্দরীকে উদ্দেশ করে যে কথা বলেছেন, আমি আমার প্রত্যেকটি রচনা সম্পর্কে ঠিক সেই কথাটাই বলব—

'আমার অন্তর হতে লইয়া বাসনা
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি'

অপরে সেই মুখ দেখতে পায় কি না জানি নে। কিন্তু আমি আমার প্রত্যেকটি লেখার মুখাবয়ব স্পষ্ট দেখতে পাই। আমি এদের ভালবাসি, এরাই আমার মনোহারিণী মানস-সুন্দরী।

আপন স্বভাবের সঙ্গে মিশ খেয়ে গেলে যে জিনিসের সৃষ্টি হয় তা লেখককে যতখানি আনন্দ দেয়, পাঠককে ততখানি। স্বভাবজাত বলেই এ জিনিস স্বতঃস্ফূর্ত। যত্নকৃত অধ্যবসায় দ্বারা এ জিনিস আয়ত্ত করা সম্ভব নয়—ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। কেননা এখানে বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের প্রকাশটা বড়ো কথা নয়, আসল কথাটা হল ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। এজন্য ইংরেজি সাহিত্যে এর নাম হয়েছে Personal essay বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। সোজা কথায় জিনিসটি হল ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালী চিত্তের ক্ষণকালীন বহিঃস্ফুরণ। ইংরেজ মনীষী একে বলেছেন—a loose sally of the mind. আমরা এরই নাম দিয়েছি রম্য রচনা।

এ জাতীয় প্রবন্ধকার আগে কথক, পরে লেখক। অবশ্য লেখকমানুষরা সাধারণত—মুখচোরা স্বভাবের লোক। তাঁদের কলমের ডগায় যত সহজে কথা জোগায় জিবের ডগায় তত সহজে নয়। আবার এমন মানুষ দেখেছি যাঁরা চমৎকার আসর জমিয়ে গল্প করতে পারেন, কিন্তু সেই কথাকেই যদি লেখার পাতায় হাজির করতে বলা হল তো এমন আড়ষ্ট, এমন অপ্রতিভ মূর্তিতে দেখা দেবে যে তাকে আর সেই প্রাণবন্ত স্বতঃস্ফূর্ত কথা বলে চেনাই যাবে না। গুছিয়ে বলা আর গুছিয়ে লেখা এক কথা নয়। বেশির ভাগ মানুষই মুখে এক, কলমে আর। কিন্তু আমি যে জাতীয় প্রবন্ধের কথা বলছি, সে-জাতীয় প্রবন্ধের রচয়িতারা আর যাই হোন মুখচোরা মানুষ নন। এঁরা বলিয়ে-কইয়ে মানুষ। ভারতচন্দ্র বলেছিলেন, 'পড়িয়াছি যেই মত বর্ণিবারে পারি'; এঁদের কথা হল—বলিয়াছি যেই মত লিখিবারে পারি। এটা বড়ো কম কথা নয়। শব্দের কলরবকে নিঃশব্দের কলেবর দেওয়া রীতিমতো কঠিন কাজ।

এঁদের মন মজলিসী মন। বন্ধু মজলিসে যে কথা রসিয়ে জাঁকিয়ে বলতে ভালবাসেন, সে কথাই বৃহত্তর মজলিস অর্থাৎ বিস্তৃততর পাঠক সমাজকে উদ্দেশ করে লিখে থাকেন। এ ধরনের লেখার আসল রূপ হচ্ছে মজলিসী রূপ।

আর মজলিসী মানুষের প্রধান গুণ হল—তিনি অতি সহজে শ্রোতা কিংবা পাঠকের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন।

নিছক পাণ্ডিত্য দিয়ে এই অন্তরঙ্গ সুরটি ফোটানো সম্ভব নয়। কারণ পাণ্ডিত্য জিনিসটা লেখক এবং পাঠকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে। তা ছাড়া এ জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে পাণ্ডিত্যের অবকাশ তেমন প্রশস্তও নয়। কেননা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হচ্ছে এক ধরনের সাহিত্যিক বিশ্রম্ভালাপ—কেবলমাত্র কথার নেশায় কথা বলে যাওয়া—বলাটাই মুখ্য, বিষয়বস্তু গৌণ। দমকা হাওয়ায় মাথার টুপি উড়ে গিয়েছে, টুপির মালিক তার পেছন পেছন ছুটছেন—এই দৃশ্য নিয়ে ইংরেজি ভাষায় অনবদ্য রচনার সৃষ্টি হয়েছে। যৎসামান্য ব্যাপারও যে কত অসামান্য হতে পারে এ-সব লেখা তার প্রমাণ। ল্যাম, স্টীভেন্‌সন্‌ এ জাতীয় সাহিত্যের পথিকৃৎ; চেস্টারটন, বিয়ারবোম, বেলক, লিণ্ড, গার্ডিনার এঁদের উত্তরাধিকারী। আমরা যাকে trifles বলি সে যে কতখানি tremendous trifles হতে পারে এঁরা তাই আমাদের শিখিয়েছেন। এঁরা যা-তা নিয়ে লিখেছেন, কিন্তু কস্মিনকালেও যা-তা লেখেন নি বরং রসে লালিত্যে কৌতুকে এ-সব রচনা সাহিত্যের দরবারে প্রথম শ্রেণীর আসন পাবার যোগ্য। একটি কথা এঁরা খুব ভালো করে জানেন যে এ জাতীয় লেখার মধ্যে লজিকের চেয়ে ম্যাজিকের প্রয়োজন বেশি। বলা বাহুল্য, এখানে ম্যাজিক মানে রস।

প্রবন্ধ বলতেই আমরা বুঝি তথ্যবহুল তত্ত্বগভীর ঠাসবুননি ধরনের সামগ্রী। সেকেলে গহনার মতো নিখাদ সোনার তাল—যেমনি মোটা তেমনি ভারী। যিনি পরেন তাঁর ওজন বাড়ে, রূপ বাড়ে কিনা সন্দেহ। মনে রাখতে হবে যে, সোনা এক জিনিস, গহনা আরেক; একটির মূল্য ওজনে আরেকটির কারুশিল্পে। সোনা মাত্রই যেমন গহনা নয়, প্রবন্ধ মাত্রই তেমনি সাহিত্য নয়।

প্রবন্ধ সাহিত্যকে আমরা সাধারণত পাণ্ডিত্যের বাহন বলেই জানতুম। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধকে পাণ্ডিত্যের বোঝা থেকে মুক্ত করেছিলেন, আর বীরবল প্রাকৃত ভাষার মারফতে তার প্রকৃতি দিয়েছিলেন বদলে। এঁদের প্রবন্ধের মধ্যে কোনো তত্ত্বকথা থাকত না বললে ভুল বলা হবে। তত্ত্বকথা তাঁরাও বলেছেন, তবে তাকে রসে ডুবিয়ে পরিবেশন করেছেন। এজন্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে লিরিকের আমেজ আছে। আর বীরবল wit-এর চুমকি বসিয়ে প্রবন্ধকে ঝলমলে করে আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। গভীর সুরে গভীর কথা-বলাকেই আমরা প্রবন্ধ রচনার আর্ট বলে জানতুম, কিন্তু হালকা সুরেও যে গভীর কথা বলা চলে সে কথা আমাদের জানতে বাকি ছিল। অর্থাৎ কিনা

রসবেত্তার কথায় যে সারবত্তাও থাকতে পারে এই কথাটি তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

এই জাতীয় লেখা প্রথমাবধিই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলে পরিচিত হয়ে এসেছে; ফলে বেশিরভাগ লোক একে রম্য রচনা বলতে শুরু করেছেন। রম্য রচনা নামটাতে আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে, তার কারণটি এইখানে বলে নিই। আমার মতে সার্থক রচনা মাত্রই রমণীয় রচনা। কোনো বিশেষ ধরনের রচনাকে যদি আগে ভাগেই রম্য রচনা নাম দিয়ে বসে থাকি তা হলে তার নামের মধ্যেই একটি সার্টিফিকেট জুড়ে দেওয়া হয়। সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। ধরুন, এর পরে কেউ যদি বলেন অমুক রম্যরচনাটি যথার্থ রসোত্তীর্ণ হয় নি, তবে তার রম্যরচনা নামের সার্থকতা রইল কোথায়? ল্যাম, স্টীভেন্‌সন্‌ যে-সব প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তাদের ধরেই কেউ belles lettres নাম দেয় নি; কালের বিচারে তারা সে নাম অর্জন করেছে। আমাদের দেশে এখন অসংখ্য ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, এদের মধ্যে যে-সব রচনা রসের বিচারে উত্তীর্ণ হবে তারাই একদিন রম্য-রচনা নামের অধিকারী হবে। নামে অনেক কিছু যায় আসে বলেই এই কথাটি বলতে হল। সব-কিছুর আদিতে নাম। নামে গলদ থাকলে গোড়ায় গলদ থেকে যায়।

রচনা মাত্রই যখন রম্য রচনা নয়, প্রবন্ধ মাত্রই তেমনি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নয়। সাধারণ প্রবন্ধে বক্তব্য-বস্তুটা প্রধান। লেখকের একটি প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে, সেটিকে তিনি যুক্তিতর্কের দড়ি-দড়া বেঁধে বেশ মজবুত চেহারা করে পাঠকের সামনে পেশ করেন। কোনো কোনো দেহের গঠন যেমন পেশীবহুল, এদের গঠন তেমনি যুক্তিবহুল। এই জাতীয় প্রবন্ধে বক্তব্যটা প্রমাণ সাপেক্ষ, ব্যক্তিত্বের মুখাপেক্ষী নয়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে ব্যক্তিত্বটাই প্রধান, বক্তব্য অপ্রধান। সেখানে লেখাটা বক্তব্যের ভারে কাটে না, ব্যক্তিত্বের ধারে কাটে। বলবার কিছুই নেই অতএব লিখলুম না—কেবলমাত্র এই কথাটি বলবার জন্যে অনায়াসে সাত পাতা প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে এবং তাতেও লেখকের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেতে পারে। শুধু তাই নয়, সবটা মিলিয়ে জিনিসটা রসোত্তীর্ণ হতেও বাধা থাকে না। সেটা সম্ভব হয় কেবলমাত্র লেখকের ব্যক্তিত্বের গুণে। যে মানুষের সাধা গলা, তিনি যদি বিশেষ কোনো গান না করে শুধু আপন মনে সুর ভাঁজেন সেটি যেমন শ্রোতার মনকে আকর্ষণ করে, এও তেমনি। প্রবন্ধকারের মনটি সাধা মন, বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ—অনেক দেখেছেন, অনেক জেনেছেন, অনেক শুনেছেন, অনেক পড়েছেন, অনেক ভেবেছেন। সেই

বহুলক্ষতার প্রসাদে মনটি কানায় কানায় পূর্ণ—তারই খানিকটা যখন ছলাৎ করে লেখার পাতায় উপচে পড়ল তখন সে জিনিসের আর তুলনা হয় না। সাহিত্যে সেটি নিঃসন্দেহে রম্য সৃষ্টি। তার মধ্যে কাব্য আছে, নাট্য আছে, কাহিনী আছে, ইতিবৃত্ত আছে, আপন মনের কল্পনা আছে, কৌতুকহাস্যের দ্যুতি আছে, সজল চোখের মিনতি আছে—লেখকের বিচিত্র মনের চিত্রিত বিবরণ।

কোনো কোনো সমালোচকের মতে এ জাতীয় প্রবন্ধ রচয়িতারা বেশিমাত্রায় আত্মসচেতন; অর্থাৎ কিনা, এঁদের লেখার মধ্যে উত্তমপুরুষেরই প্রাধান্য। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের স্রষ্টা ফরাসী সাহিত্যক মঁতেন (Montaigne)। তিনি গোড়াতেই বলে নিয়েছেন "It is myself that I portray"। ইংরেজ প্রবন্ধকার জে. বি. প্রিস্টলির মতে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সম্বন্ধে এটিই প্রথম এবং শেষ কথা। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে প্রবন্ধকার স্বয়ংই হচ্ছেন হিরো, তাঁকেই কেন্দ্র করে সমস্ত দুনিয়া চলছে। প্রত্যেকটি রচনা তাঁরই আত্মচরিতের টুকরো অংশ। ল্যাম্-এর প্রবন্ধাবলী তাঁর আত্মচরিত্র ছাড়া আর কি? প্রত্যেকটি পাতা স্মৃতি বিজড়নে স্নিগ্ধ। কোথাও হালকা কৌতুকে উজ্জ্বল, কোথাও অশ্রুবাষ্পে সজল। নিজস্ব ভালো লাগা না-লাগা দিয়ে সব কিছুর বিচার। তার ফলে এঁদের মতামত অল্পবিস্তর একপেশে হতে বাধ্য। কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। ইনি যা বলছেন তা যুক্তিগ্রাহ্য কিনা সে কথা অবান্তর, সবটা মিলিয়ে জিনিসটা রসগ্রাহ্য কিনা সেটাই বিবেচ্য।

বিষয়বস্তু নির্বিশেষে রসসৃষ্টি সম্ভব কি সম্ভব নয় তারই মধ্যে ভাষার আসল শক্তিপরীক্ষা। সুখের বিষয়, বাংলাভাষা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। অতি অল্পদিনের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ যে অভাবনীয় বিস্তার লাভ করেছে তা সত্যই বিস্ময়কর। এর কৃতিত্ব বহুল পরিমাণে পাঠকদের প্রাপ্য। গল্প নয়, উপন্যাস নয়, ছন্দোবদ্ধ কবিতা নয়, শুধু রসগ্রাহ্য করে কথা বলতে পারলে আগ্রহবান শ্রোতার যে অভাব হয় না, সাহিত্যিক আবহাওয়ার পক্ষে এটি অতি শুভ সূচনা। পাঠক-সমাজ যেখানে এতটা রসগ্রাহী, লেখক সমাজকে সেখানে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, এখানে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করছি। এই খাদ্য সংকটের দিনে নন্‌সিরিয়েল ফুড বলে একটা কথার প্রবর্তন হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নামে বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে যা চলছে তার একটা অংশকে একধরনের নন-সিরিয়েল লিটারেচর বলা যেতে পারে। এর মধ্যে হাস্যকৌতুক আছে, রসোজ্জ্বল উক্তি আছে, আলঙ্কারিক বাক্যপ্রয়োগ

আছে, কিন্তু খাঁটি সাহিত্যের রস খুব বেশি নেই। আমরা এর সমস্তকেই রম্য রচনা বলে চালিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সে জিনিসটার আসল রূপ যে কী, ল্যাম্-এর যে কোনো প্রবন্ধের দু-পাতা পড়লেই রসিক পাঠক তা বুঝতে পারবেন। বারো আনা জার্নালিজমের সঙ্গে সিকি পরিমাণ সাহিত্যের ব্যাসন মিশিয়ে দিলেই সেটা সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে না। জার্নালিজমের ধর্ম এক, সাহিত্যের ধর্ম আর।

স্যাটায়ার

লাতিন কবি জুভেনালকে স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ-রসাত্মক রচনার আদি গুরু বললে খুব ভুল হয় না। অবশ্য তার আগেও গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যে বিদ্রূপাত্মক রচনা লেখা হয়েছে, কিন্তু প্রাচীন স্যাটায়ারিস্টদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা। জুভেনাল সর্বসমেত ষোলটি স্যাটায়ার লিখেছিলেন। প্রথম স্যাটায়ারটি তৎকালীন কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে রচিত। প্রথম বাক্যেই বলছেন, আমি কি চিরকাল শ্রোতা হয়েই থাকব? অপরের রচনা-কবিতা, নাটক শুনে শুনে আমার কান ঝালা-পালা হয়েছে আর কিছু না হোক এর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই আমাকে লেখনী ধারণ করতে হবে। আমার কানের ওপর যারা অতখানি অত্যাচার করেছে তাদের আমি অত সহজে ছাড়ছিনা। তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন অপাঠ্য জিনিস পাঠ করে যখন অতিষ্ঠ বোধ করেছেন তখনই তাঁর লেখার তাগিদ এসেছে। বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি নে, আমি যে যৎকিঞ্চিৎ লিখে থাকি তারও মূল কারণটা ঐখানে। আমি জাত লিখিয়ে নই, নিজেকে বিধিদত্ত ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করিনা, লেখার জন্য কেউ আমাকে মাথার দিব্যিও দেয়নি। তবু যে লিখি তার কারণ খুব আজে বাজে জিনিস পড়ে পড়ে যখন আমার মন মেজাজ খিঁচড়ে যায় তখনই আমার লেখার জিদ চেপে বসে। লোকে বলে লিখতে হলে প্রসন্ন মনে লিখতে হয়, আনন্দ থেকেই রসের জন্ম। কিন্তু রস যে সব সময়েই মধুর রস হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। আমার লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা বলেন, আমার লেখায় তিক্ত রসটাই বেশি অর্থাৎ ওঁদের মতে আমিও একজন খুঁদে স্যাটায়ারিস্ট। অবশ্য আজকের দিনে অধিকাংশ লেখকই পুরোপুরি না হলেও অংশত স্যাটায়ারিস্ট—গল্প উপন্যাস, কবিতা নাটক সব কিছুতেই একটু টক তেতো না হয় তো ঝাল লঙ্কার ঝাঁঝ মেশানো।

কিছুকাল আগে আমি মানব সমাজের বিশেষ দুটি চরিত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি—এদের একজন সিনিক আরেকজন ব্ল্যাসফেমার। এখন যে ব্যক্তি স্যাটায়ারিস্ট নামে পরিচিত সে এদেরই জ্ঞাতিভ্রাতা। আজকের সমাজে এঁর পশার প্রতিপত্তি পূর্বোক্তদের চাইতে ঢের বেশি। তিনটি চরিত্রের মধ্যে চারিত্রিক মিল অতি সুস্পষ্ট। তিনজনই নিন্দুক; নিন্দুক বললে কম বলা

হয়। এরা বিদ্রোহী—ধর্মদ্রোহী, রাজদ্রোহী, সমাজদ্রোহী। তিনের মধ্যে যেমন মিল তেমনি অমিলও কিছু আছে। ব্ল্যাসফেমার নিন্দুক হয়েও নিজে বহুনিন্দিত ব্যক্তি। তাঁর সম্বন্ধে ধারণা তিনি শ্রদ্ধেয়কে অশ্রদ্ধেয় করবার চেষ্টা করেন। অবশ্য এ অভিযোগ সব সময়ে সত্য নয়। অতীতে দেখা গিয়েছে, যে সব উক্তির জন্য তিনি সমাজে নিন্দিত এবং রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়েছেন তার সবই অন্যায় উক্তি এমন নয়। বরং কালক্রমে প্রমাণিত হয়েছে যে, তার বেশির ভাগ কথাই যুক্তিসঙ্গত। ইদানীং কালের ব্ল্যাসফেমাররা অবশ্য নিতান্ত বাহাদুরি দেখাবার জন্যে অনেক সময় প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য, সেটা সব সময়ে সমর্থনযোগ্য নয়।

আদি যুগের সিনিক ফিলজফি ছিল গভীরতর। তাঁরা সমাজজীবনের আপাত মনোহর বহু জিনিসের মুখোস খুলে দিয়েছিলেন, কোন প্রকার কৃত্রিমতাকে প্রশ্রয় দেননি, সকল প্রকার তামসিকতার নিন্দা করেছেন। এ যুগে সব জিনিসই সস্তা হয়ে গিয়েছে, সিনিসিজমও। নাক সিঁটকিয়ে ঠোঁট উল্টিয়ে কথা বললেই এখন সিনিক সাজা যায়। সিনিসিজম এ যুগের মুদ্রাদোষ।

এটা ঠিক যে, ব্ল্যাসফেমি, সিনিসিজম, স্যাটায়ার এই তিনটিই বয়ঃপ্রাপ্ত সমাজের সৃষ্টি। আদিম সমাজে সরলচিত্ত মানুষ সব কিছুকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করত। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে নানা সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। সভ্যমানুষের মন প্রশ্নসঙ্কুল মন। যেখানে ছিল দ্বিধাহীন বিশ্বাস সেখানে এসেছে যুক্তিসন্ধানী জিজ্ঞাসু মন। গোড়ার দিকে ব্ল্যাসফেমি বা সিনিসিজম যতখানি সোরগোলের সৃষ্টি করত এখন আর ততখানি করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের মন এখন সবরকম পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত। আজকের দিনে ব্ল্যাসফেমির জন্য কাউকে প্রাণ দিতে হয়না, বড় জোর এক আধটু গালাগাল খেতে হয়। গুরুতর রকমের মূল্য দিতে হয়না বলে ব্ল্যাসফেমিরও মূল্য কমে গিয়েছে। আদি যুগের সিনিক মতবাদও আজ লুপ্ত। এ যুগের সিনিকরা সব জিনিকে বাজার দরে যাচাই করে, ফলে কোন কিছুকেই তারা যথার্থ মূল্য দিতে জানে না।

কৌতুকের বিষয় যে, এককালে মূল্যবান জিনিসের মূল্য হ্রাসের বিরুদ্ধে এঁরা প্রতিবাদ জানাতেন কিন্তু এখন এঁদের একমাত্র কাজ হয়েছে সব জিনিসের মূল্য হ্রাস করে দেওয়া। সিনিক এবং ব্ল্যাসফেমার দুজনেই নিজ নিজ সম্মানের আসন অনেক খানি খুইয়ে বসে আছেন। এককালে তাঁদের উভয়ের ইচ্ছে ছিল সমাজকে সংস্কার করা, এখন এঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সমাজকে চমকে

দেওয়া। স্বীকার করতেই হবে, এটা খুব একটা কিছু মহৎ উদ্দেশ্য নয়। এ যুগের ব্লাসফেমি এবং সিনিসিজম এর মধ্যে প্রশংসনীয় খুব বেশি কিছু নেই তথাপি সাহিত্য রসিক হিসেবে আমি এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ কারণ সাহিত্যে এঁরা যথেষ্ট রসের সঞ্চার করেছেন।

সমাজে যে সম্মানের আসন সিনিক এবং ব্লাসফেমার নিজ দোষে হাত ছাড়া করেছে সে আসন আজ গ্রহণ করেছে স্যাটাররিস্ট। ব্লাসফেমি এবং সিনিসিজম এ দু'-এর গুণ সন্নিপাতে স্যাটায়ারের জন্ম। ব্লাসফেমির মধ্যে আছে চ্যালেঞ্জের ভাব, সিনিসিজমের মধ্যে অবজ্ঞার। এই দু'-এর মিশ্রণে মানুষের মনে যে সুতীব্র indignation-এর সৃষ্টি হয় তাই থেকে স্যাটায়ারের জন্ম হয়েছে। ব্লাসফেমি এবং সিনিসিজম বাস্তব জীবনে যে আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং শিল্পসাহিত্যে যখন তা প্রতিফলিত হয়, তখন তাই স্যাটায়ারের রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ স্যাটায়ার হল গিয়ে ব্লাসফেমি এবং সিনিসিজমের-এর রসায়িত রূপ। আজকের দিনের যে সুসভ্য সমাজ তা এই তিনের ত্র্যহস্পর্শের ফল। সৃষ্টির মধ্যে একদা যা ছিল অজ্ঞাত এবং অর্ধপরিস্ফুট বিজ্ঞান এসে তার ঢাকনা খুলে দিয়েছে। দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ যেমন ব্লাসফেমি, বিজ্ঞান কর্তৃক বিশ্বরহস্যের বস্ত্রহরণ তেমনি ব্লাসফেমি। অসভ্য সমাজে যেমন থাকে অজ্ঞানতার আবরণ, সভ্যসমাজের গায়ে তেমনি দেখা দেয় আরেক জাতীয় আবরণ—সেটা ভান ভণ্ডামি কৃত্রিমতার আবরণ। যারা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তাঁরা সেই আবরণ উন্মোচন করেন। প্রাচীন সমাজে এই কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন ব্লাসফেমার এবং সিনিক। আজকের সমাজে এ দু'-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন স্যাটায়ারিস্ট। স্যাটায়ারিস্ট একাধারে সিনিক এবং ব্লাসফেমারও বটে। এরা তিনজনেই প্রটেস্টেন্ট অর্থাৎ এদের মনোভঙ্গি প্রতিবাদমূলক। ব্লাসফেমি অপেক্ষাকৃত বিনয়ী ; সে বলে, তুমি এতকাল যা ভেবে এসেছ সে তোমার ভ্রান্ত ধারণা—অতএব আমার কথা শোন। সিনিসিজম দুর্বিনীত ; সে বলে, তোমাকে বলে কিছু লাভ নেই, উপদেশো হি মূর্খানাং ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সমাজ এদের কখনো সুনজরে দেখেনি। হাটের মাঝখানে কারো বিদ্যে বুদ্ধি চরিত্র ফাঁস করে দিলে কেউ খুশি হয়না। স্যাটায়ারও ঐ কাজই করেছে কিন্তু অপেক্ষাকৃত চাতুর্যের সঙ্গে করেছে। সে হাসি মুখে কঠিন কথা বলেছে। অর্থাৎ বিদূষণ ক্রিয়ার সঙ্গে বিদূষকের আর্ট মিশিয়ে নিয়েছে। যাকে হাস্যকর করেছে তাকেও হাসিয়েছে। সমাজের একটা সমষ্টিগত রসবোধ আছে। সামাজিক রসচর্চার অন্য নাম পরচর্চা। পরনিন্দা পরচর্চাকে অনেকে নিন্দনীয়

মনে করেন, আমি করি না। পরচর্চাকে আমি মস্ত বড় আর্ট বলে মনে করি; সমাজকে সে জীবন্ত রেখেছে, ও জিনিস না থাকলে সামাজিক জীবন শুষ্ক, নীরস হয়ে যেত। স্যাটায়ার আর কিছু নয়, উঁচুদরের পরচর্চা। নিন্দাও যে অনিন্দনীয় হতে পারে, বিদ্রূপ যে সব সময়ে বিরূপতার সৃষ্টি করে না স্যাটায়ার তা প্রমাণিত করেছে। অরসিক মানুষেরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে জানেনা, তারা গালাগালি করতে জানে। সুদর্শন চক্রও অস্ত্র, ভীমের গদাও অস্ত্র। বেশীর ভাগ মানুষ ভীমের গদাই ব্যবহার করে, বরুণাস্ত্র বায়বাস্ত্রের ব্যবহার জানে না। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ যে কী ধারালো অস্ত্র সে কথা অনেকেরই জানা নেই। কোন মানুষকে যদি সর্বসমক্ষে হাস্যকর করে দেওয়া যায় সে যতখানি অপ্রস্তুত হয় গালাগাল দিলে ততখানি হয় না। খোঁচা দিয়ে কথা বলার মধ্যে রস আছে, ধার আছে। মাথায় বাড়ি দিয়ে কথা বলার মধ্যে কোন সৌন্দর্য নেই। সাত কোটি সন্তানেরে···রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ কর নি।—কথার মধ্যে নিঃসন্দেহে আঘাত আছে; কিন্তু ধার নেই কিংবা রস নেই এমন কথা কেউ বলবে না। অপর পক্ষে কোন ব্যক্তি যখন বলেন, বাঙালীর মত এমন হাড়ে বজ্জাত, হারামজাদা মানুষ পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই—এর মধ্যে ধারই বা কোথায় রসই বা কোথায়? একেই বলে ভীমের গদা, অস্ত্র হিসেবে অত্যন্ত স্থুল। ভীমের কোন sense of humour ছিল না, সূক্ষ্মরসবোধ ছিল না। তাঁর গদাটি সেই স্থুলতার প্রতীক। হাস্যরসাত্মক আক্রমণকেই বলে satire, হাস্যরসবর্জিত আক্রমণকে বলে invective—একটি art অপরটি dirt। স্যাটায়ার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, it pleases even when it hurts. সমষ্টিকে আঘাত করলে ব্যক্তি বিশেষের গায়ে বড় একটা লাগে না; কেউ নিজের গায়ে পেতে নেয় না, সকলেই উপভোগ করে। অবশ্য স্যাটায়ারে ব্যক্তিগত আক্রমণের দৃষ্টান্তও প্রচুর আছে—পোপ ড্রাইডেনের কাব্য, বিশেষ করে পোপ-এর কাব্য তার নিদর্শন। কিন্তু সত্যিকারের রসসৃষ্টি হয়েছিল বলে আজকের দিনেও তা উপভোগ্য। সে কালও নেই, সেই ব্যক্তি বিশেষরাও নেই কিন্তু রসটুকু থেকে গিয়েছে। রস যত সূক্ষ্ম হবে তত বেশি দীর্ঘস্থায়ী এবং দূরগামী হবে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে রচিত আরিস্টফেনিস্-এর স্যাটায়ার আজও সুখপাঠ্য। অনেকের ধারণা স্যাটায়ার খুব উঁচু দরের জিনিস নয়; তাঁদের মতে এটি সৎসাহিত্যের তালিকায় পড়ে না। তাঁরা মনে করেন, এ জিনিস অতিমাত্রায় সাময়িকতা দোষ-দুষ্ট এবং সেই হেতু স্বভাবতই স্বল্পায়ু। এ অতি ভুল ধারণা। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, জুভেনাল, সারভেনটিস, সুইফট স্যাটায়ার রচনা করেই

পৃথিবীর সাহিত্যে ক্লাসিক আখ্যা লাভ করেছেন। এই সূত্রে একটা কথা মনে হচ্ছে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্য অনস্বীকার্য কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে স্যাটায়ার নেই। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এখানে ওখানে খুচরো ভাবে ছড়িয়ে থাকতে পারে, কিন্তু নিছক ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্য বলে কোন জিনিস আছে বলে মনে করিনা। পণ্ডিতদের মুখে একটি গ্রন্থের নাম শুনেছি—বিশ্বগুণাদর্শচম্পূ—দুই বন্ধু দেশ পর্যটনে বেরিয়েছেন। এক বন্ধু যে জিনিসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, অপরজন তারই নিন্দায় মুখর। মনে রাখা প্রয়োজন যে, নিন্দা করলেই স্যাটায়ার হয় না, স্যাটায়ারের নিজস্ব একটা ভঙ্গি আছে। আমার মনে হয় উক্ত সংস্কৃত গ্রন্থ স্যাটায়ার নয়, একদেশদর্শিতার দোষ প্রদর্শনই ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। আসল কথা আমাদের দেশে সেকালের মানুষ সমাজকে বড় বেশি সমীহ করে চলত, সহজে তাকে ঘাটাতে চাইত না। এই কারণে সে যুগে স্যাটায়ার রচিত হয়নি। স্যাটায়ার এ দেশে এসেছে অপেক্ষাকৃত হাল আমলে। বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ রসের প্রথম আভাস দেখা গিয়েছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে। অন্তত তাঁর মনের গঠন স্যাটায়ারের উপযোগী ছিল। তবে পুরোপুরি স্যাটায়ার রচনা ইংরেজের আমলেই হয়েছে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে।

কারো কারো ধারণা স্যাটায়ার হাল্‌কা ধরনের রস রচনা। লেখার ভঙ্গিটা হাস্যরসাশ্রিত বলে অনেকে এই মারাত্মক ভুলটি করেন। বাস্তবিক পক্ষে স্যাটায়ার সব সময় গুরুতর বিষয় নিয়ে রচিত। তার কার ব্ল্যাসফেমি, এবং সিনিসিজম-এর মতো স্যাটায়ারও সংস্কার প্রয়াসী। সমাজের বহু জঞ্জাল স্যাটায়ারের আঘাতে দূরীভূত হয়েছে। তবে এক শ্রেণীর স্যাটায়ারিস্ট আছেন তাঁরা শুধু ভাঙবার প্রয়াসী, গড়বার ক্ষমতা তাঁদের নেই। এঁদের বলা যেতে পারে demolition squad। এমন যে বার্নার্ড শ তিনিও এঁদের অন্যতম। একজন বলেছেন, Shaw's genius was for intellectual slum-clearance, not for town-planning.

তা হলেও শ' আমাদের প্রণম্য কারণ সাহিত্যকর্মে রসসৃষ্টিই মুখ্য, সাংসারিক উদ্দেশ্য গৌণ।

সাহিত্যে যত রকমের রস আছে তার মধ্যে এখন ব্যঙ্গরসের প্রয়োগ সব চাইতে বেশি বিস্তৃত। আগেই বলেছি গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক সব কিছুর মধ্যে ব্যঙ্গ অনুপ্রবেশ করেছে। চিত্রশিল্পে কার্টুনের জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়ছে। এখন মানুষের স্বভাব হয়েছে একে অন্যকে খোঁচা দিয়ে কথা বলা। কেউ কারো মান রেখে কথা বলেনা। এই স্বভাবই বা হলো কি করে? এরও

গভীরতর কারণ আছে। আগে মানুষ জীবনকে, সংসারকে অনেক বেশি সম্ভ্রমের চোখে দেখত। এখন জীবন এত কঠিন হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ মনে করে জীবন তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে। সেই কারণে সেও ফিরে জীবনকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে। তাতেই যা একটু সান্ত্বনা। মানুষের চোখে সংসারের রূপ যখন বদলে যায় তখনই কথায় বার্তায় আচারে ব্যবহারে বিদ্রূপ প্রাধান্য লাভ করে। স্যাটায়ার এখন সর্বব্যাপী। পৃথিবীতে এই সবে সত্যিকারের স্যাটায়ারের যুগ এসেছে। এককালে সমাজ ব্ল্যাসফেমারকে জীবন্ত দগ্ধ করেছে, এখন সেই ব্ল্যাসফেমি স্যাটায়ার নাম গ্রহণ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে।

শিল্পে-সাহিত্যে জীবনে

মহাকাব্যের কবি মধুসূদন

মহাকবি হতে গেলে মহাকাব্য রচনা করতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। মধুসূদন যদি মেঘনাদবধ রচনা না করে শুধু সনেট ক'টি লিখে যেতেন তাহলেও তিনি আমাদের প্রথম শ্রেণীর কবি বলে গণ্য হতেন। মহাকাব্যের চল এ যুগে উঠে গিয়েছে। এ যুগের কোন মহাকবিই মহাকাব্য রচনা করেননি—শেক্স-পীয়ার না. গ্যোয়টে না, রবীন্দ্রনাথ না। মধুসূদনের কৃতিত্ব এই যে তিনি মহাকাব্য রচনা করেও মহাকবি বলে পরিচিত হতে পেরেছেন। কাজেই মধুসূদনকে জানতে হলে, বুঝতে হলে মহাকাব্যের রচয়িতা হিসাবেই তাঁকে জানতে হবে।

অভিধানমতে কোন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত সুবৃহৎ কাব্যকেই বলে মহাকাব্য। সাধারণত মহাকাব্য বলতেই আমরা মনে করি সেটি একটি মহাকায় কাব্য। আসলে কিন্তু কায়া দিয়ে এর বিচার নয়। মহাকাব্য কেবলমাত্র বৃহৎ কাব্য নয়, মহৎ কাব্য। আবার সে কাব্যই মহৎ যার জগৎটা বৃহৎ। অবশ্য কালে কালে সব জিনিসেরই আকৃতি প্রকৃতি বদলে যায়। মহাকাব্য সম্বন্ধেও প্রচলিত ধারণা ক্রমে বদলে যাচ্ছে। প্রাচীন কালের সব অতিকায় জীব যেমন ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে—সাহিত্যসংসার থেকেও বৃহদাকার মহাকাব্য তেমনি অন্তর্ধান করছে। তাছাড়া সব সময়েই যে পুরাণবর্ণিত কিংবা ইতিহাস ঘটিত কোন কাহিনীকে আশ্রয় করেই মহাকাব্য রচনা করতে হবে এমনও নয়। এই ধরুন, টি. এস. এলিয়ট যে Waste Land নামক কাব্য রচনা করেছেন সেটি অতিশয় সংক্ষিপ্ত—সব মিলিয়ে পাঁচশো লাইনও নয়—তাহলেও তাকে এ যুগের মহাকাব্য বলা যেতে পারে। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক বহু ঘটনার ইঙ্গিত থাকলেও কোন বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করে এ কাব্য রচিত নয় তথাপি একে মহাকাব্য বলছি এই কারণে যে, এর মধ্যে মহাকাব্যের ব্যাপকতা আছে, এ যুগের সমগ্র জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কাব্য রচিত। মহাকাব্যের অন্যান্যগুণ—ভাবগাম্ভীর্য, ভাববিন্যাসের সৌকর্য এবং অনন্যসাধারণ কলাকৌশল—এ সমস্ত গুণই তাতে বিদ্যমান। সর্বোপরি একটি সুবিন্যস্ত জীবন দর্শনেরও ইঙ্গিত আছে। রবীন্দ্রনাথও আভিধানিক অর্থে মহাকাব্য রচনা করেননি। কিন্তু তিনি যে অসংখ্য গীতিধর্মী কবিতা রচনা করেছেন তাদের সম্মিলিত মূর্তি ব্যাপকতায় গভীরতায় ব্যঞ্জনায় সুষমায় যে কোন

মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনীয়। মধুসূদনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর পরবর্তী বাঙালী কবিরা অনেকেই মহাকাব্যে হাত মক্স করেছিলেন। কবি-জীবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের মনেও বোধকরি মহাকাব্য রচনার একটা অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত ছিল। ঐ যে পরিহাসের সুরে বলেছিলেন "আমি নামব মহাকাব্য সংরচনে ছিল মনে"—সেটা একেবারে উড়িয়ে দেবার কথা নয়। বিশেষ করে শেষটায় যে কথাটি বলেছেন তাতে আমার পূর্বোক্ত বক্তব্যটির সমর্থন আছে। গীতিকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁকে এমনভাবে সম্মোহিত করেছিলেন যে মহাকাব্যের কল্পনাটি "গেল ফাটি হাজার গীতে"। বলেছেন, "মহাকাব্য যে অভাব্য দুর্ঘটনায় পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়"। অর্থাৎ বলতে চেয়েছেন যে, সেই কণাগুলোকে একত্রে মিলিয়ে দেখতে পারলে তার মধ্যেই কল্পিত মহাকাব্যটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ জীবনের একটি সমগ্র চিত্র এর মধ্যে ধরা পড়েছে। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আধুনিক পাঠকের কাছে মহাকাব্য তার পূর্বতন সংজ্ঞা এবং অঙ্গসজ্জা ঘুচিয়ে দিয়ে ক্রমে ভিন্ন মূর্তি ধারণ করেছে।

মধুসূদন অবশ্য পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে প্রচলিত রীতি অনুসরণ করেই তাঁর মহাকাব্য রচনা করেছেন। হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিলটন তার গুরু। তাঁদের প্রদর্শিত পথেই তিনি চলেছেন। কিন্তু প্রকৃত কবি এবং শিল্পীর এই বিশেষত্ব যে, তাঁরা প্রচলিত রীতি অনুসরণ করলেও কথনোও গতানুগতিক পথে চলেন না। তাঁদের সৃষ্টি আপন বৈশিষ্ট্যের গুণে বিশিষ্ট, আপন প্রতিভার ছাপ তাতে পড়বেই। মধুসূদন তাঁর কাহিনীটি কবিগুরু বাল্মীকির কাছ থেকে ধার করেছেন। কিন্তু সে জিনিসকে তিনি যেভাবে উপস্থাপিত করলেন তাতে শুধু যে তার রূপান্তর ঘটেছে এমন নয়, গোত্রান্তর ঘটেছে বলতে হবে; কারণ সে কাহিনীর মূল আবেদনটিকেই তিনি বদলে দিয়েছিলেন। প্রতিভার স্পর্শে পুরাতনও নতুন হয়ে যায়। শেক্সপীয়ারের বেলায়ও এই জিনিসটি দেখা গিয়েছে। তাঁর নাটকের মাল-মসলা তিনি সেকালের বহুল প্রচলিত কতকগুলো কাহিনী থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর হাতে পড়ে যে সব ভূতপূর্ব কাহিনী এমন অভূতপূর্ব রূপ ধারণ করল যে, তাদের আর চেনাই যায় না। মধুসূদনও তাই করেছেন। পুরাতন কাহিনীটিকে ঘষে মেজে শুধু যে তার রূপ পরিবর্তন করেছেন এমন নয়, আগেই বলেছি, তিনি তার স্বরূপও বদলে দিয়েছিলেন। বাল্মীকির রাম-রাবণ আর মধুসূদনের রাম-রাবণ এক নয়। রঘুপতি রাজা রাম মধুসূদনের চোখে ভিখারী রাঘব। রাবণই তাঁর কাছে

'হিরো'র আসন লাভ করেছেন। বাল্মীকি রচনা করেছেন রামায়ণ, মধুসূদন রচনা করেছেন রাবণায়ণ।

ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী বলে সে যুগে কিছু বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল, এখন লোকে তা ভুলেই গিয়েছে। কারণ কাব্যবিচারে লৌকিক ভক্তি বিশ্বাসের ঐতিহ্যটা বড় কথা নয়, কাব্যের নিজস্ব একটা ঐতিহ্য আছে, সেটা শিল্পবোধের ঐতিহ্য। কবি যে আবেদনের সৃষ্টি করেন পাঠকের মন যদি তা স্পর্শ করে তাহলেই তার সৃষ্টি সার্থক। রঘুকুলপতির চাইতে তিনি যে রক্ষকুলপতির প্রতিই অধিকতর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, যে অনুভূতি পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়ে থাকলে বোঝা যাবে যে, শিল্পের আবেদন ঐতিহ্যের আবেদনের চাইতে বড়। মিলটনও তাঁর Satan-কে যথেষ্ট তেজবীর্যের অধিকারী হিসেবে দেখিয়েছেন, নানা গুণে গুণান্বিত করে দেখিয়েছেন। তাই যদি না হত তাহলে সর্বশক্তিমান বিধাতা-পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তিনি অযোগ্য বিবেচিত হতেন। সেদিক থেকে বাইবেলের Satan আর মিলটনের Satan এক নয়। কবি মানুষেরা নীতিবাগীশ নন, তাঁদের কাছে নীতির চাইতে শিল্পের দাবী বড়।

প্রতিভা জিনিসটা কখনই নিয়মতান্ত্রিক নয়। সে নিয়মমতে চলে না, সমান পথেও চলে না। বেড়া ভেঙে, আল ভেঙে, দুর্গম পথে আপন খুশি মতো এগিয়ে চলে। মধুসূদনের প্রতিভা সেই বাঁধভাঙা বাঁধন-ছেঁড়া দুঃসাধ্য সাধনের প্রতিভা। বিষয়বস্তুর বেলায় যেমন পুরাতনকে নতুন আকার দিয়েছেন, প্রকাশভঙ্গিতেও তেমনি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। এ যাবৎ বাংলা পদ্যের গতি ছিল আড়ষ্ট, পয়ারের ছন্দে চলি চলি পা করে চলত; প্রতি দু'পা এগিয়ে দম নিতে হত। পাখি যদি তার পাখার ব্যবহার না করে শুধু দু'পায়ের সাহায্যে চলে তখন তার গতি যেমনটা হয় তেমনি। যেটা তার স্বাভাবিক গতি নয়। প্রতি পদে যদি বিরতি ঘটে তাহলে গতির ধর্ম ব্যাহত হতে বাধ্য। মধুসূদন বাংলা কাব্যের পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে অবিরাম গতির স্বাচ্ছন্দ্য দিলেন। আমাদের ভাষায় ছন্দোবদ্ধ বাক্যকে বলে পদ। এজন্য কবিতাকে আমরা সাধারণ কথায় বলেছি পদ্য, আর যিনি সে পদ রচনা করেন তাঁকে বলেছি পদকর্তা। ফলে কবি এবং কাব্য উভয়কেই আমরা একটু ছোট করে দেখেছি। মিল দেওয়া পদ্য হলেই কাব্য হয় না, আর পদ্য রচয়িতা হলেই কবি হয় না। কারণ কবি শুধু অক্ষরের মিল খোঁজেন না। ভাষার একটা নিজস্ব melody আছে, তিনি সেই melody-কে আবিষ্কার করেন। প্রতি দুই পঙক্তিতে মিল না রেখে ভাষার সুর তাল বা মেলডি রক্ষা করে যথাযোগ্য স্থানে যতির ব্যবহার করেন।

আমাদের কাব্যে মধুসূদনই সর্বপ্রথম এই কাজ করলেন। তিনি যাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলেছেন, সেটি প্রকৃতপক্ষে অক্ষরের মিত্রতা বা মিল বর্জন করে ভাষার মিত্রতা অর্জন। ভাষার অন্তর্নিহিত সুর এবং ছন্দকে জাগ্রত করে দিয়ে তিনি বাংলা ভাষার যথার্থ কাব্যিক চরিত্রটিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন।

"সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে,"

রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন মেঘনাদবধ-এর সেই হঠাৎ থমকে যাওয়া লাইনটা। শুধু লাইনটাই তো থমকে যাওয়া নয়, সমস্ত বাংলা দেশই বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল এই ভেবে যে আমাদের এতকালের পরিচিত ভাষার মধ্যে এমন সুর তাল মাত্রা লুক্কায়িত ছিল! এ ছাড়া সাধারণত দেখা যায় মহাকাব্যের বিষয়বস্তুটি একটু গুরুগম্ভীর রকমের। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভাষার মধ্যেও সেই গাম্ভীর্যটি আনতে হয়। ভাবলে খুব অবাক লাগে যে আমাদের ভাষার অপেক্ষাকৃত অপরিণত অবস্থায়ও মধুসূদন ঐ সামঞ্জস্যটি রক্ষা করতে পেরেছিলেন। আমি যাকে সাধারণ কথায় ভাষার গাম্ভীর্য বলছি কাব্যা-লোচনায় একে বলা উচিত ভাষার সমারোহ, ইংরেজীতে যাকে বলে grandeur। এতখানি grandeur যে আমাদের ভাষার সাধ্যায়ত্ত ছিল মধুসূদনই সর্বপ্রথম সে বিষয় আমাদিগকে অবহিত করলেন।

সাধারণ পাঠকের কাছে মধুসূদন মহাকাব্য রচয়িতা হিসেবে পরিচিত, যদিচ খাঁটি মহাকাব্য বলতে তিনি একখানাই রচনা করেছেন—সেটি মেঘনাদ বধ কাব্য। তাঁর প্রথম কাব্য তিলোত্তমা সম্ভব-কে তিনি নিজে মহাকাব্য আখ্যা দেননি, বলেছেন 'মহাকাব্য জাতীয় কাব্য'। এর কারণ কাব্যশাস্ত্র মতে মহাকাব্যে কমপক্ষে আটটি সর্গ থাকা প্রয়োজন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যটি চার সর্গে সমাপ্ত অর্থাৎ আকারে-প্রকারে এটিকে পুরোপুরি মহাকাব্য বলা চলে না। এটি সুন্দ-উপসুন্দর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই দুই অসুর ভ্রাতার বলে-বীর্যে দেবতারা ভীত, সন্ত্রস্ত। অনন্যোপায় হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বারস্থ হলেন। ব্রহ্মা বিশ্বের সর্ববিধ সৌন্দর্য তিল তিল করে তুলে নিয়ে তিলোত্তমা নামে এক অপরূপা অপ্সরার সৃষ্টি করে অসুরদের রাজ্যে প্রেরণ করলেন। তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হয়ে সুন্দ-উপসুন্দ উভয়ে তাঁকে পাবার জন্য লালায়িত হল। ফলে দুই ভ্রাতায় বিবাদ বিসম্বাদ যুদ্ধ। দ্বন্দ্বযুদ্ধে উভয়ের মৃত্যু। দেবতারা বিপদমুক্ত হলেন, তিলোত্তমা নক্ষত্রের রূপ ধারণ করে নভোমণ্ডলে স্থান গ্রহণ করলেন।

মেঘনাদ বধ কাব্যের বিষয়বস্তু সকলেরই জানা আছে। নয় সর্গে সমাপ্ত এই এই কাব্য আকারে প্রকারে সৌষ্ঠবে বিষয়গৌরবে মহাকাব্যের সকল দাবীই পূরণ করেছে। বর্ণন চিত্রণে বাচনভঙ্গিতে বহু স্থানে হোমার ভার্জিলের অনুকরণস্পষ্ট; কিন্তু প্রতিভাগুণে সমস্তই নিজস্ব করে নিয়েছেন। কোথাও অসঙ্গতি নেই।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। রেনেসাঁসের প্রবল উদ্দীপনা ইংল্যাণ্ডের জীবনে যে নাটকীয় সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল তার থেকে এলিজাবেথীয় নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল। মধুসূদনের যুগে পাশ্চাত্যশিক্ষার সঙ্ঘাতেও বাংলাদেশেও এক নবজীবনের জোয়ার এসেছিল। তাকেও আমরা রেনেসাঁস আখ্যা দিয়েছি। নানা দিক থেকে বাঙালী জীবনেও এক নাটকীয় সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সেদিনের সেই উদ্দীপনায় নতুন এক নাট্যসাহিত্য সৃষ্টিই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের শতাধিক বৎসর পূর্ব থেকেই নাটকের একটি tradition ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। আমাদের সে tradition ছিল না। মাতৃকোষে বিবিধ রতনের মধ্যে নাটক ছিল না। তথাপি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মাতৃভাষার সেবায় মধুসূদন সর্বপ্রথম নাটকেই হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমাদের সদ্যোজাত নাটকের ক্ষেত্রে কোনো মহৎ কীর্তি রেখে যাওয়া খুব সহজসাধ্য হবে না। কাব্যের ক্ষেত্রে আমরা কতকটা পথ তবু এগিয়ে ছিলাম। সেখানে শক্তি পরীক্ষার এক নতুন পথে নতুনতর অভিযানের অবকাশ বেশি। প্রতিভাবানের প্রতিভাই তাকে বাঞ্ছিত পথে নিয়ে যায়। আরেকটি কথা মহাকাব্য যিনি রচনা করবেন তাঁর জীবনের মধ্যেই মহাকাব্যের উপকরণ সঞ্চিত থাকে। দান্তে মিলটনের জীবনে যেমন মধুসূদনের বেলায়ও তেমনি মহাকাব্যের উপকরণ তাঁর জীবনের মধ্যে নিহিত ছিল। মানুষের জীবনে যা কাম্য—কুলশীল, ধনমান, বিদ্যাবুদ্ধি, প্রতিভা কোন কিছুরই তার অভাব ছিল না। তথাপি জীবনের বহু আশা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকেছে—দুঃখ দৈন্য নিরাশায় জীবন বিধ্বস্ত হয়েছে। রক্ষকুলপতির স্বর্ণলঙ্কা যেমন ধ্বংস হয়েছে এও তেমনি। প্রতিভার উন্মাদনায়, ঐশ্বর্যের স্বপ্নে লঙ্কাধিপতির মতোই তিনিও গর্বিত উদ্ধত দৃপ্তস্বভাব। দুই-এর মননে বচনে স্বভাবে আশ্চর্য মিল। পরিণতিও এক। কাব্যের উপসংহারে রাবণের বিলাপ—'কি পাপে লিখিলা এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?' আর জীবনের অন্তপর্বে মধুসূদনের নিজ বিলাপ—'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়!' একই ভগ্ন হৃদয়ের হতাশ্বাস।. এইজন্যই বলতে চেয়েছি যে মহাকবির জীবনই একটি মহাকাব্য। Samson Agonistes যেমন মিলটনের জীবননাট্য, মেঘনাদ বধ তেমনি মধুসূদনের জীবনকাব্য।

জীবনশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

নদী এসে সাগরে মেশে; বলি সাগর সংগম, আমরা তাকে মাহাত্ম্য দিই। সাগর ছাড়াও তিন নদী এক জায়গায় এসে মিলল, বলি ত্রিবেণীসংগম, তাকেও মাহাত্ম্য দিই। সংগমে স্নান করে লোকে পুণ্যার্জন করে। মিলনের মিশ্রণের একটা মহিমা আছে, সেজন্যেই সকলের চোখে এর মাহাত্ম্য। একের সঙ্গে আরেক মিশে যোগফল হয় দ্বিগুণ অর্থাৎ গুণ বাড়ে। আবার দুয়ে মিল যে জিনিসের সৃষ্টি হয় সে জিনিস সম্পূর্ণ নতুন। সে প্রাণবান বেগবান, বিরাট বিচিত্র। এই নতুনকে বৃহৎকে বিচিত্রকে পাওয়াই পুণ্যার্জন। এই যেমন নদীর মিলন তেমনি আছে কালের মিলন, যুগের মিলন। এক যুগ গিয়ে আরেক যুগ যখন দেখা দেয় তখন তাকে বলি যুগসন্ধি। তাকেও একই কারণে বলা যেতে পারে পুণ্যসংগম। একটা প্রচলিত জীবনধারার সঙ্গে একটা অপরিচিত জীবনধারার যখন সংযোগ ঘটে তখন জীবনের বিস্তার বাড়ে, বৈচিত্র্য বাড়ে, সম্ভাবনা বাড়ে। যুগসন্ধির সেটাই মহিমা।

নবাবী আমল গিয়ে বিলিতি আমল এসেছে। নতুন মাত্রই আসে বহু সম্ভাবনা নিয়ে। আবার যে যুগ চলে যায় সেও নিজেকে একেবারে নিঃশেষ করে যায় না, তারও কিছু থেকে যায়। নবাবী আমলের জাঁকজমক—ঝাড় লণ্ঠন, ফরসি ফরাশ একেবারে বিদায় হয় নি; বিলিতি কায়দা কানুন, লটবহরও পুরোপুরি এসে পৌছয় নি। তা হলেও দু-এর সমাহারে এক অপূর্ব বর্ণসমারোহের সৃষ্টি হল। নতুন পুরাতনের বিরোধে মিলনে, গ্রহণে বর্জনে সমাজে এক আবর্তের সৃষ্টি হয়। আমরা বিলিতি ঢঙে তার নাম দিয়েছি রেনেসাঁস। নামটা পুরোপুরি অসংগত না হলেও এর মধ্যে একটু অতিশয়োক্তি আছে। কারণ আমরা ঘুমে এমন অচৈতন্য ছিলাম না যে ইংরেজ এসে ঝাঁকুনি দিয়ে আমাদের জাগিয়ে দিল। দেশের জ্ঞানভাণ্ডার শূন্য ছিল না, জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞানস্পৃহারও অভাব ছিল না। কাজেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বার্তা যখন এসে পৌছল সেদিনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় তাকে গ্রহণ করতে খুব একটা ইতস্তত করেন নি। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলনে যে বহু বিচিত্র প্রতিভার স্ফুরণ হল, নিজ ভাণ্ডারের যথেষ্ট সঞ্চয় না থাকলে কেবল নকলনবিশির দ্বারা তা কখনোই সম্ভব হত না।

আমাদের রেনেসাঁস প্রকৃতপক্ষে দুই ভিন্ন জীবনধারার সংগম। সে সংগমে

সেদিন যাঁরা পুণ্যস্নান করেছিলেন তার মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার অগ্রগণ্য। আবর্তের মুখে প্রথম যাঁরা সংগমে স্নান করেছেন কিছু তাঁদের বেগ পেতে হয়েছে, নাকানি চুবুনি অনেকেই খেয়েছেন। পুণ্যার্জনে অল্পবিস্তর বিঘ্ন থাকেই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে পরিচয় আজ দেশবাসীর কাছে সমুজ্জ্বল তাতে বিশ্বাস করাই কঠিন যে তিনি হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্র ছিলেন। সেখানকার বিজাতীয় পরিবেশের ফাঁড়া কাটিয়ে তিনি অক্ষত দেহ মনে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। বিজাতীয় শিক্ষাকে তিনি নিজগুণে শোধন করে নিয়েছিলেন। নিজ পরিবারের শিক্ষায় দীক্ষায় পাশ্চাত্য বিদ্যাকে যথাযোগ্য আসন দিয়েও বিলিতিয়ানার রাহুগ্রাস থেকে তাকে রক্ষা করেছিলেন। তথাপি গোড়ার দিকে আতিশয্য খানিকটা ছিল, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। ৬ নম্বর বাড়ির ঐশ্বর্যে তখনই একটু বৈরাগ্যের রঙ লেগেছিল কিন্তু ৫ নম্বর বাড়ির জৌলস তখনো জাজ্বল্যমান। পলতার বাগানবাড়িতে অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথ পার্টি দিচ্ছেন। কন্যা বিনয়িনীর (প্রতিমা দেবীর মাতা) বিয়ে ঠিক হয়েছে, সে উপলক্ষে পার্টি। এক রাজসূয় যজ্ঞ। বালক বয়সে দেখা সে পার্টির বর্ণনা অবনীন্দ্রনাথ নিজ মুখেই দিয়েছিলেন—'যেখানে যত আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব সাহেবসুবো কেউ বাদ রইল না। বিরাট আয়োজন হল। দিকে দিকে তাঁবু পড়ল। কেক মিষ্টান্নে ফুলে ফলে, আতর-গোলাপে ভরে গেল চার দিকে। নাচ-গানেরও ব্যবস্থা হয়েছে। বাবুর্চি খানাসামা টেবিল ভরে স্যাণ্ডউইচ আইসক্রিম সাজাচ্ছে। ওদিকে বৈঠকখানায় শুরু হয়েছে পার্টির নাচ গান। প্রথম দিনে দেশি রকমের পার্টি; দ্বিতীয় দিন হল সাহেবসুবোদের নিয়ে ডিনার পার্টি। ব্যারিস্টার নন্দ হালদার টোস্ট-প্রস্তাবের পর গ্লাস শেষ করে বিলিতি কায়দামাফিক পিছন দিকে গ্লাস ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অমনি সকলেই আরম্ভ করলেন গ্লাস ছুঁড়ে ফেলতে। একবার করে গ্লাস শেষ হয় আর তা পিছনে ছুঁড়ে ফেলছেন, ঝন্‌ঝন্ শব্দে চার দিক মুখরিত। মনে আছে, খানসামারা যখন লাইন করে করে সাজাচ্ছিল কাচের গ্লাস—গোলাপি আভা, খুব দামী। পরদিন সকালে যখন ঝাটপাট শুরু হল, গোলাপের পাপড়ির সঙ্গে গোলাপি কাচের টুকরো স্তূপাকার হয়ে বাইরে চলে গেল।" দু-তিন দিন পরে পার্টি শেষ হল। নবাবী আমলের জেল্লা জলুস আর বিলিতি আমলের হরব বিলাস—দু-এর মিলন এ ভাবে হত। জোড়াসাঁকো বাড়ির সেকাল-একাল মেশানো বহু বৈভব-চিত্রের মধ্যে এই একটা নমুনা দেওয়া হল।

আবর্তের তোড়ে যে ফেনা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে তা মজে যেতে একটু সময়

লাগে, ঠাকুর-পরিবারেও লেগেছে। তবে শিক্ষা এবং রুচি মজ্জাগত ছিল বলে তামসিকতা দূর হতে খুব একটা বিলম্ব হয় নি। রাজসিকতা বরাবরই ছিল; বলা বাহুল্য, রাজসিকতা বলতে রজোগুণ-জাত লক্ষণাদি নয়। রবীন্দ্রনাথ যে রাজ-মহিমা, রাজ-সমারোহের কথা বলেছেন এ সেই রাজসিকতা। সে রাজ-মহিমার প্রকাশ সৌন্দর্যে মাধুর্যে ঔদার্যে। ভারতীয় সমাজে এ জাতীয় রাজসিকতার মাহাত্ম্য অজানা ছিল না। 'রাজর্ষি' কথাটির মধ্যেই তার প্রমাণ। দেবেন্দ্রনাথ মহর্ষি আখ্যা লাভ করেছিলেন, রাজর্ষি আখ্যা দিলেও কিছু বেমানান হত না। ঐশ্বর্যের দীপ্তি তখনো দেদীপ্যমান কিন্তু আতিশয্য বর্জন করে ক্রমে তা একটি স্নিগ্ধ সংযত রূপ ধারণ করল। বিলাস ব্যসনের ধরন গেল বদলে। মহর্ষি ছিলেন সৌন্দর্যের উপাসক। সমগ্র পরিবারে নিত্যদিনের জীবনযাত্রায়—বসনে ভূষনে কথনে, চিন্তনে, আমোদে আহ্লাদে ক্ষুদ্রতম কর্মটিকেও শোভন সুন্দর করে দিয়েছিলেন। সৌন্দর্যবোধ প্রকৃতপক্ষে বিশেষ এক ধরনের মূল্যবোধ। সাধারণত আমরা কোনো জিনিসের মূল্য নির্ণয় করি প্রয়োজনের নিরিখে আর প্রয়োজন ভুলে অকারণে কোনো জিনিসকে যদি মূল্য দিই সেটি নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যবোধ-জাত। একটি হল গতানুগতিকের দৃষ্টি, অপরটি অনুরাগের। অনুরাগের দৃষ্টিকেই বলে দিব্যদৃষ্টি। সব-কিছুকে ভালোবেসে দেখা। এ দৃষ্টি যিনি লাভ করেন রূপে রঙে রসে সমস্ত পৃথিবী তাঁর কাছে অপরূপ হয়ে দেখা দেয়। সৌন্দর্যবোধ একটি যেন সোনার কাটি। মহর্ষি তাঁর পরিবারে সোনার কাটিটি ছুঁইয়ে দিয়েছিলেন। আর তারই ফলে একটি মাত্র পরিবারের পরিধির মধ্যে একে একে বিচিত্র প্রতিভার স্ফুরণ হতে লাগল। শিল্পে কলায় সংগীতে সাহিত্যে বাংলা দেশে এক নবযুগের সূচনা হল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির শুধু সৌন্দর্যনিকেতন নয়, আনন্দনিকেতনও বলা যেতে পারত। সম্বৎসর আনন্দোৎসব লাগাই থাকত। এ-সবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অবনীন্দ্রের পিতা গুণেন্দ্রনাথ এবং মহর্ষিপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথের উক্তিতে—গুণজ্যোতি হরে যেথা মনের তিমির—এর আভাস আছে। গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন শৌখিন মানুষ, নানা রকমের শখ ছিল। দিশী বিলিতি নানা জাতীয় ফুলে লতায় অপূর্ব বাগান রচনা করেছিলেন। আর ছিল সংগ্রহের বাতিক; জহুরীরা আসত কত রকম দামি পাথর নিয়ে—হীরা পান্না নীলা পলা ইত্যাদি। কেউ বা আসত পাথরে বা কাঠে কাজ করা নানাবিধ শিল্পসামগ্রী নিয়ে। বড় বড় ওস্তাদ গাইয়েরা আসতেন, সংগীতের আসর বসত। চিত্রকলারও শখ ছিল। গুণেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

দুজনেই আর্টস্কুলের ছাত্র ছিলেন। স্বদেশী নাট্যমঞ্চের গোড়াপত্তনে পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ির মতো জোড়াসাঁকো বাড়িও যথেষ্ট সহায়তা করেছে। অবনীন্দ্র-পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'নববাবু বিলাস' নাটকের অভিনয় হয়েছিল। সেই প্রথম, দ্বিতীয় অভিনয় হয়েছিল পিতা গুণেন্দ্রনাথের উদ্যোগে। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়ে বহুবিবাহের নিন্দা করে নাটক লেখানো হল। নাম 'নবনাটক'। নাট্যকারকে দামি শাল এবং পাঁচশো টাকা পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ তখন শিশু। প্রথম দিকে যা ছিল কেবলমাত্র শখের ব্যাপার ক্রমে তা নানাবিধ সৃষ্টিমূলক কিছুবা দেশাত্মবোধক কাজে নিয়োজিত হতে লাগল। জ্যেঠামশায় গণেন্দ্রনাথ হলেন হিন্দু মেলার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক রচনায় মনোনিবেশ করলেন। সংগীত প্রেমিক ছিলেন, নতুন নতুন সুরসৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাতে কথা জুড়ে দিয়েছেন। পরিবার-পরিজনকে নিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হল।

এক অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য জোড়াসাঁকোর নিত্যদিনের জীবনকে হাসি গানে চিত্রে শিল্পে সুন্দরের আবাহনে যেন মাতিয়ে রেখেছিল। পরিবার-মধ্যে এই বিচিত্র প্রাণ মাতানো কর্মকাণ্ড অবনীন্দ্রের শিশুমনকে নিত্য দোলা দিয়েছে। যেখানে জীবনস্রোত নিত্য বহমান সেখানে ধীরে ধীরে পলি জমতে থাকে। সেই পলি থেকেই কবি এবং শিল্পীমনের সৃষ্টি হয়। শিশুমনের এই সঞ্চয়ের কথা অবনীন্দ্রনাথ বারম্বার বলেছেন তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' এবং 'আপন কথা' গ্রন্থে। শিশুরা রূপকথার গল্প শোনে, অবনীন্দ্রনাথ এক রূপকথার রাজ্যে মানুষ হয়েছেন। সেখানকার মানুষজন যেমন শানিত-বুদ্ধি তেমনি মার্জিন-রুচি, যেমন বিত্তবান তেমনি হৃদয়বান। এঁদের হাসি খেলা, আমোদ আহ্লাদে কোথাও কোনো স্থূলতা নেই। এক কথায় সমস্তই যেন larger than life. সে রূপকথার রাজ্যের ছবি অবনীন্দ্রনাথ নিজ হাতে তুলে ধরেছেন তাঁর দুই স্মৃতি-চারণ গ্রন্থে—'ঘরোয়া' আর জোড়াসাঁকোরে ধারে'।

ইচ্ছা করেই রূপকথার রাজ্য বলছি ; কারণ এক সময়ে ঐ কথাটি নিন্দাচ্ছলে উচ্চারিত হতে শুনছি। আমার এক বন্ধু পূর্বোক্ত গ্রন্থ দুটি পাঠ করে বলেছিলেন রূপকথার কাল কি আর আছে? এঁরা এক অবাস্তব জগতে বাস করতেন। শুনে আমি খুব অবাক হই নি , কেননা খুব সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক আটপৌরে ধরনের ব্যাপার না হলে কোনো কিছুকে এ যুগে বাস্তব বলে গ্রাহ্য করা হয় না। বোধ করি ঠাকুরবাড়ির পার্থিব বৈভবের চিত্রই আজকের পাঠকের কাছে

রূপকথার ন্যায় অবাস্তব বলে মনে হয়েছে। পারিবারিক বৈভবের কথা অবশ্যই বলেছেন, না বললে সত্য গোপন করা হত। কিন্তু একটি সহজ কথা আমরা ভুলে যাই যে দুঃখের অভিজ্ঞতায় সকল মানুষই সমান। প্রকৃতপক্ষে এক দারিদ্র্য ছাড়া সাংসারিক আর সকল রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই এঁদের যেতে হয়েছে। এঁরা বিধাতার আদুরে সন্তান নন—দুঃখ আঘাত মৃত্যুশোক এঁদের ভাগে কিছু কম জোটে নি। পলতার বাগানে যে পার্টির উল্লেখ করেছি তারই দুদিন পরে পিতা গুণেন্দ্রনাথের মৃত্যু। শৈশবেই পিতৃহারা। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, একদিনেই যেন ছেলেবেলাটা ফুরিয়ে গেল। কিন্তু ফুরিয়ে যেতে দেন নি, চিরজীবন আঁকড়ে ধরে থেকেছেন। সেজন্যেই ছেলেদের নিয়ে তাঁর খেলা, ছেলেদের জন্যে গল্প বলা, তাদের জন্যে খেলনা গড়া।

দুঃখ আঘাত অনেক পেয়েছেন, বহু মৃত্যু পার হয়ে এসেছেন কিন্তু সমস্তকেই দেখেছেন জীবন-দেবতার নিপুণ শিল্প হিসাবে। আমরা এঁদের ঐশ্বর্যটাকেই বড় করে দেখেছি সেজন্যে বুঝতে অনেক ভুল করেছি। তিনি যে ঐশ্বর্যের চিত্র এঁকেছেন তাতে কোথাও কোথাও প্রচ্ছন্ন কৌতুক প্রকাশ পেয়েছে আবার এরই বর্ণচ্ছটা ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে মুগ্ধও করেছে। তা ছাড়া ঐশ্বর্যের কথা যেমন বলেছেন তেমনি আবার তুচ্ছতম জিনিসটিও উল্লেখ করতে ভোলে নি—"গলির ভিতরে ছোট্ট ঘর, অমৃত দাসী সেই ঘরে বসে জাঁতায় সোনামুগের ডাল ভাঙে আর বাটনা বাটে।···সেই ঘরটি আর জাঁতাটি, সারাজীবন তাই নিয়েই কেটেছে; তার মিউজিক ছিল জাঁতার ঘড়-ঘড়ানি। সোনামুগ আর বাটনার হলুদের জল ভেসে যাচ্ছে, কাপড়েও লেগেছে, সোনাতে হলুদে মাখামাখি। এখনো মনে হয় তার কথা; দুঃখিনী একটি বুড়ির ছবি চোখে ভাসে।" আর ক্ষীরের পুতুল কাহিনী? সত্য তো বটেই—সত্যের চাইতেও যাকে বড় বলব—রস, কাব্যরস—সেই রসে সিক্ত স্নিগ্ধ সেই কাহিনী। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—"তারপর একদিন মাও গেলেন; দাদাও গেলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ি শূন্য করে। ক্রমে ক্রমে আমার দক্ষিণ বারান্দার জলসা বন্ধ হল।···ভাই বন্ধু সঙ্গী ছাত্র সব চলে গেছে, অতবড় খালি বাড়ির সেই দক্ষিণ বারান্দায় একা বসে আমি পুতুল গড়ি···এমন সময় একদিন ফেলাবতী এসে হাজির। কোথা থেকে উঠে এল এতটুকুন মেয়েটি, নেড়াভোলা চেহারা। বললুম, কে তুই?

আমি ফেলা।

ও ফেলা, তা এসো।

দেখে বড়ো আনন্দ হল। যখন ফেলে-দেওয়া জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি, নতুন রূপ দিচ্ছি, তখন এল ফেলাবতী আমার। বললুম, কোত্থেকে আসিস? ঘর কোথায়?

বললে, এই এখান থেকেই। বলে, রাস্তার মোড়ের দিকটা দেখালে।...

ভাবছি, এই কোন্ ফেলা এল। মনে হল না—সে মানুষ।

বললুম, কী চাই তোর?

আমি এখানে বসে খেলা করি নে একটু?

তা বেশ তো, কর তুই খেলা। বলি, ফেলা একটা সন্দেশ খাবি?

তা খাব।

রাধুকে বলি, রাধু, আমার ফেলার জন্যে সন্দেশ নিয়ে আয় একটা।...[রাধু] একটা সন্দেশ আর মাটির গেলাসে জল এনে দেয়। ফেলা সন্দেশ খেয়ে জল খেয়ে গেলাসটি এক কোনায় রেখে দেয়।

বলি, কেমন লাগল?

ফেলা বলে, তোমাদের সন্দেশ কেমন আঠা আঠা, গলায় লেগে যায়।...

এমনি রোজ আসে সে, সন্দেশ খাইয়ে ভাবসাব করি। সে একপাশে বসে খেলে, আমিও খেলি।...বিনি পয়সার খেলুড়ি ফেলা নিঃসঙ্গ দিনের, মানুষের মধ্যেও সে ফেলা, কাঠকুটরো, ছেঁড়া টুকরো কাগজেরই সামিল। যত ফেলা জিনিস কুড়িয়ে বাড়িয়ে এক বুড়ো আর এক মেয়ে খেলা জুড়েছি সেই দক্ষিণের বারান্দায়। ··দক্ষিণের বারান্দায় সেই শেষ প্রবেশ ফেলাবতী ও আমার। তার পর অসুখে পড়লুম। সেই অবস্থাতেই শুনি দক্ষিণের বারান্দা বিকিয়ে গেছে মাড়োয়াড়ীদের হাতে।"

এই হচ্ছে আসল রূপকথা। শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখলে আর কবির মন নিয়ে বললে তবেই এমন বাস্তব রূপকথার সৃষ্টি হয়। আর রূপকথা কি নিন্দের কথা? কথা যদি রসের মধ্যে রূপ লাভ করে তা হলে রূপকথাই হয় রসসাহিত্য। অবনীন্দ্রনাথের লেখায় যেমন রূপকথার আমেজ আছে তেমনি আবার আমাদের চিরপরিচিত পাঁচালির জমাট ভাবটি আছে। দাশু রায়ের পাঁচালি একদিন যেমন বাঙালীকে মাতিয়েছিল এই সেদিনও বিভূতিভূষণের পাঁচালি তেমনি তাকে মাতিয়েছে। পথের পাঁচালিকে যদি বলি অপুর পাঁচালি, অবনীন্দ্রের কথা কাহিনীকে বলব অবুর পাঁচালি ('মাসি' গল্পে অবু নামেই তাঁর পরিচয়)। শিল্প-কলায় ভারতের বিস্মৃতপ্রায় ঐতিহ্যকে তিনি যেমন পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, সাহিত্যে তেমনি বাংলাদেশের লুপ্তপ্রায় গল্পবলার ধারাটিকে তেমনি পুনরাবিষ্কার

করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ সত্যিকারের কথা-সাহিত্যিক অর্থাৎ তাঁর মুখের কথাতেই সাহিত্যের আমেজ থাকত। কথা বলার নিজস্ব একটা ঢঙ ছিল, রবীন্দ্রনাথ সেটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনিই তাঁকে সাহিত্যের আসরে টেনে আনলেন। প্রথম দিকে নিজের মনেই সংশয় ছিল। লেখা বলতে অবীন্দ্রনাথ বুঝতেন ছবি লেখা। নানা বর্ণে রঙ-বেরঙের ছবি লিখলেন; কিন্তু বর্ণমালা দিয়েও যে মালা গাঁথা যায়, ছবি ফুটিয়ে তোলা যায় সে কথা কখনো মনে আসে নি। বললেন, আমি আবার কি লিখব, কেমন করে লিখতে হয় আমি জানি নে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তুমি যেমনটি করে কথা বল, গল্প কর, ঠিক তেমনটি করেই লিখবে। লিখলেন শকুন্তলার কাহিনী। পাণ্ডুলিপিটি এনে রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ পড়ে বললেন, চমৎকার হয়েছে। কোথাও কলম ছোঁয়ালেন না। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্নীকে বলেছিলেন বাংলাদেশের রূপকথা সংগ্রহ করতে। মৃণালিনী দেবী তাঁর সংগ্রহ থেকে ক্ষীরের পুতুলের গল্পটি একদিন অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, কাকীমা ঠিক যেমনটি করে গল্পটি বলেছিলেন ঠিক তেমনটি করেই তিনি লিখেছেন। বলা বাহুল্য, শিল্পী-সুলভ মন নিয়ে তিনি তাঁর ভাষায় যথেষ্ট রঙ ছড়িয়েছেন। তা হলেও রূপকথায় তাঁর হাতে-খড়ি যে মৃণালিনী দেবীর কাছেই হয়েছিল সে কথাটি সোৎসাহে স্বীকার করেছেন। বলেছেন, এই আমার রূপকথার আদিকথা। ক্ষীরের পুতুল তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। রূপকথার জগতে এর তুলনা মেলা ভার। সেই শুরু। ক্ষীরের পুতুলের রাজার মতো অবু সদাগর তাঁর সপ্তডিঙায় পাল তুলে দিয়ে সাহিত্যের দরিয়ায় ভেসে পড়লেন। মণি মুক্তা হীরা জহরতে ডিঙা ভরতি হতে লাগল। দুয়োরানীর যেমন দুঃখ ঘুচেছিল আমাদের শিশু সাহিত্যেরও তেমনি দুঃখ ঘুচল। রাজকাহিনী যখন লিখলেন রীতিমতো সোরগোল পড়ে গেল। এক সময়ে লোকে বলত বাংলাভাষার এমন বর্ণাঢ্য জমকালো রূপ এর আগে কখনো দেখা যায় নি। রাজকাহিনী সম্পর্কে একটি কথা অবশ্য আমার মনে হয়েছে। চিত্রশিল্পী হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ রঙের ব্যবহারে অতিশয় সংযত কিন্তু সাহিত্যশিল্পী হিসাবে রঙের ব্যবহারটা একটু যেন বেহিসাবী হাতে করেছেন। রাজকাহিনীর ভাষা একটু অতিমাত্রায় কাব্যময়। রূপকথায় সেটা খুব মানিয়ে যায় কারণ রূপকথার জগৎ কাব্যের জগৎ।

সাহিত্য রচনায় শিশুকে করেছিলেন তাঁর মিডিয়াম কিংবা বলা যেতে পারে শিশুরাই তাঁকে পেয়েছিল মিডিয়াম হিসাবে। শিশুর জগৎ বিস্ময়ের জগৎ। অবনীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে তারা তাদের নিজের জগৎকে আরো স্পষ্ট করে

দেখেছে, তাঁর মুখ থেকে সে জগতের বিস্ময়কর কাহিনী শুনেছে। সে জগৎ যেমন বিস্ময়ের তেমনি বিশ্বাসের। শিশুর জগতে সবই সম্ভব, অসম্ভব কিছুই নেই। সেখানে একটা জলজ্যান্ত ছেলে ঠাকুর দেবতার পাশে বুড়ো আঙুলটির মতো এই টুকুন একটা যক্ হয়ে গেল। তার পরে খোঁড়া হাঁসের পিঠে চড়ে, বুনো হাঁসের দলে ভিড়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। গল্প বলবার এমনি আশ্চর্য কৌশল যে আমরা বয়স্ক বুদ্ধিমন্তরা যারা বিশ্বাসের জগৎ থেকে নির্বাসিত, সেই আমাদেরও নেশায় পেয়ে যায়। গল্পের শেষে রিদয়-এর মতোই মনে প্রশ্ন জাগে, 'আমি কি সত্যিই বড় হয়ে গেছি?' শিশুজগতের চাবিকাঠির সন্ধান একমাত্র কবি শিল্পীরাই জানেন। শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রধানতম প্রয়াস হল সৃষ্টির গভীরতম রহস্যের আবিষ্কার এবং উদ্ঘাটন। সৃষ্টির আদিমতম রূপটির অনুধাবন কবি শিল্পীর এক নিরন্তর জিজ্ঞাসা। শিশুও আদিম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিশু সংসারের সব চাইতে পুরাতন সামগ্রী। আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সে এক আছে, তার কোনো পরিবর্তন হয় নি। সৃষ্টির আদিম রূপের নিদর্শন হিসাবে শিশুর প্রতি কবি শিল্পীর স্বাভাবিক আকর্ষণ। ইংরেজ কবিদের মধ্যে একদিক থেকে সব চাইতে ওরিজিন্যাল কবি বলা যেতে পারে উইলিয়াম ব্লেক। শিশুর মনই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু, সেই মনকে বুঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টাতেই লিখেছেন তাঁর Songs of Innocence। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শিশুরঞ্জনী কবিতা তেমন লেখেন নি কিন্তু তাঁর কাব্যে শিশু এবং শৈশব কৈশোর অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। রবীন্দ্রনাথও বলতে গেলে আজীবন শিশুপরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যালয় স্থাপন করে বলেছিলেন, শিশু মহারাজের দ্বাররক্ষীর কাজ নিয়েছি। দ্বাররক্ষী তো নয়, তিনি ছিলেন শিশুমহারাজের সভাকবি। গল্পে নাটকে কবিতায় গানে ছড়ায় নানাভাবে শিশুমনের তুষ্টি এবং পুষ্টি-সাধন করেছেন। আর অবনীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় শিশুমহারাজের দরবারে বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মজার মজার কাহিনী আর যত রকমের উদ্ভট গল্প বলে শিশুর মনোরঞ্জন করেছেন। আপন কথার ভূমিকায় নিজেই বলেছেন, "আমার ভাব ছোটদের সঙ্গে···থেকে থেকে যারা কাছে এসে বলে, 'গল্প বলো', সেই শিশু-জগতের যারা সত্যিকার রাজ-রানী, বাদশা-বেগম তাদেরই জন্যে আমার লেখা।" পশ্চিমের অনেক দেশেই শিশু-সাহিত্য সুসমৃদ্ধ এবং সুপ্রচুর। নিরক্ষরতা দেশব্যাপী বলে আমাদের শিশুসাহিত্যের পরিমাণ এবং বিস্তার দুই-ই কম। কিন্তু সমৃদ্ধির দিক থেকে সে কারো তুলনায় কম নয়। বরং শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে নিষ্ঠা দেখিয়েছে পৃথিবীর আর কোনো দেশে তা দেখা যায় নি। কোন্

দেশে বিদ্যাসাগরের সমতুল্য ব্যক্তি লিখেছেন কথামালার গল্প, লিখেছেন বোধোদয়? (প্রকৃতপক্ষে বাঙালী সন্তানের হাতে-খড়ি হয়েছে বিদ্যাসাগরের হাতে; তাঁর 'বর্ণপরিচয়'-এর দৌলতে বাঙালীর অক্ষর পরিচয় হয়েছে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথও ঐ কাজটি করেছেন তাঁর সহজ পাঠ-এর মাধ্যমে।) 'কথা ও কাহিনী'র ন্যায় narrative verse পৃথিবীর উন্নততম দেশেও ক'টি লেখা হয়েছে? কোন্ দেশের শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ শিল্পী—মহামনস্বী ব্যক্তিরা বুড়ো আঙুলের মতো ছোট্টটি হয়ে একরত্তি ছেলেমেয়েদের জন্যে গান ধরছেন, ছড়া বেঁধেছেন, জমিয়ে বসে গল্প বলেছেন, নিজের হাতে গল্পের বইতে ছবি এঁকে দিয়েছেন? একমাত্র বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরাই এ সৌভাগ্য লাভ করেছে। এই কারণে এক সময়ে আমার একটি প্রবন্ধে আমি বাংলাদেশকে শিশুতীর্থ আখ্যা দিয়েছিলাম।

রূপকথা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনেক কথাই এসে গেল। সাহিত্যে শিল্পে রূপসৃষ্টি নিয়েই কারবার। কথা সুর ছন্দ দিয়ে যেখানে রূপ সৃষ্টি হয় সেখানেই সাহিত্যের রূপকথা আর রেখা রঙ তুলি দিয়ে যেখানে রূপের সৃষ্টি সেখানে শিল্পের রূপরেখা; শিল্পী সাহিত্যিক দুজনেই রূপকার, দুজনেরই শক্তি পরীক্ষা এক মাপকাঠিতে—যা প্রত্যক্ষ তাকে অধিকতর উজ্জ্বল আর যা অপ্রত্যক্ষ তাকেও চোখের সুমুখে জাজ্বল্যমান করে তোলার ক্ষমতায়। অবনীন্দ্রনাথ কথা দিয়েও ছবি এঁকেছেন; তাঁর লেখনী তুলির কাজ করেছে। লেখার মধ্যে রঙ ছড়িয়েছেন প্রচুর। অথচ দেখুন ছবির বেলায় রঙের ব্যবহার করেছেন ভয়ংকর হিসেব করে, কোথাও এতটুকু বাড়তি খরচ করেন নি। ছবি আঁকেন নি তো, ছবি আপনা থেকে যেন ফুটে বেরিয়েছে। মতিবাবু ছিলেন কর্তাদের আমলের সভাসদ। কর্তারা চলে গিয়েছেন, এখন ছেলেদের দরবারেই নিত্য এসে বসেন। গল্পগুজব করেন, ছবি আঁকা দেখেন। একদিন বললেন, "দেখুন,...আপনার ছাত্র নন্দলাল, সুরেন গাঙ্গুলী, ওরা ছবি আঁকে, দেখে মনে হয় বেশ যত্ন করে ভালো ছবিই এঁকেছে। কিন্তু আপনার ছবি দেখে তো তা মনে হয় না।...

তবে কী মনে হয়?

আপনার ছবি দেখলে মনে হয় আঁকা হয়নি মোটেই।

সে কি কথা! আপনার কাছে বসেই আঁকি আমি, আর বলছেন আঁকা বলেই মনে হয় না!

না, মনে হয় যেন ঐ কাগজের উপরেই ছিল ছবি।" ঐ যে বলেছি, ছবি যেন আপনা থেকেই ফুটে বেরোত, সে কথাটাই ভদ্রলোক বলতে চেয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'বুড়ো [মতিবাবু] বড় সার্টিফিকেটই দিয়েছিলেন আমায়'।

অবনীন্দ্রনাথ বলতেন আর্টিস্টকে তিনটি ধাপ পেরোতে হয়। প্রথম দিকটাতে রঙ রেখার কায়দাটুকু নিয়েই মেতে থাকে, তার পরে আসে রসের প্রৌঢ়তা, রঙ সাজসজ্জার কী বাহার—মোগল আমলের আর্টে যেমনটা দেখা যায়। "তারপর সেই বাহার থেকে পৌঁছল গিয়ে রসের আরো উঁচু ধাপে, তবে এল বাইরের রঙ-চঙ-ছুট ছবি যেন মেঘলা দিনের ছায়া, স্নিগ্ধ গম্ভীর।" আর্টের দুই শক্তি—দৃশ্য বস্তুকে জীবন্ত করে চোখের সামনে তুলে ধরা, অদৃশ্য ভাবকেও তেমনি জাজ্বল্যমান করে ফুটিয়ে তোলা। 'শাজাহানের মৃত্যু' ছবির কথায় বলেছেন—প্রাণাধিকা কন্যার মৃত্যু হয়েছিল অল্পদিন পূর্বে, অন্তরের বেদনাকে ঢেলে দিয়েছিলেন ঐ ছবির মধ্যে। মৃত্যুকে ফুটিয়ে তোলা তাতেই সম্ভব হয়েছিল। ঐ যে বলেছেন, তুলিটি জলে ডোবাই, রঙে ডোবাই, মনে ডোবাই—তবে তো ছবি আঁকা হয়। সংগীতের বেলাতেও ঐ কথাই বলেছেন—অন্তর বাজে তো যন্তর বাজে। এক সময়ে অবনীন্দ্রনাথ যন্ত্রসংগীতের যথেষ্ট চর্চা করেছিলেন, অধিকারও জন্মেছিল।

শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে একই ব্যাপার। টেকনিক সব-কিছুতেই আছে কিন্তু সবার মূলে হল মনের কারসাজি। মন যদি গররাজি হয় তো কোনো কারসাজিতেই কাজ দেবে না—ছবিতে রঙ ধরবে না, সাহিত্যে রস লাগবে না, সংগীতে সুর বাজবে না। একেই বলে 'একে তিন তিনে এক'। অর্থাৎ তিনটিরই রহস্য এক। একটির রহস্য ভেদ করতে পারলেই বাকি দুটিকেও পাওয়া যায়। রেখার জগৎ থেকে লেখার জগতে, সুরের জগৎ থেকে রসের জগতে প্রবেশপথ দুর্গম নয়। নাট্যাভিনয়েও অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। সেখানেও ঐ একই রহস্য—যে ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন নিজেকে সর্বান্তঃকরণে তার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন।

শিল্পী মানুষ—তিনি চিত্রকর হন, সাহিত্যিক হন, সংগীতজ্ঞ হন কিংবা অভিনেতাই হন—উঁচু দরের কৃতিত্ব অর্জন করতে হলে তাঁকে প্রেমিক হতে হবে। তাঁকে ভালবাসতে হবে শুধু আপনজনকে নয়, আপন পর সকলকে, সকল জীব, সকল সামগ্রীকে। অবনীন্দ্রনাথের ন্যায় এমন হৃদয়বান, মায়া-মমতাশীল মানুষ সচরাচর দেখা যায় না ; শিল্পকে সাধে বলেছে মায়াবিনী, মায়া দিয়ে তাকে গড়তে হয় আবার সেই মায়া দিয়েই সে অপরের মনে মোহের সৃষ্টি করে। ভাঙাচোরা ছেঁড়াখোঁড়া জিনিস—কাঠের টুকরো, টিনের পাত,

পিসবোর্ড জোড়াতালি দিয়ে অপূর্ব সব খেলনা গড়েছেন। এ এক অত্যাশ্চর্য কল্পনার খেলা। একটা কোনো সৌসাদৃশ্যকে মূর্তি দেওয়া—একটা resemblance-কে ফুটিয়ে তোলা—শিল্পীর যথার্থ কাজ। কল্পনাশক্তির এ এক কঠিন পরীক্ষা। তাঁর জীবনের শেষ খেলা ঐ কুটুম কাটাম নিয়ে। এই যে 'কুটুম' কথাটি ব্যবহার করেছেন এর মধ্যেই তাঁর আন্তরিক মমতাটি প্রকাশ পেয়েছে। আবার যা-কিছু গড়েছেন তাতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভাঙা টুক্‌রো-টাক্‌রা জুড়ে তৈরি করছিলেন একটা ইঁদুর। শ্রীমতী রানী চন্দকে বলছেন—দেখলে, যেই না স্প্রিং দিয়ে লেজটি জুড়ে দিয়েছি অমনি জ্যান্ত হয়ে এক লাফে কোথায় গেল পালিয়ে, আর খুঁজেই পাচ্ছি না। শিল্পের আর শিল্পীর একই রহস্য। শ্রেষ্ঠ শিল্পী যা ধরবেন তাই জীবন্ত হয়ে উঠবে। মনে আছে অনেক কাল আগে—তখন বোধকরি আমি স্কুলের ছাত্র—মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের একটি ছবির প্রিণ্ট দেখেছিলাম। ছবিটির তলায় লেখা—the spirit of the stone. একটা প্রকাণ্ড পাথর পড়ে আছে—শ্যাওলায় ঢাকা। রঙ প্রয়োগের কৌশলে সমস্ত জিনিসটা এমন ইঙ্গিতময়, মনে হচ্ছিল পাথরটা জীবন্ত, এক্ষুণি নড়েচড়ে উঠবে। আমি ছবির কিছু বুঝি না কিন্তু সে ছবি আমার কিশোর মনে আশ্চর্য মোহের সৃষ্টি করেছিল; কতবার যে ছবির পাতাটি উল্টে দেখেছি, ভেবেছি পাথরটা এক্ষুণি নড়ে উঠবে।

মোহ মায়া যদি সৃষ্টি না করল তো শিল্প কী? সৃষ্টিমূলক কাজ আমাদের জীবনের পরিধি বাড়িয়ে দেয়, আমাদের আত্মীয়তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। মানুষজন তো বটেই, প্রাণীজগৎ, গাছপালার জগৎ, মাঠের সবুজ, মেঘের রঙ, জলের ঢেউ সব-কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধের গ্রন্থি রচনা করে। এ-সবই শিল্পের মোহিনী মায়ার গুণে। লিখতে যখন বসেছেন তখনো সেই মোহেরই সৃষ্টি করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ লেখেন যেন কথা বলেন। এ কথা আমরা সকলেই জানি যে মুখের কথার তুলনায় ছাপার কথা অনেক বেশি আড়ষ্ট। অবনীন্দ্রনাথের লেখায় বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই। মনের কথা মুখের ভাষায় এমন নিঁখুত ভাবে লেখার পাতায় এসে নেমেছে যে পথে শুধু এতটুকু তার খোয়া যায় নি। কথা দিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করতে হয় কিন্তু সে কথা শুধু সশব্দ হলে চলবে না, তাকে সজীব হতে হবে। অবনীন্দ্রনাথের ভাষা আশ্চর্য রকম প্রাণবন্ত, বলা যেতে পারে throbbing with life। ইংরেজীতে যে বলে style is the man, সে কথাটা খুব খাঁটি। প্রত্যেক লেখকের নিজ নিজ স্টাইল; যার যার যেমন নিজস্ব চরিত্র, এও তেমনি। লেখকের ব্যক্তিত্বটাই

তাঁর স্টাইল হয়ে ফুটে ওঠে। টেকনিক নকল করা যায়, স্টাইল নকল করা যায় না। যে জিনিস অনুকরণসাধ্য সে জিনিস খুব উঁচু দরের নয়, তার আয়ুষ্কালও দীর্ঘ হয় না। অনেকে যখন অনুকরণ করতে শিখল তখনই তার মূল্যহানি, সে আপনি বরবাদ হয়ে যাবে। এজন্যে টেকনিক কেবলই বদলাতে থাকে কিন্তু স্টাইল তার নিজস্বতা বরাবর বজায় রাখে।

অবনীন্দ্রনাথ স্টাইলের রাজা, যেমন তাঁর ছবিতে তেমনি তাঁর লেখায়। তার কারণ তাঁর জীবনযাপন-প্রণালীর মধ্যেই একটি নিজস্ব স্টাইল বা ঢঙ ছিল জাঁকজমক সমারোহের মধ্যে বাস করেছেন রাজা-বাদশার মতো কিন্তু সেই সমারোহকে তিনি সাংসারিক জীবনের ভোগের মধ্যে যতখানি পেয়েছেন তার চাইতে বেশী পেয়েছেন শিল্পীমনের উপভোগের মধ্যে। আকাশের মেঘে মেঘে রঙের সমারোহকে যে চোখে দেখেছেন পার্থিব বৈভবকেও সেই চোখে অর্থাৎ শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখেছেন—যে দৃষ্টি থাকলে শুধু সমারোহ নয়, নিতান্ত অনাড়ম্বর ঘটনার মধ্যে তাৎপর্য পাওয়া যায়, রিক্ত নিরাভরণ বস্তুর মধ্যেও সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যায়। যে দৃষ্টি অনাদৃত অবহেলিত জিনিসের এবং মানুষের অ-দৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যকে উদ্ঘাটিত করতে পারে তাকেই বলে শিল্প দৃষ্টি। মোগল প্রাসাদের ছবি যেমন এঁকেছেন তেমনি আবার সাজাদপুরের পল্লীদৃশ্যও এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথের পোর্ট্রেট যেমন করেছেন—তেমনি আবার নিজের চাকর রাধুরও পোর্ট্রেট করেছেন—একটি নয়, তিন তিনটি। প্রথম ছবিতে—রাধু মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে এসেছে গামছা কাঁধে চাকরির খোঁজে; দ্বিতীয় ছবিতে রাধু বসে খবরের কাগজ পড়ছে; তৃতীয়টিতে রাধুর মাথায় গান্ধীটুপি, রাধু কংগ্রেস ভলান্টিয়ার সেজেছে। তিন ছবি মিলিয়ে নাম দিয়েছিলেন transformation of রাধু। শিল্পের দৃষ্টি তুচ্ছকে তাচ্ছিল্য করে না। সামান্যকে অসামান্য করে দেখতে জানে। নিজের মতো করে যিনি দেখেন, নিজের মতো করে যিনি ভাবেন তিনিই আবার নিজের মতো করে প্রকাশ করতেও পারেন। একান্তভাবে নিজস্বভঙ্গিতে প্রকাশ করার নামই স্টাইল। ভাববার বিষয় এক হতে পারে, এমন-কি, ভাবটা অপরের কাছ থেকে ধার করাও হতে পারে কিন্তু ভাববার ভঙ্গি যাঁর নিজস্ব তাঁর প্রকাশের ভঙ্গিও নিজস্ব। শিল্পে সাহিত্যে পরস্বাপহরণ একটা মস্ত বড় অপরাধ নয় যদি তাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করা যায়। শুধু গলাধঃকরণ করলে চলে না, তাকে মনে মজ্জায় মিশিয়ে নিতে হয়। নারীকে বলপূর্বক হরণ করলে অপরাধ হয়, কিন্তু সে নারীর যদি হৃদয় হরণ করা যায় তা হলে বরমাল্য লাভ হয়। অবনীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গল্প-গ্রন্থ—খাতাঞ্চির

খাতা, আলোর ফুলকি, বুড়ো আংলা, হানাবাড়ির কারখানা—বিদেশীগল্পের ছায়ায় রচিত। কিন্তু ঐ ছায়াটুকুই, কায়াটি সম্পূর্ণ নিজের হাতে গড়া। সে-সব কাহিনীকে তিনি বাংলাদেশের মাটি জল হাওয়ার সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়ে নিয়েছেন যে তাদের আর বিদেশী বলে চিনবার জো নেই। পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত তারা সম্পূর্ণরূপ বিস্মৃত হয়েছে। এক সময়ে একটি গল্প লিখেছিলেন, তার বিদেশী কায়াটি পুরোপুরি ঢাকা পড়ে নি, তলায় নিজেই লিখে দিয়েছিলেন—ফরাসী থেকে চুরি।

চার্লস ল্যাম-এর ছিল স্টাইল। তিনি বলতেন—You may derive thoughts from others, but your way of thinking, the mould in which the thoughts are cast, must be your own. Intellect may be imparted, but not each man's intellectual frame. ল্যাম-এর স্টাইল ইংরেজি সাহিত্যে আর হয় নি, অবনীন্দ্রনাথের স্টাইলও বাংলা সাহিত্যে আর হবে না। কারণ সে স্টাইল তাঁর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাস্তবিকপক্ষে কবি শিল্পী যে জীবন যাপন করেন, যে-সব ধ্যান ধারণা তাঁর মনে রঙ ধরিয়েছে, ফুল ফুটিয়েছে সে-সমস্তই মিলে মিশে তাঁর শিল্পরীতি হয়ে দেখা দেয়। ছবির মধ্যে যেমন নানা রঙের মিশ্রণ, অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় তেমনি চলিত অচলিতের মিশ্রণ—এমন কিছু শব্দ, এখন যা ব্যবহারে নেই, অর্থটাও অস্পষ্ট। হঠাৎ করে বলে ওঠেন—'লবডঙ্কা।' নিজেই বলেছেন, "কী সেটা, দেখতে লঙ্কার মতো আর খেতে ঝাল না মিষ্টি তা জানি নে, কিন্তু খুব চেঁচিয়ে কথাটা বলে খুব মজা পাই।" ল্যাম্-এর রচনাতেও বহু archaic শব্দের প্রয়োগ। তাঁর সমকালীন ভাষার সঙ্গে এলিজাবেথীয় বাক্যচ্ছটা এবং সপ্তদশ শতকীয় গদ্যরীতির প্রতিধ্বনি মিশে গিয়ে যেন রামধনুর বর্ণচ্ছটা বিস্তার করেছে। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যভাষারও ঐ বর্ণাঢ্য রূপটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। মজলিসী মানুষ তো—কিছু বৈঠকি ভাব, সাবেকি ঢঙ, পুরোনো দিনের ছড়া, রূপকথার ভাষা—সবটা মিলিয়ে ল্যাম্-এর ভাষার ন্যায় একটু যেন ছিটগ্রস্ত। কিন্তু ছিটগ্রস্ত মানুষের যেমন একটা আকর্ষণ আছে, এ ভাষাও তেমনি এক অদ্ভুত মোহের সঞ্চার করে। এ ছাড়া, অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে যতখানি ছন্দের দোলা বাংলা সাহিত্যে এমন আর কারো গদ্যে নেই। ভাষামাত্রই শব্দ-বাহন, শব্দের মধ্যে সংগীতের ছন্দ লুক্কায়িত থাকে যেজন্যে আমরা বলি শব্দতরঙ্গ। আবার বাক্যের গতির মধ্যে নৃত্যের ছন্দও বর্তমান। যিনি ভাষা-শিল্পী তিনি এই দুই ছন্দেরই যথোচিত ব্যবহার জানেন। অবনীন্দ্রনাথ ভাষার ঐ স্বচ্ছন্দতা

সম্পর্কে বিশেষভাবে সজ্ঞান। প্রত্যক্ষ নমুনা দেখুন, ছেলেবেলাকার বর্ষাদিনের স্মৃতিচারণ—"সারারাত সাতদিন ঝমাঝম। মটর ভাজি কড়াই ভাজি ভিজে ছাতি। যেদিকে চাও ভিজে শাড়ি পরদা টেনে হাওয়ায় দুলছে, তারই তলায় তলায় খেলে বেড়ানো সারাদিন, সন্ধ্যে থেকে কোলা ব্যাঙে বাদ্যি বাজায়, রাজ্যের মশা ঘরে সেঁধোয় টাকাংদিং টাকাংদিং মশারি ঘিরে। দাসী চাকর সরকার বরকার সবার মাথায় চড়ে গোলপাতার ছাতা।·· ছেলে বুড়ো মিলে গান গল্প, বাবু ভায়ে মিলে খোস গল্প—আর কত কি মজা, আঠারো ভাজা জিবে গজা। গুড়গুড়ি ফরসি দাদুরীর বোল ধরত গুড়ুক ভুড়ুক।"

অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের কথা ভাবতে গেলে শেষের কবিতায় অমিট রায়ের মুখের সেই উক্তিটি আমার মনে পড়ে—শিবের ছিল স্টাইল, একেবারে ওরিজিন্যাল। সত্যি সত্যি শিবের মূর্তিটি একবার ভেবে দেখুন—মাথাভর্তি জটাজুট, লটপট বাঘছাল, তার ববম্ ববম্ বাজে গাল—সমস্তটা মিলিয়ে শিব একাধারে যে বিস্ময় এবং কৌতুকের উদ্রেক করেন সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের স্টাইল—সাধু অসাধু, চলিত অচলিত শব্দের মিশ্রণে অভিনেতা-সুলভ বাচন-ভঙ্গিতে এবং অদ্ভুত ধরনের ধ্বনি-মুখর শব্দ প্রয়োগে সেই কৌতুকমিশ্রিত বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

অবনীন্দ্রনাথ বড়দের জন্যে সামান্যই লিখেছেন। তবে এ কথাও সত্য যে তাঁর শিশু বা কিশোর সাহিত্য একান্তভাবে বেবী-ফুড নয়। Alice in Wonderland যেমন সর্বজনীন আনন্দের ভোজ, অবনীন্দ্রনাথের শিশুরঞ্জনী গ্রন্থাবলীও বয়স নির্বিশেষে সর্বজনের উপভোগের সামগ্রী। বড়দের কথা ভেবেছেন জীবনের শেষার্ধে। এক সময়ে ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে কিছুদিন গঙ্গাবক্ষে স্টীমারে ভ্রমণ করেছেন। স্টীমারের ডেলি প্যাসেঞ্জারদের অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। পথে বিপথের গল্পে এঁদের কেউ কেউ বিভিন্ন চরিত্রে দেখা দিয়েছেন। সেই স্টীমার-ভ্রমণের কৌতুকাবহ বর্ণনা আছে জোড়াসাঁকোর ধারের স্মৃতিচারণে। ঘরোয়া এবং জোড়াসাঁকোর ধারে দুই যমজ গ্রন্থ। এ দু-এর তুলনা নেই। এ তাঁর আপন কথা, আপনজনের কথা, সর্বোপরি তাঁর সারাজীবনের 'হিয়েরো' রবিকার কথা। পারিবারিক কাহিনী কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে এক যুগের বিস্মৃতপ্রায় বাঙালী সমাজের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। এ দিক থেকে চারুচন্দ্র দত্তের পুরানো কথাকে বলা যেতে পারে এ দুই গ্রন্থের জাতি-ভ্রাতা। এ ছাড়া বড়দের জন্যে যা লিখেছেন তা প্রধানত শিল্পসম্পর্কিত আলোচনা। বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বাগেশ্বরী

বক্তৃতামালা আমাদের শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এত কথার পরেও যে কথাটি বলতে বাকী থাকে সেটি হল সৃজনীপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্রষ্টা নিজে। রবীন্দ্রনাথের জীবনই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য; তেমনি অবনীন্দ্রনাথ যে জীবন যাপন করেছেন সেটিই তাঁর শিল্প-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আচার্য নন্দলাল ও শান্তিনিকেতন

বুঝে যতখানি আনন্দ, না বুঝে ততখানি—বলেছিলেন অ্যালডাস হাক্সলি। হাক্সলি সাহিত্যিক মানুষ, কিন্তু এ কথা তিনি সাহিত্যরস সম্পর্কে বলেন নি, বলেছেন চিত্রশিল্প সম্পর্কে। শিল্প ব্যাপারে হাক্সলি নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন না বরং তাঁর বহুবিধ রচনা পাঠ করে এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে চিত্রকলা সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি চিত্রশিল্পের একজন খাঁটি সমজদার ছিলেন। তথাপি শিল্প এমন জিনিস—তা কাব্যসাহিত্যই হোক আর চিত্রকলাই হোক—সে সম্পূর্ণরূপে কখনো নিজেকে ব্যক্ত করে না, খনিকটা তার অব্যক্ত এবং অস্পষ্ট থেকেই যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রখ্যাত শিল্পী এল্ গ্রেকোর কোনো কোনো ছবি হাক্সলির কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছে, তারই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি পূর্বোক্ত মন্তব্যটি করেছিলেন। অর্থাৎ যা স্পষ্টত বোঝেন নি তাও চোখে দেখে তিনি আনন্দ পেয়েছেন।

আমার কথা সম্পূর্ণ আলাদা। রঙ-রেখার ভাষা এবং চিত্রাঙ্কণের প্রকরণ সম্পর্কে আমার জ্ঞান এত সামান্য যে ছবি দেখার আনন্দ বলতে গেলে আমাকে একেবারে না বুঝেই পেতে হয়েছে। কিন্তু বুঝি নি বলে আনন্দ পাই নি এ কথা অবশ্যই বলব না। কাব্য সাহিত্য শিল্প সম্বন্ধে এটা নতুন কথা নয়। রস গ্রহণ করতে সবটুকু বোঝবার প্রয়োজন হয় না, বোঝা যায়ও না। অনেক কবিতা আছে যার মর্ম পুরোপুরি বুঝতে পারি নি, ব্যাখ্যা করে কখনোই বুঝিয়ে বলতে পারব না, অথচ তারই মধ্যে অপূর্ব স্বাদ পেয়েছি—এ অভিজ্ঞতা আমার একলার নয়, কাব্যরসিক মাত্রেরই এই অভিজ্ঞতা। এমন যে টি. এস. এলিয়ট তিনিও বলেছেন—"Some of the poetry to which I am most devoted is poetry which I did not understand at first reading ; some is poetry which I am not sure I understand yet"। কাব্যের আস্বাদ লাভ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "লাভ করিবার জন্য পুরোপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না।' রবীন্দ্রনাথ 'কথা'কে বলেছেন মুখরা—'মুখরার মন রাখতে চিন্তা করিতে হয় বিস্তর।' সে তুলনায় রেখাকে বলেছেন 'অপ্রগলভা' ; ওর মুখে কথা নেই। কিন্তু আমি বলব মুখে কথা নেই বলেই ওর মন পেতে হলে চিন্তা করতে হয় আরো বিস্তর। আমার সাধ্যে সেটা কুলোয় না। অবনীন্দ্রনাথ-

নন্দলালের বহু ছবি মনকে আশ্চর্য রকম দোলা দিয়েছে অথচ সে ছবি বিশ্লেষণ করে কিছুই আমি বলতে পারব না। এই সম্পর্কে জঁা পল সাত্রের একটি উক্তি মনে পড়ছে—"I relished the ambiguous delight of understanding without understanding"।

শিল্পকে বোঝা যেমন কঠিন শিল্পীকে বোঝাও তেমনি কঠিন। শিল্প সাধারণ জিনিস নয়, শিল্পীও সাধারণ মানুষ নন। খানিকটা অসাধারণত্ব এঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই নিহিত। তথাপি ছবি না বুঝেও ছবি দেখে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় তেমনি শিল্পীকে পুরোপুরি না বুঝেও তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অনুভব করা যায়। যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আচার্য নন্দলালের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য-লাভের সৌভাগ্য আমার হয় নি. আলাপ-পরিচয় সাধারণ শিষ্টাচারেই আবদ্ধ ছিল। কোনো গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা কখনোই হয় নি। তা হলেও অসাধারণ মানুষের অসাধারণত্ব কোনো মতেই ঢাকা থাকে না, আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে। এমন মিতভাষী মিতাচারী মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। অথচ যখন যেখানে উপস্থিত থেকেছেন তাঁর নীরব উপস্থিতি সমস্ত পরিবেশকে প্রসন্ন করেছে। অসাধারণ মানুষও যে কত সাধারণভাবে চলাফেরা মেলামেশা করতে পারেন সেটা নন্দলাল বসুকে দেখে যতটা মনে হয়েছে এমন আর কাউকে দেখে নয়। পরনে খদ্দরের পাজামা, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া, গলায় খদ্দরের চাদর, পায়ে স্লিপার। গ্রীষ্মের দিনে রৌদ্রতাপ নিবারণের জন্য চাদরটি মাথায় জড়িয়ে নিতেন। ক্ষিতিমোহনবাবুকেও দেখেছি বেশভূষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। এণ্ড্রুজ সাহেবকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা তাঁর আপন-ভোলা চালচলনের কথা এখনও বলেন। এমন দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যেতে পারে। এঁদের সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার সঙ্গে শান্তিনিকেতন-জীবনের বিশেষ একটি যোগ আছে। উপকরণ-বাহুল্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন না। এখানকার জীবন আরম্ভ করেছিলেন খোলা মাঠের মধ্যে খান কয়েক খড়ের চালাঘর নিয়ে। যাঁরা এসে কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সেই পরিবেশের সঙ্গে অভ্যাসে আচরণে অশনে বসনে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। অবশ্য বলে নেওয়া ভালো যে বেশভূষার ঔদাসীন্যটা in itself একটা গুণ নয়, বেশভূষার পরিপাট্যও একটা দোষ নয়। আসল কথাটা হল, রবীন্দ্রনাথ একটি সরল অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে যে একটি ঐশ্বর্যময় জীবনের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন এঁরা সেই জীবনের প্রতীক। তাঁর ঈপ্সিত ঐশ্বর্য বহিরঙ্গে প্রকাশ না পেয়ে অন্তরঙ্গ জীবনে প্রতিফলিত হবে, এই তিনি চেয়েছিলেন। জানতেন

বাইরের বৈভব অন্তরের দারিদ্র্যকে কখনো ঢেকে রাখতে পারে না। সহজ সরল জীবনের মধ্যে একটি আভিজাত্য আছে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন সে আভিজাত্যের চর্চা করেছে। শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন জীবনটিকে নানা কারুকার্যে মণ্ডিত করে শোভন সুন্দর করে গড়ে দিয়েছিলেন। দৈনিক কর্মসূচি হিসাবে না দেখে এর সাংগঠনিক দিকটির কথা ভাবলে একে একটি শিল্পকর্ম বলে মনে হতে পারত। কারণ ঐ কর্মসূচির মধ্যে রুচিটাই প্রধান স্থান পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায় রুচির স্থান সর্বোপরি। সুষ্ঠু রুচিবোধ একবার গড়ে দিতে পারলে আর কোনো ভাবনা থাকে না। শোভন পরিচ্ছন্ন রুচি বাহ্যিক জুলুসের অপেক্ষা রাখে না। এখানকার শিক্ষক-চরিত্র ঐ আদর্শেই গড়ে উঠেছিল। চাল্-চলনের সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ নানাগুণে গুণান্বিত। এঁরা কেউ লেখক, কেউ শিল্পী, কেউ সঙ্গীতজ্ঞ, কেউ অভিনেতা, কেউ গ্রামসেবক, কেউ ক্রীড়াপারদর্শী। বহু গুণী ব্যক্তির সমাবেশে এক অত্যুজ্জ্বল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। সামান্য একটি ইস্কুল পরিচালনার জন্য—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতি-মোহন সেন, এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন প্রমুখ পণ্ডিতের সমাবেশ আপাতদৃষ্টিতে একটু বেহিসেবী মনে হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে কোনো জিনিসকেই ছোট করে কল্পনা করেন নি। অবশ্য তাঁর বৃহতের কল্পনা আয়তনের পরিমাপে নয়, আয়োজনের পরিমাপে। যে জিনিস নিছক প্রয়োজনের মাপে তৈরী সে কখনো সত্যিকারের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এই কারণেই ইস্কুলের জন্যও এমন-সব পণ্ডিতের কথা তাঁকে ভাবতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ এর মধ্যেই নিহিত ছিল। পরবর্তীকালে যখন বিশ্বভারতীর সৃষ্টি হয় তখন দেশবিদেশাগত মনীষীদের সমাগমে এই গুণীসমাবেশ বহুগুণে সমৃদ্ধ হয়েছিল। বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, হরিচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সনের সঙ্গে এসে যুক্ত হলেন সিলভাঁ লেভি, স্টেন কোনো, ফর্মিকি, টুচ্চি, উইনটারনিজ, লেজনি, কলিন্স, বোগদানভ, বেনোয়া প্রমুখ পণ্ডিতগণ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনোও অধ্যাপনার কাজ করেন নি, কিন্তু প্রাচীন তপোবনবাসী ঋষির ন্যায় নিয়ত জ্ঞানচর্চায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর জ্ঞান-তপস্যা এখানকার পরিবেশকে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। চোখের সম্মুখে এরূপ একাগ্র নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত একটা বৃহৎ প্রেরণার উৎস।

একই সময়ে একই স্থানে এতগুলি গুণীজনের সমাবেশ পৃথিবীর খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখা গিয়েছে। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভাকেও হার মানিয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'একা নবরত্ন ক্ষিতিমোহন'। পাণ্ডিত্যে এবং রসালাপে ক্ষিতিমোহনবাবু একলাই বিদ্বজ্জনসভা জমিয়ে রাখতে পারতেন। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ—তাঁর সৃজনী প্রতিভার অবিরাম প্রবাহ গানে গল্পে নাটকে মন্দিরের ভাষণে শান্তিনিকেতনের জীবনকে রূপে রসে আনন্দে অভিষিক্ত করে রেখেছিল। যে গুণী-সমাবেশের কথা বলছিলাম একমাত্র আর্থারের রাউণ্ড টেবল্-এর সঙ্গে এর তুলনা চলতে পারত। টেনিসন্ রাজা আর্থারের রাউণ্ড টেবল্ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন—the goodliest fellowship of famous Knights whereof this world holds record—রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিশ্বভারতী সম্পর্কে সে কথা বলতে পারতেন। আর্থারের নাইটরা যেমন শৌর্যবীর্যের ব্রতপালনে নিত্য উৎসুক, এইসব জ্ঞানান্বেষী পণ্ডিতেরাও তেমনি জ্ঞানের বিস্তীর্ণ রাজ্যে সারাক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিযুক্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথ কাণ্টীয় দর্শনের মর্মোদ্ধারে মগ্নচিত্ত, বিধুশেখর শাস্ত্রী নানা ভাষার অনুশীলনে এবং হিন্দু বৌদ্ধ শাস্ত্রালোচনায় নিবিষ্টমন, ক্ষিতিমোহনবাবু মধ্যযুগীয় সন্তদের বাণী সংগ্রহে রত, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিধান রচনায় একাগ্রচিত্ত। আমরা সাধারণত বলি বিদ্যাদান, বিদ্যালাভ—কথাগুলি অসম্পূর্ণ। আসল কথা বিদ্যা অর্জন। এঁরা বিদ্যাকে নিজ চেষ্টায় এবং অধ্যবসায়-বলে অর্জন করেছেন অর্থাৎ শিক্ষক হয়েও এঁরা শিক্ষার্থী। ছাত্ররা এই যে বিদ্যাচর্চায় রত অন্যমনা পণ্ডিতদের নিয়ত চোখের সুমুখে দেখেছে এটাই একটা মস্ত বড় শিক্ষা।

এ ছাড়া বিদ্যাচর্চাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো কেবলমাত্র পঠন-পাঠন পুথিচর্চায় আবদ্ধ রাখেন নি। বিদ্যাচর্চাকে তিনি দেখেছেন জীবনচর্চা হিসাবে। শান্তিনিকেতন-শিক্ষার একটা বিশেষ দিক দেশবাসী আজ পর্যন্তও ভালো করে বুঝতে পারেন নি। সেটি এর ভাবগত দিক। কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার অন্তরে একটি ভাবপ্রবাহ নিত্য প্রবাহিত রাখতে হয়। এই কেন্দ্রগত ভাবটিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন লোকহিতব্রত। তাঁর শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি লোকহিতের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। বারম্বার বলেছেন চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবনের সঙ্গে যোগস্থাপন শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। বলেছেন—"মাঠের মধ্যে ছেলেদের রেখে শিক্ষা দিচ্ছি, কিন্তু লোকালয়ের জন্য ওদের যথার্থভাবে প্রস্তুত করতে হবে। ওরা যদি সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর মতো বই-পড়া ভালো মানুষ লোক হয়ে ওঠে—ওদের অন্তঃকরণ যদি সত্যভাবে মানব-প্রেমে অভিষিক্ত না হয়ে ওঠে তা হলে আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হবে। নদী পাহাড়ের গুহার মধ্যে লালিত ও পুষ্ট হবে, কিন্তু লোকালয়ে প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশের ক্ষুধাতৃষ্ণা

মেটাবার সম্বল তাকে জোগাতে হবে—আমাদের ছেলেরা আমাদের দেশের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করবার জন্যেই আমাদের বিদ্যালয়ের নির্জনে সত্যের ও ভাবের ধারায় পরিপুষ্ট হতে থাকবে এই আমার ইচ্ছা।” জনজীবনের বার্তাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন Song of the Open Road। বিদ্যাদান কার্যের সঙ্গে ঐ মহাসঙ্গীতের ধ্বনিকে মিলিয়ে দেওয়া শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কিন্তু সে কাজ সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যিনি আদর্শ শিক্ষক তিনি শুধু বিদ্বান নন, তিনি ভাবুক; কিন্তু ভাবসঞ্চারের ক্ষমতা সকলের সাধ্যায়ত্ত নয়। এমনকি বিশেষ ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হবার ক্ষমতাও অনেকের নেই। শান্তিনিকেতনের শিক্ষকবর্গকে তিনি বরাবর বলে এসেছেন যে শিক্ষাব্রতীকে লোকহিতব্রতী হতে হবে। এই ব্রতপালনে তাঁকে সহায়তা করেছেন প্রথম যুগের অধিকাংশ অধ্যাপক, বিশেষ করে ক্ষিতিমোহন সেন। বাংলাদেশের গ্রামজীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। গ্রাম-দেশে প্রচলিত কথকতা রীতিকেই তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের বাহন করেছিলেন। নন্দলাল বসু অবহেলিত গ্রামবাসী কামার কুমোর ছুতোরকে শিল্পীর সম্মান দিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত নানা কারুশিল্পকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা দেশের গ্রাম্য জীবনকে রঙে রেখায় তিনিই ফুটিয়ে তুললেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এণ্ড্রুজ দুর্গত মানুষের কল্যাণ কামনায় যে অক্লান্ত কর্মের দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন তা অতুলনীয়; সাঁওতাল পল্লীর সেবায় পিয়ার্সনের নিষ্ঠা ছাত্রদের সেবাকার্যে উদ্বুদ্ধ করেছে; এল্‌মহার্স্ট, কালীমোহন গ্রাম সংগঠন কার্যে প্রাণমন সমর্পণ করেছেন। এ সমস্তই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত।

এ কথা নিশ্চিত যে ব্যাপক অর্থে শিক্ষাদান ব্যাপারে পাণ্ডিত্য ছাড়াও আরো অনেক গুণের প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ কবি, তিনি স্রষ্টা। তিনি জানেন যে মানুষ নিষ্ক্রিয় ভাবে শুধু গ্রহণ করে না, সে দিতেও চায়। মানুষের মন সৃজনবিলাসী, সৃজনকার্যেই তার প্রধান তৃপ্তি। শিক্ষা ব্যাপারটা একটা অকর্মক ক্রিয়া নয়। বিদ্যার্জন ক্রিয়াটা তখনই সকর্মক অর্থাৎ সার্থক হবে যখন বিদ্যার্থী নিজেকে প্রকাশ করতে শিখবে। সে গান করবে, অভিনয় করবে, ছবি আঁকবে, কবিতা লিখবে, নাচবে, খেলবে। কোনো কিছুতে পারদর্শিতা দেখাতে পারলে তবেই তার আত্মবিশ্বাস জন্মাবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার আয়োজনকে অনেক বিস্তৃত করতে হয়েছে। ছাত্রদের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে হয়েছে নানা দিকে, নানাভাবে। এইজন্যে প্রয়োজন হয়েছে দিনেন্দ্রনাথের ন্যায় সুরশিল্পীর, নন্দলালের ন্যায় চিত্রশিল্পীর। আত্মপ্রকাশের

প্রশ্ন ছাড়াও শিক্ষার ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের চর্চা রবীন্দ্রনাথের মতে অপরিহার্য। একবার যদি সৌন্দর্যবোধ মনে জাগিয়ে দেওয়া যায় তা হলেই মানুষের মন নীচতা। ক্ষুদ্রতা হিংসা বিদ্বেষ—সকল প্রকার কুৎসিত চিন্তা থেকে বিরত থাকবে। সৌন্দর্যবোধ মূলত পরিমিতিবোধ—আচারে ব্যবহারে, নিত্যদিনের কর্মে। সুমিতিবোধ আর সুনীতিবোধ এক কথা। সভ্য মানুষের একমাত্র নীতি সৌন্দর্যবোধ যার বাস্তব প্রকাশ ব্যবহারের সৌকুমার্যে। যে কাজ সৌন্দর্যবোধকে পীড়িত করে তাই নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। কল্যাণকে এবং সুন্দরকে এই জন্যেই আমাদের শাস্ত্রে একাসনে স্থান দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাকে যেখানে বৃহত্তম শিল্প অর্থাৎ জীবনশিল্প হয়ে দেখা হয়েছে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধান কথা শিল্পরুচি। সে কাজ গোড়ার দিকে শুরু করেছেন কবি নিজে। কবিমনের স্বভাবসুলভ শোভন রুচির ছাপ পড়েছে প্রতিদিনের প্রত্যেকটি কাজে। রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে যেখানে কোথাও একটু রঙ ছিল না, সবুজের আভা ছিল না, সেখানে একটি যেন মরূদ্যান গড়ে উঠল। ক্ষয়ে-যাওয়া মাটির ক্ষয় নিবারণ হল। মাটির গায়ে সবুজের ছোপ লাগল, ছেলেদের মনেও। এই সমস্তই কবির নিজ উদ্যমে সম্ভব হয়েছে। নন্দলালের আগমনের পরে আশ্রমের সাজসজ্জায় তিনিই হলেন রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়। কবি এবং শিল্পীর মিলনে দিনে দিনে শান্তিনিকেতন-জীবনের শ্রীসৌন্দর্য বাড়তে লাগল। কবির কাব্য রঙে রেখায় রূপ গ্রহণ করল। প্রাচীরগাত্রে দেখা দিল কচ-দেবযানীর কাহিনী, নটীর পূজার কাহিনী। রবীন্দ্রনাট্যের প্রযোজনায় মঞ্চসজ্জার ভার নিলেন নন্দলাল। যথার্থ শিল্পরুচি যাদুমন্ত্রের কাজ করে। যৎসামান্য উপকরণের সাহায্যে সহজের মধ্যে সুন্দরকে ফুটিয়ে তোলবার দুঃসাধ্য সাধনায় নন্দলালের অসামান্য প্রতিভা প্রকাশ পেল। সুরকার হান্‌ডেল্ সম্পর্কে বীটোফেন বলেছিলেন—go and learn of Handel how to achieve great effects with simple means। রূপসজ্জার ব্যাপারে সামান্যকে অসামান্য করবার ক্ষমতায় নন্দলালের সমকক্ষ ব্যক্তি এ দেশে জন্মগ্রহণ করেন নি। আমাদের মঞ্চসজ্জা এবং উৎসবসজ্জায় এক নতুন ধারার প্রবর্তন হল। পরবর্তীকালে কংগ্রেস মণ্ডপ সজ্জায় শিল্পের এই সহজিয়া সাধনার রূপ দেখে গান্ধীজি বলেছিলেন, নন্দলালজি তো যাদুকর হ্যায়। শান্তিনিকেতনের উৎসব প্রাঙ্গণ প্রভৃতি ঋতুতে তাঁরই হাতের ছোঁয়া লেগে প্রাণবন্ত হয়েছে। এক কথায় শান্তিনিকেতনের প্রসাধন-ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। সুন্দর জিনিস সারাক্ষণ চোখের সুমুখে থাকলে মানুষের রুচি অজ্ঞাতসারে মার্জিত হয়। চৈতন্যর কাছে

ঢাকা আধারে ছবি কিংবা মূর্তি কোনো হস্তশিল্পের নিদর্শন ছাত্রদের চোখের স্মুখে রাখা থাকত। রুচি অনুশীলনে এর মূল্য অপরিসীম। সঙ্গীত সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। ছাত্ররা ক্লাশ করছে, তারই মধ্যে দূর থেকে গানের স্বর তরঙ্গিত হয়ে আসছে। নিত্যকার রুটিনবদ্ধ জীবনকে ছন্দোবদ্ধ করেছে। এরও মূল্য কম নয়। চার্লস ল্যাম তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন—ঘরে বসে আমি লিখছি, আমার জানলার বাইরে ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, তাদের রিন্‌রিনে গলার কলকোলাহল আমার কাজ অনেকখানি সহজ করে দিচ্ছে। বলেছেন, "It is like writing to music. They seem to modulate my periods." ছেলেপেলের উচ্চকণ্ঠ কলরব যদি ক্লান্তি হরণ করতে পারে তা হলে তাদের মিঠে গলার গান যে কাজের মধ্যে কতখানি মাধুর্য এনে দিতে পারে—শান্তিনিকেতনে এই অভিজ্ঞতা নিত্য দিনের। রুটিনের রূঢ়তা ছাত্র শিক্ষক উভয়ের মন থেকে আপনি দূর হয়ে যায়।

ঋতু-উৎসবের অঙ্গসজ্জার কথা আগে বলেছি। এই সূত্রে বলা আবশ্যক যে রবীন্দ্রকাব্যে ঋতু-বৈচিত্র্য বা প্রকৃতির নিত্যপরিবর্তনশীল রূপ যে স্থান অধিকার করেছে নন্দলালের চিত্রশিল্পেও ঠিক সেই স্থান দখল করেছে। সকল দেশেরই কাব্যে শিল্পে বিষয়বস্তু এককালে আহরণ করা হয়েছে প্রধানত পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক মালমসলা থেকে। অর্থাৎ সে কালের কাব্য শিল্প কিছুবা ধর্মকথা কিছুবা ইতিবৃত্ত। পশ্চিম দেশে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই কাব্য শিল্পের রাজ্য-বিস্তার শুরু হয়েছে। পুরাবৃত্ত ইতিবৃত্ত ছেড়ে আমাদের নিত্য পরিচিত জগৎ কাব্যে সাহিত্যে স্থান পেল। ইংরেজি সাহিত্যে এ পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতর করেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। তাঁর কাব্যকীর্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য—to give the charm of novelty to things of everyday life. অতিপরিচয়ে যে জিনিস উপেক্ষিত তার মধ্যে সৌন্দর্যের আবিষ্কার যথার্থ শিল্পীমনের পরিচায়ক। আমাদের সাহিত্যে ঐ কাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের চতুষ্পার্শ্ব সম্পর্কে আমাদের মনকে সজাগ করে দিলেন। আমাদের ঘরের পাশের গাছপালা, ফুলফল, আমাদেরই দোরের স্মুখ দিয়ে যে মানুষ হাটে যায়, গোরুর গাড়ি চালায় তাদের সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য বাড়ল।

আমাদের কাব্যে সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে কাজটি করেছেন চিত্রশিল্পে সেই কাজ করেছেন নন্দলাল। রবীন্দ্রনাথ যেমন বুনো ফুলটিকেও অবহেলা করেন নি, বলেছেন—তোমায় আসন কাব্যে দিলাম পেতে, নন্দলালের ছবিতেও তেমনি এতকালের শিল্পের উপেক্ষিতরা রেখায় তুলিতে ফুটে উঠল। বীরভূমের

খোয়াই, গোরু-চরা মাঠ, সাঁওতাল মাঝি মেঝেন, সমুদ্রতীরের নুলিয়া, পাহাড়ী কুলি মজুর—শিল্পের জগতে এদের সকলের স্থান করে দিলেন। আমাদের চিত্রশিল্পে এইটি মস্ত বড় দান। এর অভিনন্দন মিলেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেখানে নন্দলালকে সম্বোধন করে বলেছেন—

যাহা তাহা যেমন-তেমন আছে কতই কী যে,
তোমার চোখে ভেদ ঘটে নাই চণ্ডালে আর দ্বিজে।

কিংবা

এঁকে বসলে ছাগল একটা উচ্চশ্রবা ত্যেজে

উচ্চশ্রবাকে ত্যাগ করে ছাগলের প্রতি মনোনিবেশ করার মধ্যেই পুরাবৃত্ত ছেড়ে পারিপার্শ্বিককে গ্রহণ করার ঈঙ্গিত আছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন আমাদের অভ্যাস-জীর্ণ চোখ এবং মনকে নিত্য পরিচিত জিনিসের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত করেছেন নন্দলাল সেই জিনিসকেই তুলির স্পর্শে চোখের সুমুখে তুলে ধরে ঐ পরিচয়কে আরো অন্তরঙ্গ করেছেন। নন্দলালের প্রকৃতিবন্দনা কেবলমাত্র গিরিশৃঙ্গের শোভা এবং সূর্যাস্তের আভায় সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর প্রকৃতির মূর্তি বহু ক্ষেত্রে অতিশয় প্রাকৃত—

ঐ যে গরিবপাড়া,
আর-কিছু নেই ঘেঁষাঘেঁষি কয়টা কুটীর ছাড়া।
তার ওপারে শুধু
চৈত্র মাসের মাঠ করছে ধূ ধূ।

এই নিরাভরণ দৃশ্যের সৌন্দর্য নন্দলালের আবিষ্কার। এ দিক থেকে নন্দলাল কবিগুরুর শিল্পীশিষ্য। তাঁর শিল্পকর্ম অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকৃতির পরিপূরক। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গ্রন্থে ছবির অলংকরণ নন্দ-লালের কৃত। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাকে তিনি রঙে রেখায় রূপ দিয়েছেন। এ দিকে থেকে নন্দলাল রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম interpreter বা ভাষ্যকার। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথও নন্দলালের আঁকা চিত্র অবলম্বন করে বহু কবিতা রচনা করেছেন। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে যাঁরা এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন তাঁর কাজে, মন মিলিয়েছিলেন তাঁর মননে, সুর মিলিয়েছিলেন তাঁর গানে, তাঁরা অনেকেই বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী; কিন্তু কবি এবং শিল্পীতে যে যোগাযোগ ঘটেছিল এমন মণিকাঞ্চন যোগ কদাচিৎ ঘটে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগ স্থাপন বিশ্বভারতীর অন্যতম আদর্শ। সেই কার্যে রবীন্দ্রনাথের সহায়তা করেছেন এণ্ড্রুজ দেশ-বিদেশে কর্মযোগে আর করেছেন নন্দলাল তাঁর শিল্পসাধনার

বলে। যে কালে বিদেশী ছাত্রদের এ দেশে আসার রেওয়াজ হয় নি সেই তখনো দূর দেশের শিক্ষার্থীরা শান্তিনিকেতন কলাভবনে এসে ভিড় করেছেন। এসেছেন সিংহল থেকে, চীন জাপান জাভা থেকে। শান্তিনিকেতনের 'নন্দন' ক্ষুদ্রাকারে এ যুগের নালন্দা।

দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সাধনার স্থল শান্তিনিকেতন। সেই সাধনক্ষেত্রের প্রসাধন-ভার যিনি গ্রহণ করেছিলেন তিনি বিনা সাধনায় সে কার্য সাধন করতে পারেন নি। নন্দলালের জীবন এক সাধনার জীবন। অর্ধশতাব্দী-কাল বলতে গেলে যোগাসনে বসে কাটিয়ে দিলেন। অর্থ স্বার্থ পদমর্যাদা, ক্ষমতার মোহ, বহির্জগতের সমারোহ কিছুই তাঁকে একাগ্র নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। চতুর্গুণ মাইনের চাকুরি একাধিক বার প্রত্যাখ্যান করেছেন। শান্তিনিকেতনের ইতিহাস বহু জনের স্বার্থত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। সে ইতিহাস আজ বিস্মৃতপ্রায়।

শান্তিনিকেতন-শিক্ষার উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য গুরুশিষ্যের সম্পর্ক। এ দিক থেকে শান্তিনিকেতন ভারতীয় ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। পুরাকালের সেই গুরুভক্তি যে এ কালেও সম্ভব সে কথা নন্দলাল এবং তাঁর শিষ্যদের সম্পর্ক স্বচক্ষে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করত না। ছাত্রদের শুভাশুভ চিন্তায় তিনি তাঁদের অভিভাবক, সংকটে সমস্যায় সচিব, ললিত কলাচর্চায় প্রিয়সখা। ছাত্র শিক্ষক মিলে কলাভবনে একটি অতি স্নিগ্ধ পারিবারিক জীবন গড়ে উঠেছিল। ঐটিই শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ। শিক্ষক নন্দলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য—

"ছোটো বড় সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্ব প্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে শোকে অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।"

প্রকৃত শিক্ষক যে কী ভাবে আপন ব্যক্তিত্বকে চতুষ্পার্শে পরিব্যাপ্ত করতে পারেন তার প্রমাণ—শুধু কলাভবনের ছাত্রদের কাছেই নয়—সমস্ত আশ্রমবাসীর নিকট তিনি মাস্টারমশায় নামে পরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ সমগ্র শান্তিনিকেতন তাঁকে শিক্ষাগুরু হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

শিক্ষা জিনিসটা একতরফা নয়— শিক্ষক-ছাত্রের সমবেত প্রয়াসের ফল। আপন শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে বলেছেন,

"শেখাই নি, একসঙ্গে কাজ করেছি। ছাত্রদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কাজ

করেছি। আমারটা দেখে ওরা শিখেছে, ওদেরটা দেখে আমি। কে মাস্টার, কে ছাত্র মনেই হয় নি।"

এই হচ্ছে আদর্শ শিক্ষকের কথা। এই এক কথায় শান্তিনিকেতন-শিক্ষা-পদ্ধতির মর্মকথাটি তিনি ব্যক্ত করেছেন। লেনার্ড এলমহার্স্ট বলেছিলেন; নন্দলালের সঙ্গ একটা এডুকেশান। শিক্ষকের কৃতিত্ব সম্পর্কে এর চাইতে বড় কথা আর হতে পারে না। শিক্ষকের ব্যক্তিত্বই শিক্ষার প্রধানতম উৎস। সেই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—বুদ্ধি হৃদয় নৈপুণ্য অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির এরকম সমাবেশ অল্পই দেখা যায়।

সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যা বিতরণই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ নয়, বিদ্যার বিকিরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সেদিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি কেবলমাত্র তার ক্যাম্পাস্‌এ আবদ্ধ নয়, সমগ্র দেশে বিস্তৃত। শিক্ষা বিকিরণের আদর্শ নিয়েই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ এবং লোকশিক্ষা সিরিজের গ্রন্থাদি প্রকাশকে বিশ্বভারতীর কর্মসূচীর অন্তর্গত করে দিয়েছিলেন। আবার গ্রন্থপ্রণয়নই শিক্ষা বিকিরণের একমাত্র উপায় নয়। রবীন্দ্রনাথের গান এবং নাটকের অভিনয়ও এ কাজে প্রচুর সহায়তা করেছে। নন্দলালও শিল্প-বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর এক অভিনব দান—তাঁর অঙ্কিত অগণিত স্কেচ। যখনই যাঁর কাছে চিঠি লিখেছেন তখনই কার্ডের এক দিকে কোনো না কোনো স্কেচ করে পাঠিয়েছেন। অটোগ্রাফ বইএর তো কথাই নেই। এরূপ শত শত স্কেচ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। লোক-শিক্ষার এ এক অভিনব প্রণালী। এক কালের লোকসঙ্গীত, লোকসাহিত্য যে কাজ করেছে শিল্পের ক্ষেত্রে নন্দলাল বসু সেই কাজ করেছেন। শ্রীযুত অমিয় চক্রবর্তী বলেছেন, "আচার্য নন্দলাল বসুর সংহত স্কেচের এবং চিত্রের অজস্রত্ব বিশ্বের শিল্পে অতুলনীয়।" এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কারুকলার ভাষা নির্বাক। শান্তিনিকেতনের সর্বাঙ্গে কারুকলার ছাপ অর্থাৎ নন্দলালের নীরব উপস্থিতি সর্বত্র বিজ্ঞাপিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রেখা অপ্রগলভা; সে কখনো নিজেকে সরবে ঘোষণা করে না। শিল্পের স্বভাব শিল্পীর মধ্যে বর্তায়। নন্দলালের মতো মিতভাষী মিতাচারী মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। শিল্পসৃষ্টিতে তিনি যে সংযম দেখিয়েছেন দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে সেই সংযম প্রকাশ পেয়েছে। ব্যবহারে বা কাজে কখনো কোনো প্রকার আতিশয্য প্রকাশ পায় নি। মানুষের ধর্মবোধ যেমন আচরণে প্রকাশ পায় তাঁর

শিল্পকর্ম তেমনি নিত্যকার আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে তিনি সার্থক করেছেন—'আর্টিস্টের স্বকীয় আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর চরিত্রে তাঁর জীবনে। আমার বারম্বার তার প্রমাণ পেয়েছি নন্দলালের স্বভাবে।'

আচার্য নন্দলালের দেহাবসানের সঙ্গে শান্তিনিকেতন-ইতিহাসের এক অধ্যায় সমাপ্ত হল। যাঁদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন বিশ্বভারতীর সংসার পেতেছিলেন নন্দলালের মৃত্যুতে সে সংসারের শেষ প্রদীপটি নিবে গেল।

শান্তিনিকেতনে সরোজিনী নাইডু

বিভিন্ন দেশে বিশ্ববিত্থালয়-জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত গড়ে উঠেছে রাজ অনুগ্রহে, সরকারী সহায়তায় কিংবা সমষ্টিগত প্রচেষ্টায়। ব্যক্তিগত প্রয়াসে বা কোন বিরাট প্রতিভার ছত্র-ছায়ায় বিশ্ববিত্থালয়-সদৃশ কোন বিত্থাকেন্দ্র কোথাও গড়ে উঠেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে এক্ষেত্রে একক এবং অনন্য বলা চলে। প্লেটোর অ্যাকাডেমি এবং অ্যারিস্টটলের লিসিয়াম বিত্থালয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ বিত্থালয় দুটি যদিচ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে পরিচিত ছিল না তথাপি খ্যাতি প্রতিপত্তিতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতেই এরা ন্যূন নয়। বহুবিধ জ্ঞানচর্চার এরা পথিকৃৎ, নানা চিন্তার জন্মদাতা। আকৃতিতে না হলেও প্রকৃতিতে এরা যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠাতা আচার্যদের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আজ আড়াই হাজার বছর পরেও এই দুই বিদ্যালয়ের স্মৃতি অমলিন। প্লেটোর অ্যাকাডেমি তার মৃত্যুর পরেও অন্যান্য পণ্ডিতদের তত্বাবধানে বেশ কিছুকাল বেঁচে ছিল। মাঝে একাধিক বার বন্ধ হয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। কিন্তু অ্যারিস্টটলের বিদ্যালয় তাঁর জীবদ্দশাতেই লুপ্ত হয়েছে। সরকারের বিষ নজরে পড়ে এথেন্সে পাট তুলে দিয়ে তাঁকে পালাতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের প্রতিও তৎকালীন ভারত সরকারের সুদৃষ্টি ছিল না। নানাভাবে নানা বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে। এক সময়ে সরকার এক ফতোয়া জারি করেছিল যে সরকারী কর্মচারীরা তাঁদের ছেলে-পেলেদের শান্তিনিকেতন বিত্থালয়ে পাঠাতে পারবেন না। তবু বলতে বাধা নেই যে বিদেশী সরকারের বিরূপতা শান্তিনিকেতনের খুব একটা ক্ষতি করতে পারেনি। সত্যি বলতে কি, এখন যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় সরকারের কুনজরে যতখানি অনিষ্ট হয়, অতিরিক্ত সুনজরে তার চাইতে ঢের বেশী অনিষ্ট হতে পারে।

কোন বিরাট প্রতিভার অভিভাবকত্বে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে অতি দ্রুত তা পরিণতি লাভ করে, খ্যাতি প্রতিপত্তি বহু দূরে ব্যাপ্ত হয় কিন্তু এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে খুব নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কারণ এরূপ প্রতিষ্ঠানের উপযোগী প্রাণরস যোগাতে পারে এমন প্রতিভা সর্বক্ষণ সর্বত্র মেলে না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য। যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনিই আচার্যরূপে

অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রধানত তাঁরই উপদেশ নির্দেশমত কার্য পরিচালনা হত। রবীন্দ্রনাথের পরে আচার্য পদে বৃত হলেন অবনীন্দ্রনাথ। মহাকবির পরে মহাশিল্পী। অভিভাবক রূপে বিশ্বভারতী এবারও পেল এক শক্তিশালী সৃজনী প্রতিভাকে। বার্ধক্যক্লিষ্ট অশক্ত দেহ নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এসে বাস করেছেন। এখানকার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সাধ্যমত যোগ রক্ষা করেছেন, উৎসাহ প্রেরণা জুগিয়েছেন। ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে বসেছে, তিনি মুখে মুখে গল্প রচনা করে তাদের শুনিয়েছেন। ছাত্রদের সাহিত্য-সভায় সভাপতিত্ব করেছেন, কলাভবনের ছাত্র অধ্যাপকদের সঙ্গে শিল্পকলার আলোচনা করেছেন, উৎসবে পার্বণে তার আনন্দময় সান্নিধ্যের প্রসাদগুণে সমস্ত পরিবেশ প্রসন্ন হয়েছে। এরই মধ্যে সময় করে নিজের ছবি আঁকা এবং কুটুমকাটুমের কাজও চলেছে।

শান্তিনিকেতনের প্রাণশক্তির মূলে আছে তার অফুরন্ত আনন্দ কারণ আনন্দই সকল শক্তির উৎস। রবীন্দ্রনাথের আনন্দোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব থেকে নিয়ত যে আনন্দ বিচ্ছুরিত হত তাতেই সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি সঞ্জীবিত থাকত। অবশ্য প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ছিলেন শান্তিনিকেতনের অধিবাসী, পরবর্তীরা তা নন, কাজেই তাদের কাছ থেকে অতখানি আশা করাও যুক্তিযুক্ত নয়। একমাত্র অবনীন্দ্রনাথ পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসে বাস করেছেন : বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা সত্ত্বেও এই আনন্দ নিকেতনের আনন্দধারাটি তিনি সাধ্যমত প্রবাহিত রেখেছিলেন। এ দু জনের পরে যাঁরা আচার্য পদে বৃত হয়েছেন তাঁদের পক্ষে স্থায়ীভাবে এখানে বাস করা সম্ভব ছিল না : কাজেই তাঁদের নিত্য সান্নিধ্যের সৌভাগ্য থেকে শান্তিকেতন বঞ্চিত হয়েছে। এরই মধ্যে যাঁরা নিজ দায়িত্বটি মনে রেখে আংশিকভাবে হলেও ঐ ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করেছেন তাঁদের কাছে শান্তিনিকেতন চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। এদিক থেকে সরোজিনী নাইডু এবং জওহরলাল নেহরু বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁরা যখন পর পর আচার্য পদে নির্বাচিত হন তখনও বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়নি। কাজেই শান্তিনিকেতন তাঁদের পেয়েছিল নিতান্ত ঘরোয়া-ভাবে, তাঁরাও নিতান্ত আপনজনের মতো এসেছেন থেকেছেন, অল্প সময়ের জন্য হলেও আমাদের জীবনের শরিক হয়েছেন। নেহরু তো কখনো কখনো বলা কওয়া নেই, রান্না ঘরে গিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেতে বসে গিয়েছেন, খেলার মাঠে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে নাগরদোলায় চেপে বসেছেন। মিসেস নাইডু এবং পণ্ডিত নেহরুর বেলাই এটি দেখেছি যে তাঁরা যখনই এসেছেন তখনই সারা আশ্রমে

একটি আনন্দের স্রোত বয়ে যেত, উৎসব লেগে যেত। আনন্দই যে শান্তি-নিকেতনের প্রাণ—শান্তিনিকেতনের প্রবেশদ্বারে ঘোষিত আনন্দরূপমমৃতং-যদ্বিভাতি—এই ঋষিবাক্যের মর্মটি তারা বুঝে নিয়েছিলেন। নাইডু প্রকৃত কবি এবং নেহরু কবি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলেই তাঁদের পক্ষে এটি বুঝে নেওয়া সহজ হয়েছিল। শান্তিনিকেতনকে তাঁরা অতি সহজে আপন করে নিতে পেরেছিলেন, শান্তিনিকেতনও তাঁদের একান্ত আপনারজন বলে জেনেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণে সকলের জন্য আসন পেতে দিয়েছিলেন। ঐ যে বলেছিলেন, সবারে করি আহ্বান—জ্ঞান,গুণী, বিদ্বান, পণ্ডিতদের তো বটেই, কিন্তু বিশেষ করে ডেকে বলেছিলেন—'এসো উৎসুক চিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ।' এটি যাঁরা না বুঝেছেন তাঁরা শান্তিনিকেতনকে কখনই বুঝতে পারবেন না। শান্তিনিকেতনের কাছ থেকে কিছু পেতে হলে উৎসুক চিত্ত এবং আনন্দ-পিপাসু মন নিয়ে আসতে হবে।

অবনীন্দ্রনাথ অবসর নেবার পরে এলেন সরোজিনী নাইডু। কবির পরে শিল্পী, শিল্পীর পরে আবার এক কবি। মহাকবি বলব না কিন্তু মনে প্রাণে কবি। কবি তো শুধু কাব্য রচনা করেন না, তিনি কবি-জীবন যাপন করেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় শ্রীমতী নাইডুরও নিত্য দিনের জীবনটি ছিল কাব্যরসে সমৃদ্ধ। সরোজিনীর ব্যক্তিত্বটি যেমন উজ্জ্বল, ভাবভঙ্গি তেমনি উচ্ছল। মনটি একটা পূর্ণ কুম্ভ, ক্ষণে ক্ষণে খানিকটা যেন ছলাৎ করে উপচে পড়ছে। কথারও বিরাম নেই, হাসিরও বিরাম নেই। নিজে হাসতে জানতেন, অপরকে হাসাতে জানতেন। মজলিশী কথায়-বার্তায় অতুলনীয়। সত্যিকারের কথাশিল্পী একেই বলে। কথায় যেমন গুণপনা তেমনি আবার কথায় ধার, স্ফুলিঙ্গের মত ঠিকরে পড়ত। ইংরেজী ভাষার উপরে অসামান্য অধিকার, অপূর্ব বাচনভঙ্গি। শুনে আশ মিটত না।

কবি-মন যেমন কমনীয় তেমনি নমনীয়। ওকে যেমন ইচ্ছা হেলানো দোলানো যায়। এমন কি এক আধটু ছেলেমানুষি বা ছ্যাবলামি করতেও তাদের বাঁধে না। রবীন্দ্রনাথও ছ্যাবলামিতে পারদর্শী ছিলেন। ছোটদের সঙ্গে ছেলে-মানষি, বড়দের সঙ্গে হাস্য পরিহাস লেগেই থাকত। এটা কবি-স্বভাবের অন্তর্গত। সেইজন্যেই একটি সরোজিনীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—আমি তো মনে করি ইয়ু আর এ্যাজ ফ্রিভলাস অ্যাজ আই অ্যাম। সরোজিনী উল্লসিত হয়ে জবাব দিয়েছিল—গুরুদেব, আপনি ঠিক বলছেন জগৎ পারাপারের তীরে যেখানে ছেলেদের মেলা বসেছে আমরা দুজন তাদেরই দলে। বেলাভূমিতে

বালি আর সমুদ্রের ফেনার সঙ্গে রামধনুর রং মিশিয়ে আমরা যে খেলাঘর তৈরি করেছি সেখানেই আমাদের আশ্রয়। লক্ষ করবার বিষয় যে পূর্বোক্ত চিঠিটিতেই ঐ ফ্রিভলাস রমণীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—ডিয়ার সরোজিনী, ইয়ু আর গ্রেট। তুমি এত বিচিত্র গুণের অধিকারিণী যে তোমাকে দেখে সত্যি আমার হিংসা হয়। দেখা যাচ্ছে ফ্রিভলিটি এবং গ্রেটনেস-এ তেমন কোন বিরোধ নেই।

এই যাকে ছ্যাবলামো বলছিলাম, এটি প্রকৃত পক্ষে যথার্থ বিদগ্ধ মনের লিরিক্যাল গুণ। যাঁরা সাহিত্য রসিক তারা এর যথার্থ মূল্য বুঝতে পারবেন। প্রমথ চৌধুরী দুঃখ করে বলেছিলেন যে আমাদের সাহিত্যে গুণপনাযুক্ত ছ্যাবল্যামোর বড় অভাব। ছ্যাবলামো জিনিসটা যে ফ্যালনা নয়, বরং সাহিত্যের একটি মস্ত বড় উপাদান, বীরবলের ঐ উক্তিটিই তার প্রমাণ। শুধু সাহিত্যের নয়, আমি বলি জীবনেরও একটি মহার্ঘ উপাদান। এটি না থাকলে তেমন তেমন মহাপুরুষেরও মহিমা অনেকখানি কমে যেত।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য সেই বহুগুণধারিণী সরোজিনী একদিন এলেন বিশ্বভারতীর আচার্য হয়ে। সরোজিনী কৃতার্থ, শান্তিনিকেতন উল্লসিত। শান্তিনিকেতনের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। বহুকাল পূর্বে গান্ধীজির নির্দেশে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। শান্তিকেতনের তখন দুঃস্থ অবস্থা, দীন মূর্তি। তাও বলেছেন—যদি পাথরে গড়া মানুষ হতাম তা হলেও আই কুড নট হেলপ বিইং ইন্‌স্পায়ার্ড বাই শান্তিনিকেতন। তারপরেও কয়েকবার এসেছেন। ১৯৩৪ সালে যখন আসেন তখন আম্রকুঞ্জে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। ভারতীয় নারীসমাজের অগ্রগণ্যা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নিজ হাতে তাঁকে মাল্যভূষিত করে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। পরে আচার্য হয়ে যখন এলেন তখন একেবারে ঘরের মানুষ হয়েই এসেছেন। হাসি গল্পে উৎসবে উল্লাসে সমস্ত আশ্রম মেতে উঠত। দীর্ঘদিনের পরিচিতা ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী ছিলেন সমবয়স্কা, দুই বন্ধুতে গল্প জমত। সরোজিনী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ইন্দিরাদেবী বলেছেন—ফুল অব ফান এণ্ড ফ্রলিক। রানী চন্দকে সিটিং দিয়েছেন পোর্ট্রেট আঁকার জন্যে। ছেলেমেয়েরা সাহিত্যসভার আয়োজন করেছে, তিনি সানন্দে তাতে যোগদান করেছেন, বক্তৃতা করেছেন। 'সাহিত্যিকা'র আয়োজিত সেই সাহিত্য সভার কথা অজও স্পষ্ট মনে আছে। সাহিত্যিকার সম্পাদক আমাদের প্রিয় ছাত্র মফজ্জল হায়দার (বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতর শহীদ) ছিলেন সে সভার প্রধান উদ্যোক্তা। অন্নদাশংকর রায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। অন্যতম বক্তা ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। "প্রভাতদার এমনিতেই

রবীন্দ্র-সদৃশ শ্মশ্রুমণ্ডিত সুদর্শন মূর্তি তার উপরে আবার রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে মাথায় চড়িয়েছেন, কালো রঙের টুপি। মিসেস নাইডুর চোখে কৌতুহলের দৃষ্টি, মুখে কৌতুকের হাসি। বক্তৃতা করতে উঠে হাসতে হাসতে বলেছিলেন—দ্যাট জেণ্টালম্যান হু ওয়জ ট্রাইং টু লুক লাইক গুরুদেব—। সত্যি বলতে কি, ভাবে ভঙ্গিতে সব সময়েই বালিকাসুলভ একটি দুষ্টুমি ভরা ভাব থাকত।

আচার্য হিসাবে সমাবর্তন উৎসবে সভানেত্রীর আসনে বসেছেন। সমাবর্তন ভাষণ দেবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রাজগোপাল আচারি। দুজনেই সমান বাকপটু—কেউ কাউকে ছেড়ে কথা কন না। সভানেত্রী নাইডু চক্রবর্তী রাজগোপালকে ভাষণ দেবার জন্মে আহ্বান করতে গিয়ে তর্জনী আস্ফালন করে রীতিমত শাসানির ভঙ্গিতে বলছেন—অ্যাজ্ দ্য আচারিয়া অব বিশ্বভারতী আই কম্যাণ্ড দ্য গভর্নর অব ওয়েস্ট বেঙ্গল টু ডেলিভার হিজ কনভোকেশন অ্যাড্রেস। বলবার ভঙ্গি দেখে সভায় হাসির রোল উঠেছিল। রাজ্যপাল দাঁড়িয়ে উঠে বেশ একটু করুণ মুখ করে বললেন—ফর মেনি ইয়ার্স পাস্ট উই ইন কংগ্রেস সার্কল্স হ্যাভ বিন ইয়ুজ্ড টু দিস কাইণ্ড অব বুলিং। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর পরিহাস বাক্য থেকে কেউ রক্ষা পাননি, স্বয়ং গান্ধীজিও না। সত্যি বলতে কি—For irrelevant looks noboby could beat her. গান্ধীজী সম্পর্কে তাঁর সেই উক্তিটি ক্লাসিক পর্যায়ের বলতে হবে—উই হ্যাভ্ টু স্পেণ্ড এনরমাস সামস্ অব মানি টু কিপ বাপুজী লিভিং ইন পভার্টি।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও তামাসা করতে ছাড়েননি। কবি গিয়েছেন বম্বেতে, সেখানে তাঁর অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন হয়েছে। মিসেস নাইডু তখন সেখানে। তাকেই করা হয়েছে অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী। বম্বেবাসীদের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাদি সব তিনিই করছেন। কবির সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন তাঁর সেক্রেটারি অনিল চন্দ এবং তাঁর সদ্য-বিবাহিত পত্নী রানী চন্দ। দিনমান কবি-সংবর্ধনার প্রচণ্ড ভিড়ে নব-বিবাহিত কন্যাটি একটু বিভ্রান্তবোধ করছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই দেখে সারাক্ষণ তাঁকে নিজের কাছে কাছে আগলে রাখছেন; যেখানেই যাচ্ছেন নিজের পাশটিতে বসাচ্ছেন। বম্বের একজিকিউটিভ কাউন্সিলার স্যার গোলাম মহম্মদ হেদায়েৎউল্লার গৃহে ডিনারের নিমন্ত্রণ। সুসজ্জিত হল-ঘরে নিমন্ত্রিতরা সমাগত। রবীন্দ্রনাথ বসেছেন একটি সোফায়, পাশে বসিয়েছেন রানী চন্দকে। বাড়ির মহিলারা ঘোরতর পর্দানশীন কিন্তু কবির সম্মানে সেদিন তাঁরাও সর্বসমক্ষে এসে বসেছেন। কথাবার্তার ফাঁকে এক সময়ে একজন বয়স্কা মহিলা রানী চন্দকে জিগ্গেস করেছিলেন—বুঢঢা সাব্ আপকা সাব্ হ্যায়?

ডিনার থেকে ফিরবার পথে রানী চন্দ চুপি চুপি মিসেস নাইডুকে ঐ কথাটি বলেছিলেন। শুনে নিজে তো হেসে কুটি কুটি। পরদিন দেখা গেল বম্বের পরিচিত মহলে কারোই আর গল্পটি জানতে বাকি নেই। যেখানে গিয়েছেন সেখানেই গল্পটি সালঙ্কারে প্রচার করেছেন।

যাক বম্বে থেকে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে আসা যাক। চীনভবনের উদ্যোগে প্রতি বৎসর সিনো ইণ্ডিয়ান সোসাইটির অধিবেশন হত। সকালবেলায় সমাবর্তন উৎসব সম্পন্ন হয়েছে, অপরাহ্নে বসেছে চীন ভারত সম্মেলন। আচার্য সরোজিনী সভানেত্রী, রাজগোপাল আচারি প্রধান বক্তা। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মৈত্রী স্থাপনের কথা বলতে গিয়ে রাজগোপাল আচারি এই বলে বক্তৃতা শুরু করেছিলেন যে তাঁর কংগ্রেস সহকর্মীরা অনেকেই বহু দেশ পর্যটন করেছেন কিন্তু তিনি নিজে দেশ ছেড়ে কোথাও যাননি। মিসেস নাইডুর দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার বন্ধু সরোজিনী দেবী যাননি এমন দেশ খুব কমই আছে, এমন কি সি হ্যাজ বিন ইন ইণ্ডিয়া অলসো ফর সাম টাইম। সভাস্থ সবাই হাসছিলেন, মিসেস নাইডু সব চাইতে বেশি।

যেমন কথা বলতে ভালবাসতেন, হাসতে ভালবাসতেন, হৈচৈ করতে ভালবাসতেন তেমনি খেতেও ভালবাসতেন। হায়দ্রাবাদের মানুষ, মুসলমানী হাল-চালে অভ্যস্ত। টেবিল চেয়ারে খাওয়ার চাইতে মেঝেতে ফরাশ পেতে খাওয়া বেশি পছন্দ করতেন। ভোজ্যবস্তু থাকবে মাঝখানে। সবাই ঘিরে বসবেন, ইচ্ছামতো নিজ নিজ প্লেটে তুলে নেবেন। মিসেস নাইডু এলে সে ভাবেই খাওয়ার ব্যবস্থা হত। জিবে টাকরায় লাগিয়ে সশব্দে খুব রেলিশ করে খেতেন। হেসে বলতেন—জান আমার মেয়েরা আমাকে বলে গ্লাটন। নিজে খেতে ভালবাসতেন কিন্তু দুঃখ ছিল, তার মেয়েরা অতিশয় স্বল্পাহারী, একজন আবার নিরামিষাশী। বলতেন, নিরামিষের মধ্যে কি আছে বল তো? অতিশয় স্নেহপরায়ণ মানুষ। ছেলে-মেয়েদের কথা যখন বলতেন তখনই মনে হত একেবারে ষোল আনা বাঙালী মা। সন্তানদের প্রতি যেমন টান তেমনি আবার নিজের মায়ের প্রতিও। অন্তরঙ্গদের কাছে মায়ের কথা বলতে ভালবাসতেন। একবার বলেছিলেন, জান, আমার মায়ের ইচ্ছা মৃত্যু, বলে কয়ে চলে গেলেন। মা দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন। নানা কাজে মিসেস নাইডুকে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হত। কিন্তু হায়দ্রাবাদে যখনই ফিরে আসতেন তখনই প্রতিদিন অনেকটা সময় মায়ের শয্যাপার্শ্বে কাটাতেন। একদিন গিয়ে বসতেই মা বললেন, তুমি এসেছ, ভাল করেছ, আমি আজই চলে যাব। মিসেস

নাইডু তো অবাক, বললেন, ও কি কথা, তোমাকে তো আজ আমি অনেকটা ভাল দেখছি ; দেখো এখন তুমি ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠবে। মা বললেন, না, আমি আজই যাব, তোমার বাবা আমাকে নিতে আসবেন। মিসেস নাইডু বলছিলেন, আমি ভাবলাম, অনেকদিন ভুগে ভুগে মায়ের এখন মাথার ঠিক নেই, কি বলতে কি বলছেন। কিন্তু খুব আশ্চর্যের কথা সেদিনই মায়ের মৃত্যু হল।

রানী চন্দ বলছিলেন, মিসেস নাইডু আমাদেরও দেখতেন আপন সন্তানের মতো, মিশতেন একেবারে ঘরোয়া ভাবে—দে তো বোতামটা একটু লাগিয়ে, এখানটা একটু সেলাই করে। অনিলবাবুকে খুব ধমকাতেন। বলতেন—রানী ছবি আঁকছেন, বই লিখছেন তুমি করছটা কি? অনিলবাবু বলেছিলেন, ম্যাডাম, সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। সরোজিনী নাইডুর স্বামী এবং রানী চন্দর স্বামী দুজনেই পত্নী গরবে গরবী। মিসেস নাইডু হাসতে হাসতে—ইয়ু রাসকেল, বলে অনিবাবুকে তাড়া করেছিলেন।

আজন্ম বাস করেছেন বাংলা দেশের বাইরে, শিক্ষালাভ করেছেন বিদেশে। বাংলা বলা-কওয়ার অভ্যাস হয়নি। লিখেছেন ইংরেজীতে, বক্তৃতা করেছেন ইংরেজীতে। তাই বলে বাংলা জানতেন না এমন নয়, খুব ভালই জানতেন। প্রমাণ পাওয়া গেল এক সভায়। রবীন্দ্রনাথ বক্তা, ভাষণ দিলেন বাংলায়। শ্রোতাদের মধ্যে কিছু বিদেশী, বেশ কিছু অ-বাঙালী। তারা রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা বুঝতে পারেননি বলে দুঃখিত। উদ্যোক্তাদের অনুরোধে সরোজিনী নাইডু রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাটির মর্মকথা অতি সুন্দরভাবে ইংরেজীতে পরিবেশন করে দিলেন।

সে যুগের ভারতীয় নারীসমাজে এমন ঝলমলে ব্যক্তিত্ব আর একটিও ছিল না। সমস্ত দেশকে আলো করে রেখেছিলেন। সেদিন দেশবাসী সরোজিনীকে দেখেছে বিজয়িনী মূর্তিতে। আজকের নবীনেরা তাঁকে দেখেও নি, চেনেও না। তাঁকে চিনতে হলে তাঁকে দেখতে হত, তাঁর মুখের কথা শুনতে হত, তবে বোঝা যেত তাঁর মহিমা। বেশি কিছু তো রেখে যাননি, খান তিনেক কাব্যগ্রন্থ, এখন খুব কমেই তা পড়ে দেখে। তা ছাড়া সমস্ত দেশই আজ নিষ্প্রভ, সেজন্য আমাদের ইতিহাসে একদা যা ছিল অত্যুজ্জ্বল তারও ঔজ্জ্বল্য আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে। এ বছর সরোজিনী নাইডুর জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হবার কথা। বৎসর প্রায় শেষ হয়ে এল কিন্তু কোথায় কিভাবে তাঁকে স্মরণ করা হল, টেরই পাওয়া গেল না। অন্যে পরে কা কথা, যে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিকটতম আত্মীয়ের সে-ই কি তেমন করে তাঁকে স্মরণ করেছে।

সাহিত্য শিল্পী প্রমথ চৌধুরী

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব যেমন বিলম্বিত, খ্যাতিলাভ তেমনি দ্রুতত্রস্ত। বলতে গেলে লেখনী ধারণ মাত্রই তাঁর বিজয়বার্তা চতুর্দিকে ঘোষিত হয়েছে। বিলম্বিত আবির্ভাব এই কারণে বলেছি যে, সবুজপত্রের প্রতিষ্ঠা এবং প্রমথবাবুর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে, একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটির কথা ভাবাই যায় না। সেই সবুজপত্রের জন্ম বাংলা ১৩২১—ইংরেজী ১৯১৪ সালে। তখন প্রমথবাবুর বয়স ছেচল্লিশ। নিঃসন্দেহে পরিণত বয়স। এদিক থেকে প্রমথ চৌধুরী এবং রাজশেখর বসু সমগোত্রীয়। তাঁরা রয়ে সয়ে প্রচুর পুঁজিপাটা নিয়ে রীতিমত তৈরী হয়ে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেছিলেন। এসে আর হাত মক্স করতে হয়নি, ধরেই পাকা হাতের পরিচয় দিয়েছেন। দুজনের বেলাতেই দিগ্বিজয়ী রোম্যান বীরের মতো সমরাঙ্গনে প্রবেশ এবং জয়লাভ মুহূর্তে সংঘটিত হয়েছে।

সবুজপত্রের পাতাতেই প্রমথবাবুর লেখকজীবনের শুরু, এ কথা পুরোপুরি সত্য না হলেও অনেকাংশে সত্য। এর আগে তাঁর দুটি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। একটি প্রবন্ধ-পুস্তক, নাম তেল-নুন-লকড়ি (অনুমান ১৯০৬ সালে)। পৃষ্ঠাসংখ্যা পঞ্চাশের অনধিক। অপরটি সনেট পঞ্চাশৎ নামে তাঁর কবিতা সংগ্রহ (১৯১৩), এটিও পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এদের গ্রন্থ না বলে পুস্তিকা বলাই ভালো। দেখা যাচ্ছে এ যাবৎ তাঁর সমগ্র সাহিত্যকৃতি অনধিক এক শত পাতায় নিবদ্ধ। অবশ্য এ ছাড়াও কিছু লেখা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। বোধ করি নিজেরই মনঃপুত হয়নি বলে সে সব জিনিস গ্রন্থসন্নিবিষ্ট হয় নি।

জীবনের চল্লিশ বৎসরকাল তিনি একান্ত মনে বিদ্যাচর্চাতেই কাটিয়েছেন। সাহিত্য এবং দর্শনের কৃতী ছাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে সুগভীর তাঁর অধ্যয়ন, প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য দর্শনে নিত্য অনুসন্ধানী তাঁর মন, দেশ-বিদেশের সাহিত্যে অবাধ সঞ্চারণ। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধিৎসা কত বিস্তৃত ছিল তার আক্ষরিক প্রমাণ তাঁর রচনার বৈদগ্ধ্যে, চাক্ষুষ প্রমাণ তাঁর সুনির্বাচিত গ্রন্থসংগ্রহে। তার কতক অংশ বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে, কতক বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দান করে গিয়েছেন।

বহু স্মৃতি, বহু শ্রুতি, বহু অধ্যয়নে সমৃদ্ধ তাঁর মন। এতখানি প্রস্তুতি নিয়ে

খুব কম লেখকই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। শিল্পে সাহিত্যে অশিক্ষিত পটুত্বের অবকাশ আছে অর্থাৎ অধ্যয়নের অভাব বহু দর্শনে, বহু শ্রবণে, বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে পূরণ করা যেতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বিদ্যার অভাব বুদ্ধির দ্বারা পূরণ হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে দিব্যদৃষ্টির যোগ হলে চাই কি শেক্সপীয়ারেরও সৃষ্টি হতে পারে। শেক্সপীয়ার ছাড়াও দেশে বিদেশে অনেক সাহিত্যিক দেখা গিয়েছে যাঁরা পণ্ডিত নন কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি। সে জ্ঞান তাঁদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ। বাস্তবিকপক্ষে এ কথা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে যে, পুঁথি-পড়া বিদ্যা ছাড়াও উঁচু দরের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। সেই সঙ্গে এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে সে সাহিত্যের আবেদন বহুবিস্তৃত। এটা খুবই স্বাভাবিক,কারণ বেশির ভাগ পাঠকও অশিক্ষিত পটুত্বের অধিকারী। তাঁদের বিদ্যে নেই,বুদ্ধি আছে। তাঁদের জ্ঞানগম্যি অল্প কিন্তু রসবোধ প্রচুর। সাহিত্যসৃষ্টি এবং সাহিত্যপাঠ—উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যার চাইতে বুদ্ধির অর্থাৎ রসবোধের প্রয়োজন বেশী। অপর পক্ষে রসবোধের সঙ্গে বহু অধ্যয়ন যুক্ত হলে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় সে অন্যবিধ গুণের অধিকারী। তার নিজস্ব একটি আভিজাত্য আছে সেটি তার বৈদগ্ধ্য-জাত। তার রীত-চরিত্রও আলাদা। সে বাক্যে এবং ব্যবহারে সংযত, মুখরতার চাইতে প্রখরতা বেশী, উচ্ছলতার চাইতে উজ্জ্বলতা। এ সাহিত্যের আবেদন অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য কারণ এর জন্যে খানিকটা মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। লেখক যেখানে নানা বিদ্যাচর্চার অলিগলি ঘুরে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেছেন পাঠককেও সেখানে বিদ্যাবুদ্ধিতে একটু শান দিয়ে নিতে হয়, নতুবা এর পুরো রসটুকু গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

সাহিত্যিককে পণ্ডিত না হলেও চলে কিন্তু তাঁর পণ্ডিত হতে কোনই বাধা নেই। বরং পাণ্ডিত্যকে যদি তিনি কাজে লাগাতে পারেন তাতে তাঁর সাহিত্য কর্মের জলুস বাড়বারই কথা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সাহিত্যের কাজে পাণ্ডিত্যকে ব্যবহার করায় অনেকখানি কৌশলের প্রয়োজন। পাণ্ডিত্য জিনিসটা আকরিক লোহার ন্যায় ব্যবহার করতে গেলে তাকে শোধন করে নিতে হয়। সেটা একরকমের রাসায়নিক প্রক্রিয়া। বলা যেতে পারে কবি, সাহিত্যিক বা শিল্পী মনের alchemy—যার গুণে বিদ্যা বা পাণ্ডিত্য রসে পরিণত হয়। ঐ শোধন প্রক্রিয়াটা জানা না থাকলে পাণ্ডিত্য—তা যতই গভীর হোক সাহিত্যের ভোগে লাগে না। সুখের বিষয়, প্রমথবাবু পাণ্ডিত্যের ছোবড়াটুকু ফেলে দিয়ে শাঁসটুকু ব্যবহার করতে জানতেন। পাণ্ডিত্যকে রসান্বিত করবার কৌশলটি তাঁর বিশেষ ভাবে জানা ছিল। প্রচুর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও এমন আল-

গোছে তাকে ব্যবহার করেছেন যে, পাঠককে কখনো আঁতকে দেননি, বরং তার ঔৎসুক্যকে উসকে দিয়েছেন। 'বই পড়া' (বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'প্রবন্ধ-সংগ্রহ' দ্রষ্টব্য) নামক প্রবন্ধটি যখন সবুজপত্রে প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে প্রমথবাবুকে লিখেছিলেন, 'তোমার প্রবন্ধের মধ্যে অনেক মাল-মসলা আছে কিন্তু তারা এমনি ভান করছে যেন তাদের কোন গৌরব নেই, যেন তারা ভারাকর্ষণের কোন ধার ধারে না।' এই কথা তাঁর সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধেই বলা চলে। তার কারণ প্রমথবাবু সেই অতি বিরলসংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তিদের অন্যতম যারা বিদ্বান হয়েও বিদ্যা জাহির করবার জন্যে একটুও ব্যস্ত হন না। বিদ্যা জিনিসটা এমনি তাঁদের আজ্ঞাবহ যে, তাকে তাঁরা যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। আমরা যারা সামান্য বিদ্যার কারবারী, আমাদের সে পেয়ে বসে। আমাদের যৎ-সামান্য চিন্তার পুঁজিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পুঁথি-পড়া বিদ্যে এসে সবটুকু জায়গা জুড়ে বসে। নিজের কথা ফেলে, তখন পরের মুখের বুলি আওড়াতে হয়। আমরা ভুলে যাই যে, এর ফলে আমাদের চিন্তার দারিদ্র্যই শুধু প্রমাণিত হয়।

বিদ্বান ব্যক্তির অভাব দেশে তখনও ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু সেই বিদ্যার ব্যবহারে যে কৌশল বা আর্টের প্রয়োজন সেটি তখনও বেশী লোকের জানা ছিল না, এখনও নেই। সে কৌশল তাঁদেরই আয়ত্ত যাঁদের মন সজীব এবং সক্রিয়, যাঁরা নিজের মতো করে ভাবতে জানেন। আবার এঁরাই পরের ভাবনাকেও সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নিতে পারেন। আর সব চেয়ে বড় কথা, যে মানুষ নিজে ভাবতে জানেন তিনি অপরকে ভাবাতেও জানেন। প্রমথবাবুর এই গুণ প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি নিজের মতো করে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে সব কিছু দেখেছেন, ভেবেছেন, বলেছেন এবং সেই সঙ্গে বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজকে নতুন করে ভাবাতে শিখিয়েছেন। তিনি সারাক্ষণ নিজের মনের সঙ্গে তর্ক করতেন, সব জিনিস যুক্তি দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। এদিক থেকে বলা যেতে পারে, প্রমথবাবু আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যে নতুন এক ডায়েলেকটিকের জন্মদাতা। আবার যাদৃশী ভাবনা তাদৃশী ভাষা। ফলে নতুন এক ভাষার সৃষ্টি হল। সে ভাষা যেমন সতর্ক তেমনি সপ্রতিভ।

আমাদের ভাষার এক প্রান্তে বিদ্যাসাগরী ভাষা, অপর প্রান্তে বীরবলী। বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণ করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের হাতে সে ভাষাই রূপে লাবণ্যে মোহনী রূপ ধারণ করেছিল। প্রমথবাবু কোন কিছুরই মোহিনী রূপে ভুলতেন না। যা স্বাভাবিক নয়, পোশাকী, তাকে তিনি

প্রশ্রয় দিতেন না। আমাদের সাধু ভাষাকে তিনি পোশাকী ভাষা বলে বর্জনীয় মনে করেছেন। মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে মুখের কথায়, সে কথা যখন কলমের মুখে প্রকাশ পাবে তখন তার রূপ কেন বদলে যাবে তার সঙ্গত কারণ তিনি খুঁজে পাননি। এজন্যে লেখার ভাষাকে তিনি যতটা সম্ভব মুখের ভাষার কাছে নিয়ে এসেছিলেন। শিক্ষিত সমাজে মৌখিক বাক্য এবং লিখিত বাক্যের ব্যবধান ঘুচে যাবে এটাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত। এই অত্যন্ত স্বাভাবিক কাজটি করতে গিয়ে প্রচুর বাধা এবং বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহায্য ব্যতিরেকে কতখানি সম্ভব হত বলা যায় না, তথাপি বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষা প্রচলনের কৃতিত্ব বহুলাংশে প্রমথবাবুর প্রাপ্য, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। ভাষার কথ্য রূপই তাঁর ভাষার একমাত্র গৌরব নয়। আগেই বলেছি তাঁর ভাষার আশ্চর্য মুনশিয়ানা। তিনি নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী। বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয়ে যে, রবীন্দ্র-গুণগ্রাহীদের অগ্রণী হয়েও প্রমথবাবু সজ্ঞানে কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেননি। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি প্রেরণা গ্রহণ করেছেন আর কিছু নয়। লেখার মাল মসলা, ঠাটঠমক সমস্তই তাঁর নিজস্ব।

প্রমথবাবু স্বনামে বেনামে দুভাবে লিখেছেন। গল্প, কবিতা এবং সাহিত্য সমাজ রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখেছেন স্বনামে। অন্যত্র তিনি ছল করে ছদ্মনামের ব্যবহার করেছেন। প্রমথবাবু স্বভাবত মজলিসী মানুষ ছিলেন। মজলিসী মানুষরা সারাক্ষণ কাজের কথা বা জরুরী কথা নিয়ে থাকতে পারেন না। তাঁদের সব কথাই কথার কথা অর্থাৎ কিনা বাজে কথা। কিন্তু সেই বাজে কথাতে একটু যদি রস লাগানো যায় তা হলে সেই জিনিসই সাহিত্য হয়ে ওঠে। সুবিখ্যাত ইংরেজী উপন্যাস Tristram Shandayর রচয়িতা বলেছিলেন, 'Writing, when properly managed, is but a different name for conversation.' আমাদের সাহিত্যে এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছেন বলতে গেলে একমাত্র প্রমথ চৌধুরী। গুরুগম্ভীর বিষয়েও এমনভাবে লিখেছেন, মনে হবে ঠিক যেন কথা বলে যাচ্ছেন।

সেদিনের বিদ্বজ্জনসভায় প্রমথবাবু প্রধান সভাসদ হয়ে বসেছিলেন। কথার জলুসে এক দিকে যেমন লোককে আনন্দ দিয়েছেন, অন্য দিকে তেমনি আবার তাদের ভাবিয়েছেনও। আকবর বাদশার বিদূষক বীরবল নামটি ছদ্মনাম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আগের দিনের বিদূষকরা ভাঁড়ামি বা রসিকতা করে লোকের মনতুষ্টি করতেন। একালের বিদূষককে শুধু রসিকতা করলে চলে না,

তাঁকে রসসৃষ্টি করতে হয়। বীরবল তাই করেছেন। তিনি আমাদের হাস্য-রসকে বেশ একটু উঁচু পর্দায় তুলে দিয়েছেন। 'বীরবলের হালখাতা'র বিষয়বস্তু অপেক্ষাকৃত হাল্কা কিন্তু তাই বলে মূল বক্তব্যটা হাল্কা নয়। সেখানেও পাঠককে তিনি ভাবিয়ে ছেড়েছেন। সব লেখাতেই চিন্তার কিছু খোরাক থাকত। সহজ সুরে গভীর কথা বলা একটা আর্ট। বীরবল সে আর্টে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাংলা ভাষায় খাঁটি belles lettres তাঁর কলমেই সর্বপ্রথম বেরিয়েছে।

প্রমথবাবু দুঃখ করে বলেছিলেন যে, আমাদের সাহিত্যে গুণপনাযুক্ত ছ্যাবলামোর অভাব। ছ্যাবলামো আমাদের চরিত্রে যথেষ্টই আছে, কিন্তু আমরা তার সাহিত্যিক বা আর্টিস্টিক ব্যবহার জানি না। ছ্যাবলামো যখন গুণান্বিত হয় তখন আর সে ছ্যাবলামো থাকে না, তখন তার নাম হয় রসান্বিত বাক্য। বলা বাহুল্য তারই নাম সাহিত্য, কারণ বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। খুব অসাধারণ শক্তি না থাকলে ছ্যাবলামোকে গুণপনাযুক্ত করা যায় না। ফলস্টাফ-এর মুখ দিয়ে এত যে আজেবাজে কথা বলানো হয়েছে তার জন্যে শেক্সপীয়ারের মতো অসামান্য প্রতিভার প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের সাহিত্যেও এর জন্যে প্রয়োজন হয়েছে বঙ্কিমের প্রতিভার। তিনি তাঁর কমলাকান্তের দপ্তরে এর জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গিয়েছেন। কৃষ্ণকান্তের উইলের চাইতে কমলাকান্তের 'উইল' আমাদের হাতে ঢের বড় সম্পত্তি অর্পণ করেছে। প্রচুর পাণ্ডিত্য এবং মনীষার অধিকারী হয়েও মনকে কি করে ভারমুক্ত করতে হয় কমলাকান্তের ছদ্মনামে বঙ্কিম তারই দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। এর জন্যে চাই অত্যন্ত supple মন এবং সে অনুযায়ী supple ভাষা। অর্থাৎ ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে লেখকের আজ্ঞাবহ হতে হবে। প্রমথবাবু তাঁর বীরবলের হালখাতায় এ দু'-এর আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

প্রমথ চৌধুরীর সব চাইতে বড় কৃতিত্ব তিনি বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিকেল রীতির প্রবর্তক। বাংলা ভাষার স্বভাবধর্মবশত আমাদের ভাষার সুললিত ভঙ্গির চর্চাটাই অত্যধিক হয়েছে। প্রত্যেক ভাষাতেই লালিত্যের যেমন প্রয়োজন তেমনি ঋজু কঠিন দার্ঢ্যেরও প্রয়োজন আছে। বাংলা ভাষায় সেটার যথেষ্ট অভাব ছিল। সে অভাব প্রমথবাবু অনেকাংশে পূরণ করেছেন। বাঙালী মন স্বভাবধর্মে আলস্যপরায়ণ, জড়ত্বপ্রাপ্ত মন। নির্বিচারে সব কিছুকেই গ্রহণ করা তার স্বভাব। সেই স্বভাবকে তিনি খানিকটা চৌকস এবং সচকিত করে তুলেছিলেন। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথও যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁদের লেখনীর মোহিনী মায়া যতখানি আমাদের মুগ্ধ করেছে, তাঁদের

দিক্‌সন্ধানী সত্যান্বেষী মন ততখানি আমাদের স্পর্শ করেনি। বোধ করি এই অর্থেই কেউ কেউ বলেছেন যে, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন সোনার কলম দিয়ে আর প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন ইস্পাতের কলম দিয়ে। সে ইস্পাত আবার ইংরেজীতে যাকে বলে of the finest temper. সে ভাষার যেমন ধার তেমনি ঝকঝকে তার মূর্তি। এমন খরধার মেদলেশহীন সুগঠিত ভাষা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। প্রমথবাবুর গল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"ঠিক তোমার সনেটেরই মত—পালিশ করা, ঝকঝকে, তীক্ষ্ণ। উজ্জ্বলতার বাতায়ন মগজের তিনতলা মহলে মধ্যাহ্নের আলো সেখানে অনাবৃত। রসাক্ত সুমিষ্টতা দোতলায়, সেখানে রসনার লোলুপতা। তোমার লেখনী সে পাড়া মাড়াতে চায় না।" এ কথা তাঁর গল্প সম্বন্ধে যতখানি প্রযোজ্য, প্রবন্ধ সম্বন্ধে ততখানি তো বটেই, বোধ করি ততোধিক। এমন শানিত ভাষায় লেখা প্রবন্ধ ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি। রঙ্গে ব্যঙ্গে, হাস্যে শ্লেষে, বিদ্যার ঔজ্জ্বল্যে, বুদ্ধির ঝলকে প্রবন্ধসাহিত্যকে তিনি এক নতুন মূর্তিতে উপস্থাপিত করেছিলেন।

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, তাঁর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ—সব একই গুণে গুণান্বিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—পালিশ-করা, ঝকঝকে, তীক্ষ্ণ। কবিতা খুব বেশী লেখেননি। দু'খানা মাত্র গ্রন্থ—সনেট পঞ্চাশৎ এবং পদ-চারণ (শেষোক্ত নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া)। দুটিই শীর্ণকায়, কিন্তু ঝিলমের শীর্ণ স্রোতের ন্যায় 'খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার'। আবেগের বাষ্প-মাত্র নেই, তাই বলে শুষ্ক নয়। ধারালো ঝাঁঝালো অথচ রসালো। পদচারণ নামক কবিতা-গ্রন্থটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গপত্রে নিজেই বলেছেন এ পদ্যগুলো গদ্যের কলমে লেখা। এ কবিতা যে ক্লাসিকেল রীতিতে রচিত ঐ কথার মধ্যেই তার আভাস আছে। আরো বলেছেন, "এগুলির ভিতর আর কিছু না থাক, আছে rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ reason," এখানেও সেই ক্লাসিকেল রীতিরই ইঙ্গিত। যাঁরা কাব্য রচনাকে নিতান্ত প্রেরণাজাত ব্যাপার বলে মনে করেন তাঁরা অকারণ পুলকে অর্থাৎ without rhyme or reason লিখে থাকেন। প্রমথ চৌধুরী গদ্য পদ্য কোন জিনিসই rhyme or reason ব্যতিরেকে কদাপি লেখেননি। সাহিত্য সৃষ্টিতে যে যত্নকৃত crafts-manship-এর প্রয়োজন আছে তাঁর কালে একমাত্র তিনিই তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাঁর কবিতা সেদিনে না হয়ে এ দিনে লেখা হলে অধিকতর সমাদর লাভ করত। তিনি যে কবিতা লিখেছেন তার বারো আনাই সনেট।

সনেটের সুনির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে রসনার লোলুপতার অবকাশ কম। সেজন্যে form হিসাবে তিনি এটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। নিজেই বলেছেন—

সনেটের গোনা গাঁথা ছত্র চতুর্দশ—
এ পাত্রে যায় না ঢালা একগঙ্গা রস।

অবশ্য সনেট ছাড়া অন্যবিধ কবিতা যে ক'টি লিখেছেন তাতেও যে তিনি পাত্র উজাড় করে রস ঢেলেছেন এমন নয়। কবিতাকে আমরা অলংকৃতা বনিতা রূপে দেখে অভ্যস্ত। তিনি তাকে সেভাবে দেখেননি। কবিতাকে তিনি কখনো অনাবশ্যক অলংকারে সাজাননি। বলেছেন—পরীর শরীরে কখনো সাজে না জরির থান।

ঐ একটি পঙ্‌ক্তিতেই কবিতা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব স্পষ্টত প্রকাশ পেয়েছে, আবার তিনি যে কবি সে কথাও ঐ লাইনটির দ্বারাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদের দেশে এ যুগের সব লেখকই বলতে গেলে ইংরেজী পাঠশালার ছাত্র। প্রমথবাবু পাঠ নিয়েছেন ফরাসী পাঠশালায়। দর্শনে বের্গসঁ তাঁর গুরু সাহিত্যে ভলতেয়ার। ভলতেয়ারের ভাষা সম্পর্কে প্রমথবাবু বলেছিলেন—'লঘু, তীক্ষ্ণ, চোস্ত, সাফ'—কোথাও ঢিলেঢলা কিছু নেই, যেমন আঁটসাট দেহের বাঁধুনি, তেমনি ঝলমলে উজ্জ্বল মুখশ্রী। অনেক কাল আগে যখন প্রমথবাবু সবে লেখায় হাত দিয়েছেন তখনই রবীন্দ্রনাথ তাঁর লিখনভঙ্গি সম্বন্ধে একটি চিঠিতে মন্তব্য করেছিলেন যে, কোথাও ফাঁক নেই, শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাসবুনানি। সেই চিঠিতে এ কথাও বলেছিলেন যে, এ গুণটি প্রাচ্য নয়। ঠিকই বলেছেন, প্রমথবাবুর মনটা পশ্চিমমুখী। পদ্য লিখছেন ইতালীয় ছাঁদে, গদ্য ফরাসী চালে। তাঁর রচিত প্রথম সনেটটিতেই বলে নিয়েছিলেন—

ইতালির ছাঁচে ঢেলে বাঙালীর ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ—
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট!

ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ গন্ধ রস সম্পর্কে তিনি নিজেই সবিস্তারে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর নিজের লেখা গদ্যে ফরাসী স্বাদ-গন্ধ বিলক্ষণ মিশিয়ে দিয়েছেন। যাঁর যেমন মনোধর্ম সে অনুযায়ী তাঁর সাহিত্যকর্ম। সমস্তটা মিলিয়ে সংক্ষেপে বলতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে, প্রমথবাবুর সাহিত্য বাঙালী রুচির পক্ষে একটু অতিমাত্রায় sophisticated. সেই কারণে তাঁর সাহিত্য কোনকালেই খুব বেশী জনপ্রিয় হবে বলে আশা করা যায় না।

প্রমথ চৌধুরীর নামের সঙ্গে সবুজপত্রের নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, এ কথা পূর্বেই বলেছি। সবুজপত্র নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের বৃহত্তম কীর্তি। তার কারণ সবুজপত্র কেবলমাত্র একটি সাহিত্যপত্র নয়, এটি বাংলা দেশের একটি literary movement, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি বিশেষ একটি অধ্যায়। খুব একটি শুভ লগ্নে—১৯১৪ সালে এর জন্ম। এক বৎসরও পূর্ণ হয়নি, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের গৌরব নিঃসন্দেহে বেড়েছে, সাহিত্যসেবীদের মনে নতুন উদ্দীপনা এসেছে, বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়ের মনে। ঠিক সেই মুহূর্তে নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি সাহিত্যপত্রের পরিকল্পনা খুব স্বাভাবিক কারণেই মনে এসেছে। দেশের যৌবনকে, নবীন সম্প্রদায়কে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করা এবং নতুন পথে পরিচালিত করাই এ পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের জরাগ্রস্ত জড়ত্বপ্রাপ্ত দেশে সবুজপত্র জীবনের এবং যৌবনের বার্তা প্রচার করবে এই ছিল স্পষ্টত তার ঘোষণা। এইজন্যেই একে একটি আন্দোলন বলেছি। রবীন্দ্রনাথ সে আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক, প্রমথবাবু প্রধান কর্মকর্তা। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে যে সবুজপত্রের যাত্রা শুরু তার প্রমাণ পত্রিকার প্রথম প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫শে বৈশাখে (১৩২১)। শুধু তাই নয়, আমার মতে ঠিক ঐ সময়ে সবুজপত্রের প্রতিষ্ঠাকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির public celebration হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। আবার সবুজপত্র যে যৌবনের অভিযান হিসাবে যাত্রা শুরু করেছিল তারও প্রমাণ প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত সবুজের অভিযান নামক কবিতা। 'আধ মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'—এটাই ছিল সবুজপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ সংখ্যাতে বীরবলের প্রবন্ধ 'সবুজপত্র'—তাতে তিনি পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে সবুজের তথা যৌবনের গুণকীর্তন করেছেন। এ ছাড়াও প্রথম সংখ্যায় ছিল সত্যেন দত্তের কবিতা—'সবুজ পাতার গান'। তাতে তিনি যৌবনকে রাজটিকা দেবার প্রস্তাব করেছিলেন।[১] রবীন্দ্রনাথ আমাদের জরাগ্রস্ত দেশের নাম দিয়েছিলেন জরাসন্ধের দুর্গ। প্রমথবাবুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন "আমাদের জরাসন্ধের দুর্গের মধ্যে দেশের ক্ষত্রিয়েরাই বন্দী রয়েছে, যারা ক্ষত থেকে দেশকে ত্রাণ করবে, যারা দূরে দূরান্তরে আপন অধিকার বিস্তার করবে, যারা বিরাট প্রাণের ক্ষেত্রে দেশের জয়ধ্বজা বহন করে নিয়ে যাবে। সেই যুবক ক্ষত্রিয়দের হাত পা থেকে জরার লোহার বেড়ি ঘুচিয়ে দেবার ব্রত

১। এই সূত্রে প্রমথ চৌধুরীর 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নিয়েছ তোমরা।" যদ্দূর মনে পড়ছে সম্পূর্ণ চিঠিটি পরে সবুজপত্রে ছাপা হয়েছিল। এটিকে সবুজপত্রের manifesto বলা যেতে পারে। প্রমথ চৌধুরী একদা অগ্রণী হয়ে জরাসন্ধের লৌহকপাটে আঘাত হেনেছিলেন, সে কৃতিত্ব তাঁকে দিতে হবে। তাঁর শক্তির উপরে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ আস্থা ছিল বলেই তাঁকে ঐ কাজে এমন অকুণ্ঠভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

সবুজপত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে একটি নতুন লেখকগোষ্ঠীর উদ্ভব হল। অতুল গুপ্ত, সুরেশ চক্রবর্তী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কান্তি ঘোষ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা বলতে গেলে প্রমথবাবুর আবিষ্কার। বাংলা সাহিত্যে পরোক্ষভাবে এটাও তাঁর একটা contribution. কিন্তু সবুজপত্রের তথা প্রমথবাবুর অপর একটি contribution সম্বন্ধে আমরা পুরোপুরি সজ্ঞান নই। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। দেশ বিদেশে গীতাঞ্জলির অভাবনীয় সাফল্য রবীন্দ্রনাথকে যদি আধ্যাত্মিকতা এবং মিস্টিসিজম-এর জালে জড়িয়ে ফেলত তা হলে অবাক হবার কিছুই ছিল না। তাঁর পরবর্তী কাব্যরচনা যদি গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালির পুনরাবৃত্তি হত তা হলে কিছুই অস্বাভাবিক ঠেকত না। রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণ পরিণতির পথে গীতাঞ্জলির সাফল্যই এক প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত। দেখা যাচ্ছে ইংরেজী গীতাঞ্জলির পর তাঁর যে কাব্যাংশ তিনি ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশ করেছিলেন তার প্রায় সমস্তই মিস্টিকগন্ধী। তাতে পশ্চিম মহাদেশে তাঁর ক্ষতিই হয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে সবুজপত্রের প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্র-সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিল। আধ্যাত্মিকতার সুর ছেড়ে দিয়ে যৌবনের জয়গান তাঁর মুখে উচ্চারিত হল। এ কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সবুজপত্রের পাতাতেই বলাকা কাব্যের জন্ম হয়েছে। ফাল্গুনী নাটক যাকে অন্য নামে যৌবনের জয়যাত্রা বলা যেতে পারে তারও প্রকাশ সবুজপত্রে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত যৌবনের কবি, তা হলেও এই সময়টাতে বিশেষ করে গদ্যে পদ্যে তিনি অনবরত দেশের যৌবনশক্তির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। আমার আসল বক্তব্য এই যে, সবুজপত্রের তাগিদে রবীন্দ্রকাব্যের আধ্যাত্মিক রঙটা বেশ খানিকটা ক্ষয়ে গিয়েছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথেরও মঙ্গল হয়েছে, বাংলা সাহিত্যেরও। এর কৃতিত্ব অংশত প্রমথ চৌধুরীর প্রাপ্য।

প্রমথবাবু যখন লেখক হিসাবে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেননি তখনই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যবাণী করেছিলেন—"আমার তো দেখে শুনে মনে হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে তোমার একটা দিন আসছে এবং তোমার একটা কাজ আছে। এইবার সাহিত্য-সিংহাসনে তুমি রাজদণ্ড গ্রহণ করে শাসনতার নেবে

এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।" রাজদণ্ড অবশ্য রবীন্দ্রনাথের হাতেই ছিল কিন্তু ঐ ভবিষ্যদ্বাণীই পরে সবুজপত্রে চরিতার্থতা লাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যে প্রমথবাবু যে নতুন কিছু দিয়েছেন সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না। আমাদের সাহিত্যে হৃদয়বৃত্তির চর্চা যতখানি হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তির ততখানি নয়। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে এমন লেখক বিরল যারা বুদ্ধিমান পাঠককে stimulate করতে পারেন। প্রমথবাবু সে অভাব বেশ খানিকটা পূরণ করেছিলেন। নতুন কথা নতুন ভঙ্গিতে বলবেন এই উদ্দেশ্য নিয়েই আসরে নেমেছিলেন। নতুনত্বটা আর কিছু নয়—সংক্ষেপে বলতে গেলে emotion-এর পথ ছেড়ে reason-এর পথ গ্রহণ।

কবিতা প্রবন্ধ গল্প-সাহিত্যের এই তিন বিভাগেই তিনি কৃতিত্বের অধিকারী। নাটকে হাত দেননি। কিন্তু তাঁর কোন কোন গল্প একটি যেন monologue, সেও এক ধরনের নাটক। তা ছাড়া অনেক গল্পই dialogue প্রধান। Dialogue রচনায় এতখানি যাঁর নৈপুণ্য তিনি ইচ্ছে করলে নাটক রচনায় প্রয়াসী হতে পারতেন, কিন্তু তাঁর মনের গড়নটা ঠিক নাটক রচনার অনুকূল ছিল না। তাঁর মন এবং বলার ধরন—দুটোই অতিমাত্রায় মজলিসী। নাটকেও একটা সুনির্দিষ্ট সুবিন্যস্ত কাঠামো আছে, খানিকটা যেন strait-jacket পরানো মূর্তি —সে ইচ্ছামত হাত পা ছুঁড়তে পারে না। তাকে একটা নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে হয়। মজলিসী গল্প সে রকম নয়, সে আপন খুশিমতো ডাইনে বাঁয়ে হেলে দুলে চলে, সদর রাস্তা ছেড়ে যখন তখন অলিতে গলিতে ঢুকে পড়ে। নাটক জিনিসটা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বস্তু তাকে একটা inevitalbe পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছতে হয়। মজলিসী গল্পের কোন দায়দায়িত্ব নেই সেখানে inevitable বলে কিছু নেই। অত্যন্ত গম্ভীর সুরে যার আরম্ভ grotesque-এ তার অবসান। পরমা রূপসী অকস্মাৎ প্রেতিনী প্রতিপন্ন হয়। যেখানে চার-ইয়ারী-কথা সেখানে ইয়ারবক্সীসুলভ খানিকটা irresponsible আবহাওয়া থাকবেই। প্রমথ চৌধুরীর সব গল্পই বলতে গেলে 'ফরমায়েশী গল্প'। সেটাকে তিনি ইচ্ছামত কান মুচড়ে মুচড়ে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

প্রমথবাবুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, গল্প কাকে বলে। তিনি বলেছিলেন, যা শুনতে ভালো লাগে তাই গল্প। এই কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সেই আদি যুগ থেকে লোকে বলছে, গল্প বল। গল্প বরাবর লোকে শুনতেই এসেছে। গল্প বলা আর শোনা—এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। লেখা গল্প বসে বসে পড়তে

গেলে গল্পের স্বাভাবিকতা খানিকটা নষ্ট হয়ে যায়। মুখে বলা গল্প এক, কলমে লেখা গল্প আর। কলমের কালিমা একটু তার গায়ে লাগবেই। মুখে বলা গল্পের মুখশ্রী আলাদা। প্রমথবাবু তাঁর বলার গুণে গল্পের সেই মুখশ্রীটি অবিকৃত রেখেছেন। অর্থাৎ গল্পটা পড়লেও মনে হয় যেন কারো মুখ থেকে শুনছি।

তাঁর স্বকীয়তা এবং অন্যান্য সমস্ত গুণের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েও একটি কথা বলা আবশ্যক। হৃদয়াবেগ নামক পদার্থকে তিনি অতিশয় সন্দেহের চোখে দেখেছেন এবং সর্বপ্রকারে তাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন। ভাবে গদগদ হওয়া কোন কাজের কথা নয়, কিন্তু তাই বলে কাব্যে সাহিত্যে emotion এবং sentiment জাতীয় জিনিস একেবারেই অচল এমন কথা কেউ বলবেনা। দেহে অতিরিক্ত চর্বি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্তু খানিকটা. চর্বি শরীরের পোষণ এবং রক্ষণের জন্যে অত্যাবশক। প্রমথবাবুর গল্পে কবিতায় চর্বি নেই। শরীরে চর্বি না থাকলে যেমন শীর্ণকায় দেখতে হয় প্রমথবাবুর রচনায় তেমনি একটি শীর্ণ ইংরেজিতে যাকে বলে emaciated ভাব আছে। কবিতায় সেই পরিপুষ্ট মুখশ্রী নেই, গল্পের অনেক চরিত্রই পূর্ণাবয়ব হয়ে ফুটে ওঠেনি। আগে বলেছি যে পোশাকী জিনিসকে তিনি সাহিত্যে বর্জনীয় মনে করতেন কিন্তু কৌতুকের বিষয় যে, হৃদয়ানুভূতিকে বাদ দেওয়ার দরুন তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোকে ঠিক রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয় না। এরা পোশাকী মানুষ। যেখানে মানুষ নিয়ে কারবার সেখানে ভাবে ভাষায় একটু আর্দ্রতার প্রয়োজন আছে। ঐ আর্দ্রতার অভাবে তাঁর গল্প যতদিন যাচ্ছে, তত যেন একটু brittle হয়ে পড়ছে। প্রমথবাবুর রাজ্যে প্রেমে পড়লেই বোকা বনতে হয়। চারইয়ারী কথার চার বন্ধুই সমান তুখোড় কিন্তু শেষ পর্যন্ত চারজনাই বোকা বনেছেন। wit-এর ঝলকে কথার বাহাদুরিতে পাঠকের মনকে ধাঁধিয়ে দেবার মতো অর্থাৎ এর মধ্যে literary virtue যতখানি তার চাইতে ঢের বেশী এর Virtuosity. লিপিচাতুর্যে অতুলনীয় কিন্তু সাহিত্যের অন্তিম পরীক্ষায় ক্ষীণজীবী।

ছোটগল্প ও প্রেমেন্দ্র মিত্র

ছোটগল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কে, আমার জানা নেই। এইটুকু শুধু জানি, জন্ম-মুহূর্তেই তিনি পূর্ণযৌবনা। রোমক দেবী মিনার্ভার ন্যায় born in full panoply. সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির ইতিহাস আছে, কিন্তু ছোটগল্পের আবির্ভাব যেমন অকস্মাৎ, বিকাশ তেমনি দ্রুত।

সব দেশেই দেখা গিয়েছে ছোট গল্প সাহিত্যের পরিণত বয়সের সন্তান। সাহিত্যে এই একটি অভিনব ব্যাপার—আগে বড় জিনিসে হাত পাকিয়ে তবে ছোট জিনিসে হাত দিতে হয়। মহাকাব্য আগে, গীতিকাব্য পরে; উপন্যাস আগে, ছোটগল্প পরে। ছোটগল্পের কারুকলা উপন্যাসের চাইতে সূক্ষ্মতর, এই জন্যেই এর আবির্ভাবে বিলম্ব। সূক্ষ্ম জিনিস বলতে বুঝি সেই জিনিস, যার ক্ষুদ্র আকারের মধ্যে বৃহতের আভাস লুক্কায়িত। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, প্রত্যেকটি ছোটগল্প এক একটি বালখিল্য উপন্যাস। বালখিল্যগণ আকারে অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ, তথাপি তাঁরা ঋষি। ঋষিত্বের পরিমাপ গঠনে নয়, মননে। ছোটগল্পের কৃতিত্ব তার বিস্তারে নয়, গভীরতায়।

সাহিত্যের যত সন্তানসন্ততি আছে, ছোটগল্প তার মধ্যে সব চাইতে বয়ঃকনিষ্ঠ। বাংলা ছোটগল্পের বয়স কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর। অথচ বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ছোটগল্পের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, এমন আর কিছুতে নয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রথম গল্প রচয়িতা। গল্পগুচ্ছে যে শিশুর জন্ম, গল্পগুচ্ছেই তার পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তি। ক্ষণে ক্ষণে তার মূর্তি বদল হয়েছে। সাধনার পাতায় যাকে দেখেছি কমনীয়কান্তি, সবুজপত্রে তার পেশী-সবল সুদৃঢ় মূর্তি। বাংলা ছোটগল্পের জন্ম এমন একটি শুভ মুহূর্তে হয়েছে, যখন বাংলা-সাহিত্য প্রাদেশিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্যের ধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ফলে হয়েছে এই যে, জন্ম-মুহূর্তেই ও প্রবীনের সমাজে ভিড়েছে। অর্বাচীনের দলে ওকে অনাবশ্যক কালক্ষেপ করতে হয়নি। কাব্য-সাহিত্যে, গদ্য-সাহিত্যে, গোড়ার দিকে আমরা আধ আধ বুলি শুনেছি। কিন্তু আমাদের কথা-সাহিত্যের ধরেই মুখে পাকা কথা। রবীন্দ্র-যুগ আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ। সেই যুগে জন্মেছে বলে সাহিত্যের সমস্ত প্রসাদগুণ ও জন্মমুহূর্তেই একাধারে লাভ করেছে।

এইখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্র-যুগ কথাটাকে অনেকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে থাকেন তাঁদের মতে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্। তিনি অদ্বিতীয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু তিনি এক নন, তিনি বহু। এই যুগের শ্রেষ্ঠত্ব বলতে যদি কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের একক কৃতিত্বকেই ধরে নিই, তবে যুগের প্রতি যেমন অবিচার হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রতিও তেমনি অবিচার করা হয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সেই সব অনন্যসাধারণ সাহিত্যিকের অন্যতম যাঁরা শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেন না, সাহিত্যিক সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় এবং প্রভাবে বহু সৃজনী-প্রতিভার সৃষ্টি হয়েছে বলেই রবীন্দ্র-যুগ নামটি সার্থক হয়েছে। একের গৌরবে যেমন বহুবচন, বহুর গৌরবে তেমনি একবচনের বিধান।

'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ যে মধুচক্র রচনা করেছিলেন, সেখানে বলতে গেলে তিনিই একমাত্র মক্ষিকা। সাহিত্যিক-গোষ্ঠী বলতে আজ আমরা যা বুঝি, তার প্রথম উদ্ভব সবুজপত্রের রঙ্গমঞ্চে। সেখানেও গোষ্ঠীপতি রবীন্দ্রনাথ। প্রমথ চৌধুরী অধিকারী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথই প্রধান নায়ক। রবীন্দ্রনাথ কাণ্ডারী, প্রমথ চৌধুরী ভাণ্ডারী।

এর পরবর্তী লেখক গোষ্ঠীর আবির্ভাব 'কল্লোল'-এর রঙ্গমঞ্চে। এঁরা বেশীর-ভাগ বয়সে নবীন। প্রবীণের দল এঁদের অর্বাচীন বলে অবজ্ঞা করেছেন, নবীনদের আচরণেও স্পর্দ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, জোর গলায় রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রপন্থীদের অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছেন। সেদিনকার বাদ-প্রতিবাদ কালের ব্যবধানে আজ অনেকখানি বিলীন হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ যৌবনের কবি, তাঁর সাহিত্যে নবীনের জয়গান। তিনি যে যৌবন জলতরঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন, 'কল্লোল' এ তারই কল্লোলধ্বনি শোনা গিয়েছে। অবশ্য এঁদের ঠাটঠমকটা অন্য ধরণের, কথা বলেছেন অন্যদেশী চালে, বিশেষ করে হুট হামসুনি চালে—তবু দেখ সেই কটাক্ষ আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য যেমনটি ঠিক দেখা যেত রবীন্দ্রের কালে। কালিদাসের ললনারা যেমন আধুনিকাদের মধ্যে বর্তমান, কল্লোলপন্থী-দের মধ্যেও তেমনি রবীন্দ্র-প্রভাব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। পাছে ইতিহাস বিকৃত হয়, এইজন্যে বলে রাখা প্রয়োজন 'কল্লোল'-এর প্রত্যক্ষ ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বর্তমান না থাকলেও পশ্চাৎ ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। সীজারের চাইতে সীজারের ভূত বেশী শক্তিশালী। রবীন্দ্রনাথের চাইতে রবীন্দ্র-প্রতিভার পরোক্ষ প্রভাব বেশী কার্যকরী।

'কল্লোল', 'কালি-কলম'-এর অঙ্গনে বহু শক্তিমানের আবির্ভাব হয়েছিল।

এঁরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সন্ততি এবং এঁরাই রবীন্দ্রযুগের নাম সার্থক করেছেন। বলাবাহুল্য এঁরা রবীন্দ্রপ্রতিভার বিরোধী নন, রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিপূরক।

কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁরা নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন স্পষ্টাক্ষরে। সেই বিস্তৃত ইতিহাসের আলোচনা আজকের প্রসঙ্গে অবান্তর। আসল বক্তব্যটা ছোটগল্প সম্বন্ধে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে যাঁর প্রতিভা সবচেয়ে সেদিন বিস্মিত করেছিল, তাঁর নাম প্রেমেন্দ্র মিত্র। আগেই বলেছি এঁদের ঠাটঠমকটা ছিল নতুন ধরণের। বিদেশী অনুকরণ প্রয়াস এঁদের সাহিত্য প্রচেষ্টাকে কখনো কখনো বিড়ম্বিত করেছে। নিছক নতুনত্বের একটা মোহ আছে। সাহিত্যিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গে সেই মোহ একদিন কেটে যায়। নতুনের চাইতে নবীন বড়। নতুন জিনিস পুরাতন হয়ে যায়, কিন্তু নবীন নিত্যকালের। এঁদের মধ্যে নতুনত্বের মোহ সর্বাগ্রে কাটিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সাহিত্যের অনেক অলিগলি পথ আছে, তার আবিষ্কার প্রয়োজন। কিন্তু সাহিত্যের যেটা সদর রাস্তা, তার সঙ্গে যদি এসব গলিপথের সংযোগ না থাকে, তবে সে পথ আঁধা গলি বা blind alley তে পরিণত হয়। কল্লোল-পন্থীদের মধ্যে অনেকে আঁধা গলিতে বেশ কিছুকাল ধরে পাক খেয়ে বেড়িয়েছেন। সত্যিকারের সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল বলেই সাহিত্যের সদর রাস্তা খুঁজে পেতে এঁদের বিলম্ব হয়নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যিক অভিযানে পরীক্ষণ নিরীক্ষণের অন্ত ছিল না; কিন্তু তাঁর সহজাত সাহিত্যবোধ তাঁকে পথভ্রান্ত হতে দেয়নি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম গল্প সংগ্রহ 'পুতুল ও প্রতিমা'র প্রথম সংস্করণ হতে বারো বৎসর লেগেছিল। যদ্দূর মনে পড়ে, একথা প্রেমেনবাবুর মুখেই শুনেছি। দ্বাদশবর্ষ অজ্ঞাতবাসের পরে দ্বিতীয় সংস্করণ। বোঝা গেল দ্বাদশবর্ষ পরে নতুন এক পাঠক সমাজের সৃষ্টি হয়েছে, যাঁরা ভেজালের বাজারেও খাঁটি জিনিসের স্বাদ চেনেন। ইতিমধ্যে হয়তো বা তৃতীয় সংস্করণ হয়ে থাকবে। বাংলাদেশে বেশীরভাগ লেখকের গ্রন্থ প্রথম সংস্করণেই কৈবল্য লাভ করে। যারা বিশেষ পুণ্যবান, তাঁদের ভাগ্যেই দ্বিজত্ব প্রাপ্তি ঘটে। গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য পাঠকের দাবী মেটানো। যে গ্রন্থ অতি সহজেই দাবী মিটিয়ে দেয়, সে গ্রন্থের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। দাবী মিটলেই প্রয়োজন মিটল। আর যে গ্রন্থ পাঠকের দাবী না মিটিয়ে দাবীকে জিইয়ে রাখতে পারে, সে গ্রন্থকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতে হয়। সম্প্রতি প্রেমেন্দ্রবাবুর শ্রেষ্ঠ গল্পের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই জাত লিখিয়েদের একজন, যাকে পাঠকসমাজ পুনঃ পুনঃ আবিষ্কার করবে। এই ব্যাপারে প্রেমেনবাবুকে অভিনন্দিত করবার আগে পাঠকসমাজকে অভিনন্দিত করা উচিত। ভালো জিনিস সৃষ্টি করা আর ভালো জিনিসের কদর করা—দুই-এরই সমান কৃতিত্ব।

যাঁরা সার্থক লেখক, তাঁদের লেখার সাহিত্যিক মূল্য তো থাকবেই, খানিকটা ঐতিহাসিক মূল্যও থাকা স্বাভাবিক। আমাদের কথা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি বিশেষ অধ্যায়। সেই অধ্যায়টিকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে তবেই দেখা সার্থক হবে। এই জন্যেই গোড়ার দিকে অত কথা বলতে হল।

রবীন্দ্রনাথ যে রাজপথ রচনা করে গিয়েছেন, তার প্রান্তসীমায় এসে যদি নবীনেরা থেমে যেতেন, তবে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব ব্যর্থ হত। রবীন্দ্রনাথ এক সুদূরপ্রসারী জগতের সন্ধান এবং সঙ্কেত দিয়ে গিয়েছেন।

নবীনেরা সেই সঙ্কেত গ্রহণ করে নিজ নিজ পথে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন। সেটা বিরোধ নয়, অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে অতিশয় নিষ্ঠাবতী শুচিবাইগ্রস্তা হিন্দু বিধবা জয়কালী দেবী আপন পুজোর মন্দিরে বুনো শূয়োরকে আশ্রয় দিয়ে তার প্রাণরক্ষা করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর সংগম' নামক গল্পে নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা দাক্ষায়নী দেবী পতিতার কন্যাকে আপন স্নেহছায়ায় আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি তার প্রাণরক্ষা করতে পারেন নি, কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশী করেছেন। মৃত বালিকাকে আপন সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে তিনি তাঁর আজন্ম সংস্কারকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। দুটি গল্পই সংস্কার মুক্তির কাহিনী ; কিন্তু তফাৎ আছে। একটি জীবে দয়া আর একটি মানুষের প্রতি অসীম ভালবাসা। বলা নিষ্প্রয়োজন, জীব বলতে আমরা মানুষকে বুঝি না। জীবে দয়া করা সহজ, কিন্তু মানুষকে দয়া দেখানো বড় সহজ নয়। আর একটি কথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য। দেবতার জাত যায় না, মানুষের যায়। দাক্ষায়নী জাত বলতে, ধর্ম বলতে জন্মাবধি যা কিছু বুঝে এসেছেন সমস্তই এক মুহূর্তে বিসর্জন দিয়েছেন। জয়কালী দেখিয়েছেন ময়াল কারেজ, দাক্ষায়নী দেখিয়েছেন সোশ্যাল কারেজ। সাহসের কথাই যদি বলেন তো বলব নৈতিক সাহসের চাইতে লৌকিক সাহস বড়। এই দুটি গল্প মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, একই বিষয়বস্তুর ক্রমপরিণতি কিভাবে হয়েছে। এই জন্যেই বলেছিলাম নবীনেরা রবীন্দ্র-বিরোধী নন, রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিপূরক।

রবীন্দ্রনাথ ভীড়ের মানুষ ছিলেন না। তিনি মানুষকে দেখেছেন ভীড়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে। এঁরা ভীড়ের মানুষ, সংসারের সব মানুষই তাই। ভীড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভীড়ের মানুষের ক্লোজ-আপ ছবি নিয়েছেন। তাতে জীবনের গ্লানি, ক্লেদ, পঙ্ক সবই ধরা পড়েছে। এই ক্লোজ-আপ ভিয়ুর আর এক নাম রিয়ালিজম। নতুনত্বের মোহ বড় বিষম মোহ। ভীড়ের মাঝখানে থাকার একটা অসুবিধা আছে। কথায় বলে, গাছের ভীড়ে বন দেখা যায় না, তেমনি মানুষের ভীড়ে মানুষের সমগ্র রূপ চোখে ধরা পড়ে না। আগে বলেছি নতুনের চাইতে নবীন বড়। রিয়ালিজম এর চাইতেও বড় জিনিস আছে, তার নাম রিয়ালিটি। যে রিয়ালিজম্ এর মধ্যে রিয়ালিটির সংস্পর্শ নেই, সেটা নারকেলের ছোবড়া, তাতে শাঁস নেই। নিছক রিয়ালিজম্-এর মোহে পড়ে অনেক লেখকের লেখা অন্তঃসারসার শূন্য হয়ে পড়ে। এখানেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহজাত সাহিত্যবোধ তাঁকে রক্ষা করেছে। সংসারে যা কিছু ঘটে, তা ঘটেছে বললেই বাস্তবতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না, অর্থাৎ কোনো ঘটনার যথাযথ বর্ণনামাত্রকেই বাস্তব আখ্যা দেওয়া যায় না। সংসারে কোন ঘটনাই আকস্মিক নয়। তার পশ্চাতে অলঙ্ঘনীয় কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান। মানব-মনের অত্যন্ত স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে যে ঘটনা ঘটে, তাই বাস্তব। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, মনের স্বাভাবিক গতি বহুল পরিমাণে জৈব নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই দু-এর সম্মেলনে সত্যিকারের বাস্তবের উৎপত্তি। প্রেমেন্দ্র মিত্র যে বাস্তব জীবনের ছবি এঁকেছেন সেটা তাঁর মন-গড়া বাস্তব নয়, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। প্রত্যেক মানুষেরই অভিজ্ঞতার পরিধি সীমাবদ্ধ। লেখক যে কাহিনী রচনা করেন, তা আমাদের পরিমিত জগতের বহির্ভূত হলেও একটি সহজ পরিচয়ের আভাস বহন করে আনে, অজানাকে জানা বলে মনে হয়, অচেনাকে চেনা। নইলে অঘোর দাস লোকটাকে কে চিনত কিংবা রজনীকে? ('সংসার সীমান্তে' গল্প দ্রষ্টব্য) কাহিনীটা সম্ভাব্যতার গণ্ডী অতিক্রম করেনি বলেই অপরিচিত মানুষ আমাদের পরিচিত সীমানায় পৌঁছে গিয়েছে। সার্থক সৃষ্টি কখনো সৃষ্টিছাড়া হয় না। রিয়ালিটির বোধ থাকলে মানুষের কল্পিত কাহিনী মানুষের সত্য ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায়। অক্ষম লেখকের হাতে পড়লে পূর্বোক্ত কাহিনীটি পতিতোদ্ধারিনী সেন্টিমেন্টালিজম্-এ পরিণত হতে পারত।

রিয়ালিজম্ জিনিসটা 'টোকেন মানি'র 'ফেস্ ভ্যালু'র মতো। ওর মুদ্রা মূল্য আর ধাতু-মূল্য এক নয়। বিচার বিশ্লেষণের আগুনে গালিয়ে নিলে আসল মূল্য ধরা পড়ে যায়। ফেস্ ভ্যালু এবং রিয়েল ভ্যালু যার এক তাকেই বলব

খাঁটি মুদ্রা। তা না হলেই মুদ্রাস্ফীতি। গল্পের বেলায়ও তাই। রিয়ালিজম্ যদি রিয়ালিটিকে ছাড়িয়ে যায় তবে গল্পটা অনাবশ্যক স্ফীত হয়ে গালগল্পে দাঁড়ায়।

রিয়ালিজম্ এবং রিয়ালিটির মিলন যেন মনিকাঞ্চন যোগ। অতি অল্প সংখ্যক লেখকের ক্ষেত্রে এই মিলনটি ঘটেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই স্বল্পসংখ্যকের একজন। এর কারণ প্রেমেনবাবু মূলত কবি। রিয়ালিটি বোধ কবি-মনের সহজাত বৃত্তি। সেই বোধটি আছে বলেই সস্তা গদগদ ভাব বিলাসিতা থেকে তিনি সহজে রক্ষা পেয়েছেন। তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে গিয়ে যে সহজ সত্যটিকে আমরা আবিষ্কার করি, সেটি হচ্ছে এই—কোনো দুর্বল মুহূর্তে মানুষের মনে অনেক সাধু সঙ্কল্পের উদয় হয়। সেই সঙ্কল্পটা যে মিথ্যা চাতুরী এমন নয়। কিন্তু মনের সঙ্কল্পের চাইতেও কঠিন সত্য আছে—সেটা দেহের অস্বাস্থ্য—ধরুন ম্যালেরিয়া। একশত পাঁচ ডিগ্রী জ্বরের তাপে সব সঙ্কল্প গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প ধুয়ে মুছে কোথায় অন্তর্হিত হয়। এ মানুষটা ভালো কি মন্দ, সে প্রশ্নটা অবান্তর। আসলে মানুষটা ষোল আনা মানুষ—সংসারে সব মানুষ যা হয়ে থাকে, এ লোকটিও তাই। এই কথাটা এইজন্য বলতে হল যে, কারো কারো মুখে শুনেছি প্রেমেন্দ্র মিত্র নাকি অতিশয় নির্মল এবং নৈরাশ্যবাদী লেখক। অপর কোন লেখক হলে তেলেনাপোতার সেই অরক্ষণীয়া, অনাদৃতা মেয়েটিকে যেমন করেই হোক উদ্ধার করে ছাড়তেন। সাধু সঙ্কল্পটা নিতান্ত জ্বরের ঘোরে মারা যেত না। আশাবাদী লেখক কিংবা নিরাশাবাদী লেখক—এসব কথা আমি ভালো বুঝিনে। যিনি নিতান্তই আশাবাদী লেখক, তিনি জীবনের আদ্ধেকটুকু মাত্র দেখেছেন। নিরাশাবাদী লেখকও তাই। গোটা জীবনটাকে এঁরা দেখেন নি। প্রেমেন্দ্র মিত্র আশাবাদীও নন, নৈরাশ্যবাদীও নন—তিনি মনুষ্যবাদী—জীবনবাদী—যে মানুষের জীবন নিত্য আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কোনোকালে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন কিনা আমি জানিনে। তবে ওঁর লেখা পড়ে অনেক সময়ে মনে হয়েছে, ওঁর মনের মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক কৌতূহল সদাজাগ্রত। আমাদের এই যুগে যে সমস্ত প্রভাব বিশেষ করে সাহিত্যের চরিত্র-গঠন করেছে বলা যায়, তার মধ্যে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব বোধ করি সবচাইতে বড়। অবশ্য গল্প-উপন্যাসে মানব-মনের রহস্য নিয়েই প্রধান কারবার। তাহলেও প্রেমেন্দ্র মিত্র গোড়া থেকেই এ জিনিসটাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। গতানুগতিক মন নিয়ে ওঁর কারবার নয়।

ওঁর গল্পের নায়ক-নায়িকারা অত্যন্ত জটিল মনের মানুষ। অথচ তিনি সেই জটিলতার জট ছাড়াবার কোন চেষ্টা করেন নি। সংসারে সব চাইতে দুর্গম স্থান মানুষের মন। সেই দুর্গমতম স্থানটিতে তিনি প্রখরতম দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। কোন তত্ব উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা নেই। মানুষের মন সম্বন্ধে তাঁর যে অসীম কৌতূহল শুধু সেই কৌতূহলটিকে জাগ্রত করে দিয়েছেন।

শুধু আমাদের দেশে নয়, অন্যান্য দেশেও মনস্তাত্বিক গল্প বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল। তার কারণ মনটা সেখানে গৌণ, মনোবিজ্ঞানের থিয়োরীটাই মুখ্য। গল্পটা অত্যন্ত নড়বড়ে, কোনরকমে থিওরীর ঠেকো দিয়ে ওকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে থিওরীর বালাই নেই। তিনি শুধু একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেন। সেই পরিবেশের মধ্যে মনটা যেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে, সেটাই মনের সঠিক পরিচয়। এই পরিবেশ সৃষ্টিতেই তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। ঠিক এমনটি না হলে মনটা পুরোপুরি ধরা দিত না। সদ্য-বিবাহিতা লাবণ্যর প্রথম স্বামীগৃহে প্রবেশের কথাটা স্মরণ করুন। জঙ্গলাকীর্ণ অন্ধকার শেওলা-পিচ্ছিল গন্ধভারাক্রান্ত পথে পদে পদে হোঁচট খেতে খেতে প্রথম স্বামীগৃহে পদার্পণ। জরাজীর্ণ ভুতুড়ে পোড়ো বাড়ি—ভয়ে লাবণ্যর গা ছম্‌ছম্ করে। অপর-দিকে স্বামীটি এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ—কথা বলে কম, আপন চিন্তায় মগ্ন, হঠাৎ কথনো আদরে চুম্বনে বধূকে অস্থির করে, পরমুহূর্তেই আবার নির্বিকার। এবার দুটি চিত্র মিলিয়ে দেখুন—একদিকে ভুতুড়ে পোড়ো বাড়ি অপর দিকে ভুতুড়ে পোড়ো মন। লাবণ্য স্বামীর মনের হদিস্ পায় না। মনের মধ্যে উঁকি মেরে দেখতে ভয় করে—গা ছম্‌ছম্ করে। যেমন জঙ্গলাকীর্ণ বাড়ি, তেমনি সন্দেহাকীর্ণ মন। স্ত্রী যদি ভালবেসে কথা কয়, স্বামী ভাবে এ শুধু নারীসুলভ শঠতা। যদি কথা না বলে, তবে ভাবে স্ত্রী উদাসীন। অথচ সুখের আকাঙ্ক্ষা আছে। ভাবে, এই অভিশপ্ত বাড়িটা ছেড়ে যেতে পারলে হয়তো বা নতুন করে জীবন শুরু করা যাবে। বেশ, পোড়ো বাড়িটাতো ছাড়া গেল। কিন্তু পোড়ো মনটা? সেটা যে সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। দারুণ দুর্যোগের রাতে দুজনে চলেছে। নদীর উপরে ভাঙা সেতু। বধূর যেতে পা সরেনা—যদি পড়ে যাই। বেশতো, যদি পড়ি তো দুজনে এক সঙ্গেই পড়ব।

সেতুর মাঝখানে এসে লাবণ্য হঠাৎ পা ফস্‌কে পড়ে গেলে। নিতান্ত ভাগ্যের জোরে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার।

এই আকস্মিক ঘটনাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হতে পারত, যদি না সদ্য

উদ্ধারপ্রাপ্ত বধূটির একটি উক্তি উদ্ধার কর্তার কানে এসে পৌছোত—পা ফসকে তো পড়িনি, আমার যেন মনে হল তুমি আমায় ঠেলে দিলে··· ।

দুর্যোগের অন্ধকারে ঝড় জলের মধ্যে স্বামী স্ত্রী এগিয়ে চলে গেল। ঐ একটি মাত্র উক্তিকে আশ্রয় করে গল্পটি খাড়া করা হয়েছে। থিওরীর কচকচি নেই। শুধু একটি পটভূমিকা রচনা করে দিয়েছেন। তারই সাহায্যে মানবমনের একটি অত্যন্ত দুজ্ঞেয় রহস্য পাঠকের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। ভাঙা সেতু এবারকার মতো কোন মতে অতিক্রম করা গিয়েছে। কিন্তু আবার কোথাও ঐ অদ্ভুত প্রকৃতির স্বামীটি লাবণ্যকে জীবনের সেতু থেকেই ঠেলে দিয়েছে কিনা কে জানে। সেটাই প্রশ্ন; যে প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারে না—আমি না আপনিও না, প্রেমেন্দ্র মিত্রও না।

প্রত্যেকটি গল্প ধরে ধরে আলোচনা করবার স্থানও নেই প্রয়োজনও নেই। পুডিং-এর স্বাদ বুঝতে হলে খেয়ে দেখাই বুদ্ধিমানের কাজ। সমালোচনা পড়ে সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণের চেষ্টা, পাক প্রণালীর বই পড়ে আহারের সাধ মেটানোর মতো। মূল জিনিসটার স্বাদ বুঝতে হলে প্রত্যেকটি গল্প মন দিয়ে চেখে খেতে হবে। নাভানা পাবলিশার্স এই গল্প-সঙ্কলনটি প্রকাশ করে পাঠক-সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আরো ভালো কাজ করতেন, যদি অত বাছ-বিচারের মধ্যে না গিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প একত্র সঙ্কলন করে প্রকাশ করতেন। শ্রেষ্ঠ অংশটা বাদ দিলে যা বাকী থাকে, সেটা নিকৃষ্ট, এমন কথা কোন ন্যায়-শাস্ত্রে বলে না। বর্জিত অংশেরও উৎকর্ষ আছে। বেশী বাছ-বিচার করতে গেলে অবিচার করাই হয়—বিশেষ করে প্রেমেন্দ্রবাবু যখন খুব অল্প সংখ্যক গল্পই লিখেছেন। শ্রেষ্ঠ জিনিসের চাইতেও বড় জিনিস আছে—সেটা হচ্ছে সমগ্র অর্থাৎ সম্পূর্ণ জিনিস। পুরো জিনিসটাকে জানলে তবেই ভালো করে জানা হয়।*

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প—নাভানা পাবলিশার্স

প্রতিভার অভিশাপ : নজরুল প্রসঙ্গে

সংসারে নির্গুণ মানুষের চাইতে গুণী মানুষের সংখ্যা বেশী। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে অধিকাংশ মানুষেরই কোন-না-কোন বিষয়ে কিছু-না-কিছু গুণপনা আছে। কারো গানের গলা চমৎকার, কারো ছবি আঁকায় হাত, কেউ নৃত্যকুশলী, কেউ দক্ষ অভিনেতা, কেউ খেলাধূলায় পারদর্শী, কেউ আবার ছন্দ গাঁথেন, গল্প লেখেন। এমন কি কথাবার্তায়, আচারে ব্যবহারে যে মানুষকে খুবই সাধারণ বলে মনে হয়, একটু খোঁজ করলে দেখা যাবে তিনিও নানা হাতের কাজে রীতিমতো ওস্তাদ। এখানে বলে নেওয়া ভালো যে, গুণের মধ্যে আবার গুরভেদ আছে। গুন এবং গুণপনা সম-গোত্রের জিনিস হলেও ঠিক সম-স্তরের নয়। কোন মানুষকে গুণীজনরা গুণবান বললে যতখানি বোঝায়, শুধু গুণপনা আছে বললে ঠিক ততখানি বোঝাবে না, কথাটা একটু হালকা হয়ে যাবে। তফাৎটা উৎকর্ষের। গুণপনার দৌড় খুব বেশী নয়—স্বল্প কাল এবং স্বল্প পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ। গুন জিনিসটা একটু উঁচুদরের। সব সময়ে স্থান কালের সীমায় আবদ্ধ থাকে না, দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। একটু উচ্চাকাঙ্ক্ষীও বটে। গুণপনা কৃতিত্ব লাভেই তুষ্ট, গুণের দাবী একটু বেশী। শুধু কৃতিত্বে তার মন ওঠে না, সে চায় কীর্তি। যথার্থ গুণীজন বলতে তাঁকেই বোঝায় যিনি বিশেষ কোন ক্ষেত্রে আপন গুণসিদ্ধির দ্বারা সমাজে এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, যে প্রতিষ্ঠা একমাত্র গুণবলেই লভ্য—ধনবলে নয়, পদবলে নয়, ভুজবলে তো নয়ই। সে প্রতিষ্ঠার আয়ুষ্কাল গুণী ব্যক্তির জীবৎকালকে ছাড়িয়ে যায়।

বিদ্বান পণ্ডিত, কবি সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী সুরশিল্পী নৃত্যশিল্পী, শিক্ষাব্রতী সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ—এঁরা সকলেই গুণীজন। উৎকর্ষের একটা স্তরে উত্তীর্ণ হলে এঁদের সকলেরই কীর্তি এবং প্রতিষ্ঠা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। এঁরা শুধু কৃতী ব্যক্তি নন, এঁরা কীর্তিমান কারণ এদের কিছু কিছু কীর্তি নিঃসন্দেহে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই যে গুণবাণের কথা বলছি এরা বিশেষ কোন ট্যালেণ্ট বা গুণের চর্চা করেছেন, তাতে পারদর্শিতা লাভ করেছেন এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে গুণগ্রাহীদের মনে স্থান করে নিয়েছেন। গুণ জিনিসটা স্নো-বলের মতো কলেবরে বাড়তে থাকে। চর্চা যত বাড়বে, কদর তত বাড়বে; গুণ-গ্রাহীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ফলে গুণীর অবর্তমানেও গুণকীর্তন থামবে না। গুণবানরা এভাবেই প্রতিষ্ঠাবান হন।

কিন্তু এই যে গুণের কথা বলা হল এও গুণের সর্বোচ্চ স্তর নয়। গুণ যখন আপনাকে বহু গুণে অতিক্রম করে যায় তখন শুধু গুণ বললে তার সবটুকু বলা হয় না। গুণের যেখানে চরম স্ফুরণ সেখানে গুণ কথাটা বড় বেশী নিরীহ নিষ্প্রাণ শোনায়। সেখানে সে একটা প্রচণ্ড শক্তি রূপে প্রকাশ পায়। সোজা কথায় গুণ সেখানে আগুন হয়ে দেখা দেয়। সমস্ত মানুষটাই একটি প্রজ্জ্বলিত শিখার মতো জ্বলতে থাকে। সে শিখার আভা চতুর্দিক আলোকিত করে। এই আভার নাম প্রতিভা। প্রতিভা কথাটাকে আমরা একটু ঢিলেঢালা ভাবে ব্যবহার করি। একটু উঁচু দরের ট্যালেণ্ট হলেই তাকে প্রতিভা বলে চালিয়ে দিই। ট্যালেণ্ট বা গুণ যখন স্বাভাবিকের মাত্রা ছাড়িয়ে উৎকর্ষে, বৈশিষ্ট্যে, বৈচিত্র্যে, অজস্রতায়, অনন্যতায় সকলের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে তখন তা প্রতিভার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোয়। প্রতিভা জিনিসটা একটা আকস্মিক ফেনোমেনন-এর ন্যায়—কোন ধরা বাঁধা বিধি নিয়মের বশীভূত নয়। এ জিনিস চর্চার দ্বারা পাওয়া যায় না। অর্জিত বিদ্যা নয়, প্রকৃতি-দত্ত শক্তি। শেক্সপীয়ার যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, আমরা ইস্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভাবে বিদ্যাচর্চা করে থাকি সে ভাবে তা কখনই লভ্য নয়। সে জ্ঞান একমাত্র প্রতিভাবানের কাছেই ধরা দেবে আর কারো কাছে নয়। কারণ সে জ্ঞানের ভাণ্ডার যেখানে—book in brooks and sermons in stones—সেখান থেকে জ্ঞান আহরণের ক্ষমতা আমাদের নেই। সাহিত্য সংগীত শিল্পকলায় যেখানেই অত্যুচ্চ ক্ষমতার প্রকাশ পেয়েছে, দেখা গিয়েছে সেখানে পূর্বার্জিত বিধিবদ্ধ শিক্ষার কোন প্রমাণ নেই। সেটা নিজ প্রতিভা থেকে উদ্ভূত।

আগেই বলেছি প্রতিভা প্রকৃত-দত্ত শক্তি। প্রকৃতি দেবীর দানের হাত দরাজ। কিন্তু একমাত্র প্রতিভার বেলায় দেখা যায় তিনি অতি মাত্রায় কৃপণ। দার্শনিক শোপেনহাওয়ার কথাটি বড় সুন্দর করে বলেছেন। বলেছেন প্রকৃতির আভিজাত্য-বোধ বড় কড়া। মনুষ্য সমাজে আভিজাত্য সূচিত হয় বংশগৌরবে, ধনগৌরবে, পদগৌরবে—এ হেন অভিজাতের সংখ্যা শত সহস্র। কিন্তু প্রকৃতি-দত্ত প্রতিভাগৌরবে অভিজাতের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কোটিতে একজন মেলে না। বাস্তবিক পক্ষে অনন্যসাধারণ ক্ষমতার অধিকার না হলে কোন মানুষকে ঠিক প্রতিভাবান বলা চলে না। প্রতিভার মধ্যে গুণের প্রকাশ যতখানি শক্তির আকাশ তার চাইতে ঢের বেশী। মানুষটার মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তির ক্রিয়া চলতে থাকে এবং ঝড়ের বেগে তাকে ঠেলে নিয়ে চলে। এ শক্তিটা সব সময়ে ঠিক স্বাভাবিক ভাবে ক্রিয়া করে না। শক্তি জিনিসটা স্বভাবতই একটু বেপরোয়া উড়নচণ্ডী।

শক্তির অধিকারী কতখানি একে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারবেন তারই উপর নির্ভর করবে এর চরিতার্থতা। আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে অপচয়ের আশংকা। প্রতিভার কুটিলা গতি—ও যে কখন কোন্ দিকে মোড় নেবে তার ঠিকানা নেই, অধিকারীর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এ শক্তির স্বভাবই এমন যে মানুষটাকে রীতিমতো পেয়ে বসে। আমরা কোন অস্বাভাবিক ভাবগ্রস্ত মানুষকে যেমন বলি ওকে কিছুতে পেয়েছে, এও তেমনি। ভূতে পাওয়া মানুষ তো আর কিছু নয়—তার কার্যকলাপ অভূতপূর্ব। ইংরেজিতে এরূপ মানুষকে বলে—a man possessed—কথাটা যে খারাপ অর্থে বলা হয় এমন নয়। বরং উল্টো—কথাটা গুণবাচক। কোন অসাধারণ শক্তির প্রেরণায় কোন মানুষ যখন অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হন তখন খুব সঙ্গত ভাবেই তাঁকে ঐ আখ্যা দেওয়া হয়। তবে এ শক্তির মধ্যে বিপদের বীজ নিহিত আছে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। ইংরেজি daemonic বা demonic (গ্রীক মূল থেকে উদ্ভূত) শব্দটিতে এর ইঙ্গিত আছে। কোন আসুরিক শক্তির প্রাবল্যে অত্যদ্ভুত কার্যকলাপ সম্পর্কে শব্দটির ব্যবহার। পশ্চিমী লিজেণ্ডে ফাউস্ট কাহিনী এই অসাধ্যসাধিকা শক্তির প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। ফাউস্ট-এর বিদ্যা বুদ্ধির অভাব ছিল না কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি চেয়েছেন অসাধ্য সাধনের শক্তি। ফাউস্ট মানুষটাকে কেউ খারাপ বলে না; কিন্তু আপন উদ্দাম শক্তিকে (প্রতিভাই বলা যেতে পারে) আয়ত্তে রাখতে পারেন নি বলেই নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে এনেছিলেন। আধুনিক জীবনেও প্রতিভা যে ভয়াবহ ট্রাজেডি ঘটাতে পারে টমাস মান্ তাঁর ডক্টর ফাউস্টাস নামক উপন্যাসে তা দেখিয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা অনেকেই প্রতিভাকে অবিমিশ্র শুভঙ্করী শক্তি বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে প্রতিভা কল্যাণ করে যতখানি তার চাইতে অকল্যাণ করে বেশী। অর্থাৎ প্রতিভাবানের পক্ষে প্রতিভা অনেক সময়ে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

এ কথা নিশ্চিত যে প্রতিভা একটি—double-edged sword। এর দু দিকেই ধার। কাজেই একে ব্যবহার করতে হয় অতি সন্তর্পণে, সাবধানে। নতুবা হিতে বিপরীত হবার আশংকা। প্রতিভার দীপ্তি যেমন প্রতিভাবানের সকল কর্মকে সমুজ্জ্বল করে তেমনি আবার প্রতিভার উত্তাপ প্রতিভাবানকে দগ্ধ করে ছাড়ে। নিরন্তর একটা অস্থিরতার মধ্যে থাকেন, শান্তিতে থাকতে জানেন না। স্বভাবতই ছিটগ্রস্ত মানুষ; ছিটের মাত্রা একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয়। প্রতিভা জিনিসটা প্রকৃতপক্ষে একটা উন্মাদনার মত কাজ করে। শোপেনহাওয়ার যে বলেছেন প্রতিভাবানে এবং উন্মাদে একটা আত্মীয়তার

সম্পর্ক আছে সেটা কিছু মিথ্যা নয়। বহু যুগে আগে প্লেটোও বলেছিলেন যে প্রতিভাবান মানুষ কখনই কথায় কাজে নরম্যাল নয়। দৃষ্টান্তের অভাব নেই। নিউটনের সময়িক ভাবে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল; নীটশের পরিণতি আরোই মর্মান্তিক। শোপেনহাওয়ার বলেছেন, কেউ আবার আত্মঘাতীও হন—ভ্যান গগ্‌ তার দৃষ্টান্ত। কেউ বা দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়েন—পল গগ্যাঁর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। অকাল মৃত্যুর দৃষ্টান্তও কম নয়—শেলী, কীট্‌স, বায়রন, দার্শনিক স্পিনোজা, আমাদের বিবেকানন্দ—প্রত্যেকেই প্রতিভাবান এবং প্রত্যেকেই অকালে গত। এ সূত্রে মাইকেল মধুসূদনেরও নাম করা যেতে পারে। তিনিও অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁরও অকাল মৃত্যুই বলতে হবে; তাছাড়া শেষ জীবনে দুঃসহ দৈন্য ভোগের মূলেও রয়েছে তাঁর প্রতিভা-বিড়ম্বিত জীবন। অনেক দিন আগে একটি প্রবন্ধে বলেছিলাম যে আমাদের রেনেসাঁসের প্রথম বলি মধুসূধন, ইংলণ্ডে রেনেসাঁসের প্রথম বলি মার্লো (ত্রিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই মার্লোর অপঘাত মৃত্যু)। মধুসূদন যে বলেছিলেন—আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়!—এ ছলনা প্রকৃতপক্ষে প্রতিভার ছলনা। আকাশ-চুম্বী আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিভাবানের স্বভাবগত।

প্রতিভার রুদ্র মূর্তির কথাই কেবল বলছি। কিন্তু রুদ্রেরও দক্ষিণ মুখ আছে এবং প্রতিভাবান মানুষরা সেই দক্ষিণ মুখের দাক্ষিণ্য থেকে কখনই বঞ্চিত হন না। দুঃখ পান, দুর্ভোগ ভোগেন কিন্তু যখন যে অবস্থাতেই থাকুন প্রতিভাবানের অসামান্যতা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। মুখে স্বীকার করুন বা না করুন সকলেই মনে মনে জানেন যে ইনি আর সকলের মতো নন, ইনি ভিন্ন, ইনি অনন্য। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে প্রতিভার স্বভাবে একটা অতিশয়তা আছে। আপন শক্তির পরে অগাধ বিশ্বাস এবং বোধকরি সে কারণেই কথায় কাজে একটু প্রগলভতা, একটু স্পর্ধার ভাব প্রকাশ পায়। প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত বলেই প্রগলভতা প্রকাশ পেলেও সেটা খুব একটা দৃষ্টিকটু কিংবা পীড়াদায়ক মনে হয় না। বরং বললে অন্যায় হবে না যে, প্রগলভতা এবং স্পর্ধিত স্বভাব মানুষটার আকর্ষণ খানিকটা বাড়িয়েই দেয়। আসল কথা, প্রতিভাবানকে ভালো মন্দ সব কিছুতেই মানিয়ে যায়। কিন্তু বিপদের আশংকাটা এখানেই। প্রতিভার একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আছে—চকিতে মনকে চমৎকৃত করে, লোকে নির্বিচারে তারস্বরে সব কিছুর তারিফ করতে থাকে। মাথা ঠিক রাখা দায় হয়ে ওঠে। "ঊর্ধ্বশ্বাসে চলে, স্পর্ধায় সঙ্গে বলে, দুঃসাধ্যের প্রয়াস করে, অসাধ্যের স্বপ্ন দেখে। অতি দ্রুত চলতে

গেলে অচিরে দম ফুরিয়ে যায়, ঝড়ের উদ্দামতা এক সময়ে নিস্তেজ হয়ে আসে। প্রতিভাও অনেক সময় নিজেই নিজেকে নিঃশেষ করে। ফাউস্ট-এর শক্তির খেলা যে একটা সময়-সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল সেও একটা symbolic ব্যাপার—শক্তিরও যে সীমা আছে সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

শক্তিকে ইস্পাতের ন্যায় তাপ শৈত্যের সহনশীলতায় টেম্পার করে নিতে হয়, তবেই সে শক্তি উন্নত ধরনের কাজে ব্যবহারের উপযোগী হয়। এ না হলে শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার সম্ভবই নয়, অপচয়ের আশংকাই থাকে বেশি। শক্তি জিনিসটা এক-রোখা, আপন মর্জিমত চলে। ওকে সামলে রাখাই দায়। অস্থির অশান্ত ভাবটাকে দমন করে একটু যদি শিষ্ট শান্ত সৌম্য ভাব এনে দেওয়া যায় তাহলেই ওর প্রসন্ন রূপটি ফুটে উঠবে। এই টেম্পার করে নেওয়ার কথা বলছিলাম সেটা আর কিছু নয়, শক্তির সঙ্গে সাধনার যোগ। সহজ নয়; কিন্তু যেখানেই যোগাযোগটি ঘটেছে সেখানেই স্থৈর্যে ধৈর্যে মাধুর্যে প্রতিভা যথার্থই শক্তিরূপিণী হয়ে দেখা দিয়েছে অর্থাৎ সর্বার্থসাধিকা শক্তি রূপে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এর প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। শক্তির মধ্যে একটা বন্য উচ্ছৃঙ্খল ভাব আছে; যত বেশী শক্তি তত বেশী প্রলোভন, সেজন্যে তাকে বশ মানিয়ে নিতে হয়, নইলে বিপত্তি ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরিসীম শক্তিকে আপন বশে রেখেছিলেন। অনন্য-মনা সাধনার বলেই সেটি সম্ভব হয়েছিল। শক্তি এবং সাধনার এমন শুভ-সংযোগ পৃথিবীতে কমই ঘটেছে। রূপ গুণ, ধন মান, বিদ্যা বুদ্ধি, খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্তই পথে পথে প্রলোভনের ফাঁদ পেতে রেখেছিল কিন্তু তাঁর আপন কক্ষপথ থেকে তাঁকে এতটুকু বিচ্যুত করতে পারে নি। জগৎ-জোড়া খ্যাতি লাভ করেও মতি-ভ্রম ঘটেনি। শক্তি এবং খ্যাতি দুটিকেই তিনি সবিনয়ে গ্রহণ করেছেন। অপর এক দৃষ্টান্ত শেক্সপীয়ার। মানব জীবনের নিগূঢ়তম রহস্যকে তিনি মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন, মানুষের গভীরতম দুঃখকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন। একের পর এক ট্রাজেডি রচনা কালে শেক্সপীয়ারকে এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শেক্সপীয়ার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ঐ সময়ে শেক্সপীয়ার যেন এক অত্যুচ্চ গিরিশিখরের কিনারায় দাঁড়িয়ে জীবন-রহস্যের অতল গহ্বরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। এ যেকোন মুহূর্তে মন এবং মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে চরম বিপদ ঘটাতে পারত। একান্ত স্থিতধী ব্যক্তি ছিলেন বলেই ধীর মস্তিষ্কে এ কাজ করা সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বেলায় যেমন ঘটেছে শেক্সপীয়ারকেও তেমনি সমব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অনেক নিন্দাবাদ এবং কটুবাক্য শুনতে

হয়েছে কিন্তু তাতে শেক্সপীয়ারের কিছুমাত্র চিত্তবিকার ঘটেছিল বলে মনে হয় না। তিনি তাঁদের কোন কথার জবাব দিয়েছেন এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। বরং সমসাময়িকদের মুখে gentle Shakespeare কথাটি অল্পাধিক প্রচলিত ছিল। শক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্যে যে মানসিক স্থৈর্য এবং প্রশান্তির প্রয়োজন গ্যয়টে এবং টলস্টয়ের মধ্যেও তা দেখা গিয়েছে। যৌবনের চাঞ্চল্য গ্যয়টের মধ্যে কি ছুকম ছিল না কিন্তু তার উদ্দামতাকে তিনি দমন করেছিলেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিভা থেকেও তার যথাযোগ্য ব্যবহার হয় না। খামখেয়ালীপনার দরুণ অপচয় ঘটে প্রচুর। প্রতিভার মধ্যেই একটা লক্ষ্মীছাড়া অসংসারী ভাব আছে। কোন্‌টা আবশ্যক কোনটা অনাবশ্যক, কোনটা আগে কোন্‌টা পরে বুঝতে পারেন না বলে সমস্ত কাজকর্মই বিশৃঙ্খলা এবং অগোছাল হয়ে যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে দেশে বিদেশে বহু জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু তাঁর বড় দাদার মতো পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি কমই দেখেছেন। একাধারে কবি এবং দার্শনিক কিন্তু তিনি যে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সে তুলনায় অতি সামান্যই তিনি দিয়ে যেতে পেরেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য। সাহিত্য সংগীত চিত্রবিদ্যায় সমান পারদর্শিতা ছিল; কিন্তু মনে হয় অভিনিবেশের অভাবে তাঁর সৃজনশক্তির যথোচিত ব্যবহার হয় নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে এঁদের প্রতিভায় গৃহস্থালি ছিল না। এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে এক সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে প্রতিভার একটি শিখা ধূমকেতুর মত যেন তার পুচ্ছটি বুলিয়ে গিয়েছে। একই সময়ে একই পরিবারে এমন বহুবিধ গুণের সমাবেশ বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু সে অগ্নিশিখায় কেউ স্বর্ণ বর্ণে সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছেন, কেউ আবার সে অগ্নিতাপে দগ্ধও হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের দুই সহোদর ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ বিকৃত মস্তিষ্ক। দুই খুল্লতাত ভ্রাতা গণেন্দ্রনাথ এবং গুণেন্দ্রনাথ অকালে গত—যথার্থ বিদগ্ধ জন হয়েও দাহন কাণ্ড থেকে রক্ষা পান নি। আবার রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ সে তাপে তপ্ত হয়েই তাঁদের সৃজনশক্তি লাভ করেছেন।

প্রতিভা যেমন লণ্ডভণ্ড করে ছাড়ে, মতি স্থির থাকলে তেমনি আবার প্রতিভাবানকে মহামণ্ডিত করে। সত্যি বলতে কি, প্রতিভার মহিমা রাজমহিমাকেও ছাড়িয়ে যায়। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান গ্যয়টের দর্শনপ্রার্থী ছিলেন। তারও আগে রাজশক্তি যখন ঢের বেশি পরাক্রমশালী তখন স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর

ভক্টর জনসনকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন শুধু তাঁকে দেখবার জন্তে। ঐ যুগেই ভল্টেয়ার ইয়ুরোপীয় রাজন্যবর্গের কাছে যে সম্মান লাভ করেছিলেন তা এ কালে, সে কালে কোন কালেই আর ঘটে নি। প্রাশিয়ার সম্রাট ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট-এর প্রাসাদে বহুদিন তিনি সম্মানিত অতিথি রূপে বাস করেছেন। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাতেন, নিয়মিত পত্রালাপ করতেন। সুইডেনের রাজা গুস্তাফাস্, ডেনমার্কের রাজা ক্রিস্চান রাজকার্য পরিচালনায় সবিনয়ে তাঁর উপদেশ নির্দেশ প্রার্থনা করতেন। আমাদের এ যুগেও দেখা গেল পশ্চিম মহাদেশের দেশে দেশে শাসকবর্গ রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করে রাজ সমারোহে অভ্যর্থনা করেছেন।

অবশ্য প্রতিভাবানরা সকলেই জগজ্জয়ী শক্তির অধিকারী হবেন এমন কোন নিয়ম নেই। প্রতিভার ছোঁয়াচটা লেগেছে, মানুষটা জ্বলেও উঠেছিল কিন্তু অল্পকাল জ্বলেই হঠাৎ নিবে গিয়েছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। আরম্ভটা যেমন চমক-লাগানো, শেষটা আবার তেমনি মিয়োনো। যে কারণেই হোক শেষরক্ষা হয়নি। তাহলেও মানুষটা যে অসাধারণ তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবেই। প্রতিভা জিনিসটাই বেহিসাবী; ওকে সামলে রাখতে না পারলে হিসাবে গরমিল হয়ে যায়, আকাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। সামান্যটুকু করতে গিয়ে অনেকটুকু নিয়ে টান ধরে; লাভ হয় যতখানি, ক্ষয় হয় তার চাইতে বেশি। ফলে সমস্ত শক্তিই অকালে নিঃশেষিত হয়। এই যে বেহিসাবী উড়নচণ্ডী প্রতিভা—এর দৃষ্টান্ত সকল কালে, সকল দেশেই দেখা গিয়েছে। দূরে যেতে হবে না, আমাদের হাতের কাছের দৃষ্টান্ত—কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। সে প্রতিভার ছাপ তাঁর সৃষ্টিকর্মে ততখানি নয়, যতখানি তাঁর ব্যক্তিত্বে। কবি ছিলেন কিন্তু খুব উঁচুদরের কবি তাঁকে বলব না। তাহলেও স্বভাব-কবির অনায়াস-লব্ধ উচ্ছলতা তাঁর কাব্যকে একটি উজ্জ্বলতা দিয়েছিল। মানুষটা যেমন প্রাণবন্ত ছিলেন, তাঁর কাব্যেও তেমনি একটা প্রাণবন্ত ভাব ছিল, সেটাই পাঠকের মনকে টানত। গান লিখেছেন অজস্র, সুরের বৈচিত্র্যে লোকের মন মাতিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় একাধারে গীতিকার এবং সুরকার, কিন্তু নজরুল গীতিকে কখনই রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে তুলনীয় মনে হয়নি। গান করতেন, খুব যে সুকণ্ঠ ছিলেন এমন নয়, তাহলেও এমন দরদ দিয়ে গাইতেন যে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনতো। গুণ-গুলির কোনটাকেই অসাধারণ বলব না, কিন্তু সব মিলিয়ে গোটা মানুষটা অসাধারণ। একটা জ্বলজ্বলে ঝলমলে মানুষ। সেজন্যেই একে ব্যক্তিত্বের

প্রতিভা বলেছি। প্রতিভা-দীপ্ত ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। নজরুলের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই এর সাক্ষ্য দেবেন।

প্রতিভাবানরা এমন কিছু কীর্তি রেখে যান যা শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে থাকে। কিন্তু প্রতিভাবান হয়েও নজরুল এমন কিছু রেখে যান নি যা খুব দীর্ঘজীবী হবে। কারণ তাঁর প্রতিভা পূর্ণ পরিণতি লাভের সুযোগই পায় নি। নজরুলের সাহিত্যিক জীবন বলতে গেলে মাত্র কুড়িটি বছরের। কুড়ি বাইশ বছরে শুরু, চল্লিশ বেয়াল্লিশে শেষ। একটি উল্কার মত অকস্মাৎ বাংলার আকাশে দেখা দিলেন। আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ গতিতে দীপ্ত শিখায় সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে অচিরে উল্কাটি ভূমিসাৎ হল। গতি স্তব্ধ হওয়া মাত্র তার আলোও নেই, তাপও নেই। একটি শীতল প্রস্তরখণ্ড মাত্র। আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুদ্গীরণ করে ঝিমিয়ে পড়ে, কিন্তু পরে কোন সময়ে আবার অগ্নিমূর্তি ধারণ করে অগ্নি বর্ষণ করতে থাকে। নজরুলের কত জ্বালাময়ী কবিতা এক সময়ে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের ন্যায় ঝলকে ঝলকে প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু একদিন যে সেই স্রোত স্তব্ধ হল, আর তাতে এতটুকু স্পন্দন ফিরে এল না। নিজের আগুনেই নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে চিরতরে নির্বাপিত হল। প্রতিভা কারো হাতে আসে দেবতার বর হিসাবে, কারো কাছে অভিশাপ হয়ে। দৃষ্টান্ত আগেই দিয়েছি। একটা বিস্ফোরক পদার্থকে বহন করে চলা সব সময়েই বিপজ্জনক। যাঁরা স্থিতধী তাঁরা নীলকণ্ঠ। অর্থাৎ বিপদ তাঁরাও এড়াতে পারেন না, অনেক ক্ষয়ক্ষতি, দুঃখ আঘাত সইতে হয়। তবে সেই সমস্তই তাঁদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাই ঘটেছে। সকল ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে প্রতিভা তার মূল্য আদায় করে নেয়।

নজরুল মানুষটা এমন, প্রথম দর্শনেই চমক লাগিয়ে দিতেন। নিজের কথা মনে পড়ছে, তখন আমি কলেজে ইনটারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র, বয়স সতেরো আঠারোর বেশি নয়। সে বয়সে অবশ্য সহজেই চমক লেগে যায়। তবে নজরুলেরই বা বয়স তখন কত? তেইশ চব্বিশের বেশি নয়। কিন্তু এরই মধ্যে 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে সারা দেশে শোরগোল বাধিয়ে দিয়েছেন। আমাদের হস্টেলে 'বিদ্রোহী' কবিকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। সুদর্শন মূর্তি, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, চোখে মুখে তারুণ্যের আভা। কথাবার্তায়, ভাবে ভঙ্গিতে উচ্ছ্বসিত হাসিতে কোন একটি মানুষের মধ্যে এতখানি প্রাণের প্রাচুর্য এর আগে আমি দেখি নি। 'বিদ্রোহী' এবং 'কামাল পাশা' কবিতা আবৃত্তি করলেন, গান করলেন। অনুরোধ উপরোধের প্রয়োজন ছিল না, আপনা থেকেই একের

পর এক গান করে গেলেন। হাসি গান কথা আপনা থেকেই যেন উপচে পড়ছিল। এই যে উপচে-পড়া ভাব এটাই তাঁর প্রতিভা। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের মধ্যে যেটুকু প্রয়োজনের অতিরিক্ত, যেটুকু তার উদ্বৃত্ত সেটুকুর মধ্যেই তার শক্তির পরিচয়। নিজেকে তিনি নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি। অন্তর্নিহিত কোন শক্তির তাড়নায় অস্থির হয়ে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। বালক বয়সে পাঠ্যাবস্থা থেকেই ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবন, প্রথম যৌবনে গিয়েছেন ইংরেজদের হয়ে লড়াই করতে, ফিরে এসে সাহিত্য চর্চা, সেই সঙ্গে রাজনীতি, পরে সাংবাদিকতা। যে ইংরেজের হয়ে একদিন লড়েছিলেন সে ইংরেজের বিরুদ্ধেই রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ, পরে গীতিকার এবং সুরকার, শেষ পর্যন্ত যোগ সাধনা। কি যে চেয়েছেন, কিসের পেছনে ছুটেছেন কে জানে, মনে হয় তাঁর অস্থির অশান্ত চিত্ত শান্তি পায় নি।

১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যকাব্য 'বসন্ত' নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন। নাটকের প্রথম গানটিতেই আছে—

আমরা বাস্তুছাড়ার দল
ভবের পদ্মপত্রে জল।
আমরা করছি টলমল
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য হাওয়া
নাইকো ফলাফল।

মনে হবে এ যেন নজরুলেরই বর্ণনা। অথচ নজরুলের বয়স তখন তেইশ-চব্বিশের বেশি নয়। কবি তাঁকে দেখেই চিনেছিলেন। বসন্ত অজস্রতার ঋতু—ফুলে ফলে রঙে গন্ধে আপনাকে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়ে রিক্ত বসন্ত একদিন বৈরাগী হয়ে চলে যায়—সে উদাসীন, কারো দিকে সে ফিরেও তাকায় না। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গেও নজরুল জীবনের একটু যেন মিল আছে।

বলছিলাম শান্তি পান নি। নিজে শান্তি না পেলে কি হবে, অপরকে আনন্দ দিয়েছেন প্রচুর। প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তি ছিল, এক সময়ে বহু লোক তাঁকে ঘিরে থেকেছে। যখন যার সঙ্গে মিশেছেন তারই মন জয় করে নিয়েছেন। নিজেকে দিতেও পারতেন নিঃশেষে। সমস্তই আত্যন্তিক, বিপদটা ওখানেই—সর্বমত্যন্তম্ গর্হিতম্। বেহিসাবী উড়নচণ্ডী মানুষ, সব কিছুতেই মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছেন—নিজের ইচ্ছায় নয়, সবই হয়েছে কোন প্রবল শক্তির তাড়নায় যার উপরে তাঁর কিছুমাত্র কর্তৃত্ব ছিল না। এমন নির্ভেজাল ভালো মানুষ কে,

কোন কিছুকে বাধা দেবার বা ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। অজাতশত্রু মানুষ। এখানে স্বভাবতই কল্লোল গোষ্ঠীর কথা মনে হবে। আমরা তখন ভাবতাম কল্লোলের আঙিনায় চমৎকার একটি সাহিত্যিক ব্রাদারহুড-এর সৃষ্টি হয়েছে। পরে দেখা গেল, তাঁদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনটা বড় ঢিলে। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা কন নি, একে অন্যের সম্পর্কে অশোভন উক্তিও করেছেন। এক নজরুল সম্বন্ধেই কারো মুখে কোন নিন্দা শোনা যায় নি, তিনিও কারো সম্বন্ধে কোন নিন্দার কথা কোন দিন উচ্চারণ করেন নি।

দোষে গুণে মিলিয়ে নজরুল এমন মানুষ ছিলেন যে, তাঁকে ভালবাসা খুব সহজ ছিল। দোষ-গুণগুলি সবই ছিল তাঁর স্বভাবজাত। প্রতিভা যেমন স্বভাবজাত, প্রতিভাবানের দোষগুণও তেমনি। আগেই বলেছি, প্রতিভা জিনিসটা বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের ন্যায় অর্জিত ক্ষমতা নয়, শ্রমসাধ্য অধ্যবসায়ের দ্বারাও লভ্য নয়। এ জিনিস প্রকৃতি-দত্ত, আপন স্বভাবের মধ্যে নিহিত। সাধ্য সাধনা করে একে পাওয়া যায় না। ঐ যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'তোরা পারবিনে ফুল ফোটাতে/যে পারে/সে আপনি পারে সে ফুল ফোটাতে'— প্রতিভার প্রকৃত পরিচয়টি ঐ। প্রতিভাবানের পক্ষে যা সহজসাধ্য, বিদ্বান বা পণ্ডিতের পক্ষে তা শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য। কারণ, প্রতিভা তার কল্পনার ডানা মেলে দিয়ে যেখানে গিয়ে পৌছোতে পারে, পাণ্ডিত্য বেচারী পায়ে হেঁটে (তাও আবার পুঁথির ঝাঁকা মাথায় করে) কখনো সেখানে গিয়ে পৌছোতে পারে না। ব্যাপারটা বারো আনাই স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু বাকি চার আনার জন্যে একটু-আধটু সাধ্যসাধনার প্রয়োজন আছে বইকি, নইলে শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। নজরুলের প্রতিভা পরিণতি লাভ করেনি। কবিজীবনের প্রারম্ভে যে প্রতিশ্রুতি দেখা গিয়েছিল ক্রমবিকাশের পথে তা আর বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নি। অর্ধপথেই গতি স্তব্ধ হয়েছে। যৌবনের দৌড় বড় বেশী দূর নয়। প্রতিভাবান-দের বিষয়ে বলতে গিয়ে পশ্চিমী লেখক বলেছেন, Youth gives brilliance—যৌবনের দান চমক, ঝলক। Age gives fullness to that brilliance—প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ পরিণত বয়সের দান। বলেছেন, greatness come with age—প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্যে চাই বয়সের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান-গাম্ভীর্য। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। পৃথিবীর সাহিত্যে একমাত্র কীট্সকে বলা চলে এর ব্যতিক্রম। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সে তিনি যে পরিণত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই এমনটি আর ঘটেনি। শক্তির পরিণতিতে বয়স বা সময়ের একটা মস্ত বড় ভূমিকা আছে, এ

কথা কেউ অস্বীকার করবে না। নজরুলের বেলায় অঘটন ঘটল, মাঝপথে সময় স্তব্ধ হয়ে রইল। বয়স বাড়ল কিন্তু তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই রয়ে গেলেন। পরিণতির কোন সুযোগই পান নি। পরিণতি লাভ তো দূরের কথা একেবারে যে ভরাডুবি হল সেও তাঁর বেপরোয়া স্বভাবের দরুণই বলতে হবে। জীবনযাত্রায়, সংসারযাত্রায় কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলাটা নিরাপদ। নজরুল নিরাপদ পথে চলতে জানতেন না, কোন ব্যাপারেই মাত্রাজ্ঞান ছিল না—সংসারী মানুষ ছিলেন কিন্তু ঘর সংসারের কথা ভাবেন নি; গান করতে বসেছেন তো আহার নিদ্রা ভুলেছেন; সাহিত্যচর্চা করেছেন তো অর্থার্জনের কথা ভাবেন নি, রাজনীতি করেছেন তো রাজশক্তির পরোয়া করেন নি, রাজদ্রোহের দায়ে পড়েছেন।

অনেক ব্যাপারেই তাঁকে সামলে রাখা কঠিন ছিল কিন্তু একটি ব্যাপারে তিনি আশ্চর্য সংযম এবং অবিচল দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মান্ধতাকে তিনি কোন কালে প্রশ্রয় দেননি। ধর্মবিরোধ তাঁর কবিধর্মে এতটুকু আঁচড় বসাতে পারে নি। সর্বান্তঃকরণে কবি ছিলেন বলেই বিভেদ-মূলক কোন চিন্তা কোন কালে তাঁর মনে স্থান পায় নি। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। কোন কবিকে জাতীয় কবির আখ্যা পেতে হলে সমগ্র দেশের এবং জাতির ট্রাডিশনকে যথাসাধ্য আত্মসাৎ করতে হয়। এ দেশের হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রীষ্টান ট্রাডিশনকে সমগ্র ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সেজন্যে খুব ন্যায্যভাবেই তিনি ভারতের জাতীয় কবি হিসাবে স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে একমাত্র নজরুলই ভারতীয় ঐতিহ্যের যে সামগ্রিক রূপ তার প্রতি যথাযোগ্য আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। এক সময়ে তিনি যে কবি হিসাবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তার মূলে তাঁর ঐ ট্রাডিশন—নিষ্ঠা। জীবনে এবং সাহিত্যে নজরুল বাঙালী এবং ভারতীয়—এ ছাড়া তাঁর অন্য কোন পরিচয় ছিল না। জীবনের যে দেশজ রূপ তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা কবি মানুষদের স্বভাবগত। আচারে ব্যবহারে উৎকট রকমে সাহেব এবং ধর্মবিশ্বাসে খ্রীষ্টান হয়েও মাইকেল তাঁর কাব্যের উপকরণ ভারতীয় মিথলজি থেকেই সংগ্রহ করেছেন। শেক্সপীয়রের নাটকে স্থান কাল পাত্রের যে সমাবেশ তার বৃহত্তর অংশের সঙ্গেই ইংলণ্ড বা ইংরেজ জাতির কোন সম্পর্ক নেই। তথাপি তিনি যে জীবনের ছবি এঁকেছেন তা একান্তভাবেই ইংরেজ জীবন। সকল দেশেরই মহাকবির কাব্যে জাতীয় জীবনের নিখুঁত চিত্র প্রতিফলিত। অবশ্য তাই বলে নজরুলকে আমি মহাকবি বলছি না, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি ছিল

তাতে তিনি মহাকবি না হলেও মহৎ কবি হতে পারতেন। দুর্দৈববশত সে দাবিও তিনি পুরোপুরি পালন করে যেতে পারেন নি।

প্রতিভা কোন মানুষকে অতি মাত্রায় আত্ম-সচেতন করে তোলে, আবার কোন মানুষকে নিতান্তই আত্মভোলা করে দেয়। নজরুল ঐ আত্মভোলার দলে, আপন শক্তি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। অবশ্য এই ঔদাসীন্যেরও একটা সৌন্দর্য আছে। রূপ গুণ, মান মর্যাদা, ধন ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যে মানুষ উদাসীন তিনি সাধারণের বহু ঊর্ধ্বে, এ কথা মানতেই হবে। কিন্তু এর অপর দিকটাও আছে—শক্তি সামর্থ্য যাঁর আছে তিনি যদি সে বিষয়ে উদাসীন থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনি সে শক্তিকে যথোচিত মর্যাদাই দিচ্ছেন না। অবমানিত শক্তি তখন তার প্রতিশোধ নেয়। প্রতিভাকে কেবলমাত্র দেবতার বর হিসাবে দেখলে হয় না, একে এক বিরাট দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে হয়, নতুবা বিপত্তি ঘটে। আমরা কথায় বলি শাপে বর হল কিন্তু দেবতার বরও যে অভিশাপ হয়ে দেখা দিতে পারে প্রতিভাবানদের বেলায় বারম্বার তা দেখা গিয়েছে। যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করতে না পারলে প্রতিভা ব্যুমেরাং-এর ন্যায় ঘুরে এসে অধিকারীকেই আক্রমণ করে। প্রতিভাবান তখন হয় প্রতিভার ভিকটিম্। প্রতিভার আপাত-মোহিনী মূর্তি দেখে আমরা মুগ্ধ হই, কিন্তু সে যে অকস্মাৎ ভয়ংকরী মূর্তি ধারণ করতে পারে সে কথা আমাদের মনে থাকে না। দেবতার বরই বলি, আর প্রকৃতির দানই বলি, একে গ্রহণ করতে হয় অতি সাবধানে। কারণ যেমন তার তাপ, তেমন তার ধার, তেমনি তার ভার। সকলে তা সহ্য করতে পারে না। সে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের সেই কবি যিনি প্রতিভার অগ্নিপরীক্ষায় জয়ী হয়েও বলেছেন—

এ তো মালা নয় গো, এ, যে তোমার তরবারি!
জ্বলে ওঠে আগুন যেন, বজ্র-হেন ভারী,
এ যে তোমার তরবারি।

প্রতীভাময়ী আশাপূর্ণা

লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম আশাপূর্ণা দেবীর কোন গল্প-সংকলন পাই কিনা সেই খোঁজে। গ্রন্থাগার কর্তা ঈষৎ হেসে বললেন, আশা পূরণ হবে বলে মনে হয় না। আশাপূর্ণা দেবীর বই লাইব্রেরীর অন্দর মহলে বড় একটা থাকে না, পাঠক মহলেই ঘুরে বেড়ায়, আর একবার বেরোলে সহজে ফেরে না। আমিও হেসে বললাম, খুব ভাল কথা। গ্রন্থাগার তো গ্রন্থের কারাগার বাইরে বেরোতে পারলে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

সত্যি সত্যি একাধিক সংকলনের মধ্যে একখানাও খুঁজে পাওয়া গেল না। যে উদ্দেশ্যে আসা তা সিদ্ধ হল না বটে, কিন্তু এই ভেবে খুশি হয়েছিলাম যে আশাপূর্ণা দেবী সিদ্ধি লাভ করেছেন। গ্রন্থের সচলতা যতখানি, গ্রন্থকারের সফলতা ততখানি। চিত্তচমৎকারিণী কাহিনী রচনা করে আজ মুষ্টিমেয় যে ক'জন আমাদের সাহিত্যের আসর জমিয়ে রেখেছেন আশাপূর্ণা তাঁদের অন্যতম। একদা বাঙালী পাঠক সমাজে শরৎচন্দ্র এবং পরবর্তী কালে তারাশংকর এবং বিভূতিভূষণ যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, আজ আশাপূর্ণা দেবী সেই জনপ্রিয়তার অধিকারিণী। বলা বাহুল্য জনপ্রিয়তাই সার্থকতার একমাত্র প্রমাণ নয়। জনপ্রিয়তার সঙ্গে উৎকর্ষ যুক্ত হলে তবেই সে জনপ্রিয়তা স্থায়িত্ব লাভ করে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে এই যাঁদের নাম করলাম, এঁদের রচিত কোন কাহিনীতে কোথাও অযথা রোমাঞ্চ বা চাঞ্চল্য সৃষ্টির চেষ্টা নেই। জীবনকে যেমন দেখছেন ঠিক তেমনটি করেই দেখাচ্ছেন। জীবনের একটা ছন্দ আছে সেটা মোটামুটি অব্যাহত গতিতে চলে। সাময়িকভাবে কখনো বড় ঝাপ্টা আসে, বড় রকমের ঢেউ ওঠে। ঢেউ-এর মাথায় যে ফেনা দেখা দেয় সেই ফেনা দিয়েও সাহিত্য হয় কিন্তু ফেনা যেমন দেখতে না দেখতে মিলিয়ে যায় তার সাহিত্যিক মূল্যও তেমনি দু'দিনেই ক্ষয়ে যায়। মহৎ সাহিত্যের কারবার জীবনের ঐ ছন্দটাকে নিয়ে। আকস্মিক কোন ঘটনায় বিপর্যস্ত হলেও ছন্দটা আবার ফিরে আসে। যুদ্ধ বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ মহামারি, ভূমিকম্প বন্যা, কত কি ঘটছে কিন্তু মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা, স্নেহ প্রীতি, রাগ দ্বন্দ্ব, ঘৃণা, বিদ্বেষ সমস্তই যেমন ছিল তেমনি থেকে যায়।

ঘরে ঘরে মানুষ যেখানে সুখে দুঃখে, হাসি কান্নায় নিত্যদিনের জীবন যাপন

করছে সেখানেই মানুষের সত্যিকার ইতিহাস রচিত হচ্ছে। আমরা যাকে কথাসাহিত্য বলি তার উপকরণ সেই ইতিহাস থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। ঐ ইতিহাসটিকেই আমি বলেছি জীবনের ধারা বা ছন্দ। আমাদের সাহিত্যে ঐ ছন্দটিকে সর্বপ্রথম ধরিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুচ্ছের গল্পের মধ্যে। এ কাজটি দেশ বিদেশের কোন সাহিত্যই খুব সহজে সম্পন্ন হয় নি। গল্প বলার আর গল্প শোনার আগ্রহ মানুষের স্বভাবজাত। কিন্তু অচেনা অজানার প্রতি মানুষের যতখানি আগ্রহ, চেনা জানার প্রতি ততখানি নয়। অচেনার মধ্যেই রোমাঞ্চ। সেজন্যে কথাসাহিত্যের আদিতে উপকথা। উপকথার রাজ্যে সম্ভব অসম্ভব সীমানা বিরোধ নেই। সেখানে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। দৈত্য দানব, মানুষ এক রাজ্যের অধিবাসী। এটা কথা সাহিত্যের নাবালক দশা। ইংরেজি উপন্যাসের শতবর্ষ ব্যাপী অভিজ্ঞতা চোখের সমুখে হাজির ছিল বলে বাংলা উপন্যাস অল্পকাল মধ্যেই নাবালক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। তা ছাড়া জন্ম মুহূর্তেই বাংলা উপন্যাস একটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার স্পর্শ পেয়েছিল। তাই বলে বঙ্কিমবাবু ধরেই নির্ভেজাল উপন্যাস রচনা করেছিলেন এমন কথা বলব না। গোড়ার দিকে যা লিখেছেন ইংরেজিতে তাকে বলে রোমান্স, খাঁটি উপন্যাস নয়। উপন্যাসের উপকরণের সঙ্গে ইতিহাসের ব্যসন মাখিয়ে খুব রোমাঞ্চকর সব কাহিনীর সৃষ্টি করেছিলেন। রাজা উজীর বাদশা বেগমের কাহিনী উপকথারই সামিল। কারণ এঁদের জীবনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ যোগ নেই। স্বর্গের ইন্দ্রপুরী সম্পর্কে যতটুকু জানি, মোগল অন্তঃপুর সম্পর্কে বোধকরি তার চাইতেও কম জানি। বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন ভ্রমর-গোবিন্দলাল রোহিণীর কাহিনী নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর কাহিনী রচনা করলেন, সেদিন কথা সাহিত্যের রাজ্যে আমাদের আসন পাকা হল। বঙ্কিমের হাতে আমাদের উপন্যাসের পরিণতি খুবই দ্রুতগতিতে হয়েছে। দীর্ঘজীবন পেলে বাংলা গল্প উপন্যাসকে তিনি সাধারণ গৃহস্থ ঘরে এনে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারতেন।

বঙ্কিমের অসম্পূর্ণ কাজটি সুসম্পন্ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুচ্ছের গল্পে। সে কথা আগেই বলেছি। সন্ধ্যা সংগীতের কবিতা পড়ে বঙ্কিম মুগ্ধ হয়েছিলেন। রমেশ দত্তর দেওয়া মালা নিজের গলা থেকে রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে এ সম্মানের যাথার্থ্য পরে গল্পগুচ্ছের গল্পেই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে। গল্পগুচ্ছের গল্প পড়ে বঙ্কিমবাবু এই ভেবে বিস্মিত হতেন, যে আমাদেরই পাড়া প্রতিবেশী,

আমাদের ঘরের সুমুখ পথে নিত্য যারা যাওয়া-আসা করে তাদের জীবন নিয়েও অপূর্ব রসের সৃষ্টি হতে পারে। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসেও এ জিনিসটি লক্ষ্য করা গিয়েছে। স্কট-এর উপন্যাসে রাজা রাজড়া, যুদ্ধ বিগ্রহ, অস্ত্রের ঝনঝনা। তাঁরই সমসাময়িক লেখিকা জেন অস্টিন নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের দৈনন্দিন জীবনকে অবলম্বন করে অনবদ্য কাহিনী রচনা করেছেন। স্কট তাই দেখে যেমন চমৎকৃত তেমনি আবার অপ্রতিভ বোধ করেছেন। বলেছেন আমার 'bow won strain' অর্থাৎ আমার চেঁচামেচি করে বলা জবরজঙ সব গল্পের তুলনায় এঁর সাদামাটা কাহিনীতে আমাদের জানা চেনা জীবনের যে ছবি ফুটে উঠেছে তাতে অনেক উঁচু দরের শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। বলেছেন এ জিনিস আমার সাধ্যাতীত। বাস্তবিক পক্ষে ইংরেজি সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট দশখানা উপন্যাসের নাম করতে গেলেও জেন অস্টিন-এর Pride and Prejudice-এর নাম অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে।

সমাজ এবং সাহিত্যের এক মতি, এক গতি। সমাজ যে পথে যায়, সাহিত্য সে পথে। সমাজের ন্যায় সাহিত্যেও কৌলীন্য প্রথার প্রচলন ছিল। শুধু আমাদের সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সকল সাহিত্যে রাজারাজড়ার প্রাধান্য। অ্যারিস্টটল তাঁর সাহিত্য-সংহিতায় বলেই দিয়েছিলেন যে ট্রাজেডি শুধু মহামান্য এবং মহাপরাক্রমশালীদের জীবনেই ঘটে। সাধারণ মানুষের জীবনে ট্রাজেডি নেই; কেননা তারা এতই নগণ্য যে তাদের দুঃখ, দুঃখ বলেই গণ্য নয়। সাধারণ মানুষের জীবন, তাদের সুখ দুঃখের কথা নিয়েও যে উঁচু দরের সাহিত্য রচিত হতে পারে উনিশ শতকের আগে কবি সাহিত্যিকরা সে কথা খুব একটা ভেবে দেখেন নি। এটা বলতে গেলে ফরাসী বিপ্লবের দান। ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থই সর্বপ্রথম দরিদ্র অবহেলিত গ্রাম্য মানুষদের নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে অভিজাত আখ্যা দিয়ে জাতে ঠেলা হয়েছে অথচ আমাদের দেশে সাহিত্যের ঐ আভিজাত্যকে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আঘাত করেছিলেন। ছিদাম রুই এবং তাঁর বউ চন্দরাকে সাহিত্যে স্থান দেবার কথা সেদিন কেউ ভাবতেও পারতেন না।

সেকালের হিতবাদী পত্রিকার তরফ থেকে অনুরোধ এসেছিল প্রতি সপ্তাহে একটি করে ছোট গল্প লিখে দেবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে সম্মত হয়েছিলেন। পর পর ছ'টি গল্প লিখেছিলেনও। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এসে সবিনয়ে জানালেন খুবই উঁচু দরের জিনিস কিন্তু এ জিনিস বাজারে চলছে না, পাঠকরা রস পাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন। বলেছেন, ওঁরা ঠিক কথাই বলেছিলেন।

সেদিনকার পাঠক মন বঙ্কিমের রোমাঞ্চকর রোমান্স কাহিনীতে এতই আচ্ছন্ন ছিল যে পাড়াগাঁয়ের আপাতদৃষ্ট নিস্তরঙ্গ জীবনে কোন প্রকার রোমাঞ্চ থাকতে পারে তা তারা ভাবতে পারত না। উত্তেজনাবিহীন নিরুত্তাপ কাহিনীতে রস পেতে বিলম্ব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিরাশ হন নি, বিরক্তও হন নি। ঐ ছ'টি গল্প লিখে নিজেই এর রস বা রোমান্সটিতে তিনি মজে গিয়েছিলেন। লিখে গিয়েছেন একের পর এক গল্প, সৃষ্টি হয়েছে গল্পগুচ্ছের অতুলনীয় রসের ভাণ্ডার। আজকে এ কথা বললে খুব ভুল হবে না যে রবীন্দ্রনাথ সব চাইতে বড় সাফল্য অর্জন করেছেন এই ছোটগল্পের ক্ষেত্রে। দেখা যাচ্ছে আজকের বাংলা কাব্য রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে অন্য দিকে মোড় নিয়েছে ; বাংলা নাটক রবীন্দ্রনাথের পথ কোন কালেই অনুসরণ করেনি; এমন যে রবীন্দ্রসংগীত, তাকে পাশ কাটিয়ে 'আধুনিক' নামে এক জাতীয় সংগীতের আবির্ভাব ঘটেছে। একমাত্র বাংলা ছোটগল্প আজও রবীন্দ্র প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হচ্ছে এবং এই একটি ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য যতখানি সফলতা লাভ করেছে এমন আর কিছুতে নয়। সত্যি বলতে কি, বাংলা ছোট গল্প আজ গুণে গরিমায় পৃথিবীর যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের সমকক্ষ।

মানুষের কথা নিয়েই সকল সাহিত্য। গল্প উপন্যাসকে আবার বলা হয়েছে কথা সাহিত্য। কথা শব্দটির অর্থ গল্প, উপাখ্যান। তাহলে কথা সাহিত্য বলতে বুঝতে হবে মানুষের কথা বা মানুষের উপাখ্যান। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি মানুষই একটি গল্প। যথেষ্ট কৌতূহল নিয়ে দেখি না বা ভাবি না বলেই আমাদের চতুর্দিকে ছড়ানো এই সব সজীব কাহিনী আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। যাঁরা দেখেন তাঁরাই লেখেন। ছাপার অক্ষরে পড়ে পাঠক অবাক হয়ে যাবে—বাঃ রে, এদের তো আমি জানি, চিনি। এদের জীবনে যে এমনটা ঘটেছে কিংবা ঘটতে পারে, সে তো কখনো ভাবতেই পারি নি। সব সাহিত্যেরই মূল কথা ঐ। কবি সাহিত্যিকরা যা বলেন তা আকাশ থেকে পেড়ে আনেন না—যা দেখেছেন শুনেছেন এবং তা নিয়ে যা ভেবেছেন তাই লিখেছেন। আমরা সে জিনিস পড়ে অবাক হয়ে বলি—তাইতো এ তো খুবই খাঁটি কথা, কিন্তু আগে কখনো মনেই হয় নি, ইনি বললেন বলে খেয়াল হল। এঁদের দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে কিছুই তাঁদের দৃষ্টি এড়ায় না, আর মনটি এত সজাগ যে যা দৃষ্টিগোচর নয় তাও তাঁদের অনুভূতিগোচর। কবি সাহিত্যিকদের ঐ গুণ তাঁরা দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি দান করেন। অনুভূতিহীনকে উদ্বুদ্ধ করেন।

আমাদের ভাষায় ভূয়োদর্শন বলে একটা কথা আছে। এই যে গল্প উপন্যাস

বা কথা সাহিত্যের কথা বলছি এ সবই ভূয়োদর্শন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। বহুদর্শী চোখ আর অন্তর্দর্শী মন থাকলে তবেই এ জিনিস সম্ভব—ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। এর জন্তে এক ধরনের মনের গড়ন আবশুক। যত্নকৃত সাধ্যসাধনায় অনেক কিছু করা যায় কিন্তু যে জিনিস শিল্পের প্রসাদগুণে প্রসন্ন সে জিনিস আয়াস-সাধ্য নয়, অনায়াস লভ্য। সে জিনিস আপনি এসে ধরা দেয়। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সংগীত সম্বন্ধে বলেছিলেন গান আমি শিখিনি, গান গেয়েছিলাম। এই পাওয়া জিনিসটা একটা মস্ত বড় কথা। বিশেষ করে কোন শিল্প যেখানে প্রতিভার স্তরে পৌছোয় সেখানে সেটা এই পাওয়ার ফল। সোজা কথায় পাওয়া আর প্রতিভা সমার্থক। প্রতিভার রহস্য বোঝা বড় কঠিন। শিখে পড়ে চেষ্টা চরিত্র করে তাকে লাভ করা যায় না। আপনি এসে ধরা দিলে তবেই তাকে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঐ কথাটিই আবার অন্যভাবে বলেছেন তোরা পারবি নে ফুল ফোটাতে / যে পারে সে আপনি পারে / পারে সে ফুল ফোটাতে।

এই যে খাঁটি নির্জলা প্রতিভার কথা বলছিলাম আশাপূর্ণা দেবী সেই প্রতিভার অধিকারিণী। এর জন্তে একেবারে কিছুই তাঁকে করতে হয় নি, এমন নয়। করেছেন—কৌতূহলী চোখ মেলে দেখেছেন, কান পেতে শুনেছেন, অত্যন্ত সজাগ সজীব সপ্রতিভ মন নিয়ে যা কিছু দেখেছেন শুনেছেন তাই নিয়ে ভাবছেন। মনের এ্যালকেমি গুণে চোখে দেখা, কানে শোনা সামান্যটুকু অসামান্য রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেখানেই প্রতিভার প্রকাশ। আমরা যাকে পঞ্চেন্দ্রিয় বলি তার প্রত্যেকটিই অশেষ জ্ঞানের উৎস। যাঁরা জাত লিখিয়ে, জাত শিল্পী তাঁদের শিক্ষা একদিকে ইন্দ্রিয়গত, অপরদিকে হৃদয়গত। তাঁরা আমাদের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত নন, তাঁদের শিক্ষা এর চাইতে ঢের বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে, জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে। জীবন তার বহু রহস্য তাঁদের কাছে উদ্ঘাটিত করেছে।

একথা আশাপূর্ণা দেবীর বেলায় যতখানি সত্য এমন সকলের বেলায় নয়। কেননা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় তো দূরের কথা আশাপূর্ণা একটি দিনের জন্তেও কোন ইস্কুলে পড়েন নি। সেকেলে পরিবারের জন্ম। ঠাকুরমায়ের নিশ্চিত ধারণা লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের বৈধব্য অনিবার্য। আশাপূর্ণা একটু বড় হয়ে বালিকা বয়সেই এর কৌতুকটা বুঝতে পেরেছিলেন। ভাবতেন ঠাকুমা নিজে তো নিরক্ষর, কিন্তু বৈধব্য তো ঠেকাতে পারেন নি। মা লেখাপড়া জানতেন, পড়াশুনা ভালোবাসতেন। কিন্তু শাশুড়ীর ভয়ে ভটস্থ থাকতেন,

লুকিয়ে চুরিয়ে পড়তেন। মেয়ের পড়াও ঐ লুকোচুরি খেলাই বলা চলে। আশাপূর্ণা নিজেই বলেছেন, কবে যে পড়তে শিখেছি মনেই পড়ে না। মা বই হাতে দিয়ে বসিয়ে রাখতেন, ছবি দেখতাম, পড়বারও চেষ্টা করতাম। এইটুকু মনে আছে, বছর পাঁচেক বয়সে মায়ের আঁতুড় ঘরের দোরে বসে মাকে আমি পড়ে শুনিয়েছি। বলেছেন, ঠাকুরমা মাকে কোন কালেই সুনজরে দেখেন নি, হেনস্তা করেছেন। মনে হয় মায়ের এই শাশুড়ীটিই পরে সুবর্ণলতার শাশুড়ী হয়ে দেখা দিয়েছেন।

একটু বড় হয়েও পড়ার সামগ্রী বাড়িতে খুব একটা পেতেন না। পাশের বাড়িতে আসত ছোটদের পত্রিকা 'শিশুসাথী'। সেটাই ছিল একটা মস্ত বড় আকর্ষণ। ও বাড়িতে গিয়ে পড়ে আসতেন। বয়স তখন তেরো কি চৌদ্দ তখন এক মজা হল, কাউকে না বলে লুকিয়ে একটা কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 'শিশুসাথী'র দপ্তরে। কিছুদিন পরে একদিন দাদা এসে বলল, শিশুসাথীতে ঠিক তোর নামের কে একজন একটা কবিতা লিখেছে। দাদা ভাবতেই পারে না যে ব্যাপারটা বোনটিরই কাণ্ড। খবরটা শুনে বোনের তো উত্তেজনায় নিঃশ্বাস রোধ হবার উপক্রম। এর ফাঁকে ছুটে গিয়ে পাশের বাড়িতে দেখে এলেন। শুধু চোখ বুলিয়ে মন ওঠে না। ছাপার অক্ষরে প্রথম লেখার আমেজ প্রথম প্রেমের মতোই। পত্রিকাটি ঘরে এনে বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখলেন অন্যদের চোখের আড়ালে। বারম্বার বের করেন আর পড়েন। মনে মনে এত খুশি হয়েছেন অথচ কবিতাটি যে তাঁরই লেখা সে কথা সাহস করে বাড়িতেও কাউকে বলতে পারেন নি। এতই ভীরু এবং লাজুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন যে নিজেই বলেছেন—সেই প্রথম লেখাটি যদি অমনোনীত হয়ে ফিরে আসত তাহলে সারা জীবনে আর লেখার কাজ তাঁর দ্বারা হয়ে উঠত না।

সেই চৌদ্দ বছর বয়সে যে কাজের শুরু হয়েছিল আজ পর্যন্ত তার বিরাম নেই। এর পরের লেখাটি 'শিশুসাথী'তেই পাঠিয়েছিলেন। এটি একটি গল্প। পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ এলেন, জানতে চাইলেন গল্পটি সত্যি তাঁরই লেখা কিনা। সন্দেহ ভঞ্জনের পরে ছাপা হল। তখন তাঁর বয়স পনেরো। ছোটদের গল্প দিয়েই কথা সাহিত্যের জগতে প্রবেশ। বলেছেন—ছোটদের কথা ভাবতে বলতে ভাল লাগত। বড়দের জন্যে লিখতে ভয় পেতেন। ভাবতেন, বড়দের গল্প তো হবে প্রেমের গল্প। প্রেমের গল্প লিখতে গেলে পাছে বড়রা কিছু মনে করেন, গাল-মন্দ করেন। আঠাশ বছর বয়সে লিখলেন বড়দের জন্য প্রথম গল্প। আনন্দবাজার শারদীয়া সংখ্যায় বেরিয়েছিল 'প্রেম ও প্রেয়সী' নামে সেই

প্রথম গল্প। সাহিত্যিক-সাংবাদিক মন্মথ সান্যাল এসে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। গৃহবধূ হিসাবে অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাৎ। দেওরের উপস্থিতিতে সান্যাল মশায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। স্বামী এবং, সমবয়স্ক ঐ দেওরটি লেখার ব্যাপারে তাঁকে সব সময়ে উৎসাহ দিয়েছেন। ঐটি না হলে কোন গৃহবধূর পক্ষে এতখানি করা কখনই সম্ভব হত না। আশাপূর্ণা দেবী নিজেও আদর্শ পত্নী এবং আদর্শ গৃহিণী। সংসার-ধর্মে এবং সাহিত্য-কর্মে কোন বিরোধ ঘটেনি। সাহিত্যের প্রতি যতখানি তাঁর আনুগত্য, সংসারের প্রতি ততখানি। একটি আরেকটিকে ছাড়িয়ে যায়নি, বরং একটি অন্যটির সহায়তা করেছে। এই সহজ সত্যটি তিনি উপলব্ধি করেছেন যে সাহিত্য কখনো জীবনকে লঙ্ঘন করে যায় না, জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে। নিজের সংসার,প্রতিবেশীর সংসার, নিত্য দিনের জীবন, চোখের সমুখে চলমান জীবনের যে ছবি সাহিত্যে তারই প্রতিচ্ছবি। নদীর এক নাম চিত্রবহা, সে তার দুই তীরের চিত্র বহন করে চলে। নদীর ন্যায় সাহিত্যকেও বলা চলে চিত্রবহা। আমাদের নিত্যদিনের যে জীবন তারই ছবিটি সে সযত্নে ধরে রাখছে।

আশাপূর্ণাদেবী কখনো তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার বাইরে যান নি। এত যে গল্প উপন্যাস লিখেছেন, কত সব মানুষের কথা বলেছেন তারা সবাই চেনা মানুষ—শুধু তাঁর নয়, আমার আপনারও চেনা। যে সব ঘটনার কথা বলেছেন তার কিছুই আজগুবি নয়, এর ওর ঘরে হামেশাই ঘটছে। আশাপূর্ণাদেবীর সাহিত্য কর্মে একটি সহজের সাধনা আছে; এজন্যে তাঁর সমস্ত গল্পে কাহিনীতে একটি নিঃসংশয় সততার ছাপ পড়েছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র এবং বিবৃত ঘটনাকে অকৃত্রিম সত্য বলে গ্রহণ করতে একটুও বাধে না। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের এমন অন্তরঙ্গ ছবি আর কে আমাদের দিয়েছেন! জীবনের অকৃপণ দান এবং নিষ্ঠুর কৌতুক, কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। যে মনটি এখানে কাজ করেছে সে একটি অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন অনুভূতিশীল কবি-মন। সে কারণেই বাঙালী জীবনের দিবারাত্রির কাব্য রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আরেকটি কথাও উল্লেখযোগ্য। এমন সুদীর্ঘকাল ধরে এমন বিপুল পরিমাণে লিখেও তিনি আজ পর্যন্ত যে লেখার একটি গুণমান বা স্ট্যাণ্ডার্ড কোয়ালিটি রক্ষা করে চলেছেন তাও বিস্ময়কর বলতে হবে।

অনেকের মুখে শুনি, কারো কারো লেখায়ও দেখেছি আশাপূর্ণাদেবী আমাদের পুরুষ-শাসিত নিপীড়িত নারীজাতির মুখপাত্রী। নারীসমাজের

দুর্গতি দূরীকরণের জন্যে তিনি লেখনী ধারণ করেছেন। এভাবে দেখলে আশাপূর্ণাদেবীর ন্যায় একজন সাহিত্যশিল্পীর প্রতি বেশ খানিকটা অবিচার করা হয়। সাহিত্যিক হিসাবে এই সহজ সত্যটি তাঁর জানা আছে যে স্ত্রী-পুরুষ একই বৃন্তে দুটি ফুল। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কথা বলা যায় না। গোটা সমাজটার ছবিই এঁকেছেন। অবহেলিত দলিত নারীর কথা যেমন বলেছেন, তেমনি দুঃশাসন পুরুষের কথাও বলেছেন। তাছাড়া মনে রাখতে হবে যে শিল্পী-মানুষ কখনো প্রচারক নন, তিনি জীবন-রসিক। জীবনের চলচ্চিত্র যেমন দেখেন ঠিক তেমনটি আঁকেন, তাতে কিছুই বাদ পড়ে না। আশাপূর্ণা-দেবী খুব ভালো করেই জানেন যে নারী নির্যাতনে পুরুষের হাত যতখানি নারীর হাত ততখানি। সুবর্ণলতার জীবন জলে পুড়ে খাক হয়ে গেল, সে কি শুধু তার পিতা আর স্বামীর দোষে? তার ঠাকুরমা এবং তার শাশুড়ির দোষ কি কিছু কম? শিল্পীর দৃষ্টি কখনো একপেশে নয়, তার মধ্যে ব্যালেন্স থাকে। তার স্পষ্ট প্রমাণ আশাপূর্ণাদেবীর নিজ মুখের উক্তি। বলেছেন—অধিকারহীন অবলাদের দুঃখের কথা বলেছি বৈকি কিন্তু আজকের স্বাধিকারমত্তা সবলাদের দেখেও খুব একটা আনন্দ পাচ্ছি না! অথচ আশাপূর্ণাদেবীকে কেউ পুরাতন পন্থী বলবে না, মনটি অতিশয় আধুনিক। আধুনিক-আধুনিকারা একটু সুস্থির মতি হউক, এটুকু শুধু চেয়েছেন। তাদের প্রতি তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি।

প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুলকথা তিনে মিলে আশাপূর্ণাদেবীর সুবৃহৎ উপন্যাস—যাকে তাঁর Magnnm opus বলা যেতে পারে, বাংলা সাহিত্যে তার জুড়ি নেই বললেই চলে। এমন বিরাট ক্যানভাসে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র ইতিপূর্বে কেউ এঁকেছেন বলে মনে করি না। বাংলাদেশের তিনটি জেনারেশানের ইতিহাস এখানে বিবৃত। তিন জেনারেশনের তিনটি রমণী—মা, মেয়ে ও নাতনিকে ঘিরে এই কাহিনী। তিনজনেরই জীবন ব্যর্থ। আগেই বলেছি, এ অঘটন একমাত্র পুরুষের দ্বারাই সংঘটিত নয়, স্ত্রী পুরুষ দু-এরই হাত আছে। দু এ মিলে যে সমাজ, সেই সমাজেরই এই কীর্তি। কত কত মানুষের জীবন নিয়ে সমাজ ছিনিমিনি খেলছে! এই যে মানুষের দুর্বিষহ দুঃখ, সে কাহিনী এর আগে এমন করে আর কেউ বলেন নি।

আশাপূর্ণাদেবীই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে একটি নিখুঁত ট্রাজিক চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন—না চেনার, না জানার, না বোঝার ট্রাজেডি। সুবর্ণলতাকে সংসারে কেউ বোঝেনি—মাতা পিতা স্বামী পুত্রকন্যা সকলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা। মাতা সত্যবতী নিজে সুশিক্ষিতা, সাধ ছিল কন্যা সুবর্ণলতাকে শিক্ষায় দীক্ষায়

মনের মতো করে গড়ে তুলবেন। ঠাকুরমায়ের পরামর্শে, বাপের সম্মতিতে সে কন্যার ন' বছরে গৌরীদান হয়ে গেল, মাকে না জানিয়ে। সত্যবতী তেজস্বিনী মহিলা; নিদারুণ অভিমানে আপন সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। স্বামী কন্যা কারো সঙ্গেই আর সম্পর্ক রাখেননি। সুবর্ণলতা বালিকা বয়সেই মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিতা; ব্যক্তিত্বহীন পিতা থেকেও নেই, স্বামীটি অত্যন্ত স্থূল প্রকৃতির সন্দিগ্ধ-চিত্ত একটি পুরুষ, সুবর্ণলতার স্বামী হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। সুবর্ণলতা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়নি কিন্তু মায়ের মার্জিত রুচি এবং চিত্ত বৃত্তির কিছু সে নিঃসংশয়ে পেয়েছিল। ফলে স্বামীগৃহে অর্ধশিক্ষিত গেঁয়ো ধরনের পরিবারটির সঙ্গে নিজেকে সে একেবারেই খাপ খাওয়াতে পারেনি। জীবনভর সকলের—প্রধানত স্বামী-শাশুড়ির গঞ্জনা সইতে হয়েছে। বহু সন্তানবতী, কিন্তু ছোট দুই কন্যাকে বাদ দিলে ছেলেমেয়ে সব ক'টিই কোকিলের বাসায় কাকের ছানা। কাকের বাসায় পালিত হলেও কোকিলের ছানা বড় হয়ে কোকিলকণ্ঠীই হয় কিন্তু এ ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টো। সন্তান ক'টি বায়স-কণ্ঠী, মায়ের কিছুই পায়নি। বংশগত স্থূল স্বভাবটি পেয়েছে পুরো মাত্রায়। সুবর্ণ-লতার সারা জীবন কেটেছে যেন বিদেশ বিভুঁইতে বিজাতীয় সব মানুষের মধ্যে যেখানে কেউ তাকে জানে না, চেনে না, বোঝে না। মনের কথা বলার মানুষটি পায়নি। এক সময় সে অভাব সে নিজেই মিটিয়েছিল। অবসর মুহূর্তে বসে বসে নীরবে নিভৃতে তার মনের ভাবনাকে সে মেলে ধরেছিল একটি খাতার পাতায়। সকলে মিলে কণ্ঠটি যার রোধ করে রেখেছিল সে মানুষের কাছে এই আত্মপ্রকাশের আনন্দটুকু ছিল জীবনের এক পরম ধন। আত্মীয়দের মধ্যে একজনের ছিল এক প্রেস। তাকে ধরেছিল বইটি ছাপিয়ে দিতে। মানুষটি ভালো, রাজি হল। বই ছাপা হয়ে বেরোবে, নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখবে, অপরে দেখবে, সকলে পড়বে—সুবর্ণলতা ভেবে রোমাঞ্চিত। কী অধীর আগ্রহে যে বসেছিল, কবে স্বচক্ষে দেখবে তার নিজের রচিত বই। শেষ পর্যন্ত বই বেরোল। মান্ধাতার আমলের ছাপাখানা, ভাঙা টাইপ, পাঁজি পুঁথির কাগজে ছাপা। তার এমন সাধের মানস-সন্তানটির মূর্তি দেখে সুবর্ণর হৃদয় বিদীর্ণ। তার উপরে আবার বাড়ি-তোলপাড়। অ্যাঁ, ঘরের বউ বই লিখে বই ছাপাচ্ছে। বড়রা গাল দিচ্ছে, নিজের ছেলেরা হাসি তামাসা করছে—আমাদের মা লেখিকা হয়েছেন! বস্তা ভর্তি সমস্ত বই ছাতে নিয়ে গিয়ে সুবর্ণলতা নিজ হাতে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। কনিষ্ঠা কন্যা বকুল সেই আগুনের ঝলকে বিদ্যুৎ চমকে মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেয়েছিল মায়ের মুখে অসীম ক্লান্তি আর অপরিসীম অন্তর্বেদনার ছাপ—

এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে জলন্ত বইগুলোর দিকে, বুঝি ভাবছে—'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।' বকুলকে নিয়ে গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড। মা-দিদিমার মতো বকুলের জীবনও ব্যর্থই বলতে হবে। কিশোরী বকুল মনে-প্রাণে ভালোবেসেছিল একটি ছেলেকে। ছেলেটিও তাকে ভালোবাসত। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে যেমনটা হয়—ছেলেটি লক্ষ্মী ছেলের মতো অভিভাবকের আজ্ঞা মতো অপর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেছে। বকুলের বিবাহের সাধ এখানেই মিটে গিয়েছে। বিয়ের চিন্তা আর মনে স্থান দেয়নি। মায়ের মতোই নিঃসঙ্গ তার জীবন, মনোজগতে বিচরণ। পিতৃগৃহেই বাস কিন্তু সুবর্ণলতার মতো সেও নিজ বাসভূমে পরবাসী কিন্তু এরই মধ্যে সে হয়েছে লেখিকা। গল্প উপন্যাস লিখে অশেষ নাম করেছে। গুণগ্রাহীর অন্ত নেই, সারাক্ষণ লোকজনের আনাগোনা, সভা-সমিতিতে আহ্বান। তবু মন ভরে না। ভাবে, সেই ব্যক্তিত্বহীন অপদার্থ ছেলেটা আজও যদি এসে বলে, এসো দুজনে নতুন করে সংসার পাতি, তাহলে এত যে নাম খ্যাতি—সব ছেড়ে ছুড়ে এ মুহূর্তে চলে যায়। কিন্তু সেও আর সম্ভব নয়; সে ছেলেটা অকালে ইহলোক ছেড়ে চলে গিয়েছে।

সর্বপ্রকারে বঞ্চিতা সুবর্ণলতার আশা-আকাঙ্ক্ষা কিছু তবু পূরণ হয়েছিল কনিষ্ঠা দুই কন্যার মধ্যে। একজন কবিতা লিখেছে, বই ছাপেনি কিন্তু কবিসুলভ জীবনযাপন করেছে, অপরজন খ্যাতনামা গল্প উপন্যাস রচয়িতা কিন্তু সুবর্ণলতা এর কিছুই দেখে যায়নি, জেনে যায় নি। সে তার আগেই চলে গিয়েছে। যখন যেখানে কিছু আশা করেছে সেখানেই নিরাশ হয়েছে। শৈশবে মায়ের কাছে পেয়েছিল শোভন রুচিবোধ, কিন্তু সারা জীবন কাটাতে হল স্থূলতার সংস্পর্শে, ক্লেদ পঙ্কের মধ্যে।

আজকে ট্রাজেডির ধারণা বদলিয়েছে। আধুনিক ট্রাজেডিতে সেই প্রচণ্ডতা নেই। কিন্তু তাই বলে তার মর্মান্তিকতা কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। নীরবে লোকচক্ষুর অগোচরে মানুষ কী দুঃসহ দুঃখ ভোগ করে, ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবন কিভাবে তিলে তিলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আধুনিক ট্রাজেডি তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। নিঃশব্দে ঘটে বলে এর নির্মমতা কিছুমাত্র কম নয়। সকল দেশের সকল সাহিত্যেই ট্রাজেডি আজ নব রূপে দেখা দিয়েছে। আমাদের সাহিত্যে এর সার্থকতম রূপায়ণ ঘটেছে আশাপূর্ণাদেবীর হাতে। সুবর্ণলতা নিখুঁত ট্রাজিক চরিত্র। ঐ গ্রন্থটি এবং সুবর্ণলতার চরিত্র সৃষ্টি আশাপূর্ণাদেবীর এক অক্ষয় কীর্তি।

স্বদেশে সমাজে

আনন্দমঠ ও আনন্দভবন

আজ থেকে ঠিক কুড়ি বছর আগে ১৯৬৪ সালে জহরলাল নেহেরুর জীবন অবসান হল। জহরলাল বিশ্বভারতীর আচার্য ছিলেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের জন্যে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে সভার আয়োজন হয়েছিল। সে সভায় আমি ছিলাম অন্যতম বক্তা। সেদিন যে কথা বলে আমার বক্তব্যের সূচনা করেছিলাম, আজ মনে হচ্ছে ইন্দিরার দেহাবসানে সে কথাটি আরও বেশী প্রযোজ্য। সেই কুড়ি বছর আগে বলেছিলাম—বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে এবং পণ্ডিত মতিলালের আনন্দভবনে কোথাও একটা মিল আছে। আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় মুক্তিকামী দেশব্রতী চলেছেন নিবিড় নিশীথে গহন অরণ্য-পথে। পথিকমনের নিভৃত চিন্তা অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারিত হল—আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না? অন্ধকার আলোড়িত করিয়া অপর এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তোমার পণ কি?

—পণ আমার জীবন।

—জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে। পণ্ডিত মতিলালও ছিলেন মুক্তিকামী স্বদেশব্রতী। অনুমান করা যেতে পারে যে, ঐ একই প্রশ্ন তাঁর মনকেও নিরন্তর আলোড়িত করেছে—আমার অভীষ্ট কি সিদ্ধ হবে না? ভারত—ভাগ্যবিধাতা তাঁকেও জিজ্ঞাসা করে থাকবেন—তোমার পণ কি?

প্রত্যুত্তরে মতলাল নিশ্চয়ই বলেছিলেন—পণ আমার প্রাণ।

ভারতবিধাতার মুখেও সেই একই কথা—প্রাণ তুচ্ছ, অনেকেই দিতে পারে। আর কী দিতে পার? মতিলালের উত্তরটিও অনুমান করা কঠিন নয়। নিশ্চয় বলে থাকবেন—প্রাণাপেক্ষা প্রিয় যে পুত্র সেই পুত্রকে দিতে পারি।

জহরলাল পিতৃসত্য রক্ষা করেছেন। পিতৃসত্য রক্ষার জন্ত রামচন্দ্র চৌদ্দ বছর বনবাস করেছিলেন, জহরলাল চৌদ্দ বছর কারাবাস করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দেশের সেবা করে গিয়েছেন। কিন্তু জানতেন যে অধীনতা থেকে মুক্ত হলেই দেশকে পাওয়া যায় না। দেশকে অধিকার করে নিতে হয়। ভালোবাসা দিয়ে সেবা দিয়ে দেশকে আপন হাতে গড়ে নিতে পারলে তবেই দেশ আপন অধিকারে আসে। সে-কাজ সময়-সাপেক্ষ, শক্তি-সাপেক্ষ,

সহজে সমাধা হয় না। সে জন্য জহরলালের মনেও নিরন্তর প্রার্থনা—আমার অভীষ্ট কি সিদ্ধ হবে না? ভারত-বিধাতা তাঁর কাছেও সর্বস্ব পণ দাবি করেছিলেন। জহরলাল নিঃসংশয়ে বলেছিলেন—জীবন সর্বস্ব-ধন একমাত্র সন্তান আমার পণ। উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ইন্দিরা প্রাণ দিয়ে পিতৃপণ রক্ষা করে গেলেন।

আনন্দমঠ ও আনন্দভবনের মিল শুধু নামেই নয়। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেও দেখা যাবে দু এর মধ্যে একটি অতি নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আনন্দমঠের যে একটি বিরাট ভূমিকা ছিল সে কথা অন্য কারোরই অজানা নেই। স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা সকলেই আনন্দমঠের দ্বারা অনুপ্রাণিত, বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সারা দেশ রোমাঞ্চিত, প্রকম্পিত। গান্ধীযুগে মতিলালের আনন্দভবন ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল। অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস আর আনন্দভবন ইতিহাস এক হয়ে মিশে গিয়েছে। সত্যি বলতে কি, আনন্দমঠের সন্তানদল যা করেছেন তার চাইতে ঢের বেশি করেছেন আনন্দভবনের সন্তানদ্বয়।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী ইতিহাসে আনন্দভবনের ইতিহাস উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর। দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ সাঁইত্রিশ বছর। এর মধ্যে তিনটি বছর বাদ দিলে বাকি চৌত্রিশ বছরই দেশের শাসন পরিচালনা করেছেন আনন্দভবনের দুই সন্তান—পিতা জহরলাল, কন্যা ইন্দিরা। পিতা-পুত্রীর মধ্যে পিতা অধিকতর ভাগ্যবান। পরাধীন ভারতে তাঁরাই হয়েছিলেন শাসনকার্যে তাঁর সহকর্মী। পথ অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক এবং সুগম ছিল; সহকর্মীদের সহযোগিতার ফলে শাসনকার্য বাধামুক্ত এবং সহজসাধ্য ছিল। প্রতিপক্ষের বিরোধিতা তখনো দানা বাঁধে নি, জহরলাল অনায়াসে তাকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন।

ইন্দিরা যখন শাসনভার গ্রহণ করলেন তখন চক্রব্যূহ তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অভিমন্যু বধ একদিনে সম্ভব হয়নি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হতে যতদিন লেগেছে, ইন্দিরা বধ করতে তত বছর লেগেছে। অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর চাইতে জহরলাল কন্যা ইন্দিরা ঢের বড়ো যোদ্ধা। চক্রব্যূহের শিকার নয়, চক্রান্তের শিকার, সপ্তরথীর বেষ্টন নয়, সপ্তদশ রথীর বেষ্টন। দেশে যত কটি দল সব কটিই তাঁর বিরোধী। সকলেই জানেন, রাজনীতির মধ্যে আর যাই থাক নীতি নামক পদার্থটি নেই বললেই চলে। আমাদের বিরোধী রাজনীতি আরোই বিচিত্র এক সামগ্রী। এর মধ্যে নীতিও নেই রাজনীতিও নেই, শুধু বিরোধিতা-

টুকুই আছে। তার কারণ বিরোধটা নীতিগত, রাজনীতিগতও নয়। এ হল আমাদের জাতীয় চরিত্রগত; অর্থাৎ হিংসা বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত আক্রোশ পরশ্রী-কাতরতা-প্রসূত। বড়োকে ছোটো করায় পদস্থকে অপদস্থ করায় আমাদের অপার আনন্দ। এরই সম্প্রসারিত সংস্করণ হল ক্ষমতাসীনকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রয়াস। এরই নাম বিরোধী রাজনীতি। রাজনৈতিক বিরোধের একটা ধরন-ধারন আছে, আমরা তার ধার ধারিনা। বিরোধ বলতে যে মত-বিরোধ, কার্য-ক্রমের বিরোধ, সে ধারণা আমাদের নেই। আমরা বিরোধিতা বলতে বুঝি বৈরিতা।

সুসভ্য সুশিক্ষিত দেশের রাজনীতিতে প্রধান দুটি পক্ষ। একটি পার্টি-ইন-পাওয়ার, অপরটি পার্টি-ইন অপজিশান। দুপক্ষের নেতা যেমন একে অন্যের প্রতিপক্ষ তেমনি আবার ক্ষমতা এবং মর্যাদায় সমকক্ষ। একবার ইনি প্রধান তো আরেকবার উনি। আমাদের দেশে গণ্ডা দশেক পার্টি প্রত্যেকটি খুদে খুদে একটি গোষ্ঠী। জন দশেকে জটলা করে একটা দল পাকাতে পারলেই একটি পার্টি গড়া যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এঁরা কেউ দেশনেতা নন; এঁদের বড়ো জোর দলনেতা বা গোষ্ঠীপতি বলা যেতে পারে। এ শুধু নেতৃত্বের লোভে ভিন্ন দল গঠন। ডিমোক্রেসির ধুয়া তুলে খুদে খুদে অ্যারিস্টক্রেসির আখড়া স্থাপিত হয়েছে। অমিত রায়ের ভাষায় বলা যেতে পারে—"সতীদেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে দেশ জুড়ে একশো পীঠস্থান তৈরি হয়ে গেল। ডিমোক্রেসি আজ যেখানে সেখানে তত টুকরো অ্যারিস্টক্রেসির পুজো বসিয়েছে। খুদে খুদে অ্যারিস্টক্রেটে দেশ ছেয়ে গেল। তাদের কারো গাম্ভীর্য নেই, কেন না তাদের নিজের পরে বিশ্বাস নেই।"

দেশনেতায় এবং দলনেতায় দুস্তর ব্যবধান। ক্ষুদ্র এবং বৃহতে যে তফাৎ, দল এবং দেশে সেই তফাৎ। দল মুষ্টিমেয়কে নিয়ে, দেশ সমষ্টি বা সমগ্রকে নিয়ে, কাউকেই বাদ দিয়ে নয়। দেশনায়ক বলেন, দেশের প্রত্যেকটি মানুষ আমার আপনজন; দলনেতা বলেন, যে আমার দলে নয় সে আমার কেউ নয়। কাজেই দলনেতা কোনোমতেই দেশনেতা হিসাবে নির্ভরযোগ্য নন। মন যাঁর ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি স্থান-কালের অব্যবহিত সীমানা ছাড়িয়ে বেশি দূরে যেতে পারে না। ভারতের মতো বিরাট দেশ তো দূরের কথা, নিজ রাজ্যটির কথাও সমগ্রভাবে ভাবা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। অপরপক্ষে আজ-কাল-পরশু ছাড়িয়ে দূর ভবিষ্যতের কথা ভাবাও তাঁদের সাধ্যে কুলোয় না। যে কোনো বৃহৎ কাজে যে গুণটি অত্যাবশ্যক সেটি হল ইমাজিনেশন বা কল্পনা-

প্রবণ মন। এ বড়ো দুর্লভ গুণ, একমাত্র প্রতিভাবানেরই সাধ্যায়ত্ত। এর ছোঁয়াচ যিনি পেয়েছেন তাঁর সকল চিন্তা সকল বাক্য সকল কর্ম বর্ণ-সুষমায় সমুজ্জল হয়ে দেখা দেবে। অগণিত মানুষের চিত্ত জয় করবার জন্যে যে বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন তার সামান্যটুকুও তথাকথিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে আশা করা বৃথা। ছিল নেহরুর, ছিল ইন্দিরার। সে বর্ণসমারোহ শুধু যে দেশবাসীকেই মুগ্ধ করেছে এমন নয়, বিশ্ববাসীকে বিস্মিত অভিভূত করেছে।

ঐ ইমাজিনেশন নামক গুণটির অভাবে আমাদের বিরোধী রাজনীতির চিত্তবৃত্তি ঠিকভাবে পরিণতি লাভ করে নি। এর আদি কথাটি বলে নিলে জিনিসটা বোঝা সহজ হবে। এক সময়ে সারা দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক সংস্থা ছিল, তার নাম কংগ্রেস। হিন্দু-মুসলমান, শিখ-খৃষ্টান সকলে কংগ্রেসের ছত্রতলে এসে মিলেছিল। কংগ্রেসের প্রসার প্রতিপত্তি যখন বেড়ে উঠল ইংরেজ সরকার ভাবল, কংগ্রেসের একটা প্রতিপক্ষ যদি খাড়া করে দেওয়া যায় তাহলে ওরা নিজেদের মতান্তর নিয়েই ব্যাপৃত থাকবে, আমাদের আর বিব্রত করবে না। মুসলমানদের গিয়ে বোঝান—কংগ্রেসটা জাতে-ধর্মে হিন্দু তোমরা আবার ওখানে গিয়ে জুটেছ কেন? খাঁটি ইসলামি মতে একটা আলাদা সংস্থা গড়ে নিলেই হয়। মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিবাদে সেই টোপটি গিলে ফেললে। জন্ম হল মুসলিম লীগের—ইংরেজের পরামর্শে এবং পৃষ্ঠপোষকতায়। বিরোধী রাজনীতির সেই থেকে শুরু। পন্থাটা বাৎলে দিয়েছিল ইংরেজরাই। কিছুটি করতে হবে না, শুধু কংগ্রেস যা বলবে, তোমরা ঠিক তার উল্টোটি করবে। কংগ্রেস যদি বলে 'না' তোমরা বলবে 'হাঁ' আর কংগ্রেস যদি 'হাঁ' বলে তোমরা বলবে 'না'। ব্যস্, বিরোধী রাজনীতিকে একেবারে জলবৎ তরল করে দিয়েছিল। ভাবনা চিন্তার বালাই নেই। কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে কংগ্রেসই নেবে, তোমরা শুধু তার বিরোধিতা করবে। ফলে আমাদের বিরোধী রাজনীতি কোনোদিনই সাবালক হতে পারে নি, নাবালকই থেকে গিয়েছে। মুসলীম লীগ যে ট্রাডিশানটা তৈরি করেছিল পরবর্তীকালে একে একে যখন নানা বিরোধী দলের উৎপত্তি হল, তারাও সেই একই পন্থা অনুসরণ করতে লাগল। দেশের জন্যে ভাবনা চিন্তা সাধ্যমতে, কংগ্রেসেই এক-আধটু করেছে, অন্যরা শুধু তার নিন্দা করেছে, বিরোধিতা করেছে। সাবালক হতে গেলে নিজস্বতা থাকা চাই। তাছাড়া বিরাট দেশের কোথাও কোনো কোনটুকু আশ্রয় করে থাকলে মন ক্রমে কুনো হয়ে যায়। অনেক দলের বেলাতেই তাই হয়েছে পরে আরেক উপসর্গ দেখা দিল। মুসলীম

লীগ পাকিস্তানের দাবি তুলে বলতে লাগল 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। পলিটিক্সে সেই প্রথম হিংসার আমদানি হল। প্রচুর রক্তপাতের পর রক্তমাখা দেশের একাংশ নিয়ে পাকিস্তানীরা চলে গেল নিজের কোটরে, কিন্তু যাবার বেলায় 'লড়কে লেঙ্গে'র লেজুড়টি গিয়েছে ফেলে। The sting is in the tail। এখন সমস্ত ক'টি দলেরই নীতি এবং আদর্শ হয়েছে লড়কে লেঙ্গে। কংগ্রেসও বাদ যায় নি, সেও ওকাজে হাত পাকিয়েছে।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আজ দেশব্যাপী যে হিংসার আগুন জ্বলছে যার পরিণামে ইন্দিরা-নিধন তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এবং অধিকাংশ সংবাদপত্র। বিরোধী নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদপত্রসমূহ যদি দেশের সংহতিনাশক কার্যাবলীকে অকপটে নিন্দা করতেন, সুস্পষ্ট ভাষায় যদি ব্যক্ত করতেন যে দেশদ্রোহী কার্যকলাপ কোনো মতেই বরদাস্ত করা হবেনা, তাহলে ব্যাপার এতখানি গড়াত না। উন্নত দেশসমূহে বিরোধী রাজনীতি এবং সংবাদপত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাদের প্রধান কর্তব্য হল একদিকে সরকারের ভুলভ্রান্তির প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, অপরদিকে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত রাখা এবং জনশক্তিকে সুচারুরূপে সংগঠিত করা। এজন্য সুসভ্য সমাজে বিরোধী রাজনীতি এবং সংবাদপত্র—দুটিকেই শক্তির উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে শক্তির উৎস দুটি সর্বক্ষণ দেশের শক্তিক্ষয়কারী কার্যে লিপ্ত। শুধু শক্তিক্ষয়কারী কাজ করেই ক্ষান্ত নয়, দুটিতে মিলে আমাদের পলিটিক্সের ডিগ্‌নিটি সমূলে বিনষ্ট করেছে। বিরোধী রাজনীতি এবং সংবাদপত্র—দুএরই ভাষা অসংযত, ব্যবহার অশোভন, কার্যকলাপ কদর্য। বিরোধী বলতে শুধু কংগ্রেসবিরোধী বলছি না; কংগ্রেস যেখানে বিরোধী সেখানে তারও ব্যবহার undignified। ইন্দিরা ব্যতিক্রম। ভারতীয় পলিটিক্সে তিনি যে dignity এবং grace এনে দিয়েছিলেন তা যথার্থই গর্ব করবার মতো জিনিস। তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং শক্তিমত্তার প্রশংসা অনেকেই করেছেন কিন্তু পলিটিক্সের ন্যায় স্থূলমতি, রূঢ়ভাষী, আস্ফালনকারী, দুর্বিনীতকে ইন্দিরা যে মহিমান্বিত রূপ দিয়েছিলেন তার তুলনা নেই। ইন্দিরার অভাবে আমাদের পলিটিক্সের স্বভাব আরোই বিকৃত হবার আশঙ্কা আছে।

সংসারে সকল কর্মই কর্তার স্বভাবগুণ লাভ করে। বহু দলে ভারাক্রান্ত আমাদের মেদবহুল রাজনীতির মধ্যে যেটুকু শ্রী সৌন্দর্য বর্তমান তার সমস্তটুকুই ইন্দিরার দান। রাজনীতি জিনিসটা কাজেকর্মে, বাক্যে ব্যবহারে, সর্বব্যাপারে

কাটখোট্টা স্বভাবের। গরম কথা যতখানি বলে নরম কথা ততখানি নয়। যেমন বাক্যবাগীশ তেমনি ব্যস্তবাগীশ ভাব। কিন্তু জহরলাল এবং ইন্দিরাকে আমরা কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি এই শান্তিনিকেতনে। দেখেছি শত কাজের মধ্যেও দিব্যি একটি relaxed ভাব। চলনে-বলনে, হাসিতে-খুশিতে, সৌজন্যে-সৌহার্দ্যে চতুর্দিকে মাধুর্য বিকীর্ণ হত। প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা শুধু দর্শনে নয়, বচনে-আচরণে সকলের মনোহরণ করতেন।

নেহরু ছিলেন কবি প্রকৃতির মানুষ। তাঁর সকল চিন্তায় সকল কাজে এমন কি রাজনৈতিক মতামতে এবং পলিসি বিশ্লেষণেও তাঁর কবি মনের ছাপ পড়ত। এদিক থেকে তিনি অপরাপর রাষ্ট্রনায়কদের তুলনায় একেবারেই ভিন্ন জাতের মানুষ ছিলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পিতৃদত্ত শিক্ষা দীক্ষার গুণে কন্যা ইন্দিরা পিতার নানা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও অধিকারিণী ছিলেন। তবে পার্থক্যও ছিল নেহরুর মন চিন্তামুখীন, ইন্দিরার কর্মমুখীন। স্বীকার করতেই হবে জহরলালের মনের flexibility যতখানি, ইন্দিরার ততখানি নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে পিতার চাইতে কন্যা অনেক কঠিন ধাতুতে গড়া। নেহরুকে লড়তে হয়েছে বহিঃশত্রুর সঙ্গে, ইন্দিরাকে ঘরে বাইরে উভয়ত। বিশেষ করে গত এক দশক ধরে বিনাযুদ্ধে এক পা অগ্রসর হতে পারেননি। বাধা-বিঘ্নের নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বে তাঁর চিত্তের একাগ্রতা এবং সংকল্পের দৃঢ়তা ক্রমেই বেড়েছে। তাঁর কোনো কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং কর্মপ্রণালী দেখে অনেক সময় আমার মনে হয়েছে যে, এ যাবৎ দেশে যত রাজনৈতিক নেতৃত্বের উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেই ইন্দিরার সাদৃশ্য সব চাইতে বেশি। এমন দুর্জয় সংকল্প, এমন অমিত তেজ, মৃত্যুর প্রতি এমন উদ্ধত ঔদাসীন্য আর কোথায় আমরা দেখেছি ?

ইন্দিরা বজ্রের ন্যায় কঠিন হতে জানতেন। কবিত্ব করে বলব না যে কুসুমের ন্যায় কোমলও হতে পারতেন ; তবে একথা অবশ্যই বলব যে ললিতে কঠোরে বিপরীতের সমন্বয়ে এক অসামান্য চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। তার ছাপ পড়ত ছোটো বড়ো সকল কাজে। বক্তৃতামঞ্চে, প্রেস কনফারেন্সে, নানাবিধ বাচনে-ভাষণে, সাধারণ কথাবার্তায়, হাস্যে পরিহাসে লক্ষ্য করা যেত পিতার ন্যায় কন্যার স্বভাবেও একটি lyrical element ছিল, এরই জন্যে প্রিয় অপ্রিয় সহস্রকাজের ঘূর্ণাবর্তে থেকেও স্বভাব-মাধুর্যটি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। নেহরু এবং ইন্দিরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে পলিটিক্সও সৌন্দর্য-মাধুর্য বিরহিত নয়। ইন্দিরার অন্তর্ধানে ভারতীয় পলিটিক্স থেকে grace নামক পদার্থটি অন্তর্হিত

হল। খুব উঁচু দরের শিক্ষা সংস্কৃতি মনে-মজ্জায় বসে গেলে, রক্তধারায় প্রবাহিত থাকলে তবেই মনের এই লাবণ্য বা personal charm এর অধিকারী হওয়া যায়। আজকাল এর নাম charisma ; আমি একে বলি ব্যক্তিগত প্রতিভা। এ অতি দুর্লভ বস্তু ; তাই বলে বিধিদত্ত নয় নিজগুণে আয়ত্ত। এই মনের গড়ন অভিনব। বহু দর্শনে, বহু শ্রবণে বহু মনস্বীর সংস্পর্শে এসে সন্নিধানে থেকে এঁর মনে প্রচুর পলি সঞ্চয় হয়েছে। ফলে মনটি যে উর্বরতা লাভ করেছে তাতেই এমন একটি সমৃদ্ধ মনের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। বহুমুখী তার শক্তি, অতি বর্ণাঢ্য তার প্রকাশ। ঐ বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বটিকেই বলা হয়েছে Charisma—মনের এক মহিমান্বিত রূপ—জনগণের হৃদয় জয় করতে হলে এমন মন অত্যাবশ্যক।

বালিকা বয়স থেকে ইন্দিরা যে জীবন যাপন করেছেন, যে সব মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেছে, যে কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখেছেন, যাতে অংশ গ্রহণ করেছেন তার চাইতে বড়ো শিক্ষা আর কোথায় পেতেন ? এক সময়ে পণ্ডিত মতিলালের গৃহ আনন্দভবন ছিল কংগ্রেস-আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। ইন্দিরা সমস্ত ভারতবর্ষকে দেখেছেন ঘরে বসে। গোরা যেমন আনন্দময়ীকে বলেছিল—মা, তুমিই আমার ভারতবর্ষ, ইন্দিরা তেমনি আনন্দভবনকে বলেছেন—তুমিই আমার ভারতমাতা।

স্কুলের শিক্ষালাভ করেছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক কর্তৃক শান্তিনিকেতনের আদর্শে পরিচালিত বম্বের একটি বিত্যালয়ে। স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে বৎসরকাল অধ্যয়ন করেছেন শান্তিনিকেতনের কলেজ বিভাগে। মায়ের মৃত্যুতে অধ্যয়নে বাধা পড়েছিল। কিন্তু শান্তিনিকেতনে ঐ একটি বৎসরের অধ্যয়নকে তিনি যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন। পরে যখন অক্সফোর্ডে পড়তে যান তখন পিতাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—'এখানে খুব যে কিছু শিখছি কিংবা মস্ত বড়ো কিছু পাচ্ছি এমন নয়। এর চাইতে ঢের বেশি আমি পেয়েছি শান্তিনিকেতনে। সেখানকার জীবন, বিশেষ করে গুরুদেবের সান্নিধ্য আমাকে অনেক দিয়েছে, অনেক কিছু শিখিয়েছে।' আমরা শান্তিনিকেতনবাসী, ভাবতে ভালো লাগে যে এমন একটি অসামান্য জীবন গঠনে শান্তিনিকেতনের কিছু হাত ছিল।

আনন্দমঠ এবং আনন্দভবনের উল্লেখ করে কথা শুরু করেছিলাম। সেখানেই আবার ফিরে আসছি। আনন্দমঠ দিয়েছে একটি মন্ত্র—বন্দেমাতরম্—দেশমাতার বন্দনাগীত। আনন্দভবন দিয়েছে একটি ব্রত—দেশমাতার সেবাব্রত।

মন্ত্র উচ্চারণের চাইতে ব্রত উদ্‌যাপন বড়ো কথা। আনন্দভবনের তিন জেনারেশন—মতিলাল, জহরলাল, ইন্দিরা একই ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন। দেশের ইতিহাসে এর তুলনা কোথায়?

ইন্দিরা গান্ধীর অসামান্য ব্যক্তিত্ব সমগ্র দেশকে যেমন অভিভূত করেছিল তেমনি সমস্ত পৃথিবীকেই সচকিত রেখেছিল। বুদ্ধিমত্তা এবং শক্তিমত্তার এমন চোখ ঝলসানো মূর্তি, দেশে এমন কি বিদেশেও কম দেখা গিয়েছে। এরূপ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের তিরোধানে দেশের কতখানি ক্ষতি হয়েছে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে একটা লাভও হয়েছে। ইন্দিরা অনেকের, অনেক জিনিসের মুখোস খুলে দিয়ে গিয়েছেন। ধর্মান্ধতা যে কতখানি অধর্মের কাজ করতে পারে তাও নিজের প্রাণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। শিখ শৌর্যবীর্যের কত না কাহিনী আমরা শুনেছিলাম, আজ সেই শৌর্যের ইতিহাস ধূলায় লুণ্ঠিত। নিরস্ত্র নারীর যারা ছিল রক্ষক, তারাই হয়েছে তার ঘাতক। পাঁচশ বছর ধরে ঐ শৌর্যবীর্যের ইতিহাস রচিত হয়েছিল। আজকের এই কাপুরুষতার কলঙ্ক ঘোচাতে আবার পাঁচশ বছর লেগে যাবে। শিখরা কত বড় গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে কি তারা বুঝেছে?

ইন্দিরার মৃত্যু প্রকৃত বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু। বহু সমর-বিজয়িনী ইন্দিরা সম্মুখ সমরে প্রাণ দিয়েছেন। এরূপ মৃত্যুতে শোক শোভা পায় না, কেননা যেমন সার্থক জীবন, তেমনি সার্থক মৃত্যু। জীবনদেবতা বলছেন—আমি ধন্য এমন পরিপূর্ণ জীবন, এমন অফুরন্ত শক্তির খেলা স্বচক্ষে দেখলাম। মৃত্যুর দেবতা বলেন—আমিও ধন্য, হাতে আসে শুধু হিম-শীতল মৃতদেহ, এমন তপ্ত রক্ত নিয়ে, এমন মৃত্যুহীন প্রাণ ক'টি এসেছে আমার হাতে? মহাকবির বাক্য সামান্য একটু বদল করে বলতে পারি—

নির্বিচল ছিলে ব্রতে, হে নির্ভীক, তুমি নির্বিকার
তোমারে পরাল মৃত্যু অম্লান বিজয়মাল্য তার।

জাতীয় সংহতি

দেশ যখন ছিল বিদেশী রাজের অধীন তখন দেশের মানুষ সকলেই ছিল স্বদেশ-অন্ত প্রাণ। সকলেই ভারত মাতার সন্তান। আনন্দমঠের সন্তান দলের ন্যায় সকলের মুখেই ছিল বন্দে মাতরম্ ধ্বনি। অর্থাৎ আমরা যেন মায়ের যোগ্য সন্তান হতে পারি, এই প্রার্থনা। এখন আর বন্দে মাতরম্ ধ্বনি শোনা যায় না। ভারত মাতার সন্তানরা এখন যোগ্য তো বটেই রীতিমতো লায়েক হয়ে উঠেছে। বলে, ওসব সেন্টিমেন্টের কথা ; এখন দেশমাতাকেই সন্তানের যোগ্য হতে হবে। বন্দে মাতরম্ ধ্বনির বদলে এখন সন্তানের মুখে একমাত্র বুলি—আমাদের দাবি মানতে হবে। স্বাধীন হবার আগে বলত—দীন দুঃখিনী মা যে মোদের, এর বেশি তার সাধ্য নেই। কিন্তু স্বাধীনতার পরে আর তর সয় নি। বলছে—তোমার সাধ্যে কুলোক বা না কুলোক, তোমার ভাঁড়ারে কিছু থাকুক বা না থাকুক, আমাদের দাবি আগে ভাগে মিটিয়ে দিতে হবে।

আসল কথা, পরাধীনতাকে আমরা যতখানি গুরুত্ব দিয়েছি, স্বাধীনতাকে ততখানি দিই নি। পরাধীনতা যেমন অসহনীয়, অবাঞ্ছনীয়, স্বাধীনতা যে আবার তেমনি মহামূল্য ধন সে কথাটি মনে প্রাণে অনুভব করি নি। খুব হাল্কাভাবে নিয়েছি। ভেবেছি দুঃখের দিন গেল, সুখের দিন এল ; অনেক কষ্ট করেছি, এখন আরাম করব ; অনেক ত্যাগ করেছি, এখন ভোগ করব ; এতদিন দাসত্ব করেছি, এখন প্রভুত্ব করব। ওখানেই ভুল করেছি। পরাধীনতার পাপ বিদায় করতে যতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, স্বাধীনতার পুণ্যফল ভোগ করতেও আবার তেমনি কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন আছে। দেশের কাজে আনন্দ আছে, আরাম নেই। 'তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা।' দেশপ্রেম রজকিনী প্রেমের ন্যায় নিকষিত হেম, স্বার্থগন্ধ নাহিক তায়। দেশের মর্ম বুঝেছিলেন তাঁরাই, যাঁরা দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন, ফাঁসি কাঠে ঝুলেছেন। স্বার্থচিন্তা লেশমাত্র তাঁদের স্পর্শ করেনি। সশস্ত্র বিপ্লবীরা ছাড়াও নিরস্ত্র বিপ্লবী—তিলক, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, নেহরু, প্যাটেল এবং বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ সুভাষচন্দ্র নিঃস্বার্থ দেশসেবায় যে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন, আজ দেশের অবস্থা দেখলে মনে হবে, সেসব যেন কোন্ এক দূর অতীতের কাহিনী। আসমুদ্র হিমাচল এই বিশাল দেশের কথা তাঁরা সমগ্রভাবে ভেবেছেন, জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষকে

তাঁরা সমদৃষ্টিতে দেখেছেন। সেই সব বিরাট মানুষের আকাশবিহারী কল্পনা, দিগন্তপ্রসারী দৃষ্টি আজ কোথায়? আজকের খুদে খুদে বিক্ষুব্ধ নেতা এবং তাঁদের বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী অনুচরবর্গকে দেখলে মনে হয় না পূর্বোক্ত দেশনায়কদের বিন্দুমাত্র প্রভাবও এদের উপর পড়েছে। জাতীয় সম্পদের অপচয় আর কাকে বলে! যাঁদের দৌলতে স্বাধীনতা লাভ করেছি তাঁদের যথোচিত মর্যাদা আমরা দিই নি। অপরদিকে স্বাধীনতাকে যতখানি মর্যাদা দেবার কথা তাও আমরা দিচ্ছি না।

অনেককাল আগে লিখেছিলাম—সাহেবদের রাজত্ব শেষ হয়েছে, এবার মোসাহেবদের রাজত্ব শুরু হবে। কথাটা খুব যে মিথ্যা বলিনি, তার প্রমাণ এখন চোখের সমুখে সুস্পষ্ট। দেশময় বিশৃঙ্খলা—চুরি ডাকাতি, খুন খারাবি, চোরাকারবারি, মজুতদারি, সব কিছু চলছে অবাধে। দুষ্কৃতকারীরা জানে যে, যেকোন কাজেরই সমর্থন পাওয়া যাবে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের কাছে। যে কোন অন্যায় কাজে প্রশ্রয় দেবেন দলীয় নেতারা যদি অন্যায়কারী দলের লোক হয়। অন্যায়কে অন্যায় বলার সাহস নেই, কেননা এদের ভোটের জোরেই তাঁদের টিঁকে থাকতে হবে। কাজেই বর্তমান জননেতারা যে ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে ভোটদাতা জনগণের মোসাহেবি করবেন তাতে আর বিচিত্র কি?

এই যে, কোন অপকর্মের অপরাধ থেকে মুরুব্বির জোরে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে, এরই ফলে সমাজের সকল বাঁধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। সমাজ বলতে দেশের জীবন। সেই জীবনের মধ্যে জাতীয় চরিত্রের প্রকাশ। সে চরিত্রটির আজ এমন ক্ষণভঙ্গুর অবস্থা যে এভাবে বললে গোটা দেশটিকে আর টিঁকিয়ে রাখা যাবে না। জাতির চরিত্রে ভাঙন ধরেছে বলেই দেশের গায়ে একে একে ফাটল দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন ভাষাভাষী মিলে মিশে থাকতে গেলে যে সংহতিবোধ বা আত্মীয়তাবোধের প্রয়োজন এবং যা একদিন আমাদের মধ্যে ছিল—আজ তা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। সকলেই সমদুঃখী বলে তখন আমরা একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম। স্বার্থের সংঘাত ছিল না। কিন্তু যেই না স্বাধীন হলাম অমনি স্ব স্ব স্বার্থ সম্পর্কে এমন অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠলাম যে সকলে সমস্বরে—আমার ধর্ম, আমার ভাষা, আমার সংস্কৃতি, আমার ঐতিহ্য ইত্যাদি রব তুলে বিষম হট্টগোল বাঁধিয়ে দিলাম।

মন ছোট হয়ে গেলে দেশ ছোট হয়ে যায়। দেশ যে কত বিরাট, আমার ক্ষুদ্র গৃহকোণে বসেও আমি তার আভাস পেয়েছি আমাদের কাব্যে সাহিত্যে।

রামায়ণ মহাভারতের কবি বিশাল ভারতের চিত্র আমাদের চোখের সমুখে জাজ্বল্যমান করেছেন। কালিদাসের কাব্যেও ভারত বর্ণনা, ভারত বন্দনা। এ যুগের কবি রবীন্দ্রনাথও ভারতের জয়গান করে—পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গকে একসূত্রে বেঁধেছেন। শুধু কবিরাই নন, দেশের চিন্তানায়ক মনীষীরাও দেশের সমগ্র রূপটিকেই দেখেছেন। তাকে টুকরো করে দেখেননি। একদা ভারতের চার প্রান্তে চারটি শংকরমঠ শুধু যে গোটা দেশের ভৌগোলিক সীমানা নির্দেশ করেছে এমন নয়, দেশের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একটি ঐক্যবোধেরও ইঙ্গিত দিয়েছে। আমি ঐ মঠ ক'টিকে কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বলে মনে করি না, এরা জাতীয় সংহতির প্রতীক। আমাদের মহাকাব্য দুটি জাতীয় ঐক্যবোধে যতখানি সহায়তা করেছে, চারটি শংকরমঠও ততখানি করেছে। কালের পরিবর্তনে ঐক্যসাধনার পদ্ধতি এবং ক্ষেত্রের পরিবর্তন হয়। এ যুগে কাব্য দিয়ে ঐক্য বিধান হবে না; মঠ মন্দির মসজিদ সংহতির চাইতে সংঘাত ঘটাবে বেশি। এ যুগের মিলন ক্ষেত্র হল নানাবিধ গণ প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই ছিল সর্বভারতের মিলনক্ষেত্র। সেখানে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের স্থান ছিল। কংগ্রেসকে খুব সঙ্গতভাবেই আমাদের জাতীয় সংহতির প্রতীক বলা যেতে পারত। এখন সেই এক কংগ্রেস ভেঙে গণ্ডা দশেক দল হয়েছে। সংহতিকে তো সেখানেই সংহার করা হয়েছে। বড় জিনিসকে আর আমরা সইতে পারছি না, ছোট বানিয়ে তবে নিরাপদ বোধ করছি। ছোট মনের ঐ লক্ষণ ক্রমেই তা আরো প্রকট হয়ে উঠছে।

জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হতে চলেছে বলে আজ আমরা কান্না জুড়েছি। ভুলে যাচ্ছি যে এই সেদিন জেনে শুনেই জাতীয় সংহতির বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা ক্রয় করেছি। দেশ বিভাগের দংশ মনে নিয়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। আমাদের স্বাধীনতার পুণ্যফল থেকে আমরা বঞ্চিত। খুনোখুনি, হানাহানি বিবাদ বিসংবাদে দেশের জীবন বিপর্যস্ত। দেশের কোন কোন অংশে বিরোধ বিদ্রোহের আকার ধারণ করছে। আমাদের স্বাধীনতা লাভের পুণ্যক্ষণটি ভ্রাতৃবিরোধে কলঙ্কিত, বহু সহস্র প্রাণ বিনষ্ট, বহু লক্ষ মানুষ মূলোৎপাটিত। সেই তখন 'আদি পাপ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। আদি মানব মানবী আদম এবং ঈভ যে সর্পরূপী Satan-এর পরামর্শে ভগবানের আদেশ অমান্য করেছিল খ্রীষ্টান শাস্ত্রে সেটিকেই বলা হয়েছে Original sin বা আদি পাপ। সেই পাপের ফলেই মানুষ স্বর্গচ্যুত হয়ে অদ্যাবধি পৃথিবীতে দুঃখভোগ করছে।

আদম ঈভের অপরাধে যেমন খ্রীষ্টান সন্তানদের দুর্ভোগ, কংগ্রেস মুসলীম

লীগের অপরাধে তেমনি ভারত সন্তানদের (পাকিস্তান সন্তানদেরও) স্বাধীনতা বানচাল। কুপরামর্শদাতা ইংরেজ সর্পরূপী Satan-এর কাজ করেছে। এখনও বলব আদম ও ঈভ যতখানি নির্বোধ ছিল, কংগ্রেস নেতৃবর্গ এবং জিন্না ততখানি নির্বোধ ছিলেন না। তথাপি তাঁরাই এ অঘটন ঘটিয়েছেন। সে ইতিহাস অতিশয় দুঃখের হলেও আদম ঈভের কাহিনীর মতোই রোমাঞ্চকর। আজ যে এক রাজ্য ভেঙে তিন রাজ্য গড়বার চেষ্টা চলছে—তার সাইকলজিটিও ঐ কাহিনীর মধ্যেই পাওয়া যাবে।

দেশ বিভাগের প্রধান নায়ক জিন্না। অথচ জিন্না-চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ঐ কাজ সম্পূর্ণরূপে তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। উচ্চশিক্ষিত উদারমতাবলম্বী সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মানুষ, দেশপ্রেমিক কংগ্রেস প্রধানদের অন্যতম। মুসলীম নেতা হিসাবে তিনি কখনো পরিচিত ছিলেন না। এক সময়ে মুসলীম লীগ তাঁকে দলে টানার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে, জিন্না অবজ্ঞার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বলেছেন, তিনি কোন সম্প্রদায় বিশেষের নেতা নন, তিনি সর্বভারতীয় নেতা। জীবনের শেষ পর্যায়ে সেই মানুষের রূপান্তর বিস্ময়কর। সে এক বিচিত্র কাহিনী এবং সে কাহিনীর মধ্যেই দেশবিভাগ এবং পাকিস্তানের জন্মরহস্য নিহিত।

প্রথম মহাযুদ্ধ কালে এরূপ আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল যে যুদ্ধশেষে ভারত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাবে। কার্যত যুদ্ধশেষে স্বায়ত্তশাসনের বদলে পাওয়া গেল রাওলাট অ্যাক্ট। কোন প্রকার দাবি উত্থাপন বা সরকারের বিরূপ সমালোচনা রাজদ্রোহ বলে গণ্য হবে। দেশের কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হল। সমস্ত দেশ যখন স্তব্ধ তখন সর্বপ্রথম প্রতিবাদ জানালেন জিন্না। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন ; রাওলাট অ্যাক্টের প্রতিবাদে সদস্যপদে ইস্তফা দিলেন। দেশ জুড়ে জিন্নার জয়জয়াকার। জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিই তখন সর্বাগ্রগণ্য। কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হয়ে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন এমন সময়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। মুহূর্তে রাজনৈতিক পটভূমির আমূল পরিবর্তন, গান্ধী নেতৃত্বের উদ্ভব। কংগ্রেস পলিটিক্স এতদিন ছিল বৎসরান্তে দুদিনের এক অনুষ্ঠান, কিছু গরম গরম বক্তৃতা। গান্ধী বললেন, বাক্যবাগীশ কংগ্রেসকে কর্মমুখীন হতে হবে। শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব পেশ করলেন। কংগ্রেস অধিবেশনে জিন্নার আর্তকণ্ঠের নিবেদন—I appeal to Mr Gandhi to cry halt to this dangerous movement. এ কী সব্বনেশে পলিটিক্স!

অ্যা, পুলিস লাঠি চালাবে, গুলি করবে, ধরে ধরে সব জেলে পুরবে। শৌখিন পলিটিক্সের দিন গেল। জিন্না ক্ষুব্ধ, তাঁর সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। যে সম্মান, যে ক্ষমতা তাঁর হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছিল, অকস্মাৎ কোত্থেকে গান্ধী এসে তা ছোঁ মেরে নিয়ে গেলেন! জিন্না হৃতসর্বস্ব—Othello's occupation is gone. এতই হতাশ হয়েছিলেন যে কিছুকালের জন্য বিলেতে চলে গিয়েছিলেন, ওখানেই বসবাস করবেন, এ পোড়া দেশে আর ফিরে আসবেন না। কিন্তু পলিটিক্সের নেশা একবার পেয়ে বসলে ছাড়ানো কঠিন। নেতৃত্বের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। দেশে ফিরে এলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি যোগদানও করেছেন কিন্তু গান্ধী কংগ্রেসে আর তিনি স্থান করে নিতে পারেননি, কারণ কারাবাস বা কোন প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন এবং দুঃখবরণে তিনি রাজি ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত, যে মুসলীম লীগকে সাম্প্রদায়িক সংস্থা হিসাবে বরাবর অবজ্ঞা করে এসেছেন, সেই মুসলীম লীগেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ব্যর্থ কাম মানুষ অনেক সময় অনেক অনর্থ ঘটান। জিন্নার frustration থেকে পাকিস্তানের জন্ম।

এই যে frustration-এর কাহিনী বলা হল এটিই ক্ষুদ্রাকারে আমাদের বহু নেতার মধ্যে ক্রিয়া করছে। এঁরা জানেন যে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় তাঁদের স্থান হবে না। জিন্না ধর্মের দোহাই দিয়ে আলাদা হয়ে গিয়ে একটা আলাদা রাষ্ট্র গড়েছেন। এঁরা খুদে নেতা, ভাষার দোহাই দিয়ে খুদে খুদে রাজ্য গড়বার স্বপ্ন দেখেছেন। সেখানে রাজত্ব গড়বেন। দেশ জুড়ে এখন তাই হচ্ছে। সতীদেহ ছিন্ন হয়ে দেশময় বহু পীঠস্থান তৈরি হয়েছে। এখন ভারতমাতার দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে দেশজুড়ে স্বাধীনতার পীঠস্থান তৈরী হচ্ছে। অমিট রায়ের ভাষায়—"ডিমোক্রাসি আজ যেখানে-সেখানে যত টুকরো অ্যারিস্টক্রেসির পুজো বসিয়েছে,—খুদে খুদে অ্যারিস্টক্রাটে পৃথিবী ছেয়ে গেল,…তাদের কারও গাম্ভীর্য নেই, কেননা তাদের নিজের পরে বিশ্বাস নেই।"

বৃহত্তর পরিবেশে যারা অস্বস্তি বোধ করে, ভাবে সেখানে থই পাবে না, নিজের স্থান করে নিতে পারবেনা, যোগ্যতার পরীক্ষায় বাদ পড়ে যাবে, তারাই আলাদা হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। দেশ বিভাগের মূলে যেমন ব্যক্তি বিশেষের frustration তেমনি খুদে খুদে রাজ্য গঠনের মূলে আছে খুদে নেতাদের বেকার সমস্যার সমাধান। গোটা দেশের রাজনীতিতে এঁদের স্থান হবে না, কাজেই এঁদের জন্যে ঘরোয়া ব্যবস্থা—যার যার অঞ্চলটি নিয়ে একটি করে রাজ্য গঠন। একটি নতুন রাজ্য মানেই নানা ঘটাপটা—লাট বেলাট, উজির নাজির, মন্ত্রী যন্ত্রী,

সেপাই সান্ত্রী, বিধান পরিষদ,স্পীকার, এম এল এ—বহু লাট বহড়। সোজা কথায় নিম্ন মানের উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের শান্তি স্বস্ত্যয়ণের ব্যবস্থা।

ভাবলে অবাক লাগে যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করতে পারেন। এ যেন ছেলেখেলা—'খেলা ঘর বাঁধতে লেগেছি'। খেলাঘরই বটে। বেশ ক'টি রাজ্য এত ছোট যে কখনই নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। ব্যয় নির্বাহের জন্যে সারাক্ষণ কেন্দ্রের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। দুর্বলের ভার বহন করতে গিয়ে সবলও দুর্বল হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার কি জেনে শুনে কতকগুলো গলগ্রহের সৃষ্টি করেছেন? দেশকে খণ্ড খণ্ড করতে গেলে যে জটিলতা দেখা দেয় সে কথা ভাবা হচ্ছে না। প্রথম দেশ বিভাগে যে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটেছিল, লক্ষ লক্ষ লোক ভিটে ছাড়া হয়েছিল, এই সব রাজ্যগঠনেও ক্ষুদ্রাকারে সে জটিলতা দেখা দিচ্ছে। ভিন্ন ভাষাভাষী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রথম দেশ বিভাগের ভয়াবহতা দেখেও আমরা কিছুই শিখিনি। আত্মঘাতী বিভেদবুদ্ধিকে রোধ করবার কোন চেষ্টা করা হয়নি। আমার ঐ 'আদিপাপ' নামক প্রবন্ধটিতে তখনই বলেছিলাম—এক বিভাগ বহু বিভাগের পথকে উন্মুক্ত করবে। এখন তাই ঘটছে।

ভেঙেচুরে দেশের কি দশা হয়েছে একবার দেখা যাক্। ব্রিটিশ ভারতে (বর্তমান পাকিস্তান সমেত) সবসুদ্ধ এগারোটা মাত্র প্রদেশ ছিল। দেশ স্বাধীন হতে না হতে পাকিস্তানকে বাদ দিয়েই রাজ্যসংখ্যা দাঁড়াল ১৪টিতে। দেশ গঠনের নামে রাজ্য গঠন শুরু হল। ভাষার দাবিতে, আঞ্চলিক স্বার্থের দাবিতে ক্রমেই বেড়ে গিয়ে বর্তমানে রাজ্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২টিতে। তদুপরি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ১১টি—সর্বসমেত ছোট বড় মাঝারিতে মিলিয়ে ৩৩টি।

রাজ্যসংখ্যার অনাবশ্যক বৃদ্ধিতেও ক্ষতি কিছু হত না যদি এই সহজ বোধটি আমাদের থাকত যে ভারতসন্তান মাত্রেরই ভারত ভূখণ্ডের যে কোন অংশে অর্থাৎ যে কোন রাজ্যে বাস করবার অধিকার আছে এবং যেখানেই বাস করুন সেখানেই একজন ভারতীয় নাগরিকের পূর্ণ অধিকার সে ভোগ করবে। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে অনেক রাজ্যেই ভিন্ন ভাষাভাষী অধিবাসীদের প্রকৃতপক্ষে বিদেশী জ্ঞান করা হচ্ছে। আসামের বিদ্যালয়ে বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্যে অসমীয়া অবশ্য পাঠ্য, কর্ণাটকে মারাঠী ছাত্রদের কানাড়া ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক। কথ্য কথা ভাষা নাকি ইস্কুলে পড়ে শিখতে হয়! লোকে ভাষা শেখে ঘরে বাইরে পথে ঘাটে হাটে বাজারে, কাজেকর্মে। যে বাঙালী ছেলেটি আসামে বাস করে সে যদি অসমীয় ভাষা না শেখে তাহলে সে খেলবে কার সঙ্গে, গল্প করবে কার

সঙ্গে, দোকান পাট করবে কি করে? আপন তাগিদে, আপন প্রয়োজনেই সে অসমীয়া ভাষা শিখে নেবে। জোর করে শেখাতে হবে না। এ শুধু ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। ফলে ভাষারও ক্ষতি, দেশেরও ক্ষতি। জোর খাটাতে গিয়ে রাজ্যের একাংশের মনে অসমীয়া ভাষার প্রতি বিরাগ জন্মিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ মুহূর্তেই গোয়া রাজ্যে কঙ্কনি এবং মারাঠী ভাষায় বিরোধ বেঁধেছে।

মানুষের এমনি বুদ্ধি, যে জিনিস নিত্য ব্যবহার্য তারও সদ্ব্যবহার জানে না। ভাষা জিনিসটা মানুষে মানুষে সংযোগের সেতু, আমরা তাকে করেছি বিচ্ছেদের হেতু। ধর্ম সকলকে ধারণ করবে অর্থাৎ রক্ষা করবে; কিন্তু এখন ধর্মের কোপে পড়লে আর কারো রক্ষা নেই। ভাষা এবং ধর্ম—যে দুটি জিনিস মানুষের সব চাইতে বড় মিত্র, তাই হয়েছে মানুষের সব চাইতে বড় শত্রু। সারা পৃথিবীতে এ দুটি জিনিস যত সংঘাত বাঁধিয়েছে এমন আর কিছুতেই নয়। এ যুগে রাজনৈতিক মতবাদও ঘোরতর সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে, তার কারণ সে মতবাদ ধর্মের আকার ধারণ করেছে। শুধু যদি মত হত তাহলে অনায়াসেই বলতে পারত যত মত তত পথ। কিন্তু মত যখন মতবাদ হয়ে ওঠে তখনই বাদ সাধে।

যাহোক, কথা হচ্ছিল ভাষাবিরোধ এবং ধর্মবিরোধ নিয়ে। ইংরেজ সাহিত্যিক এইচ. জি. ওয়েলস মানব দরদী মানুষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, আমাদের একটি মাত্র দেশ আছে, সে দেশের নাম বসুন্ধরা, একটি মাত্র জাতি আছে, সে জাতির নাম মনুষ্য জাতি। ওয়েলসও তেমনি বলতেন পৃথিবীর সকল মানুষ একই মানব পরিবারভুক্ত। ইয়ুরোপের জেনিভা শহরে দুজনের সাক্ষাৎ। ওয়েলস তিক্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, কোন কোন জাতি সাহিত্য সংস্কৃতি সভ্যতার কৌলীন্য নিয়ে অন্যের থেকে দূরে থাকতে চায়, অথচ সে কৌলীন্য অলীক। ভাষায় চিন্তায় কর্মে মানুষ যদি এক পথের পথিক হত তাহলে সভ্যতার একটা সর্বজনীন চরিত্র গড়ে উঠতে পারত। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছায় বা স্বল্পসংখ্যকের চেষ্টায় সভ্যতার হেরফের হয় না। প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষ জীবনধারা আছে, সে ধারা অনুযায়ী তার সভ্যতার চরিত্র নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন দেশের সভ্যতা বিভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করে। ঐ সব পার্থক্য সত্ত্বেও সকল মানুষ যদি মিলে মিশে থাকতে পারে তাহলেই প্রমাণিত হবে যে মানুষ সুসভ্য হয়েছে। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস।

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সভ্যতার সংজ্ঞাতে আমরা নিজেদের ঠিক সভ্য বলে দাবি করতে পারি নে। ধর্মের নামে গোড়াতেই উপমহাদেশটি ভেঙে

প্রথমে দুখানা পরে তিন খানা হয়েছে। বাকী ভারত ভূখণ্ডটুকু খণ্ড খণ্ড হয়ে আগেই বলেছি ৩৩ খণ্ডে ভাগ হয়েছে। অঙ্গ ছেদন এখনও শেষ হয় নি। আরও উমেদার আছে—গোর্খাল্যাণ্ড ঝাড়খণ্ড উত্তরখণ্ড কিউতে দাঁড়িয়ে। অঙ্গ রাজ্যের সংখ্যা যত বাড়ছে ভারতমাতার অঙ্গ তত অবশ হয়ে আসছে। বহু প্রসবিনী মাতার যে দশা হয় আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সে দশা হবে। এদের ব্যয়ভার বহন করতেই কেন্দ্র ফতুর হবে।

খণ্ড রাজ্য সমূহ অবশ্য ভারত ভূখণ্ডের অংশ হয়েই আছে। কিন্তু দুটি একটি রাজ্য ভারত রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠনে উদ্যত। পাঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায়ের একাংশ পাকিস্তানের আদলে খলিস্তান নামে নতুন এক রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছে। শিখরা যাকে পাঞ্জাবকেশরী বলে গর্ব করে সেই রণজিৎ সিং দুঃখ করে বলেছিলেন—সবই লাল হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ভারতের সবটাই তো প্রায় ইংরেজের কবলে চলে গেল। সারা ভারতকেই নিজ দেশ বলে ভাবতেন, ভালবাসতেন বলেই তাঁর দুঃখ যে আপন দেশ বিদেশের গ্রাসে চলে যাচ্ছে। সেই রণজিৎ সিং-এর দেশবাসীরা এখন বলছে ভারত তাদের দেশ নয় তারা ভারতীয় নয়, এমনকি পাঞ্জাবীও নয়, তারা খলিস্তানী।

খলিস্তানপন্থীরা পাকিস্তানের অবস্থা দেখেও কিছুই শেখেনি। পাকিস্তানের বয়স চল্লিশ হতে চলল। এর মধ্যে প্রায় ত্রিশ বছর কালই কেটেছে ডিক্টেটারের শাসনাধীন অর্থাৎ সে দেশটি এখনও স্বাধীন হয়নি। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের অন্তর্গত থেকে যেটুকু স্বাধীনতা ভোগ করেছে এখন পাকিস্তানবাসীদের সেটুকুও নেই। আরো বিপদের কথা যে আমেরিকা ময়াল সাপের মতো ওকে অর্ধেক গিলেছে। এভাবে আত্মবিক্রয় করতে থাকলে বাকীটুকুও গ্রাস করবে। ভারতবাসীরা সুখে আছে এমন কথা বলছি না। কিন্তু পাকিস্তানের মানুষ ঢের বেশী অশান্তি ভোগ করছে, বিশেষ করে সে দেশের মানবাধিকার সচেতন শিক্ষিত সম্প্রদায়। তাঁরা একান্ত নিরুপায়, সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত।

আত্মীয় বিচ্ছেদ শুধু বেদনাদায়ক নয়, বিপজ্জনক। স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মানুষ সহায়সম্বল শক্তিহীন হয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্নতা যে মানুষকে অসহায় করে সেকথা জেনেও মানুষ আলাদা হতে চায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষের একলা হবার প্রবৃত্তি হচ্ছে তার রিপু। সত্যভাবে মিলিত হবার সাধনাই কল্যাণ। ...স্বতন্ত্র হয়ে থাকলে বঞ্চিত হবে।' এ মুহূর্তে ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলের অধিবাসীই এই রিপুটিকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছে। এটি একটি বিপদের কারণ

হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু শত্রু ওৎ পেতে আছে, রিপুগ্রস্তদের অস্ত্র দিয়ে শলা-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করছে। রিপুগ্রাসে পড়লে রাহুগ্রাসে পড়তে হয় সে বোধ কি তাদের আছে?

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এই যে সংহতিবোধের অভাব, বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রভাব—এসব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। এ-সমস্যা তাঁদেরই সৃষ্টি। একটি আলাদা রাজ্য গঠিত হলে যেসব সুযোগ সৃষ্টি হবে সেসব তাঁরাই ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিতে পারবেন এই প্রলোভনেই নতুন নতুন রাজ্যগঠনের দাবি। নিজ স্বার্থটাই লক্ষ্য, রাজ্যটা উপলক্ষ আর সমগ্র দেশের শুভাশুভ নিতান্তই গৌণ। এই আমাদের শিক্ষিত সমাজ। সত্যি বলতে কি দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়টিই আজ দেশের অন্যতম বৃহত্তম সমস্যা। কেননা এরাই সর্বত্র নানা বিভেদের সৃষ্টি করেছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে বিভিন্ন দলের নেতৃস্থানীয়রা এই শিক্ষিত সমাজের অন্তর্গত। সংহতি নাশের ব্যাপারে আমাদের নেতৃবর্গের অবদান কিছু কম নয়। দুশ বছরের পরাধীনতার পরে দেশ স্বাধীন হল। বিদেশী শাসক এতকাল দেশকে শোষন করেছে। নেতৃস্থানীয়দের এইটুকু বোঝা উচিত ছিল যে এখন একমাত্র কাজ হল, সকলে একযোগে হাত মিলিয়ে দেশ গড়ার কাজে লেগে যাওয়া, দেশের অপুষ্ট দেহকে পুষ্ট করে তোলা। কিন্তু আমাদের নেতৃবর্গ রাজনীতি বলতে বুঝে রেখেছেন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন। রাজনীতির যে একটা গঠনমূলক ভূমিকা আছে সেকথা ভেবে দেখেন নি। এদিকে আন্দোলন চালাতে হলে একটা প্রতিপক্ষ থাকা চাই। পরাধীনতার কালে ইংরেজ শাসক ছিল প্রতিপক্ষ। তার বিরুদ্ধেই আন্দোলন চলে আসছিল। দেশ স্বাধীন হল, ইংরেজ বিদায় নিল। তার স্থলাভিষিক্ত হল কংগ্রেস। আমাদের রাজনীতিবিদদের চোখে এখন কংগ্রেস হল প্রতিপক্ষ। আন্দোলন করতে হবে শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। একে বলে কপি বুক পলিটিক্স কিংবা পলিটিক্স মেড ইজিও বলতে পারেন। শাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার কথা ভুলেও বলেননি। দেশের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা প্রকাশ পায়নি। মমতা তো দূরের কথা, চূড়ান্ত নির্মমতার ব্যাপার ঘটেছে। স্বাধীনতার পূর্বে সকলের মুখেই শোনা যেত—দেশের ধূলিকণাটিও আমার কাছে পবিত্র, মূল্যবান কিন্তু। স্বাধীন হওয়া মাত্র দেখা গেল দেশের কোন জিনিসেরই কানাকড়ির মূল্য নেই। ট্রাম বাস রেলের কামরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে রেল লাইন উপড়ে ফেলে এই দরিদ্র দেশের শত শত কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট করা হয়েছে। তাহলে এই বিরোধিতা কার সঙ্গে? দেশের সঙ্গে? দেশই শত্রু? উল্লেখ করা প্রয়োজন

যে বর্তমানে যেসব রাজ্যে অকংগ্রেসী শাসন চলছে সেখানে কংগ্রেসও ঐ একই বিরোধী আন্দোলনের মহড়া দিচ্ছে, জ্বালাচ্ছে পোড়াচ্ছে। খুব দুঃখের কথা যে আমাদের অপজিশান পলিটিক্স বিন্দুমাত্র ডিগনিটির পরিচয় দেয়নি। মনে রাখতে হবে যে আমাদের পার্লামেণ্টারি ডিমক্রেসি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারি সিস্টেমের অনুগামী। সে দেশে যেমন বলে—হিজ ম্যাজেস্টি'জ গভর্নমেণ্ট তেমনি আবার বলে হিজ ম্যাজেস্টি'জ অপজিশান। শেষোক্ত অর্থাৎ হিজ ম্যাজেস্টি'জ অপজিশন কথাটি শুনলে অনেকেরই একটু হাসি পাবে। কিন্তু আসল ইঙ্গিতটা হল অপজিশানকেও নিয়মতান্ত্রিক হতে হবে, দায়িত্বজ্ঞানহীন হলে চলবে না। আমাদের অপজিশান-এর দায়-দায়িত্বজ্ঞান খুব প্রখর এমন বলা চলে না। আমরা অপজিশান বলতে বুঝি উচ্ছৃঙ্খলাতায় প্রশ্রয়, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি। যদৃচ্ছ ব্যবহারই নিয়মে দাঁড়িয়েছে। ডিসিপ্লিন নামক জিনিসটি সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় নিয়েছে। দেশের জাতির সংহতি সাধে বিনষ্ট হয়েছে! ডিসিপ্লিন হল সিমেণ্টিং ফ্যাক্টর; যে জোড়া লাগায়, সে সংহতি সাধক। ডিসিপ্লিনের অভাবে সমাজের বাঁধনগুলো আলগা হয়ে গিয়েছে, ফলে বৃহৎ দেশের বিভিন্ন অংশ একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে কেন্দ্র থেকে। এরূপ হতে বাধ্য কারণ আমাদের বিরোধী পলিটিক্স কেন্দ্রের সঙ্গে শুধুই শত্রুতার চর্চা করেছে, মিত্রতার চর্চা কখনো করেনি।

সমস্যাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের উচিত এই সর্বনাশা বিরোধিতা ত্যাগ করে জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্যে নিজেদের সংযত করা। কাজ করতে হবে দেশের হয়ে, দলের হয়ে নয়। দলের উর্ধ্বে যাঁরা উঠতে পারেন না দেশ সেবার যোগ্যতা তাঁদের কখনো হবে না। এককালে বাংলাদেশ ছিল বারো ভুঁইয়ার দেশ। এখন সারা ভারতবর্ষই বারো ভুঁইয়ার দেশ। অর্থাৎ আমরা এখনও ফিউডেল যুগেই আছি। ফিউডেল লর্ডদের প্রত্যেকের একটি প্রাইভেট আর্মি থাকত। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের যতই প্রগ্রেসিভ মনে করুন না কেন, আচারে ব্যবহারে তাঁরা প্রত্যেকেই একেকটি সামন্ত নৃপতি। তাঁরা যাকে দল বা আজকের ভাষায় কেডার বলেন, সেটি হল তাঁদের ঐ আর্মি এবং সে আর্মির একমাত্র কাজ হল মারামারি খুনোখুনি। ফলে বারো ভুঁইয়ার দেশ হয়েছে বারোভূতের দেশ। এই ফিউডেল অবস্থাটা এ যুগের কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই গৌরবের কথা নয়।

দেশের জীবনে রাজনৈতিক দল সমূহের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি

সংবাদপত্র সমূহের ভূমিকাও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বলতে বাধ্য হচ্ছি যে উভয় ক্ষেত্রেই ডিগনিটি এবং সোব্রাইটির অভাব। রাজনৈতিক দল ভাবে, আস্ফালনেই বীরত্ব জাহির হয়; সংবাদপত্র ভাবে চাঞ্চল্য সৃষ্টিতেই কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। কোন কোন সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশনা এবং হেডলাইন রচনা দেখলে কখনো কখনো সন্দেহ জাগে জিনিসটা স্বদেশী পাঠকদের জন্য না বিদেশী পাঠকদের জন্য। দেশকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করে দেখাবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস বলে মনে হতে পারে। ভারতের শত্রু চতুর্দিকে, কোন কোন সংবাদপত্রের উপরে বিদেশের পরোক্ষ প্রভাব থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। দেশের ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ থাকবে না, এমন কথা কখনই বলছি না। তবে এখানেই সেই ডিগনিটির প্রশ্ন আসে। লিখবার একটা ভঙ্গি আছে। সংবাদ পরিবেশনের দোষে শুধু যে দেশের সম্ভ্রম হানি ঘটে এমন নয়, সংবাদপত্রটির নিজেরও সম্মান থাকে না। রাজনৈতিক দল এবং সংবাদপত্র উভয়েই অতি মাত্রায় মুখর, সেজন্যেই সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে জাতীয় সংহতি নষ্ট হতে পারে এমন কোন কথা অসতর্কভাবে কখনো উচ্চারণ করা উচিত নয়।

এই সংকট কালে যখন জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি বিপন্ন তখন দেশ অভিভাবকহীন। এক সময় জাতির জনকরূপে গান্ধীজী ছিলেন দেশের মস্ত বড় আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন জাতির অভিভাবক স্বরূপ। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে দ্য গ্রেট সেন্টিনেল আখ্যা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সদা জাগ্রত প্রহরীর ন্যায় আমাদের সকল ভুল ভ্রান্তির প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। করেছেনও। দেশের যে কোন বৃহৎ এবং বিতর্কিত ব্যাপারে তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। আজ এ জাতীয় দেশবরেণ্য কোন ব্যক্তিত্ব দেশে নেই। বিরাট ব্যক্তিত্বের যেখানে অভাব সেখানে দেশের ইণ্টেলেকচুয়েল সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে। ব্যক্তির অভাব সমষ্টিকে গ্রহণ করতে হয়। সাধারণ কথায় বুদ্ধিজীবী বলতে যা বোঝায়, আমি ইনটেলেকচুয়েল বলতে তার চাইতে কিছু বেশি বোঝাতে চাই। বুদ্ধিজীবীরা নিঃসন্দেহে বুদ্ধির সাহায্যেই জীবন ধারণ করেন, কিন্তু সে বুদ্ধি সব সময়ে শুভবুদ্ধি নাও হতে পারে। সেজন্যে ইনটেলেকচুয়েল বলতে আমি বুঝি এমন মানুষ যিনি একাধারে মস্তিষ্কবান এবং চরিত্রবান। দেশে এরূপ মানুষের অভাব হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তবে তাঁরা যে আছেন তা টের পাওয়া যায় না। আমাদের রাজনীতিবিদরা এবং সংবাদপত্র সেবীরা যেমন সরব, আমাদের ইনটেলেকচুয়েলরা আবার তেমনি নীরব। তাঁরা যদি discretion-কেই better part of valour বলে মনে করে

থাকেন তাহলে একে বলতে হবে ইনটেলেক্টের শোচনীয় অপচয়। এখানেই ঘটছে আমাদের পরাভব—দেশের মস্তিষ্ক যা বোঝে, দেশ মুখ ফুটে তা বলে না।

প্রেস বা সংবাদপত্রকে বলা হয়েছে ফোর্থ এস্টেট; আমি ইনটেলেকচুয়েলদের বলি দেশের ফিফ্‌থ এস্টেট। অপর চারটি এস্টেটের ন্যায় তাঁরা এক প্রচণ্ড শক্তির উৎস। সমষ্টিগতভাবে সমাজকে নেতৃত্ব দেবেন তাঁরাই। রাজনীতিকে হঠকারিতা থেকে, সংবাদপত্রকে বাচালতা থেকে নিবৃত্ত করবেন, দেশের যুব শক্তিকে সকল প্রকার অসাধু প্রবণতা থেকে বিরত রাখবেন, সকলকে সংযত করবেন। শিক্ষার নামে দেশময় কুশিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, তাঁরা একে রোধ না করলে কে করবে? আজ যাকে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা বলছি তা কুশিক্ষার ফল। পাঞ্জাব আন্দোলনের স্বদেশী কুশীলবরা প্রধানত ছাত্র সম্প্রদায়, আসামেও ছিল তাই। শিক্ষাটা যদি সুস্থ ধরনের হত তা হলে এ জাতীয় আন্দোলন হতে পারত না। শিক্ষা মানুষের আত্মীয়বোধকে প্রসারিত করে—আপন পরিবার-পরিজন ছাড়িয়ে পাড়া-প্রতিবেশীতে, প্রতিবেশী ছাড়িয়ে নিকটস্থ লোকালয়ে, লোকালয় ছাড়িয়ে চতুষ্পার্শস্থ অঞ্চলে, অঞ্চল অতিক্রম করে গোটা রাজ্য, রাজ্য ছাড়িয়ে সমগ্র দেশে এবং দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে। শিক্ষিত মনের কাছে কেউ অনাত্মীয় নয়। ভৌগোলিক সীমানা যেমন ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি জাতি ধর্ম ভাষার বৈষম্যও আত্মীয়তা বিনষ্ট করতে পারে না।

ভূগোল জিনিসটা মানুষের প্রগলভতার সৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, দুই ভাই মাপ জোক করে জমি ভাগ করে বলে—এ ভাগ আমার, ঐ ভাগ তোমার—শুনে ভগবান হাসেন। অর্থাৎ কার জমি, কে ভাগ করে। আমরাও তেমনি দেশ ভাগাভাগি করছি মাপ জোক করে সীমানা বেঁধে দিচ্ছি। আমাদের মূর্খতা দেখেও ভগবান তো বটেই, পৃথিবীসুদ্ধ মানুষও হাসছে। অথচ সেই কত কাল আগে এ দেশের মানুষই (শংকরাচার্য) বলেছিলেন, সমস্ত ত্রিভুবনই আমার স্বদেশ, ভাগাভাগির কোন প্রশ্নই নাই। তাহলেই দেখুন, বিশ্বভুবন যাঁর স্বদেশ, বিশ্বমানবের সঙ্গে তাঁর সৌভ্রাত্র। সে কথা বলেছেনও—ভ্রাতরো-মানবাঃ সর্বে। সকল মানুষই আমার ভাই।

ভাবুন একবার, কোথা থেকে কোথায় নেমে এসেছি আমরা। এখন দুটি ভাই একসঙ্গে থাকতে পারে না। দুই পাঞ্জাবী—একজন শিখ আরেকজন হিন্দু হলে, একজন আরেকজনের কাছ থেকে প্রাণ ভয়ে পালায়। ছোট মন নিয়ে বড় ঘরে থাকা যায় না। মনকে উদার করতে হবে, দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে

হবে, ভ্রাতৃত্বের ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। সে কাজ কে করবেন? রাজনৈতিক নেতারা ঠিক এর উল্টোটি করছেন। তাঁরা বলছেন, অন্য দলভুক্ত ব্যক্তি যদি তোমার সহোদর ভ্রাতাও হয় তা হলেও তাকে বিশ্বাস করবে না, তাকে শতহস্তেন দূরে রাখবে। আমাদের বর্তমান পলিটিক্সের মস্ত বড় অবদান হল, দেশ থেকে ভ্রাতৃ-বন্ধনের উচ্ছেদসাধন।

আজকের এই ভ্রাতৃবিরোধের দিনে বঙ্গবাসী অনেকেরই মনে পড়বে আজ থেকে আশি বছর আগে এ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলা দেশে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল বাঙালী সন্তানকে ঐক্যসূত্রে যুক্ত করবার উদ্দেশ্যে একটি সৌভ্রাত্র উৎসবের প্রবর্তন হয়েছিল। প্রবর্তক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। দেশ বিভাগের সর্বপ্রথম চেষ্টা হয়েছিল সেই তখন। ইংরেজ সরকার দুষ্ট অভিসন্ধি নিয়ে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল বাঙালী জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করার উদ্দেশ্যে। প্রতিবাদ জানিয়েছিল গোটা বাঙালী জাতি। সে প্রতিবাদে অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রতিবাদ জ্ঞাপনের এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫) তারিখে বঙ্গদেশ খণ্ডিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তার আগেই দেশবাসীর কাছে এই আবেদন জানিয়েছিলেন—"আগামী ৩০শে আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা খণ্ডিত হইবে। কিন্তু বিধাতা যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই, তাহাই বিশেষ রূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালির রাখিবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রা বর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখি বন্ধনের মন্ত্রটি এই: ভাই ভাই এক ঠাঁই।"

প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে খণ্ডিত বাংলার উভয় অংশেই উৎসবটি প্রতিপালিত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কলকাতায় প্রথম রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানের অতি রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়েছেন। যতদিন না বঙ্গভঙ্গ রদ হল, দুই বঙ্গ আবার এক হল ততদিন ঐ উৎসব নিয়মিত ভাবে চলেছিল। বাঙালীর ইতিহাসে রাখিবন্ধন উৎসব এক জয়যুক্ত এবং গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উত্তর পশ্চিম ভারতে রাখি বন্ধন উৎসবটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত, এখনও চলছে। প্রতি বৎসর শ্রাবণ পূর্ণিমাতে এটি অনুষ্ঠিত হয়। তাঁরা বলেন রক্ষা বন্ধন। আত্মীয় বন্ধুর কল্যাণ কামনায় একে অন্যের হাতে রাখি পরিয়ে দেন। বাংলা দেশে এ উৎসব ছিল না।

রবীন্দ্রনাথই বঙ্গদেশে এ উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন দেশের সকল মানুষকে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে।

শ্রাবণ পূর্ণিমা আবার এসেছে, ৩০শে আশ্বিনও অদূরে। বাঙালীর রাখি বন্ধন একদা বঙ্গভঙ্গকে রদ করেছিল: আজ ভারত ভঙ্গের উপক্রম দেখা দিয়েছে। এই বিষম বিপদের মুহূর্তে, ভ্রাতৃবিচ্ছেদের মহাপাতক থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আজ সারা ভারতে রাখিবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপন করার সময় এসেছে। ভারত মহাদেশকে সমগ্র জাতিকে উদ্দীপিত করতে পারেন এমন সর্বভারতীয় নেতা আজ দেশে নেই। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রেরণাদাতাও আজ নেই। দেশে এখন বৎসরব্যাপী রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মোৎসব পালন করছে। এবারকার জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে এবার-কার রবীন্দ্রোৎসব জাতীয় সংহতি বৎসররূপে পালিত হোক। আগামী ৩০শে আশ্বিন যদি সর্বভারতে রাখিবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়, প্রত্যেক ভারতীয় যদি একে অন্যের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে রাখি-সংকল্পটি গ্রহণ করে—ভাই ভাই, এক ঠাঁই তাহলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিও যথার্থ সম্মান প্রদর্শিত হবে, জগৎ সমক্ষে জাতি হিসাবে আমাদেরও সম্মান বর্ধিত হবে।

স্বাধীনতা-হীনতায়

আমাদের কবি বলেছিলেন—স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়? একালের রীতি অনুযায়ী এটিকে যদি তখন স্লোগান হিসাবে ব্যবহার করা হত তাহলে সপ্ত কোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদে উচ্চারণ করত, কেউ নয়, কেউ নয়। ব্রুটাস-এর প্রশ্নের জবাবে রোমান মব্ যেমন সমস্বরে চেঁচিয়েছিল—নান্ ব্রুটাস নান—ঠিক তেমনি। বন্দুকের ঘোড়া টিপলেই যেমন দুম দাম গুলি বেরোতে থাকে স্লোগানের ধ্বনি তুললেও তেমনি তারস্বরে বুলি বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে স্বাধীনতা পদার্থটি কি তখন আমাদের জানা ছিল না বলেই তাকে আমরা সর্বরোগহর বটিকা বলে মনে করতাম, ভাবতাম সেবন মাত্র সর্ব রোগের আরাম হবে। বহু অন্ধ সংস্কারে জীর্ণ আমাদের মন; তাগা তাবিজ ধারণ করে আমরা রোগমুক্তি বিপদমুক্তি কামনা করেছি। স্বাধীনতাকে দেখেছি তাবিজের মতো, ভেবেছি ওটি ধারণ করা মাত্র আমাদের সমস্ত অভাব অনটন দূর হয়ে যাবে, দুঃখ দুর্দশার অবসান হবে।

স্বাধীনতা লাভ হয়েছে আজ সাতাশ বছর হল। এত দিনে আমাদের এই দিব্যজ্ঞান জন্মেছে যে, স্বাধীনতা in itself একটা মহৌষধ নয়। এটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ জিনিসও নয়। স্বাধীন মানুষ স্বাধীনতাকে কিভাবে ব্যবহার করবে তার উপরেই নির্ভর করবে তার সার্থকতা। সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে না পারলে স্বাধীনতা হিতের চাইতে অহিত করবে বেশি। স্বাধীনতার মধ্যে একটি স্বাভাবিক সংযম বোধ আছে। স্বাধীনতার মর্ম যিনি বুঝেছেন তিনি জানেন যে একের স্বাধীনতা যদি অপরের স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে তাহলে কারো স্বাধীনতাই অক্ষুণ্ণ থাকে না। স্বাধীন মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থের চাইতে সমষ্টিগত স্বার্থকে বড় করে দেখে। সেজন্যে যথার্থ স্বাধীন সমাজে স্বার্থের সংঘাত স্বাভাবিক ঘটনা নয়, প্রাত্যহিক ব্যাপারও নয়। আমাদের দেশে যে এমন অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, স্বার্থবোধ এমন উদগ্র আকার ধারণ করেছে তাতেই প্রমাণ যে, আমরা যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করিনি। সত্যি বলতে কি, এখন আমরা আগের চাইতে ঢের বেশি পরাধীন। আগে ইংরেজের অধীন ছিলাম, এখন চোর জোচ্চোর, ঘুষখোর মুনাফাখোর, মজুতদার ঠিকাদারী, ভেজালকারী চোরাকারবারী—সকল প্রকার অনাচারী স্বেচ্ছাচারীর অধীনতা

স্বীকার করে নিতে হয়েছে। সম্পূর্ণ অরাজকতা—কে কোথায় সুযোগ বুঝে কার ভাগে ছোঁ মারবে তার ঠিক নেই। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, কেউ নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। আসল কথা, দেশসুদ্ধ মানুষ স্বাধীনতাকে একটা প্রকাণ্ড ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেছে। শুধু ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নয়, সকলে—মন্ত্রী যন্ত্রী, সিপাই সান্ত্রী, হাকিম আমলা, মাস্টার কেরানী সকলে। কেউ বাদ যান না, তবে এঁরা হলেন খুচরো কারবারী। পাইকারি ব্যবসাদার রাজনৈতিক নেতারা। তাঁদের মধ্যে একদল নেতৃত্ব রক্ষার অপর দল মন্ত্রিত্ব রক্ষার ব্যবসা করছেন। এই দেশব্যাপী বিরাট ব্যবসার মধ্যে রাজনীতির টানা-পোড়েন অনেকখানি। আর সে ব্যবসার প্রধান পণ্য হল দেশের অসহায় দরিদ্র জনপ্রাণী।

বিদেশী শাসককে লোকে সমীহ করত, দিশী শাসককে করে না। বিদেশী শাসক আর কিছু না বুঝুক স্বদেশের স্বার্থ বুঝত। তারা এ দেশকে শোষণ করে নিজ দেশের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। দিশী শাসকরা স্ব স্ব স্বার্থ যতখানি বোঝেন, দেশের স্বার্থ ততখানি নয়। একথা নিশ্চিত যে তাঁরা দেশবাসীকে স্বদেশী শোষণ থেকে রক্ষা করতে পারেননি। বিদেশী আমলে সেদিনকার নেতৃবৃন্দ স্বার্থত্যাগের দ্বারা দেশবাসীকে স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পরে বর্তমান নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে একমাত্র স্বার্থচিন্তা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে শেখান নি। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যেমন, স্বাধীনতা রক্ষার জন্যেও যে তেমনি স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন আছে সে কথা তাঁরা ভুলেও কখনো উচ্চারণ করেন না, পাছে জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। ফলে পাওনা গণ্ডা উশুল করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবনই বর্তমান রাজনীতির একমাত্র ক্রিয়া কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চিরকাল বুলি আউড়িয়ে আমরা অভ্যস্ত। স্বাধীনতা মানুষ মাত্রেরই birth right—এই বলে তারস্বরে চিৎকার করেছি। কখনো ভেবে দেখিনি যে স্বাধীনতা কেউ জন্মের অধিকারে লাভ করে না, যোগ্যতার অধিকারে লাভ করে। স্বাধীনতার সুফল লাভ করতে হলে আগে দেশবাসীকে তার যোগ্য হতে হবে। অযোগ্যের হাতে পড়লে উৎকৃষ্ট জিনিসকেও অতি নিকৃষ্ট কাজে ব্যবহার করা হয়। স্বাধীনতা যখন আমাদের হাতে এল তখন তাকে স্থির মস্তিষ্কে গ্রহণ করবার যোগ্যতা আমরা লাভ করি নি। স্বাধীনতা সংগ্রাম আরো দীর্ঘায়িত হলে ক্রমে সেই যোগ্যতা অর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারত। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিপন্ন বিড়ম্বিত ইংরেজ তখন নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। সাম্রাজ্যলোভ ত্যাগ করে রাজ্যভার আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে সাত তাড়াতাড়ি

সে ঘরে ফিরে গেল। সংগ্রাম করে, জয় করে পাওয়া স্বাধীনতাই খাঁটি স্বাধীনতা। দান হিসাবে পাওয়া স্বাধীনতার স্বত্বটুকু বাদ পড়ে যায়, ফলে অধীনতাটি পূর্ববৎ থেকেই যায়।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলে আসছিল তা অনেক বেশি broad based ছিল। কেবলমাত্র শাসন ক্ষমতা হস্তগত করাই তার উদ্দেশ্য ছিল না। গান্ধীজী যে আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন তাকে প্রকৃত পক্ষে বলা যেতে পারে স্বাধীনতার প্রস্তুতি পর্ব। তিনি তাঁর আন্দোলনের যে কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিলেন তাতে এমন সব বিষয়ের উল্লেখ ছিল আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীনতার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ আছে বলে মনে হবে না। সে সব বিষয়ের মধ্যে প্রধান ছিল হিন্দু মুসলীম ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন এবং দেশের চল্লিশ কোটি মানুষকে এক সূত্রে বাঁধবার জন্যে হিন্দুস্থানীকে সর্বজনীন ভাষা হিসাবে গ্রহণ (আত্মীয়তার ভাষা হিসাবে, শাসন পরিচালনার ভাষা নয়)। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের কথা যেমন বলেছেন তেমনি আবার মাদক দ্রব্য বর্জনের কথাও বলেছেন। নয়ী তালিম বা নতুন শিক্ষা বিধিরও প্রবর্তন করেছিলেন। বহুবিধ ডিসিপ্লিনের মধ্য দিয়ে তিনি দেশবাসীকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর অনুচরদের মধ্যে অনেকেই মনে মনে অধৈর্য বোধ করেছেন। তাঁরা মনে করতেন, স্বাধীনতার ব্যাপারে এসব জিনিস অবান্তর। শাসন ক্ষমতা হাতে এলে এসব কাজ আপসে এবং অনায়াসে সম্পন্ন হবে। নেতাদের মধ্যে কেবলমাত্র গান্ধীজী এবং সুভাষ বোসই বলতেন—frist things frist—আগের কাজ আগে করে নিতে হবে। পথ তৈরি করে না নিলে পথে বসতে হয়। এখন যেমন হয়েছে। অত্যাবশ্যক জিনিসগুলি সবই অনাবশ্যক বিবেচিত হচ্ছে। স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, দেশের যে অংশটুকু আমরা নিজের হাতে গড়ে তুলব সেটুকুই আমাদের নিজের অধিকারে আসবে। বিদেশীর হাত থেকে নিজের দেশকে এভাবে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে নিতে হবে। এরূপ কার্যে অসীম ধৈর্য, শ্রম এবং নিষ্ঠার প্রয়োজন। কাজেই তাঁর কথায়ও কেউ কর্ণপাত করেনি। এখন তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। অদূরদর্শী নেতৃবৃন্দ নিজেরা নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হননি। দেশকেও স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করতে পারেননি। দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য অর্বাচীন নেতৃত্বই প্রধানত দায়ী।

সাতাশ বছরের অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের এই জ্ঞান লাভ হয়েছে যে

পরাধীনতার অবসান হলেই দেশ স্বাধীন হয় না। আবার দেশ স্বাধীন হওয়াই যথেষ্ট নয়, দেশটিকে সুসভ্য হতে হবে। আজ আমরা যে সমাজে বাস করছি তাকে কেউ সুসভ্য সমাজ বলবে না। বলতে লজ্জা হয় যে বিদেশী শাসনেও আমরা যেটুকু সভ্যতা ভব্যতা রক্ষা করে চলতে পেরেছি, আজকে তাও পারছি না। বিদেশী শাসন কোন মতেই কাম্য নয়। শাসনের চাইতে শোষণের দিকে অধিকতর নজর থাকে বলে বিদেশী শাসন কখনই সুশাসন হতে পারে না। তবে একথাও বলব, বিদেশী শাসনের চাইতেও খারাপ, অক্ষমের শাসন। বিদেশী আমলে যেটুকু বা আমাদের স্বাধীনতা ছিল অক্ষমের শাসনে সেটুকুও এখন নেই। আগে পথে ঘাটে রেলে স্টীমারে লোকে নিশ্চিন্ত হয়ে চলা ফেরা করতে পারত। এখন দিন দুপুরে রেলের কামরায় ছোরা দেখিয়ে যাত্রীদের টাকা পয়সা মাল পত্র লুট করে নিচ্ছে। রাস্তায় ঘাটে রাহাজানী লেগেই আছে। চুরি ডাকাতি, খুন খারাপি আগেও হত; কিন্তু এখন তার সংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘরে বাইরে কোথাও মানুষের নিরাপত্তা নেই। গরীব দেশ, অর্ধেক মানুষ না খেয়ে থাকত, এখনও তাই থাকে। কিন্তু এখন যা হয়েছে, পয়সা থাকলেও মানুষ খেতে পরতে পাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। কারণ ব্যবসাদাররা এমন অত্যাশ্চর্য vanishing tricks শিখে নিয়েছে, যে কোন সময়ে যে কোন দ্রব্য বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। এসব ব্যাপার এমন হামেশা ঘটছে, মনে হয় এটাই নিয়ম। কোন জিনিস অল্পায়াসে কোথাও পাওয়া গেলে লোকে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে। ও মশায় শুনছেন একটু কষ্ট করে অমুক জায়গায় গেলে পাঁউরুটিও পেয়ে যেতে পারেন। শিশু তার খাদ্য থেকে বঞ্চিত, ওদিকে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল শত শত বেবী ফুড-এর টিন কোন ব্যবসায়ীর গুদামে সঞ্চিত। ভেজাল ইনজেকশন প্রয়োগে হাসপাতালে বহু সংখ্যক রোগীর মৃত্যু ঘটেছে। ভেজাল কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু কারখানার মালিকের ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে এমন খবর আমরা আজ পর্যন্ত শুনিনি। যে দেশে কোন প্রকার শাসন ব্যবস্থা আছে সে দেশে এমন সব ব্যাপার ঘটতে পারে এরূপ কল্পনা করাও কঠিন। দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা মানে সকল প্রকার বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রণের অপসারণ, যার যেমন ইচ্ছা ব্যবহারের অবাধ অধিকার।

যুগের পরিবর্তনে পূর্বেকার বহু ধ্যান ধারণা বদলে যাচ্ছে। স্বাধীনতা সম্পর্কে মানুষের মনে এক কালে যে মোহ ছিল মনে হয় অচিরে তা লোপ পাবে। আবার পরাধীনতাকে মানুষ যতখানি ঘৃণা করে এসেছে ভবিষ্যতে ততখানি ঘৃণা নাও করতে পারে। স্বাধীনতা কথাটার সংজ্ঞা যাবে বদলে।

যে শাসনাধীনে মানুষ মনুষ্যোচিত জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে অর্থাৎ যেখানে সুসভ্য জীবনের সকল অধিকার বজায় থাকবে তাকেই বলা হবে স্বাধীনতা এবং স্বশাসন দিশী কিংবা বিদেশী সে প্রশ্ন ভবিষ্যতে উঠবে না। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর যুবক যে ধ্বনি তুলছেন—চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান—সেটা শুনতে উদ্ভট শোনালেও বুঝতে হবে যে এর মূলে আছে স্বাধীনতার ঐ নতুন সংজ্ঞা। তবে চীনের সকল মানুষ স্বাধীনতার পূর্ণ মর্যাদা ভোগ করতে পারছেন কিনা সেটি আগে সঠিক ভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। এ কথা ঠিক যে, যে শাসনে মনুষ্যোচিত জীবন যাপন অসম্ভব সে শাসন ষোল আনা স্বদেশী হলেও লোকে তাকে পরাধীনতা ছাড়া আর কিছু বলবে না। স্বাধীনতা সভ্যতার মাপযন্ত্র। কোন্ জাতি কতখানি স্বাধীনতার অধিকারী হয়েছে এবং সুষ্ঠভাবে তার ব্যবহার করতে পারছে তাই দিয়ে তার সভ্যতার পরিমাণ। আমাদের স্বাধীনতার নমুনা দেখেই যেমন আমাদের বর্তমান সভ্যতার দুরবস্থা অনুমান করা যায় তেমনি অন্যান্য দেশের বেলায়ও। মনে প্রশ্ন জাগে মানুষের সভ্যতা অগ্রগতির দিকে না অধোগতির দিকে। সম্প্রতি একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনে বিশেষ করে যুব সমাজে যে শোচনীয় অধোগতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলেছেন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অসাধুতা জাতীয় চরিত্রের ভিত ক্ষইয়ে দিচ্ছে। আমেরিকার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। সেখানে দুর্নীতি উচ্চতম পর্যায়ে। আমেরিকা আজ সমস্ত পৃথিবীকে corrupt করছে। নীতিহীনতা স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দিয়ে স্বাধীনতাকে খর্ব করে। আবার স্বাধীনতাকে যদি বলি সভ্যতার ভিত তাহলে বলতে হবে আমেরিকা সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতাকেই বিপন্ন করে তুলেছে। মুনাফালব্ধ ধনে আমেরিকার সমৃদ্ধি। সে মুনাফার উদ্বৃত্ত সে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘুষের আকারে। আমরা যাকে বলি developing countries বা উন্নতিকামী দেশ তারা আসলে ঘুষের ধনে পোদ্দারি করছে। কার্যত কিন্তু সে অর্থ গিয়ে জমা হচ্ছে সেই সেই দেশের মুনাফাখোরদের হাতে। সেগুলো সেখানে বিস্ফোটক হয়ে আছে, একদিন ফাটবে। আমরা জীবাণু যুদ্ধের কথা শুনেছি। আসল জীবাণু এই ভিক্ষালব্ধ অর্থ। এই অর্থই সকল অনর্থের বীজ হয়ে সমাজে পচন ধরিয়ে দিচ্ছে। এ গেল স্বাধীনতার এক জাতীয় বিকৃতি; আবার অপর দিকটাও দেখুন। কোন দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যদি বলেন—আমার মনের কথা আমি খুলে বলতেও পারছি না, লিখতেও পারছি না; দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরও যদি সেই অবস্থা হয় তাহলে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন

আগে—সে দেশের মানুষ কি স্বাধীন? এবং যে দেশের মানুষ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করতে পারে না সে দেশকে কি সুসভ্য বলা চলে? সে জন্যেই প্রশ্ন তুলেছিলাম বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মানুষের সভ্যতা কি অগ্রগতির দিকে না অধোগতির দিকে।

যাক্, যে কথা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম সে কথাতেই আবার ফিরে আসছি। স্বাধীনতা-হীনতা কথাটি বড় অর্থবহ। সকলেই জানেন কবিদের কথায় অনেক সময় different layers of meaning প্রচ্ছন্ন থাকে। কালক্রমে সেই প্রচ্ছন্ন অর্থ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার মধ্যেও কতখানি হীনতা লুক্কায়িত থাকতে পারে এতদিনে তা বিলক্ষণ উপলব্ধি করা যাচ্ছে। কবিবাক্যটি এতদিনে আমার কাছে সুস্পষ্ট অর্থে প্রতিভাত হল। পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ এতখানি অসাধু অসচ্চরিত্র হৃদয়হীন ছিল বলে আমি মনে করি না। আমাদের জীবনের অর্ধেকেরও বেশি কাল পরাধীন ভারতেই কেটেছে। কিন্তু এমন সর্বব্যাপী অসাধুতা, সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতির এতখানি বিস্তার, মুনাফা লোভের এমন নির্লজ্জ প্রকাশ পরাধীনতার যুগে কখনো ঘটে নি। জাতীয় চরিত্রের এমন অধঃপতন ইতিপূর্বে কখনো ঘটেছে বলে মনে হয় না। বলা বাহুল্য এ অপবাদ থেকে আমরা কেউ বাদ পড়ছি না। বুকে হাত দিয়ে আজ দেশের ক'জন লোক বলতে পারবেন তাঁরা সাধু ব্যক্তি। নিজে হয়তো অসাধু কাজ করছেন না, কিন্তু চোখের সুমুখে চতুর্দিকে নিত্য যে অসাধুতা চলছে তার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ কোথায়? অবস্থাটাকে আমরা মেনে নিয়েছি অর্থাৎ প্রকারান্তরে সায় দিয়ে যাচ্ছি। তার দ্বারা আমাদের অসাধুতাই প্রমাণিত হচ্ছে। গ্লানি-বোধ বলে একটা জিনিস আছে, সেটা থাকলে তবু মনুষ্যত্বের মান থাকত। একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন আত্মধিক্কারের কথা—

বার বার আত্মপরাভব কত
দিয়ে গেছে মেরুদণ্ড করি নত;
কদর্যের আক্রমণ ফিরে ফিরে
দিগন্ত গ্লানিতে দিল ঘিরে।
মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে
ছুটিনি করিতে প্রতিকার—
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।

সেই ধিক্কার বোধ আমাদের ক'জনের মনে আছে? থাকলে অন্তত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া যেত।

বাঙালী মস্তিষ্ক ও তার অ-ব্যবহার

আমার বালক বয়সে আমার পিতৃদেবের পুস্তক সংগ্রহের মধ্যে একখানি অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা দেখেছিলাম। নাম—'বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার'—রচয়িতা প্রফুল্লচন্দ্র রায়। অল্প কয়েক পাতায় সমাপ্ত অনতিদীর্ঘ একটি প্রবন্ধ, মূল্য এক আনা। প্রবন্ধটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল 'সুপ্রভাত' নামক তৎকালীন খ্যাতনামা মাসিক পত্রিকায়—১৩১৬ (১৯০৯) সালের শ্রাবণ সংখ্যায়। স্বনামধন্য কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র (পরে বসু) ছিলেন উক্ত পত্রিকার সম্পাদিকা। স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা এবং প্রবন্ধও ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অরবিন্দের 'কারা-কাহিনী'ও সুপ্রভাতে'র পাতাতেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হত। প্রফুল্লচন্দ্রের যে প্রবন্ধটির কথা বলেছিলাম—'সুপ্রভাত'-এ প্রকাশের বৎসরকাল পরে সেটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে তৎকালীন খ্যাতনামা প্রকাশন সংস্থা সিটি বুক সোসাইটি—'Bengali Brain and its Misuse' নাম দিয়ে এর একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিল। প্রফুল্লচন্দ্র তখনো আচার্য নামে খ্যাত হননি, দেশজোড়া নামও হয়নি, তথাপি দেখা যাচ্ছে বাংলা এবং ইংরেজিতে পুস্তকাটির বহুল প্রচার হয়েছিল এবং দেশের শিক্ষিত সমাজে প্রবন্ধটি যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে লেখা ঐ প্রবন্ধটি সম্প্রতি আবার হাতে এসে পড়েছিল। প্রবন্ধটি নতুন করে আবার পড়ে মনে হল শতাব্দীর প্রথম দশকে শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তায় ভাবনায় যে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং স্বদেশপ্রেমিক বিজ্ঞানীকে উদ্বিগ্ন করেছিল। আজকের বাঙালীর চিন্তায় কর্মে চরিত্রে সেই শিথিলতা ঢের বেশী শোচনীয় আকারে দেখা দিয়েছে। চিন্তার শৈথিল্য জাতিকে যতখানি দুর্বল করে এমন আর কিছুতে নয়।

প্রফুল্লচন্দ্র যখন তাঁর প্রবন্ধটি রচনা করেন তখন এদেশে ইংরেজি শিক্ষার শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে শিক্ষিত সমাজের ভাবনা চিন্তার বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। আমাদের বিশ্বাসপ্রবণ মনকে ইংরেজি শিক্ষা ধীরে ধীরে যুক্তিপ্রবণ করে তুলেছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে যে সমাজ বলে এসেছে—বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর—স্পষ্টতই বোঝা যায় সে

সমাজে যুক্তি তর্ককে খুব একটা আমল দেওয়া হয়নি। প্রচলিত ধ্যান ধারণা সংস্কার, বিশ্বাস, আচার বিচার, স্বাধীন চিন্তার পথ বলতে গেলে বন্ধ করে দিয়েছিল। আমাদের সংস্কার-শাসিত মনে সংশয়ের বীজ বপন করেছিল শিক্ষা। নব্য-শিক্ষিতরা প্রতি পদে প্রশ্ন করে তর্ক করে বলতে লাগল—যা যুক্তি-গ্রাহ্য নয় তা কখনও বিশ্বাসযোগ্য নয়। বাড়াবাড়ি এক আধটু অবশ্যই ঘটেছিল: তাহলেও স্বীকার করতেই হবে অন্ধ বিশ্বাস এবং নানা সংস্কারের জাল থেকে মুক্ত করে দেশের অগ্রগতির পথকে তাঁরা অনেকাংশে বাধামুক্ত করেছিলেন।

ইয়াং বেঙ্গল বা নব্য বঙ্গ যখন সংস্কার প্রয়াসে ব্যস্ত তখন দেশে এক মস্ত বড় ঘটনা ঘটল। সেটি সিপাহী বিদ্রোহ। বিদ্রোহ যদিচ সিপাহীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, জনসাধারণ তাতে যোগ দেয়নি, তথাপি বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সমস্ত দেশেই এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হল। সংস্কার মুক্তির চাইতে ঢের বেশী জরুরী হয়ে দেখা দিল স্বদেশ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এক সময়ে যাঁরা সাহেবিয়ানার মহড়া দিয়েছেন তাঁরাও স্বদেশীয়ানার দিকে ঝুঁকলেন। নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে স্বদেশী ভাবাপন্ন একটি সম্প্রদায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠল। সর্বপ্রথম যেখানে তাঁরা মিলিত হলেন তার নাম হিন্দু মেলা। উনিশ শতকের ষাটের দশকে এর জন্ম। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সর্বপ্রধান রাজনারায়ণ বসু, পৃষ্ঠপোষক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। হিন্দু মেলা প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী মেলা, তবে উদ্দেশ্য যতখানি রাজনৈতিক ততখানি সাংস্কৃতিক। পরিবেশটি অতি সুন্দর—মার্জিত রুচিসম্মত সুষমামণ্ডিত। এটিকেই বলা চলে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী সংস্থা। শিক্ষিত বাঙালী স্বাদেশিকতার দীক্ষা লাভ করেছিল হিন্দু মেলার কাছ থেকে। স্বাদেশিকতা বলতে দেশকে চেনা, জানা, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শেখা। এক কথায় দেশকে নতুন করে আবিষ্কার করা। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দেশ বলতে বাঙালী শুধু বাংলা দেশের কথা ভাবেনি, সমগ্র ভারতবর্ষের কথাই ভেবেছে। স্বাদেশিকতার প্রথম উন্মেষেই বাঙালী নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিয়েছেন। স্বদেশী সংগীতের সৃষ্টি হিন্দু মেলায়। প্রথম এবং প্রধান সংগীতটি—"মিলে সবে ভারত সন্তান একতান মনপ্রাণ গাও ভারতের যশোগান"। অন্য যে সব গান রচিত হয়েছিল তারও প্রত্যেকটিতে ভারত বন্দনা। বাঙালীই সর্বপ্রথম ভারতীয় নাগরিক হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়েছে। এর কুড়ি বাইশ বছর পরে যখন কংগ্রেসের জন্ম হল, বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত সমাজে সেই তখনই প্রথম ভারতবোধের উন্মেষ দেখা দিল। বাঙালীই এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শক। ভারত পথের প্রথম দিশারী ভারতপথিক রামমোহন। তিনিই সর্বপ্রথম সমগ্র

ভারতের হয়ে কথা বলেছেন। রামমোহন গত হয়েছেন দেড়শত বৎসর পূর্বে। আজ রামমোহনের স্বজাতীয় বাঙালী নতুন আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে—'আমরা বাঙালী' অর্থাৎ আমরা যে ভারতীয় সেটিকে অগ্রাহ্য করতে হবে। এটা কি প্রগতির লক্ষণ না অধোগতির লক্ষণ?

সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ১৮৮৫ সালে। প্রথম সভাপতি বাঙালী। গোড়ার দিকে কংগ্রেসে বাঙালী প্রাধান্য কতখানি ছিল তার প্রমাণ প্রথম পঞ্চাশ বাহান্নটি অধিবেশনে এক তৃতীয়াংশ সভাপতিই বাঙালী। বলে নেওয়া ভালো, সে কংগ্রেস ছিল জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের একটি মঞ্চ। সংগ্রামী মনোভাব তখনো দেখা দেয়নি। কংগ্রেসকে সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করলেন গান্ধীজী তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯২০-২১ সালে। কিন্তু দেশে বিদেশী সরকারের সঙ্গে সম্মুখ সমর শুরু হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগেই এবং তার জন্ম হয়েছিল এই বাংলাদেশে। মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫) কংগ্রেস নেতৃত্বে সংঘটিত হয়নি। এটি সর্বতোভাবে বাঙালীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। বাংলার স্বদেশী অন্দোলনই ভারতের সর্বপ্রথম গণ-আন্দোলন। রাজনৈতিক সংগ্রামে এদেশে ইংরেজের প্রথম পরাজয় বাঙালীর কাছে। বঙ্গভঙ্গ ইংরেজকে রদ করতে হয়েছিল। লক্ষ্য করবার বিষয় সেদিনের বাঙালী যা জয় করে নিয়েছিল আজকের বাঙালী তাই হাতছাড়া করেছে। স্বদেশী আন্দোলনের মহিমা আজ বিস্মৃত, আজকের বঙ্গ সন্তানরা জানে না, বললেও বুঝবেনা। বিন্দুমাত্র দাঙ্গাবাজি না করেও যে দুর্জয় শক্তির প্রকাশ এবং প্রয়োগ সম্ভব সে কথা আজ কেউ বিশ্বাস করবে না। অশিক্ষা-কুশিক্ষা এবং রুচি-বিকারের ফলে আজকের মানুষের ধারণা, যা কিছু সুন্দর শোভন রুচি-রোচন তাই দুর্বল এবং অক্ষম। স্বদেশী আন্দোলনের ন্যায় এমন সুষমা-মণ্ডিত রাজনৈতিক আন্দোলন পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে হয় নি। স্বদেশী আন্দোলনের কাহিনী বাঙালীর সর্বোত্তম গৌরব কাহিনী। বাহুবলের চাইতে চরিত্রবল যে কত বড় বাঙালী সেদিন মহাপরাক্রমশালী ইংরেজ সরকারকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করে তা প্রমাণ করে দিয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি এই বাংলাদেশেই অতি সংগোপনে অপর একটি আন্দোলন গড়ে উঠল—সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন। বাঙালী ছেলেরা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিল, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত হল, ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিল। সেই গিয়েছে এক প্রাণময় রোমাঞ্চময় যুগ। সমস্ত দেশ উচ্চকিত। বাঙালী যেমন প্রথম ভারতীয় নাগরিক, প্রথম গণ আন্দোলনের প্রবর্তক, তেমনি আবার

প্রথম ভারতীয় বিপ্লবী। বাঙালীর বিপ্লব প্রয়াস ধীরে ধীরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সঞ্চারিত হয়েছিল—বিশেষ করে পাঞ্জাবে মহারাষ্ট্রে। তাহলেও সমস্ত বিপ্লবের বৃহত্তম ভূমিকা বাঙালীর। বাঙালীর ইতিহাসে বাংলার অগ্নিযুগ এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। সেই বাংলা দেশে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার আজ সহস্র গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে এক হিংস্রতা ছাড়া শৌর্য বীর্যের লেশমাত্র পরিচয় নেই। বেশীর ভাগই চোর ডাকাত দুষ্কৃতকারীর দল। শুনতে পাই এরাই নাকি প্রয়োজন মত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে থাকে। বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি নীতিজ্ঞানটা বেশ একটু ঢিলে করতে না পারলে আজকাল আর রাজনীতি করা চলে না। দেশে আদর্শবাদী ছেলে আজও আছে, তারা প্রাণের মায়া করে না। ভাবলে দুঃখ হয়, ঐ সব ছেলেরা দেশের জন্যে নয়, দলের জন্যে প্রাণ দিচ্ছে। নেতৃত্ব যদি নিম্নমানের হয় তাহলে সামান্য কাজের জন্যও অসামান্য মূল্য দিতে হয়।

যাক এবারে আবার গোড়ার কথায় ফিরে আসা যাক। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে উনিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশক থেকে শুরু করে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত—এই শতবর্ষকালের মধ্যে বাঙালী প্রতিভার এবং বাঙালী জীবনের এক অভিনব বিকাশ ঘটেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন এবং বিপ্লবী জনগণের গৌরব কাহিনী এইমাত্র উল্লেখ করেছি। অথচ দেখা যাচ্ছে সেই সময়টিতেই—১৯০৯ সালে প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার সম্বন্ধে দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন। এর কারণ কি? কারণটা কিছুই দুর্বোধ্য নয়। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে বাঙালী জীবন যে ধারায় এগিয়ে চলেছিল উনিশ শতকের প্রান্তসীমায় পৌঁছে দেখা গেল তাতে একটু ভাটা পড়েছে। ব্যাপারটা আপাতবিরোধী মনে হলেও কার্যত দেখা গেল স্বাদেশিকতার উন্মেষের সঙ্গে শিক্ষিত সমাজও একটু যেন প্রাচীনপন্থী হয়ে উঠেছে। স্বদেশ প্রেমিকদের কাছে স্বদেশের সব কিছুরই আদর এবং কদর বেড়ে যায়। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব, মা'র বাগানের কলাপাতার সঙ্গে ঠাকুমার দিদিমাদের অনেক সংস্কার বিশ্বাসও মর্যাদা পেতে থাকে। স্বাদেশিকতার মধ্যে স্বভাবতই একটু revivalism-এর প্রবণতা প্রচ্ছন্ন থাকে। বিদেশী জ্ঞান বিজ্ঞান বর্জনীয়। স্বদেশী ধ্যান ধারণা বরণীয়। আমাদের স্বাজাত্যবোধ একদিকে যেমন জাতির শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছে, অপরদিকে তেমনি দুর্বলতাকেও প্রশ্রয় দিয়েছে। কোন কোন ব্যাপারে তাকে পশ্চাৎমুখী করেছে। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেও একটু হিন্দুয়ানির

ভাব দেখা যাচ্ছিল। শুরু হয়েছিল আগে থেকেই। বিবেকানন্দের শিকাগো বিজয়, দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, হিন্দুধর্মের জয়জয়কার রীতি-মতো ধর্মোন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে বিবেকানন্দ শুধু ধর্মীয় নেতা ছিলেন না। স্বদেশপ্রেমিক এবং জনসেবক হিসাবে তিনি জাতীয় আন্দোলনে যথেষ্ট শক্তি জুগিয়েছেন। বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতা আমাদের স্বাধীনতা প্রয়াসে সর্বপ্রকারে সহায়তা করেছেন।

স্বদেশী আন্দোলনকালে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে বিরোধিতার ফলে শিক্ষিত মহলেও একটা ইংরেজ বিমুখতা, বলতে গেলে পশ্চিম বিমুখতাই দেখা দিয়েছিল। যাকে শত্রু জ্ঞান করি তার গুণকেও আমরা বিষ নজরে দেখি। ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রকাশের চেষ্টায় বা বিলিতিয়ানা পরিহারের প্রয়াসে আমরা একটু ইংরেজিতে যাকে বলে with Vengeance স্বদেশী হয়ে উঠেছিলাম। ভারতীয় ঐতিহ্যের গুণকীর্তন শোনা যেতে লাগল সর্বক্ষণ, সর্বব্যাপারে শাস্ত্রের দোহাই মানা হত কারণে অকারণে; সাক্ষী মানা হত রঘুনন্দন, কুল্লুকভট্টকে। সোজা কথায় পশ্চিম বিমুখ হয়ে আমরা পশ্চাৎমুখী হবার উপক্রম করেছিলাম। আধুনিক বিজ্ঞান জগতের সঙ্গে তখন সবে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। প্রফুল্লচন্দ্র নিজে বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান চর্চাই যে আধুনিক যুগে প্রবেশের তোরণদ্বার সে বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রকৃতপক্ষে যুক্তিবাদের অগ্রগতি। বাঙালী মন যখন অন্ধ বিশ্বাসের পথ ছেড়ে সবে যুক্তির পথে পা দিয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে স্বদেশীয়ানার ঢেউ এসে ভক্তি বন্যায় যুক্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় বিজ্ঞান-প্রেমিকের কাছে এটি অতি দুর্লক্ষণ বলে মনে হয়েছিল। স্বদেশপ্রেম মানুষের সহজাত বৃত্তি, মহৎ গুণ বলতে হবে কিন্তু সে জিনিস যদি দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে তাহলে স্বদেশপ্রেমই দেশের অগ্রগতিতে মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্বদেশী ভাবাবেগে প্রথমে বিলিতি দ্রব্য বর্জন, পরে এরই বাইপ্রডাক্ট হিসাবে বিলিতি তথা বিদেশী জ্ঞান বিজ্ঞান বর্জন। নূতনের প্রতি বাঙালী-মনে একটি স্বভাবজাত আগ্রহ ছিল। এখন বাঙালী সমাজের এই আকস্মিক মনোবৈকল্য লক্ষ্য করেই প্রফুল্লচন্দ্র দেশবাসীর উদ্দেশে এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বলেছিলেন—'স্বাধীন চিন্তা জাতীয় জীবন নদের উৎস, এই উৎস যেদিন হইতে শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে সেই দিন হইতে মৌলিকতা ও অনুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইয়াছে। সেই দিন হইতে বাঙালী জাতির অধোগতির সূত্রপাত হইয়াছে।' প্রফুল্লচন্দ্র বোধকরি আরো শংকিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় আধুনিক ভাবাপন্ন মানুষও

শান্তিনিকেতনে গিয়ে এক আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করেছেন কিন্তু তৎপূর্বেই বেলুড়ে মঠ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। অরবিন্দ পণ্ডিচেরিতে গিয়ে যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র যতখানি বিচলিত হয়েছিলেন ততখানি বিচলিত হবার বোধকরি কারণ ছিল না। তিনি যখন বাঙালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার নিয়ে বিষম উদ্বিগ্ন তখন তার সদ্ব্যবহারও কিছু কম হয়নি। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার তখনই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয় যেমন প্রাচীন ভারতের সহজ সরল স্বচ্ছন্দ জীবনের চর্চা করেছে তেমনি আবার শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিকতম ধারার প্রবর্তন করেছে। দেশ যে সত্যি সত্যি পিছিয়ে যাচ্ছিল এমন নয়। তবে কিছু কিছু অস্বস্তির লক্ষণ অবশ্যই দিয়েছিল। স্বাদেশিকতার মধ্যে যুক্তির চাইতে আবেগের প্রাধান্য বেশি। বাঙালীর স্বভাবে এমনিতেই ভাবাবেগের আতিশয্য। স্বদেশী আন্দোলনে আবেগের দিকটা অত্যধিক প্রশ্রয় পাচ্ছিল। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই নবজাগ্রত উদ্দীপনাকে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতেও ভাবালুতার যথেষ্ট প্রশ্রয় ছিল। 'চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন'—দেশের এমন অন্নপূর্ণা মূর্তি দু-চার শতাব্দীর মধ্যে কেউ দেখেনি, অন্নের জন্য পরের দোরে ধর্না দিতেই দেখেছে।

অতীতের গুণকীর্তন একটা আবেশের সৃষ্টি করে, তাতে বর্তমান অবহেলিত হয়। অতীতের দোহাই দিয়ে পতিতকে উদ্ধার করা যায় না। আমাদের দেশোদ্ধারের প্রয়াস পাছে অতীতোদ্ধারিণী প্রয়াসে পরিণত হয় সেই আশংকাতেই প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। মনে হয় তাতে সুফল কিছু ফলেছিল। প্রাচীনপন্থীরা বাঙালী সমাজকে স্বল্পকালের জন্য বিভ্রান্ত করলেও দীর্ঘকালের জন্য পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। একথা কেউ অস্বীকার করবে না যে বিংশ শতকের অন্তত চার দশককাল সর্বভারতীয় বহু ব্যাপারেই বাঙালী আপন প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। শিল্পে সাহিত্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব তখনো সর্বভারতে স্বীকৃত। বিজ্ঞানে সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহার খ্যাতি দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে প্রসারিত। শিক্ষা সংস্কৃতি রুচিবোধে তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ। মস্তিষ্কের ক্ষমতা অটুট—চিন্তাজগতে তার দান তখনো অবিরাম। অকস্মাৎ গান্ধীজীর আবির্ভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রাধান্য অবশ্যই কথঞ্চিৎ হ্রাস পেয়েছিল। গান্ধীজী নিজগুণেই আপামর সাধারণের হৃদয় জয় করেছিলেন এবং আপন বিক্রমে সমগ্র দেশে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

সেদিনের বাঙালী মনে কোন কার্পণ্য ছিল না। মহত্তের বৃহত্তের সমাদরে সে সর্বাগ্রে এগিয়ে গিয়েছে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনই প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন। বাঙালী মনেপ্রাণে সে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনেই সক্রিয় রাজনীতি ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব। সেদিন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অগণিত মানুষ ত্যাগ নিষ্ঠা এবং বহুবিধ দুঃখভোগের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। এমন স্বর্বস্ব ত্যাগের কাহিনী ইতিহাসে বিরল। একমাত্র সর্বত্যাগী রাজপুত্র সিদ্ধার্থের সঙ্গেই এর তুলনা চলে। তরুণ সুভাষচন্দ্রের আই. সি. এস. পদের প্রত্যাখ্যানও ঐ শুভ মুহূর্তে। এটিও ভারতের ইতিহাসে সেই প্রথম। লক্ষ্য করবার বিষয় যে শিক্ষা সংস্কৃতি রাজনীতি—সব কিছুতেই বাঙালী সাধারণকে অসাধারণের পর্যায়ে তুলেছে।

এদিকে স্বদেশী আন্দোলনের বেলায় যে সব দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছিল এবারেও সে সব দেখা দিতে লাগল। স্বদেশীযুগে revivalism-এর যে উদ্যোগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবারে তা আরো উৎকটরূপে প্রকট হল। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন ইংরেজি শিক্ষা মহাপাপ, দেশের পক্ষে অভিশাপ। ইংরেজ বাহুবলে গোটা দেশটি দখল করেছে আর শিক্ষার ছলে আমাদের মনকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে। Political Conquest-এর চাইতে Cultural Conquest আরোই ভয়ংকর, অতএব এই শিক্ষাকে বর্জন করতে হবে। গান্ধীজীর আহ্বানে ছাত্ররা দলে দলে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে এল। ইংরেজি শিক্ষা দাস মনোভাবের সৃষ্টি করে দেশের মানুষকে দেশদ্রোহী করে তুলছে এমন মনে করবার কোনই সঙ্গত কারণ ছিল না, কেন না দেশবরেণ্য নেতারা সকলেই ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত। হলে কি হবে, অন্ধ আবেগের কাছে যুক্তি সব সময়েই পরাস্ত। ইংরেজি শিক্ষার নিন্দায় দেশসুদ্ধ মানুষ মুখর। প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মুখে। কোন প্রকার সংকীর্ণতাকেই রবীন্দ্রনাথ কখনো প্রশ্রয় দেননি। বলেছিলেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন জাত নেই, সকলের কাছ থেকেই তা গ্রহণযোগ্য। শিক্ষা মাত্রই বরণীয়, বর্জনীয় নয়। এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীবাদীদের কিছুদিন বাদানুবাদ চলেছিল। গান্ধীজীর একান্ত গুণগ্রাহী হয়েও রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়ে তাঁর কর্মপন্থার বিরূপ সমালোচনা করেছেন এবং ফলে দেশবাসীর বিরাগভাজন হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কোনকালেই অব্যবহিত কাল বা অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের দাবিতে কোন কাজ করেননি। অনাগত এবং অভাবিতের কথাও ভেবে নিতেন। রাজনীতিবিদরা খুব একটা

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নন। তাঁরা নগদ প্রাপ্যে তুষ্ট। বলাবাহুল্য গান্ধীজী সর্বপ্রকারেই সাধারণ রাজনৈতিক নেতাদের বহু উর্ধ্বে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কঠোর সমালোচনাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। পরে অনেক ব্যাপারে ঐসব সমালোচনার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। গান্ধীজী খুব সঙ্গতভাবেই রবীন্দ্রনাথকে 'the great sentinel' আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই উন্মাদনার মুহূর্তে অল্প সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ছাড়া খুব কম লোকেই সেই সদা-জাগ্রত প্রহরীর কথায় কর্ণপাত করেছে।

তাহলেও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে অন্যান্য প্রদেশবাসীর তুলনায় সেদিনের বাঙালী যুক্তিবাদের প্রতি অধিকতর আনুগত্য দেখিয়েছেন। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা এটুকু বুঝেছিলেন যে দেশের মুক্তির জন্য গান্ধীজী দেশবাসীর কাছে যে মূল্য দাবি করছেন তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর—বিলিতি বস্ত্র দহন। বিলিতি শিক্ষা বর্জন। চরকায় সুতা কর্তন। এত বড় দেশের মুক্তি এত সহজে হবার নয়, একথা শিক্ষিত বাঙালীরা—সেই তখনই বলতে শুরু করেছিলেন। বাঙালী স্বভাবতই একটু সংশয়বাদী। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কোন কিছুকেই নির্বিচারে গ্রহণ করেন না। গান্ধীজীর পরম ভক্ত চিত্তরঞ্জন। সর্বস্ব ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেই চিত্তরঞ্জনই একদিন গান্ধীজীর মত এবং পথ ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন পথে পা দিলেন। গান্ধীজী এবং চিত্তরঞ্জন উভয়েই সংগ্রামী পুরুষ। তবে গান্ধীজীর সংগ্রাম ছিল একটু অতিমাত্রায় সাত্ত্বিক ধরনের। চিত্তরঞ্জন ব্যক্তিগত জীবনে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে শাক্তধর্মী। সরকারের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন।

অসহযোগ আন্দোলনের মূল নীতি হল—ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ। গান্ধীজীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে চিত্তরঞ্জন সক্রিয় প্রতিরোধে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, সরকারের অন্দর মহলে প্রবেশ করে তিনি তাঁর শাসন যন্ত্রকে বিকল করে দেবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিধানসভায় প্রবেশের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু অসহযোগের নীতিবিরুদ্ধ বলে প্রস্তাবটি কংগ্রেসে অগ্রাহ্য হয়ে গেল। চিত্তরঞ্জন তখন কংগ্রেস সভাপতি। সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি কংগ্রেসের বাইরে নতুন এক দল গঠন করলেন স্বরাজ পার্টি নাম দিয়ে। চিত্তরঞ্জন নিজগুণে সমস্ত বাঙালীর হৃদয় জয় করেছিলেন। সেদিন বলতে গেলে বঙ্গবাসী সকলে এক মন এক প্রাণ হয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। চিত্তরঞ্জন বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে দলবল

নিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করলেন। তখন সবেমাত্র ডায়ার্কি বা দ্বৈত শাসনের প্রবর্তন হয়েছে অর্থাৎ একটা আধা-দিশী আধা-বিলিতি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। চিত্তরঞ্জন অনাস্থা প্রস্তাব এনে পর পর কয়েকবারই মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন। শাসন ব্যবস্থা হিসাবে ডায়ার্কি অচল প্রতিপন্ন হল। চিত্তরঞ্জনের জয়জয়কার—শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নেতৃবৃন্দ অনেকে স্বরাজ পার্টিতে যোগদান করলেন। অর্থাৎ চিত্তরঞ্জনই তখন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সর্বভারতীয় নেতা। স্বয়ং গান্ধীজী বলেছিলেন—I am defeated and humbled and laid at his feet. কিন্তু মতানৈক্য হলে কি হবে মনোমালিন্য এতটুকু হয়নি। মহাত্মার মাহাত্ম্য চিত্তরঞ্জন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। গান্ধীজীও চিত্তরঞ্জনের প্রতি গভীর ভাবে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বিরোধ সত্ত্বেও নেতৃবৃন্দের ব্যবহারে তখন চিত্তদৈন্যের প্রকাশ ছিল না। তাঁরা জানতেন যে একই শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁরা লড়াই করছেন, শুধু মত এবং পথ ছিল ভিন্ন। তখন শত্রু ছিল ইংরেজ সরকার, এখন শত্রু হল আমাদের সমাজ ব্যবস্থা—দেশজোড়া দারিদ্র্য অশিক্ষা কুশিক্ষা ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ ভেদজনিত অবিচার এবং উৎপীড়ন। আজকের দলীয় রাজনীতি আসল শত্রুকে ভুলে একদল অন্য দলকে শত্রুজ্ঞান করে। আনুগত্য যখন দেশকে ছেড়ে কোন দলে নিবদ্ধ হয় তখন দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়, বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়, মন ছোট হয়ে যায়, বাক্যে এবং ব্যবহারে ভব্যতা রক্ষা হয় না। আজকে দলীয় নেতাদের কোঁদল দেখলে লজ্জা পেতে হয়। ডিগনিটি নামক পদার্থ বাংলার রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়েছে বলতে হবে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের আধিপত্য অতি স্বল্পস্থায়ী। মাত্র পাঁচটি বৎসর তিনি অনন্যমনা হয়ে রাজনীতিতে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু ঐ পাঁচটি বৎসর বাংলার এবং ভারতের রাজনীতিতে এক মহিমান্বিত যুগ। অকাল মৃত্যু চিত্তরঞ্জনকে কেড়ে নিয়েছে কিন্তু যাবার আগে তিনি সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে গিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজ হাতে গড়া মানুষ। পরে এই সুভাষই আরেকবার সমগ্র ভারতকে চমকিত করেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের পরে গান্ধীজী আবার ভারতীয় রাজনীতির একচ্ছত্র অধিপতি রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁর সেই অপ্রতিহত প্রাধান্যকেও চ্যালেঞ্জ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। গান্ধীর সক্রিয় বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে সুভাষ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। গান্ধীজীর নির্বাচিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কথা কোন কংগ্রেস নেতার পক্ষে কল্পনা করাও তখন সম্ভব ছিল না। সুভাষচন্দ্র অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। কিন্তু গান্ধী-অনুরাগীদের বিরোধিতায় সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি পদে ইস্তফা দিতে হল।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। চিত্তরঞ্জনের ন্যায় সুভাষও নতুন দল গঠন করলেন—ফরওয়ার্ড ব্লক নামে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য পার্টি ভিন্ন পথে, ভিন্ন প্রথায় কংগ্রেসের কাজই করেছে। সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকও আলাদা দল নয়, কংগ্রেসেরই একটি অগ্রগামী গোষ্ঠী। তাঁরা উভয়েই নিজ নিজ দলকে কংগ্রেসের পরিপূরক দল হিসাবে দেখেছেন। সুভাষচন্দ্র আই এন এ অভিযানের শুরুতে গান্ধীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। সে উদারতা, সে শোভনতা আজকের নেতৃবৃন্দের কাছে আশা করা বৃথা। এক কংগ্রেস ভেঙে এখন তিনখানা হয়েছে—কংগ্রেস (আই), কংগ্রেস (এস), কংগ্রেস (জে)। এছাড়া জনতা পার্টিরও সকলেই এককালের কংগ্রেসী, লোকদলেরও অনেকে। উদ্দেশ্য বা আদর্শের দিক থেকে এদের মধ্যে খুব যে একটা ব্যবধান আছে এমন নয়। অথচ একে অন্যের ঘোর শত্রু। কলহ দেশের ভালো মন্দ নিয়ে নয়, নেতৃত্ব নিয়ে, কে দিল্লির তক্তে বসবে তাই নিয়ে।

পলিটিক্সের একটা সাংসারিক দিক আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে সেটাও একটা মস্ত বড় দিক। মানুষের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ, সুযোগ সুবিধের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। আমাদের পূর্বতন নেতাদের সাংসারিক জ্ঞান ছিল না এমন নয়। দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশার কথা সর্বদাই ভেবেছেন। কিন্তু তাঁদের রাজনীতি নিছক সাংসারিক সুবিধাবাদকে ছাড়িয়ে উর্ধ্বে উঠতে জানত। যাঁরা শুধু সংসারটুকু নিয়ে থাকেন তাঁরা সংসারকেও পুরোপুরি পান না, অপর পক্ষে সংসারের যা প্রাপ্য তাও তাঁরা পুরোপুরি দিতে পারেন না। অত্যাবশ্যককে ছাড়িয়ে উদ্বৃত্ত যেটুকু দেওয়া যায় বা পাওয়া যায় তার মধ্যেই সব জিনিসের মহিমা। বাংলার রাজনীতির মধ্যে ঐ উদ্বৃত্তের মহিমাটি প্রথমাবধিই কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা প্রবন্ধাদি বাঙালী মনে এক নবজীবনের উল্লাস এনে দিয়েছিল। সে কাজে সহায়তা করেছে বিপিনচন্দ্র পালের উদ্দীপনাময়ী বাগ্মীতা। সে বাগ্মীতা শুধু আবেগ-সঞ্জাত নয়, বুদ্ধিদীপ্ত। প্রচুর পরিমাণে কল্পনাশক্তি না থাকলে পূর্বোল্লিখিত উদ্বৃত্ত শক্তি আয়ত্ত করা যায় না। উদ্বৃত্তের বলে ব্যক্তিত্বের যে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আজকের ভাষায় তাকেই বলে Charisma. গান্ধী নেহরু, চিত্তরঞ্জন সুভাষ—প্রত্যেকেরই এই মহিমাময় ব্যক্তিত্বটি ছিল। আজকের নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া আর কারো মধ্যে ঐ গুণের লেশমাত্র নেই। কল্পনাশক্তি বিহনে এঁদের ব্যক্তিত্ব মলিন এবং নিষ্প্রভ। এই কারণে নিজ নিজ পার্টির বাইরে জাতির জীবনে এঁদের কোনই Contribution নেই। কল্পনাশক্তি ছাড়া কোন জিনিসই সাধারণের

ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। 'তরুণের স্বপ্ন' প্রণেতা সুভাষ দেখতে জানতেন। সে কারণেই অপরের কাছে যা স্বপ্নতুল্য তাকে তিনি সত্যে পরিণত করতে পেরেছিলেন। ইংরেজ সরকারের কুলিশ-কঠিন পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে দেশ থেকে নিষ্ক্রমণে, দেশ দেশান্তর ঘুরে দূর প্রাচ্যে আগমনে, আই এন এ-র সংগঠনে এবং সসৈন্যে ভারত অভিযানে যে বিরাট কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয়েছে তা এক মহাকাব্য রচনার সমতুল্য। একাধারে বাঙালীর ধীশক্তি এবং কর্মশক্তির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র। এছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে গান্ধী সমেত সমস্ত রাজনৈতিক নেতা মিলেও যা করতে পারেন নি—সকল সম্প্রদায়ের মিলন সাধন—সুভাষচন্দ্র তা করেছিলেন। তিনি বলতেন—একটা মস্ত বড় জিনিস চোখের সুমুখে থাকলে ছোটখাট ব্যাপার লোকের দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে না, মনকে বিচলিত করে না। সুভাষের নেতৃত্বে সেটি প্রমাণিত হয়েছিল। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন সর্বসমক্ষে এমন জাজ্বল্যমান করে তুলে ধরেছিলেন যে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সকলে সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে এক পতাকা তলে মিলিত হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র শেষ বাঙালী সর্বভারতীয় নেতা। উনিশ শতকের বাঙালী যে প্রতিভার অধিকারী হয়েছিল তার শেষ প্রতিভূ সুভাষচন্দ্র। বিধানচন্দ্র রায় সর্বভারতীয় নেতা ছিলেন না। রাজনৈতিক নেতা বলতে আমরা যা বুঝি ডক্টর রায় কোনকালেই তা ছিলেন না। তিনি কর্মবীর, বক্তৃতা মঞ্চের নেতা নন। উনিশ শতকের বাঙালী জীবনে শিক্ষায় দীক্ষায় চিন্তায় কর্মে যে বিপুল বৈভব দেখা দিয়েছিল তার পূর্ণ সমারোহের মধ্যে বিধানচন্দ্রের জন্ম। পরিবেশ গুণে সেদিনকরে বাঙালী মনীষা এবং কর্মোদ্যমকে তিনি সহজে অধিগত এবং স্বভাবগত করতে পেরেছিলেন। কর্মজীবনের নানা উদ্যোগে আয়োজনে তিনি যে বিরাট কল্পনাশক্তি পরিচয় দিয়েছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। স্বাধীনতা লাভের পরে পশ্চিমবঙ্গে যা কিছু হয়েছে তার সমস্ত কিছুর পরিকল্পনা এবং সূচনা করেছিলেন বিধানচন্দ্র রায়।

বলে নেওয়া প্রয়োজন যে জাতির প্রাণশক্তির পরিচয় কেবলমাত্র রাজনীতির মধ্যে নয়। জীবনের সকলক্ষেত্রে—জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সাহিত্যে সংগীতে, শিল্পে বাণিজ্যে, এমন কি খেলাধূলায় শক্তির প্রকাশ পেলে তবেই জাতির জীবনীশক্তি প্রমাণিত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রফুল্লচন্দ্রের পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের স্বল্পকালে পরেই মোহনবাগানের শীল্ড বিজয় শুধু বাঙালীকে নয় সমস্ত ভারতবাসীকেই উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিরিশের দশক পর্যন্ত মোটামুটি বলা

যেতে পারে, বাঙালী বহুক্ষেত্রেই তার প্রাধান্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। বয়সে তরুণ হলেও সত্যেন বসু এবং মেঘনাদ সাহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা দেশে এবং বিদেশেও বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। চিত্রকলায় নন্দলাল প্রমুখ অবনীন্দ্র শিষ্যরা ভারতীয় শিল্পের গৌরবকে সমুজ্জল রেখেছেন। শিশির ভাদুড়ী নাট্যমঞ্চে নিত্য নতুন রোমাঞ্চের সৃষ্টি করছেন। সাহিত্যে তো কথাই নেই। একমাত্র রবীন্দ্র-গরবে গরবিনী এমন নয়, কাব্যে সাহিত্যে নতুন নতুন প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছে। জনপ্রিয়তার দিক থেকে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিত্য নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। জীবনানন্দ বাংলা কাব্যে নতুন স্বর যোজনা করলেন। কল্লোল গোষ্ঠীর নবীনেরা ইতিপূর্বেই সাহিত্যে এক নতুন আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে বাঙালী মন তখনো সরস সজীব, মস্তিষ্কের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ, ব্যবহার অব্যাহত এবং সে কারণেই নানা বিচিত্র পথে নব নব উদ্যমে উদ্যোগে আপন শক্তির পরিচয় দিতে পেরেছিল। সাহিত্যে যেমন বসে শুধু রবীন্দ্র নাম জপ করেনি রাজনীতিতে তেমনি চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রের দোহাই দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি। ১৯৩০-এর চট্টগ্রাম বিদ্রোহ তখনকার সব চাইতে রোমাঞ্চকর ঘটনা। গভীর গোপনে পরিকল্পিত এমন বৃহদাকারের বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ ইতিপূর্বে দেশে আর ঘটেনি। সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতায় মেদিনীপুরও ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। ঢাকা কলকাতা এবং বাংলার নানা জেলা শহরেই বাঙালী বিপ্লবীরা ইংরেজ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।

তুলনা করলে দেখা যাবে আজকের বাঙালী জীবন সবদিক থেকেই স্তিমিত। সাহিত্যে, বাঙালীর একটু স্বভাবজাত গুণপনা আছে। তাহলেও আজকের সাহিত্যশিল্পীরা পূর্বোল্লিখিতদের সমপর্যায়ে এখনও উঠতে পেরেছেন বলে মনে করি না। বাঙালী জীবন আজ ক্লিশ, বাঙালী চরিত্র শীর্ণ, জনজীবন ক্লেদাক্ত কুৎসিত। দায়িত্বশীলদের মুখের বচন অশোভন, ব্যবহার অশালীন। যেখানে রুচিবোধ নেই সেখানে শিল্প সাহিত্য কখনো উঁচুদরের হতে পারে না। নন্দলালের পরে চারুকলার ক্ষেত্রে তেমন কোন কীর্তিমান পুরুষের আবির্ভাব এখনো হয়নি। বিজ্ঞানে অন্যান্য রাজ্যের তরুণ বিজ্ঞানীরা যতখানি উত্তম এবং উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়েছেন বাঙালী তরুণরা তা দেখাতে পারেননি। এই দুর্দিনেও একাধিক ক্ষেত্রে বাঙালী প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সত্যজিৎ রায়। বিধানচন্দ্র সম্পর্কে যে কথা বলেছি সত্যজিৎ সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য। যে

পরিবার পরিবেশে তাঁর জন্ম· একদা সেই পরিবারে উনিশ শতকীয় বাংলার জাগরণের ইতিহাস রচিত হয়েছে।

যাক উনিশ শতকের দোহাই দিলেই তো চলবে না। নিজেকে সাব্যস্ত করতে হয় নিজ গুণে। বাঙালী সেখানেই আজ অপারগ। তার কারণ সে তার স্বভাব ধর্ম থেকে বিচ্যুত। বিপথগামী হলে পশ্চাদ্‌গামী হতে হয়, তাই হয়েছে। এককালে বাংলাদেশ ছিল শিক্ষায় অন্যান্য প্রদেশ থেকে এগিয়ে, এখন সে অনেকের চাইতে পিছিয়ে। এখানে শিক্ষা বলতে প্রাথমিক শিক্ষা—লিখন-পঠনের ক্ষমতাটুকু মাত্র। অগণিত মানুষকে ঐটুকু থেকে বঞ্চিত রেখে মুষ্টিমেয়র জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিপুল অর্থব্যয়—চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। আসল কথা আমাদের নেতৃবৃন্দ শিক্ষায় বিশ্বাসী নন। সমাজ সচেতনতায় বিশ্বাসী। মানুষকে শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজ সচেতন করে তুলতে হবে, একথা তাঁরা মানেন না। তাঁরা মনে করেন খুব জোর গলায় 'আমাদের দাবি মানতে হবে' বলে চিৎকার করাটাই সমাজ সচেতনতার লক্ষণ। ফলে মানুষ যত বেশি সচেতন হচ্ছে দেশ তত বেশী সমাজ-বিরোধীতে ছেয়ে যাচ্ছে।

এক সময়ে কলকাতাই ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধানতম কেন্দ্র। আজ সে গৌরব অস্তমিত। এখন পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসা প্রধানত রুগ্ন শিল্পের ব্যবসা। পরিচালকরা হাত গুটিয়ে নিচ্ছেন, সরকার রোগীর চিকিৎসাভার গ্রহণ করছেন। রোগের মূলে আছে শ্রমিক আন্দোলন। মালিকের তুলনায় শ্রমিক দুর্বল। স্বার্থরক্ষার জন্য তার সঙ্ঘবদ্ধ হবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় মালিকের ব্যবসা রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠেছে। মালিক চিরকাল জবরদস্তি করেছে, আজ শ্রমিক তার শোধ তুলছে। শ্রমিক নেতারা খুব যে তাদের সুপথে চালাচ্ছেন এমন নয়। গত ত্রিশ বৎসরেও অধিককাল শ্রমিকদের কানে একটি মাত্র মন্ত্র জপানো হয়েছে—মাইনে বাড়াও ভাতা বাড়াও। সেই সঙ্গে আরো শেখানো হয়েছে—খবরদার কাজটি কোরো না। কাজ করেছ তো ঠকেছ। এভাবে অতি সুনিপুণ চেষ্টায় শ্রমিক সমাজকে শ্রমবিমুখ করে তোলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারই পৃথিবীর একমাত্র সরকার যে নিজে থেকে বন্ধ্ ডেকে বলে—কালকে কেউ কোন কাজ করবে না; কলকারখানা আপিস আদালত যানবাহন দোকান পাট সব বন্ধ। কোন প্রকৃতিস্থ সরকার যে একটি সমগ্র রাজ্যের জীবনযাত্রাকে নিজ হাতে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে কোন সভ্য সমাজের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন হত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ওয়েস্ট বেঙ্গল নামক পত্রিকায় অতিশয় গর্বের সঙ্গে জানিয়েছে যে রাইটার্স বিল্ডিং

এবং নিউ সেক্রেটারিয়টের চৌদ্দ হাজার কর্মীর মধ্যে মাত্র চারজন বন্ধের দিনে কাজে হাজির হয়েছিলেন। কাজ না করার ডাকে দেশবাসী যে কী আশ্চর্য রকম সাড়া দিয়েছে তাই নিয়ে তাঁদের গর্ব। এটা যে সাড়া নয়, দেশের অসাড় নির্জীব অবস্থা সে কথা তাঁদের কে বোঝাবে? যানবাহন বন্ধ করে কাজে আসবার পথ বন্ধ করে দিয়ে বন্ধ্-এর সাফল্য দাবি করা হাস্যকর। তাছাড়া হামলাকারীদের তৎপরতায় প্রাণভয় তো ছিলই।

বলছিলাম ব্যবসা বাণিজ্যের কথা। যেখানে মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে কর্ম-বিমুখ করে তোলা হয়েছে সেখানে বাণিজ্য লক্ষ্মী অপ্রসন্ন হতে বাধ্য। শুধু বাণিজ্য লক্ষ্মী নয়, সমগ্রভাবে বঙ্গলক্ষ্মীই আজ মলিন-মুখী। আজকের বাঙালী জীবন দেখলে মনে হবে লক্ষ্মীশ্রী এ দেশ থেকে অন্তর্ধান করেছে। লক্ষ্মীশ্রী বলতে সাধারণত সাংসারিক অর্থেই বলে থাকি। বাঙালীর সংসার কোনকালেই ধনধান্যে পূর্ণ নয়, অভাবের সংসারই বলতে হবে। কিন্তু শত অভাবের মধ্যেও বাঙালী তার স্বভাব গুণে নিজস্ব একটি ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিল একদা যাকে সকলে সম্ভ্রমের চোখে দেখেছে। কতগুলো মূল্যবোধকে সে বিশেষভাবে লালন করতে শিখেছিল। তার ঐ ভাবমূর্তিটি সেই মূল্যবোধজাত। এখন সেই মূল্য-বোধ হারিয়েছে, ইমেজটিও নষ্ট হয়েছে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে এই মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর। স্বাধীনতাকে সোনার কাঠি বলে জানতাম। ভাবতাম স্বাধীনতার স্পর্শে দীন দুঃখিনী বাংলা সোনার বাংলা হয়ে যাবে। কিন্তু স্বাধীনতা যে এমন অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে তা কি কেউ ভেবেছিল? অতি স্বল্পকালের মধ্যে দেশের হালচালে এবং বাঙালী চরিত্রে এমন বিকার দেখা দিল যে আজকের বাঙালীকে বাঙালী বলে চেনাই মুস্কিল হয়েছে। কয়েক বছর আগে 'স্বাধীনতা হীনতায়' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। স্বাধীনতার মধ্যে যে এতখানি হীনতা ছিল তা কে জানত! অনেকে তারিফ করে চিঠিপত্র লিখেছিলেন। তখন বলেছিলাম বাঙালীর দুর্ভোগের কথা, সেই সঙ্গে তার চিত্তদৈন্যের কথা। তখনো এমন ভয়াবহ অবস্থা দেখা দেয়নি—কসবার ঘটনা ঘটেনি, কোচবিহারের নার্স হত্যা, পাশবিক অত্যাচার ঘটেনি। এখন এই বাঙালীকে বাঙালী বলবে কে? বাংলাদেশ বর্বরের দেশে পরিণত হয়েছে। সোনার বাংলায় মানুষের ধন মান প্রাণ কিছুই আজ নিরাপদ নয়।

মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে একটি সুসভ্য সমাজের এতবড় অধঃপতন কি করে ঘটল? বাঙালীকে লোকে ভাবুকচিত্তের মানুষ বলে জানত। সে ভাবতে

জানত, ভাবনাচিন্তার পথ দিয়েই সে বড় হয়েছিল। আজকের বাঙালী কি দেশের, সমাজের এই অবস্থা নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামাচ্ছে? ভাবনার কোন লক্ষণ নেই কারণ সমস্তই সে নির্বিবাদে মেনে নিচ্ছে। এমন একটা নির্জীব নিস্পন্দ ভাব এসেছে যে কোনো ঘটনায় বিপন্ন বা বিড়ম্বিত বোধ করলেও বিচলিত হয় না। বলে, এ তো হামেশাই ঘটছে। কেন ঘটছে সে প্রশ্ন করে না। তার্কিক বলে বাঙালীর খ্যাতি ছিল। এখন সে তর্ক করে না, সুবোধ বালক গোপালের মতো—তাকে যা বোঝানো যায়, সে তাই বুঝে নেয়।

আজকের বাঙালী বোমা পিস্তল ছোরা চালনায় ওস্তাদ হয়েছে—কিন্তু মস্তিষ্ক চালনার কাজটি বন্ধ রেখেছে। না ভেবেচিন্তেই কাজ করেছে! সর্দার-পোড়োদের কাছে নামতা শেখার মতো বুলি আওড়াতে শিখেছে। পুরো একটি জেনারেশান এই ভাবে গড়ে উঠেছে। আজ যারা যৌবনে পদার্পণ করেছেন তাঁদের কাছে নিবেদন তাঁরা যেন পুরোবর্তী মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করেন। তাঁদের ভেবে দেখতে হবে কি কারণে দেশের এই দশা ঘটেছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে দেশের অবস্থাটা জেনে নিলে বর্তমান অবস্থাটা বোঝা সহজ হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেকেই রসদ জুগিয়েছেন। গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসী আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লবীদের সন্ত্রাস সৃষ্টি, সুভাষচন্দ্রের আই. এন. এ. অভিযান, নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদির সম্মিলিত চাপেই ইংরেজকে এ দেশ ছেড়ে যেতে হয়েছে। এ ছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সিংহের আর সাম্রাজ্য রক্ষার তাকত্ ছিল না। লেজ গুটিয়ে আপন গুহায় ফিরে গিয়েছে। কিন্তু যাবার আগে দেশ ভেঙে দুখানা করে দিয়ে গেল। স্বাধীনতা যদি বা এল দেশ বিভাগের দরুণ তার সুফল বহুলাংশে বানচাল হয়ে গেল। দেশের অপরাংশ বুঝুক আর না বুঝুক পশ্চিমবঙ্গ তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে।

ইংরেজের ত্যক্ত সিংহাসন দখল করল কংগ্রেস। স্বাধীনতার সে-ই ছিল প্রধান প্রবক্তা। কংগ্রেস ছাড়া দেশে বলতে গেলে আর একটি মাত্র দল, সেটি মুসলীম লীগ। স্বাধীনতা সংগ্রামে তার বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। ইংরেজের নির্দেশে জন্মাবধি কংগ্রেসের বিরোধিতা করে এসেছে। সেই ইংরেজের অন্তিম দশা দেখে শুধু বলেছে, দেখো কিন্তু তুমি আমাকে অকূলে ভাসিয়ে যেও না। যাবার আগে ভাগ বাটোয়ারা করে আম'র হেঁসেল আলাদা করে দিয়ে যেও। ইতিমধ্যে দেশে কমিউনিজম-এর বার্তা এসে পৌচেছে। প্রথমে ছিল অল্প সংখ্যক শিক্ষিতের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে আবদ্ধ। ধীরে ধীরে দল হিসাবে গড়ে

উঠল বলতে গেলে তিরিশের দশকে। মুসলীম লীগের ন্যায় কমিউনিস্ট পার্টিরও স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন ভূমিকা ছিল না। আবার মুসলীম লীগ-এর ন্যায় এরও প্রধান কাজ ছিল কংগ্রেস বিরোধিতা। গোড়া থেকেই ভেবে নিয়েছে যে দেশে স্থিতিলাভ করতে হলে কংগ্রেসের সঙ্গেই যুঝতে হবে, ইংরেজের সঙ্গে নয়।

বলে নেওয়া ভালো যে কমিউনিজম ফ্যালনা জিনিস নয়। আমরা যুগ ধর্ম বলতে যা বুঝি এ যুগে কমিউনিজম হল তাই। পৃথিবীর সকল দেশে সকল জাতির উপরেই এর প্রভাব অল্পবিস্তর পড়তে বাধ্য। বিভিন্ন দেশে শাসন ব্যবস্থা বিভিন্ন রকম হতে পারে—রাজতন্ত্র হোক প্রজাতন্ত্র হোক—সকলের সমান অধিকার আজ মেনে নিতেই হবে। উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, হুজুর মজুরের ভেদ দূর হবে, সকল মানুষ সমান হবে—এর একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আছে। ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশের তো কমিউনিজমকে লুফে নেবার কথা। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। বিরাট দেশের দুই প্রান্তে দুটি ঘাঁটি করেছে, অন্যত্র বিশেষ আমল পায়নি। এর জন্যে কমিউনিস্ট পার্টি বহুলাংশে দায়ী। কমিউনিজম-এর প্রতি সে যথোচিত সম্মান দেখায়নি। কমিউনিজম সকলকে সমান চোখে দেখে, কমিউনিস্ট পার্টি তা দেখে না। তার চোখে নিজ দলের লোক এবং অপর দলের লোক সমান নয়। একমাত্র কংগ্রেসই সকল ভারতবাসীকে সমান না ভাবলেও আপন বলে ভাবত। এখন তারও মতিভ্রম হয়েছে। এখন সেও নিজেকে একটি দল বলে মনে করে এবং অন্যান্যদের মতো দলীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখে। এই সূত্রে বলতে বাধা নেই যে স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের ভূমিকা যতই গৌরবের হউক—স্বাধীনতার পরে সে তার পূর্ব গৌরব রক্ষা করতে পারেনি। স্বল্প সংখ্যক নিষ্ঠাবানকে বাদ দিলে বেশির ভাগ কংগ্রেসীই ভেবেছেন অনেক কষ্ট করেছি, এবার একটু আয়েশ করব, অনেক ত্যাগ করেছি, এবার ভোগ করব, অনেক কাল দাসত্ব করা গিয়েছে, এবার প্রভুত্ব করব। ভুলে গিয়েছিলেন যে স্বাধীনতা লাভ করলেই দেশকে লাভ করা যায় না। দেশকে নিজের হাতে গড়ে তুললে তবে দেশ আপন অধিকারে আসে। দল গঠনের কাজে যত খানি তৎপরতা দেখিয়েছে দেশ গঠনের কাজে কোন দলই ততখানি উৎসাহ দেখায়নি। দেশে এখন দলের অন্ত নেই— কেউ বামপন্থী কেউ দক্ষিণপন্থী। তাই বলে সকলেরই খুব যে একটা ডান বাঁ জ্ঞান আছে এমন নয়। দল যত বাড়ছে, দেশ তত দুর্বল হচ্ছে, বিরোধ-অশান্তি বাড়ছে। আগে জানতাম, যত মত তত পথ, এখন দেখছি যত মত তত পথ অবরোধ।

উনিশ শতকে সদ্য ইংরেজি শিক্ষিত ইয়াং বেঙ্গল সম্প্রদায় ভাবত ইংরেজি

বুলি, বিলিতি পোশাক, বিলিতি হালচাল, বিলিতি পানাহারে অভ্যস্ত না হলে সুসভ্য হওয়া যায় না। বর্তমান শতকে ত্রিশের দশকে আবার এক ইয়াং বেঙ্গল সম্প্রদায় দেখা দিল। মুখে মার্ক্সীয় বুলি, ব্যস্ত সমস্ত ভাব, তাদের ধারণা মার্ক্সবাদী না হলে এ যুগের যোগ্যতা লাভ করা যায় না। প্রথমোক্ত ইয়াং বেঙ্গলের ছিল দিশী রীতি প্রথার প্রতি দারুণ অবজ্ঞা, এঁরা ততোধিক অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন গান্ধীজীর তথা কংগ্রেস রাজনীতির প্রতি। নিজেদের গর্বভরে বিপ্লবী বলে পরিচয় দিয়েছেন। বাঙালীকে চেনাতে হবে না, বিপ্লবী সে দেখেছে—যাঁরা মনে প্রাণে বিপ্লবী, গভীর গোপনে, নীরবে নিভৃতে কাজ করেছেন, দেশের জন্যে চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁরা বিনয়-নম্র, নিজেকে বড় ভাবেননি, কাউকে ছোট করে দেখেননি। নব্য বিপ্লবীরা বেশ একটু সুপীরিয়ার ভাব দেখিয়ে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করে বলতেন—আমরা এ সব নিরামিষ আন্দোলনে বিশ্বাস করি না। রক্তপাত ছাড়া কি বিপ্লব হয়? বিপ্লব বলতে এঁরা শুধু ফরাসী এবং রুশ বিপ্লবকেই চিনে রেখেছেন। বিপ্লবকে দেখেছেন খুব স্থূল অর্থে। মানুষের জীবনযাত্রা, ভাবনা চিন্তা, ধ্যান ধারণার আমূল পরিবর্তনকেই বলে বিপ্লব। বিপ্লবের যথার্থ সংজ্ঞা মতে এ যুগের সব চাইতে বড় বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন গান্ধী। চল্লিশ কোটি মানুষের দেশে এক নিরস্ত্র ব্যক্তি যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন তেমনটি পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে ঘটেনি। ষাট বছর আগে ১৯২১-২২ সালের কথা যাঁদের মনে আছে তাঁরাই দেখেছেন চল্লিশ কোটি মানুষের জীবনযাত্রায় কী আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। বৎসরকাল মধ্যে একটিমাত্র ব্যক্তি যা করেছিলেন আমাদের তথাকথিত বিপ্লবী নেতারা পঞ্চাশ বছরেও দেশের মনে ততখানি দাগ কাটতে পারেননি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উনিশ শতকীয় ইয়াং বেঙ্গল অল্পকাল মধ্যেই সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিলেন। আতিশয্য পরিহার করে দেশ গঠনের কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসকে তাঁরাই গৌরবমণ্ডিত করেছেন। তাঁরা যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন, নতুনের মধ্যে যেটুকু গ্রহণযোগ্য সেটুকুই গ্রহণ করেছেন, বাকিটুকু বর্জন করেছেন। নয়া ইয়াং বেঙ্গল মনে করেন তাঁরা ভুল ভ্রান্তির উর্ধ্বে। যুক্তিতর্কে যতখানি বিশ্বাস তার চাইতে ঢের বেশি বিশ্বাস লাঠি সড়কি বোমা পিস্তলে। নিজেদের বিপ্লবী প্রমাণ করবার জন্যে আমাদের অহিংস আন্দোলনকে এমন সহিংস করে তুলল যে দেশশুদ্ধ, মানুষ সন্ত্রস্ত এবং সন্ত্রস্ত বলেই আবার সকলেই সশস্ত্র। একবার রক্তের স্বাদ পেলে সকল প্রাণীই হিংস্র হয়ে ওঠে। বাঙালীর রাজনীতি বাঙালীকে হিংস্র প্রাণীতে পরিণত করেছে। যে যত বেশি

হিংস্র সে তত বড় বিপ্লবী। কসবার হত্যাকারীরা, কোচবিহারের নার্স হত্যাকারী পশুরাও নিঃসন্দেহে নিজেদের বিপ্লবী বলে মনে করে। এসব ঘটনার জন্যে সমস্ত সমাজ দায়ী। খুব কম করে হলেও গত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সে নানাবিধ হিংস্রতাকে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড বলে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে।

নতুনের প্রতি বাঙালীর স্বভাবগত আগ্রহ। এ দেশে বলতে গেলে সে-ই কমিউনিজমকে সর্বাগ্রে গ্রহণ করেছে। তাতে তার সজীবতার লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু নতুন যদি নেশার মতো পেয়ে বসে তাহলে তাতে ইষ্টের চাইতে অনিষ্ট হয় বেশি। বাঙালী তার বিলিতিয়ানার নেশা অল্পদিনেই কাটিয়ে উঠেছিল কারণ সে তখন তার যুক্তি তর্ক, মস্তিষ্কের ব্যবহার পূর্ণ মাত্রায় করেছে। সেদিনের বাঙালী বলেছে—যুক্তিহীন-বিচারেণ-ধর্মহানিঃ প্রজায়তে। আজকের বাঙালী যুক্তি তর্ক ভুলে নেশার ঘোরে অন্ধ আবেগে চলেছে। সে স্বধর্মচ্যুত।

একটা নতুন জিনিস যখন আসে তখন তাকে ঘিরে নানা মিথ্-এর সৃষ্টি হয়। বলাবাহুল্য মিথ্-এর মধ্যে মিথ্যা যতখানি সত্য ততখানি নয়। প্রচার কৌশলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে, কফি হাউসে চায়ের দোকানে অবিলম্বে প্রচারিত হল যে কমিউনিজম ব্যাপারটা খুব ইনটেলেকচুয়েল অর্থাৎ কিনা কমিউনিস্ট হলেই ইনটেলেকচুয়েল হওয়া যায়। ইনটেলেকচুয়েল হবার এমন সহজ পন্থা কে ছাড়ে? দেখতে দেখতে কমিউনিস্ট শিবিরে ভিড় জমে গেল। বাঙালী যুবক সমাজ রাতারাতি ইনটেলেকচুয়েল হয়ে উঠল। তাদের কে বোঝাবে যে ইনটেলেক্ট-এর চর্চা এমন সহজিয়া পন্থায় সম্ভব নয়। ইনটেলেক্টের স্বভাবটা আদৌ আজ্ঞাবহ নয়। সে সন্দিগ্ধচিত্ত, প্রশ্ন করে করে প্রতি পদে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে। প্রশ্ন করবার বদ অভ্যাস আছে বলেই কমিউনিজম ইনটেলেক্টকে খুব একটা প্রশ্রয় দেয় না। কমিউনিস্ট দেশে মস্তিষ্কবানরা খুব সুখে আছেন এমন কথা বড় শোনা যায় না।

যাক ভিন দেশের কথা না বলে আপন দেশের কথা বলাই ভালো। আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি রাজনীতির ক্ষেত্রে খুব একটা ইনটেলেক্টের পরিচয় দিয়েছেন কার্যত তার প্রমাণ পাওয়া যায় নি। আগেই বলেছি যে ইংরেজ আমলে দেখা গিয়েছে মুসলীম লীগের পলিসি ছিল ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা এবং কংগ্রেসের বিরোধিতা। কংগ্রেস যদি বলছে—'না' লীগ বলছে 'হ্যাঁ' আর কংগ্রেস 'হ্যাঁ' বললে লীগ 'না'। নিজের মতো করে ভেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখেনি। সেজন্য মুসলীম লীগ কখনো সাবালক হতে পারেনি। খুব কৌতুকের বিষয় যে কমিউনিস্ট পার্টিও ঠিক তাই করেছে। কংগ্রেস যখন যা বলেছে বা করেছে

কমিউনিস্ট পার্টি ঠিক তার উল্টোটি করেছে। এ ব্যাপারে মুসলীম লীগের সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল। অনেক অন্যান্য ব্যাপারেও মুসলীম লীগের সঙ্গে সে হাত হাত মিলিয়েছে এমন কি দেশ বিভাগের দাবিতেও মুসলীম লীগকে সমর্থন করেছে। এসব মহৎ উদ্দেশ্যে নয়, শুধু কংগ্রেসকে দুর্বল করবার জন্য। বিদেশী শাসক তার প্রতিপক্ষ নয়, তার একমাত্র শত্রু স্বদেশী কংগ্রেস।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন বাঁধল তখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে তাঁরা এর নিন্দাই করেছেন কিন্তু যেই না রাশিয়া যুদ্ধে নামল সে মুহূর্তেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হল। এখন সর্বপ্রকার ইংরেজের সমরায়োজনে সাহায্য করতে হবে। গান্ধী যখন কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন শুরু করলেন কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন দমনে লেগে গেল। বেশ বোঝা গিয়েছে যে এ সিদ্ধান্ত তার নিজ বুদ্ধিতে নয়, মস্কোর উস্কানিতে। আরো শোচনীয় ব্যাপার যে বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষে তিরিশ লক্ষ লোক না খেয়ে মরে গেল। সে দিকে দৃকপাত নেই। কমিউনিস্টরা বলতে লাগলেন এখন ওসব ভাবলে চলবে না। এখন আমাদের লক্ষ্য পিপলস ওয়রে জয়লাভ করা। আমি আমার কমিউনিস্ট বন্ধুদের বলেছিলাম—পিপলরা সব বুঝি রাশিয়ায় বাস করে, দেশের মানুষগুলি সব পিপীলিকা? এটি যেমন দুঃখের কথা, অপর একটি তেমনি লজ্জার। সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তাঁর সমতুল্য স্বদেশ প্রেমিক এ দেশে ক'জন হয়েছেন? কিন্তু যেহেতু তিনি মিত্র শক্তির বিরোধী এবং দেশকে ইংরেজের কবল-মুক্ত করতে জীবন পণ করেছেন সেই হেতু কমিউনিস্ট পার্টির মতে তিনি দেশদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতক। এ সবের মধ্যে কি কোথাও ইনটেলেক্ট-এর পরিচয় আছে? এই সূত্রে দেশবাসীকে আরেকটি কথাও ভেবে দেখতে হবে। সুভাষ প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক এখন মন্ত্রিত্বের লোভে সেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে গিয়ে হাত মিলিয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লক নামটি ব্যবহার করবার অধিকার কি এঁদের আছে? এঁরা কি সুভাষের মান রেখেছেন?

দেশের পরম দুর্ভাগ্য যে স্বাধীন ভারত সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব এবং কর্মপ্রেরণা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়ক আখ্যা দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই দেশনায়কের যুগ শেষ হয়েছে, দল-নায়কের যুগ এসেছে। ছোট ছোট দল, যত দল তত কোঁদল। বাঙালী একদিন বড় করে ভাবতে শিখেছিল। নিজেকে কখনো বঙ্গবাসী বলে ভাবেনি, ভারতবাসী বলে ভেবেছে। আজকের যে কৃশকায় পশ্চিমবঙ্গ তারও সবটুকুর কথা আমরা ভাবি না, যার যার নিজ দলের ভাবনাটি নিয়ে ব্যস্ত। ভাবনা চিন্তার পরিধি যত

ছোট হবে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার তত কমে আসবে। দেশ-জোড়া বড় বড় সমস্যাকে দলীয় স্বার্থে ছোট করে টুকরো করে দেখতে গেলে মস্তিষ্ক চালনার প্রয়োজনই হয় না; অপর পক্ষে অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ চিত্তদৈন্য দেখা দেয়। বাস্তবিক পক্ষে বাঙালীর এমন জীর্ণ-মূর্তি আগে কখনো দেখা যায় নি। সে তার প্রখরতা উজ্জ্বলতা অনেকখানি হারিয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টি একমাত্র দোষী এমন কথা কেউ যেন মনে না করেন। সব পার্টি সমান। কংগ্রেস পার্টির অধঃপতন সব চাইতে শোচনীয়, কারণ সে বয়োজ্যেষ্ঠ। শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে। কার এমন ঐতিহ্য! আজকের কংগ্রেসকে দেখলে কেউ মনে করবে না এরই পতাকাতলে একদিন মিলিত হয়েছিলেন টিলক গোখলে গান্ধী চিত্তরঞ্জন নেহরু সুভাষ। এই সেদিন পশ্চিমবঙ্গে বিধান-সভার নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভ্যরা যে ভাবে তাঁদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন তার চাইতে আনডিগনিফায়েড ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। সত্যি বলতে কি, কোন দলের ব্যাবহারেই ডিগনিটি-বোধের কোন পরিচয় নেই। রাজনীতি জিনিসটা খুব একটা সাত্ত্বিক ব্যাপার নয়, তাহলেও এতখানি তামসিকতা আগে কখনো দেখিনি।

রাজনীতি যখন সর্বগ্রাসী হয় তখন সে সর্বনেশে আকার ধারণ করে। সব জিনিসেরই একটা সীমা নির্দেশ থাকা চাই। আমরা এ ব্যাপারে আমাদের পরিমিতি বোধ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের সমাজ জীবনে এমন কিছু নেই যার মধ্যে রাজনীতি প্রবেশ করেনি। আমাদের আহার বিহার, চাকরি বাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা সংস্কৃতি মায় খেলাধূলা আমোদ প্রমোদ সমস্তই রাজনীতি কবলিত। এর সুযোগ নিয়ে চোর জোচ্চোর, ঘুষখোর, ভেজালকারী, চোরাকারবারী, কালোবাজারী স্থায়ীভাবে সমাজে বাসা বেঁধেছে। কারণ এক দল যার নিন্দা করে, অপর দল তাকেই সমর্থন করে। কাজেই এদেরকে কেউ সমাজ থেকে উৎপাটিত করতে পারবে না। শিক্ষা সংস্কৃতি যেমন সূক্ষ্ম জিনিস রাজনীতি তেমনি স্থূল ব্যাপার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির প্রবেশ—লাইক এ বুল ইন এ চায়নাশপ—একেবারে লণ্ডভণ্ড করে ছাড়ছে। শিক্ষার মান এত নেমে গিয়েছে যে বাঙালী ছেলেমেয়েদের সহজাত বুদ্ধির ধার বহুল পরিমাণে কমে যাচ্ছে। খাদ্যে যতখানি ভেজাল, শিক্ষায় ততখানি। শিক্ষার মান যত কমছে, পি এইচ ডি, ডি লিট-এর সংখ্যা তত বাড়ছে।

স্বাধীনতা অর্থাৎ স্ব-অধীনতার দায়িত্ব যে কতখানি সে আমরা ভেবেই দেখিনি। স্বাধীনতাকে আমরা গ্রহণ করেছি ঐ ইংরেজিতে যাকে বলে

ক্যাভেলিয়ার ফ্যাশানে। এখন আর দুঃখ কষ্ট ত্যাগ স্বীকারের প্রশ্ন নেই; এখন নেতৃত্ব রক্ষার জন্যে শুধু জনপ্রিয়তাটি বজায় রাখতে পারলেই হল। জনপ্রিয়তা রক্ষার সহজতম পন্থা হল নির্বিচারে অনুগ্রহ বিতরণ, সর্বপ্রকারে সকল কাজে সকলকে প্রশ্রয় দান। সমস্ত রাজনীতিটাই হয়েছে প্রলোভনের রাজনীতি—সোজা কথায় বলতে গেলে ঘুষের রাজনীতি। অর্থাৎ আমাকে ভোট দাও, আমি তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেব, ভাতা বাড়াব, ওভারটাইম-এর ব্যবস্থা করব। বিভিন্ন দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে—কে কার চাইতে বেশি সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতি দেবে। এ রাজনীতি কখনো দেশ বা জাতি গড়তে পারে না। ক্রমাগত লাভের লোভ দেখিয়ে সকল রকমে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে জাতির মেরুদণ্ডটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একদিক থেকে ভাগ্যবান বলতে হবে। দক্ষিণপন্থী বামপন্থী দু-এরই অভিজ্ঞতা সে লাভ করেছে। আর কিছু না হোক মোহ-মুক্তি হয়েছে। বুঝে নিয়েছে যে কারো কাছেই কিছু আশা করবার নেই। উভয়েই চতুরানন অর্থাৎ চাতুর্য শুধু মুখের বাক্যে। কাজের বেলায় দু'পক্ষই সমান অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে অনবরত শুনে আসছি যে পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলার অবস্থা সন্তোষজনক। কোচবিহারের ঘটনার পরে জনৈক মন্ত্রী বলেছেন, এরূপ ঘটনা সমাজের পক্ষে কলংকের কথা। সরকারের পক্ষে কলংকের কথা কিনা তা অবশ্য তিনি বলেননি। বাঙালীর স্বভাব ছিল স্পর্শকাতর—একটুতেই বেদনাবোধ করত, লজ্জাবোধ করত, ঘৃণাবোধ করত। এখন তার ঘৃণা লজ্জা বোধ কমে যাচ্ছে। নইলে পর পর এত সব অঘটন ঘটতে পারত না। সর্বহারা কথাটা অতিরিক্ত ব্যবহারে তার তাৎপর্য হারিয়েছে। বাঙালী তার চরিত্র হারিয়েছে বলেই আজ সর্বহারা হয়েছে।

বাঙালী বড় হয়েছিল তার বুদ্ধিমত্তা, কল্পনাপ্রবণতা এবং চিন্তাশীলতার জোরে। এসব গুণের চর্চা ক্রমেই কমে আসছে। পুথিগত শিক্ষা এবং দলগত রাজনীতিই বাঙালীর কাল হয়েছে। বাঁধা বুলি আওড়াতে শিখে অবধি সে ভাবতে ভুলেছে। চিন্তাশক্তির প্রয়োগ নেই বলে তার ইনটেলেক্ট এবং ইমাজিনেশান দু-ই নিস্তেজ হয়ে এসেছে। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই বাঙালী আজ বড় রকমের কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারছে না। বলতে গেলে রাজনীতি-সর্বস্ব তার জীবন, অথচ ভারতীয় রাজনীতিতে তার কোন স্থান নেই। এভাবে চললে আজ যেটুকু আছে দু'দিন পরে তাও থাকবে না। গত কত বছর ধরে যে হিংসা এবং হিংস্রতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, বাংলার রাজনীতি তারই বলি

হবে। আমাদের রাজনীতি ইতিমধ্যেই মারামারি খুনোখুনিতে পর্যবসিত হয়েছে। বাঙালী তার বিদ্যা বুদ্ধি, সভ্যতা ভব্যতা রুচিবোধ সমস্ত বিসর্জন দিয়ে বাহুবলের চর্চায় লেগে গিয়েছে। সেজন্যে আজ বাঙালীকে আর বাঙালী বলে চেনা যাচ্ছে না। এই যাকে আজ লোড-শেডিং বলা হচ্ছে এটি সিম্বলিক। বাঙালী জীবনে আজ ডার্ক এজ বা অন্ধকার যুগ দেখা দিয়েছে।

আশা করে আছি যাঁরা যৌবনে পদার্পণ করেছেন তাঁরা বাঙালীকে রাজনীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করবেন। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক ছেলে-ধরার দল ওৎ পেতে আছে। বিগত জেনারেশানের কথা ভেবে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। অন্ধের ন্যায় পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গেলে অকারণ কলঙ্কভাগী হতে হবে। রাজনীতি ত্যাগ করতে বলছি না, তবে একটু রয়ে সয়ে করতে হবে। বিচারবুদ্ধির দ্বারা আপন পথ তাঁরা আপনি বেছে নেবেন। তাতেই বাঙালী মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার হবে; অব্যবহারে মরচে পড়ে যাচ্ছে। বাংলার নবীন জেনারেশান বাঙালীকে তার স্ব-ভাবে এবং স্ব-ধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন এই বিশ্বাসে আশ্বস্তবোধ করছি।

ভারত ললনা

একদা বাঙালী কবি বলেছিলেন—না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা—এমন খাঁটি কথা খুব কম কবিই বলেছেন। নারী শুধু যে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী এমন নয়, ইংরেজী মতে উত্তমাঙ্গিণী অর্থাৎ কিনা better half। আমাদের ভাষায় উত্তমাঙ্গ বলতে বোঝায় মস্তক। তাহলেই দেখা যাচ্ছে নারীই সমাজের brain বা মস্তিক। অপরপক্ষে সংখ্যা গণনায়ও যে কোন দেশেই নারী লোক-সংখ্যার অর্ধেক। অর্থাৎ গুণে যতখানি গুণতিতে ততখানি। অর্ধেক যদি ঘুমিয়ে থাকে তবে বাকি অর্ধেকও যে ঝিমিয়ে পড়বে তাতে আর সন্দেহ কি? দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত এই কবিতা বা গানটি লেখা হয়েছিল আজ থেকে একশো বছরেরও আগে—অনুমান ১৮৭৫—৭৬ সালে। এই শত বৎসরে ভারতীয় ললনার জাগরণ কতখানি হয়েছে একটু তার হিসেব নিকেশ প্রয়োজন।

আমাদের শাস্ত্রে গৃহিণীকে বলেছে গৃহ। সেই সূত্রমতে নারীসমাজকেই বলব প্রকৃত সমাজ। গৃহে যতখানি গৃহিণীপনার প্রয়োজন সমাজেও ততখানি। নারী যেমন গৃহের শোভা সৌন্দর্য বর্ধন করেন তেমনি সমাজেরও শোভনতা শালীনতা রক্ষা করেন। আমাদের সমাজে আজ সর্বত্র যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তাতে মনে হয় না আমাদের ললনারা খুব যথার্থ ভাবে নারীধর্ম পালন করেছেন। এই একশো বছরে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে, মেয়েরা অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে মুক্ত হয়েছেন, কিন্তু সমাজ পরিচালনার ভার সেই আগেও যেমন পুরুষের হাতে ছিল এখনও তেমনি আছে। এর ফলে আমাদের সমাজে শোভা সৌষ্ঠব তো দূরের কথা আশানুরূপ ভদ্রতা ভব্যতা শৃঙ্খলাও আসে নি।

পুরুষ স্বভাবধর্মে উচ্ছৃঙ্খল, সে শৃঙ্খলা জানেনা। সেখানে নারীকেই শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়। আমাদের সমাজের সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলার ঐ একটি মাত্র কারণ। এখানে পুরুষের পরুষ হস্তের ছাপ যতখানি, নারীর শোভন হস্তের ছাপ ততখানি নেই। আমাদের সমাজে বহুকাল ধরে পুরুষের একাধিপত্য চলে আসছে। পুরুষ মানুষ অমনিতেই হুড়মুড় দুড়দাড় করে কাজ করে, কাজের কোন শ্রী ছাঁদ নেই। মেয়েদের হাত পড়লে এরই মধ্যে একটু সুষমা দেখা দেয়। নইলে শ্রীহস্ত বলবে কেন? তাছাড়া, কাজ তো পরের কথা, মেয়েদের উপস্থিতিই চতুষ্পার্শ্বকে

শ্রীমণ্ডিত করে। একবার ভেবে দেখুন, যে দেশের রাস্তায় ঘাটে স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ মেলে না, যেখানে ইস্কুলে কলেজে মেয়েরা নেই, আপিসে নারী কর্মী নেই, যেখানে উৎসবে ব্যসনে নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ সে দেশকে মরুভূমি বলব না তো কাকে বলব। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, নারীহীন সমাজে আমাদের জন্ম হয়েছিল সে বড় দুঃখের কথা। সে সমাজ জীবনের অনেকখানি শোভা সৌন্দর্য রস থেকে বঞ্চিত। মেয়েদের উপস্থিতি শুধু যে লাবণ্য বিস্তার করে এমন নয়, সমাজের রুচি গঠনে শিষ্টাচার পালনে সহায়তা করে। যেখানে শুধু ছেলেদের মেলা যেখানে ব্যবহারে সব সময় সংযমের বাঁধ থাকে না। কিন্তু যেই মাত্র সেখানে একটি মেয়ে দেখা দিল অমনি অনাবশ্যক উচ্চ কণ্ঠ আপনি মৃদু হয়ে আসবে ব্যবহার সংযত হবে। এই জন্যেই বলছিলাম যে মেয়েদের উপস্থিতি সমাজে ডিসিপ্লিনের কাজ করে। সভ্য মানুষ মাত্রেরই মেয়েদের প্রতি একটা সমীহভাব থাকে। মেয়েদের সামনে সে কখনো যদৃচ্ছ ব্যবহার করে না। এটুকু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে যে, ডিসিপ্লিন জিনিসটা মানুষের সৌন্দর্য-বোধ জাত। যেখানে grace বা লাবণ্য সেখানেই ডিসিপ্লিন, এজন্য অসংযত ব্যবহারকে আমরা বলি graceless বা অশোভন ব্যবহার। আর ঐ যে সমীহ কথাটি বলেছি ওটা কিছু অত্যুক্তি নয়। সুবিখ্যাত ইংরেজী উপন্যাস Tristram Shandy-র একটি উক্তি এই সূত্রে বিশেষ করে মনে পড়ছে, নায়ক Shandy বলেছেন—'That female nicety, madam, and inward cleanliness of mind and fancy in your sex, which makes you so much the owe of ours.' এখানে owe শব্দটি লক্ষ করবার মতো, একেই আমি সমীহ ভাব বলেছি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ কথা বলা হয়েছে ইংল্যাণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ সম্বন্ধে, তখন আমাদের সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার কথা ভাবাই যেত না। আমাদের দেশে ব্রাহ্ম-সমাজেই সর্বপ্রথম এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার মধ্যে দেশে একটি অত্যন্ত সুন্দর এবং রুচিপূর্ণ আবহাওয়া তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন। স্ত্রী-স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে তাঁরা সমাজে যে পরিবর্তন এনেছিলেন তাকে বিপ্লবাত্মক বলা যেতে পারে। পূর্বোক্ত গানটির রচয়িতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সে যুগে ব্রাহ্ম-সমাজের একজন কর্তা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শুধু যে স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যাপারেই অগ্রণী ছিলেন এমন নয় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেরও পুরোভাগে ছিলেন। পূর্বোক্ত কবিতাটিতে ভারতের জাগরণ বলতে তিনি প্রধানত দেশের স্বাধীনতার কথাই ভেবেছেন।

দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। এখন দেখতে হবে স্বাধীনতা এবং জাগরণ এক জিনিস কিনা। স্বাধীনতা লাভের ত্রিশ বৎসর পরে দেশের যে অবস্থা আজ দেখছি তাতে মনে হয় না দেশে সত্যিকারের জাগরণ এসেছে— না পুরুষের সমাজের না মেয়েদের। দেশময় ছেলেরা যে ব্যবহার করছে—চেঁচিয়ে মেচিয়ে ভেঙেচুরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব তছ্‌নছ্‌ করছে—তাতে মনে হয় না এটা সজাগ মানুষের ব্যবহার। বরং ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরলে মানুষ যেমনটা করে এটা অনেকটা সে রকম ব্যাপার—ইংরেজিতে যাকে বলে nightmarish ব্যবহার। আর যাই হোক এটা সুস্থ মানুষের ব্যবহার নয়। আর মেয়েরা? তা, এই সেদিন যাঁরা অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন তাঁরা যখন আজ মন্ত্রী পর্যায় থেকে সমাজের নানাস্তরে জাঁকিয়ে বসেছেন তখন তাঁরা জাগেন নি এমন কথা বলা সাজে না। কিন্তু কার্যত দেখা যাছে এঁরা জেগে ঘুমোচ্ছেন। এটা আরো সাংঘাতিক। ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো যায় কিন্তু জেগেও যে ঘুমোয় তাকে জাগাবে কে? আমাদের মেয়েরা যে জেগে ঘুমোচ্ছেন তার প্রমাণ বহু-সংখ্যক মহিলা এখন শিক্ষায় দীক্ষায় পুরুষের সমান কিন্তু দেশের চেহারা দেখলে মনে হয় না তাঁরা সমাজে কিছু মাত্র প্রভাব বিস্তার করেছেন। সমাজে যে সব অনাচার চলছে তাঁরা সক্রিয়ভাবে তার প্রতিরোধ করছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। সুসভ্য দেশে নারী সমাজই প্রকৃত Vigilance Committee র কাজ করে। পুরুষ সমাজ কোথাও একটা Autonomous body নয়, তারা অনেকাংশে নারীসমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কারণ প্রত্যেকটি পুরুষই মায়ের সন্তান, ভগ্নীর ভ্রাতা, পত্নীর পতি। কিন্তু আমাদের চোরাকারবারী যখন সাততলা বাড়ি ফেঁদে বসে, দামী গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ায়, মা কি কখনো জিগগ্যেস করেন, অত টাকা তোর কোত্থেকে আসছে? কালোবাজারীর স্ত্রী কখনো বলেছেন ও কালো মুখ আর দেখব না? অধার্মিক স্বামীর পত্নীকেও সহধর্মিনী হতে হবে এমন কথা কোন্ শাস্ত্রে বলেছে? কোন ঘুষখোরের স্ত্রীকে কি বলতে শুনেছেন, 'আমি ঘুষের টাকায় কিনব না আর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি।' ভেজালের ব্যবসা করে যে ব্যক্তি মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা করছে তার পত্নীকেও কি পতিপরায়ণা হতে হবে? আমাদের দেশে এখন বিবাহবিচ্ছেদ প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় কোন স্ত্রীকে বলতে শুনি নি অসাধু ব্যবসায়ীর ঘর করব না।

বাঙালীকে বলা হয়েছে আত্মবিস্মৃত জাতি। কিন্তু আমাদের স্ত্রীজাতির ন্যায় আত্মবিস্মৃত জাতি পৃথিবীতে আর নেই। আমাদের দেশে বিশেষ করে বাংলা দেশে নারীকে শক্তিরূপিণী হিসেবে পুজো করা হয়েছে। অথচ আমাদের

ভাষায় কি করে 'অবলা' শব্দের উৎপত্তি হল সে আমি ভেবে পাইনে। এর এক মাত্র কারণ আমাদের বহুবলধারিণীরা নিজেরাই নিজেদের অবলা করে রেখেছেন। আরও মুস্কিল হয়েছে যে, হঠাৎ যখন এঁরা সবলা সাজতে যান তখন আবার মাত্রা জ্ঞান থাকে না। শক্তির প্রকাশ কোথায় এবং কি ভাবে করতে হবে সেটা ঠিক ভেবে দেখেন না।

দেশব্যাপী আজ বিক্ষোভ। সে বিক্ষোভ সরকারের বিরুদ্ধে, মালিকের বিরুদ্ধে নানা প্রকার সুবিধা আদায়ের জন্যে। কিন্তু চোরাকারবার, ভেজাল কারবার, ঘুষ, তহবিল তছরূপ—এসব সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে কোনো বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়েছে এমন তো কই শুনি নি। সরকারের বিরুদ্ধে মালিকের বিরুদ্ধে ক্ষোভের কারণ নেই এমন কথা কেউ বলবে না। পুরুষ মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করতে জানে না। সে যা করে তাই উৎকটভাবে করে অর্থাৎ তার ক্ষোভ বিক্ষোভের আকার ধারণ করে। বিসদৃশভাবে ক্ষোভ প্রকাশের নামই বিক্ষোভ। আমাদের মেয়েরা এখন বিক্ষোভ মিছিলের পুরোভাগে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভে ছাত্রীরাও যোগ দিয়েছেন। ছাত্রীরা কি বলতে পারতেন না আমাদের ক্ষোভ অবশ্যই আমরা প্রকাশ করব, কিন্তু সেটা বিনম্রভাবেই করা যাবে। আর কিছু নয়, যাঁদের আমরা ঘরোয়া আবাহাওয়ায় দেখে অভ্যস্ত ঘেরাও থেকে তাঁরা যদি দূরে থাকতেন তাহলে শুধু ভারত ললনার নয়, ভারতীয় জীবনের শ্রীসৌন্দর্য অনেকখানি বজায় থাকত।

আমরা যে আমাদের মেয়েদের নামের সঙ্গে দেবী পদবী যোগ করে থাকি সেটা ভক্তি-জ্ঞাপক নয়, শক্তি-জ্ঞাপক। দেবতাসদৃশ শক্তি আছে বলেই দেবী আখ্যা। এমন কি নারীচরিত্র সম্বন্ধে যে বলা হয়েছে, দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ তার মধ্যে খানিকটা ব্যঙ্গ মিশ্রিত থাকলেও একটা ভীতির ভাবও এর মধ্যে নিহিত আছে। দেবতারাই এঁদের সঙ্গে পেরে ওঠেন না, পুরুষ তো কোন্ ছার। নারীর এই শক্তির কথা পুরুষরা খুব ভাল করেই জানে, দুঃখের বিষয় মেয়েরা নিজেরাই তা জানেন না। জানলে সমাজের চেহারা তাঁরা বিলকুল পালটে দিতে পারতেন।

মেয়েদের সম্বন্ধে ব্যঙ্গ কৌতুক করে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। কবি সাহিত্যিকদের ওটা স্বভাব। ইংরেজ কবি এ. ই. হাউসম্যান একটি কবিতায় বলেছেন—

When Adam of the apple ate
He had no friend to keep him straight.

God to a wife ! 'twas hopeless odds .

Friends are a deal more help than gods .

তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটি লক্ষ্য করে দেখুন—স্ত্রীর সঙ্গে পাল্লা দেবেন ভগবান ! তবেই হয়েছে। স্ত্রীর হাত থেকে স্বামীকে রক্ষা করা ভগবানেরও সাধ্যের অতীত। রক্ষা করতে পারে কে ? না, তেমন যদি বন্ধু থাকে। এই যে কথাটি এটি ভয়ঙ্কর আপত্তিকর। স্ত্রী কি বন্ধু নয়, তার চাইতে বড় বন্ধু আর কে ? বিপদে আপদে তিনিই রক্ষাকর্ত্রী, পরামর্শদাত্রী। আমাদের মহাকবি স্ত্রীকে শুধু গৃহিণী বলেই ক্ষান্ত হন নি, বলেছেন সচিব—গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ। পুরুষ অনেক সময় মূর্খের মত কাজ করে ; পত্নীরূপিণী মুখ্য সচিব যদি রক্ষা না করেন, মূর্খ পুরুষকে তবে কে রক্ষা করবে ?

অভাব মোচন ও দুঃখ মোচন

মানুষের আদি এবং অকৃত্রিম প্রয়োজনগুলি সবই দৈহিক—খিদের অন্ন, পরিধানের বস্ত্র, গৃহের আশ্রয়। মানুষ যেদিন প্রথম পৃথিবীতে এসেছিল সেদিন এই অভাববোধ নিয়েই এসেছিল। ভাবলে অবাক লাগে কত শত সহস্র বছর কেটে গেল কিন্তু সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের সেই আদিম অভাব আজও পূরণ হল না—অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই। আজকের ভাষায় আমরা এদের নাম দিয়েছি সর্বহারা; নামটা আমার কাছে খুব যথাযথ বলে মনে হয় না। কিছুই যার নেই সে আবার হারাবে কি? আদিম মানুষের ন্যায় আজও যাদের আদিতম অভাব পূরণ হয়নি আমার মতে তারাই প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর আদিবাসী যদিচ আদিবাসী কথাটিও এখন আমরা অন্য অর্থে ব্যবহার করে থাকি। মৌলিক অর্থে আদিম মানুষের অন্নহীন বস্ত্রহীন গৃহহীন জীবন যাকে যাপন করতে হয় সে-ই প্রকৃত আদিবাসী। কিন্তু আদিবাসীরা অনন্তকাল আদিম অবস্থায় থাকবে এমন কোন উদ্দেশ্য বিশ্ববিধানে নিশ্চয় নিহিত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, অন্যান্য প্রাণীর প্রাণধারণের ব্যবস্থা—আহার, গাত্রাবরণ, এমন কি বাসস্থানের ব্যবস্থাও অনেকাংশে প্রকৃতিদেবীই স্বহস্তে করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত করে বিধাতা তাকে অশেষ সম্মানে সম্মানিত করেছেন। মানুষকে বলেছেন, তুমি তোমার আপন বুদ্ধিতে, আপন শক্তিতে এবং অধ্যবসায়-গুণে আপন অভাব মোচনের উপায় উদ্ভাবন করবে। মাতা বসুন্ধরা কামধেনু তাকে দোহন করে নিতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে মানবসভ্যতার মূল কথাটুকু এ-ই।

মাতা ধরিত্রী স্নেহের আঁচল বিছিয়ে রেখেছিলেন সাধ্যমত যেটুকু পেরেছেন সন্তানকে দিতে কার্পণ্য করেন নি। গোড়ার দিকে মানুষের স্থায়ী বাসস্থান বলে কিছু ছিল না, খাদ্যের সন্ধানে স্থান ছেড়ে স্থানান্তরে যেতে হত। ছিল বেদে, বহু শতাব্দী পরে যখন কৃষিবিদ্যা শিখল তখন বেদেরা গৃহী হল। এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসের রীতি-পদ্ধতি যখন আয়ত্ত হল তখন ধীরে ধীরে সমাজ গড়ে উঠল। বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা এসব গৃহীদের উপনিবেশ সবই ছিল স্ব-নির্ভর স্থানীয় প্রয়োজন স্থানীয় উৎপাদনেই মিটে যেত। যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনের ভার বিভিন্ন জনের উপর ন্যস্ত ছিল। শ্রমের গুরু লঘু তার-

তম্য থাকলেও মূলত সকলেই ছিল শ্রমিক কিন্তু গুণকর্ম বিভাগ ক্রমে শ্রেণী এবং বর্ণ বিভাগে পরিণত হল। যারা শ্রমবিমুখ কিন্তু বুদ্ধিতে প্রখর তারা চাতুর্যবলে চতুরানন ব্রহ্মার কৃপাধন্য ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হল। বুদ্ধিবলে যেমন সুবিধা আদায় করা যায়, বাহুবলে তেমনি। এক দল সমাজের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করে ক্ষাত্রধর্মে অর্থাৎ শক্তিচর্চায় মনোনিবেশ করল। উৎপাদন দ্রব্যের বিলিব্যবস্থার মধ্যে যারা একটু লাভের গন্ধ পেলে তারা গ্রহণ করল বৈশ্যবৃত্তি। আর যারা গতর খাটিয়ে উৎপাদনে ব্যাপৃত থাকল তারা হল শূদ্র—সংখ্যায় এরাই গরিষ্ঠ কিন্তু অর্থে সামর্থ্যে কনিষ্ঠ। সূচনাকালে সমাজ গড়ে উঠেছিল সমানাধিকারের ভিত্তিতে। সমাজের উৎপন্ন সামগ্রীতে সকলের সমান অধিকার। শ্রেণী বিভাগের ফলে শোষক শ্রেণীর উদ্ভব হল। যাদের শ্রমে সমাজ পুষ্ট, সংখ্যায় যারা গরিষ্ঠ তারাই হল শোষিত। লোকসংখ্যা যতদিন আয়ত্তের মধ্যে ছিল তত দিন কমবেশী সকলের ভাগেই কিছু জুটত। একেবারে অন্নহীন বস্ত্রহীন গৃহহীন কেউ ছিল না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বণ্টন ব্যবস্থায় ফাটল ধরল —জমি সকলের ভাগে জুটছে না, কেউ খেতে পরতে পাচ্ছে, কেউ পাচ্ছে না। রক্ষণাবেক্ষণের ভার যারা নিয়েছিল সেই ক্ষাত্রকুল রক্ষকুলকেই অর্থাৎ শোষক শ্রেণীকেই রক্ষা করতে লাগল। নগ্ন নিরন্ন নিরাশ্রয় এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হল। সমাজসৃষ্টির আদি পর্বে এই শ্রেণীটি ছিল না এটি আত্মসর্বস্ব সমাজপতিদের সৃষ্টি। এ অবস্থায় সৃষ্টি এক দিনে হয়নি, বহু শতাব্দী ধরে এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়েছে। অবস্থাটা যতখানি দুঃখজনক তার চাইতে বেশী বিপজ্জনক হল এই কারণে যে স্থিতাবস্থা রক্ষা করবার জন্যে কতগুলো সামাজিক নিয়মকানুন গড়ে উঠতে লাগল। এটা সেই চতুরাননদের অর্থাৎ যাদের মুখের কথায় চাতুর্যটাই বেশী সেই তাদের কাজ। অপরকে বঞ্চিত করে চতুর্বর্গ ফল লাভ চতুরজনেরাই করেছে। কথায় কথায় ধর্মের দোহাই দিয়েছে। ধর্ম এবং সমাজের অনুশাসন মিলিয়ে একটা সোশ্যাল ফিলজফি গড়ে তুলতে পারলে তার ঠেকা দিয়ে অনেক অন্যায় অবিচারকেও একটা Respectability বা ভদ্র আবরণ দেওয়া যায়। সমাজের অনুশাসন সুবিধাভোগীদের সুবিধাবাদের ফলে রচিত। তবে এ ব্যাপারে ধর্মকে যতখানি দোষ দেওয়া হয়েছে ততখানি দোষ তার প্রাপ্য নয়। সুচতুর ব্যক্তিরা নানা মতলবে ধর্মকে তাদের কাজে লাগিয়েছে। ধর্ম কখনো এমন কথা বলেনি যে, দরিদ্রের দারিদ্র্য বাড়লে অথবা দুঃখভোগীর দুঃখের বোঝা আরো বাড়লে তার অধিকতর পুণ্যলাভ হবে। এমন কথা কল্পনা করাও অন্যায় যে বুদ্ধ খ্রীষ্টের ন্যায় মহাপুরুষেরা দরিদ্র অসহায় মানুষকে বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্য

নিয়ে কোন প্রকার উপদেশ দিয়েছেন। ধর্মগুরুরা যে ভোগৈশ্বর্য, পার্থিব সুখ ইত্যাদির অনিত্যতার কথা বলেছেন তা বিশেষ করে ধনবান এবং ঐশ্বর্যবানদের উদ্দেশ করেই বলেছেন। ছুঁচের ফাঁক দিয়ে উটের প্রবেশ যেমন অসাধ্য ঐশ্বর্যলোভীদের পক্ষে স্বর্গে প্রবেশ তেমনি অসাধ্য—এ কথা কি দরিদ্রকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে ? খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থে দুঃখ দৈন্য পার্থিব সকল প্রকার কষ্টকে উপেক্ষা করে অবিচল ধর্মনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে জব-এর কাহিনী বলা হয়েছে তিনি দরিদ্র ছিলেন না, প্রভূত সম্পদের অধিকারী ছিলেন। আমাদের পুরাণে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীকে অনুরূপ দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। হরিশ্চন্দ্র রাজা ছিলেন, সত্যধর্মের পরীক্ষা তাঁকে দিয়েই করা হয়েছে।

ধর্ম সম্পর্কে এ যুগের প্রধান অভিযোগ, ধর্ম মানুষকে আপিং যুগিয়েছে ; মানুষের মনকে অভিভূত, অবসাদগ্রস্ত এবং নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যাবে ধর্ম সজ্ঞানে কাউকে নেশার পথ্য যোগায়নি। পূর্বোক্ত মতলববাজ চতুরের দলই ধর্মের অপব্যাখ্যা করে অজ্ঞ অশিক্ষিত জনগণকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছে। তাদের নানা সংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাকেই ধর্মের অনুজ্ঞা বলে শিখিয়েছে। অন্যায় অবিচার উৎপীড়ন সম্বন্ধে তারা যাতে সজ্ঞান না হতে পারে সর্বপ্রকারে সে চেষ্টা করেছে। নিজের দৈন্যদশাকে সর্বনিয়ন্তা বিধাতার বিধান বলে ভাবতে শিখিয়েছে। এ জীবনের দুঃখভোগকে পূর্বজন্মের কর্মফল বলে গ্রহণ করতে বলেছে। আবার এ আশ্বাসও দিয়েছে যে, ইহলোকের দুঃখভোগ পরলোকে অনন্ত সুখের কারণ হবে। ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং অপব্যবহার করেছে অধার্মিকেরা, সেজন্য ধর্মকে দোষ দেওয়া অযৌক্তিক। তালের রসে তাড়ি হয়, তাড়ি খেয়ে মানুষ মাতলামি করে, নানা যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হয় অতএব সব তালগাছ কেটে নির্মূল করে দাও তা হলেই লোক নেশার হাত থেকে রক্ষা পাবে, এমন কথাও এক কালে আমাদের দেশে শোনা গিয়েছে। একটা নেশা গেলে মানুষ আরেকটা নেশা ধরতে পারে। তালগাছ কেটে সমস্যার সমাধান হয় না। পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্র নির্মূল করে দিলেও নেশাগ্রস্ত মানুষের নেশা কাটবে না। পেয়ে বসলে যে-কোন জিনিসই নেশার আকার ধারণ করে। নেশাগ্রস্ত ভাবকে আমরা বলি fanaticism। ধর্মবিরোধী আন্দোলনও মানুষকে fanatic করে তুলতে পারে কারণ সেটাও মানুষকে পেয়ে বসে। আজকের পৃথিবীতে কম্যুনিজমও একটি ধর্মের আকার নিয়েই এসেছে। ভাবে ভঙ্গিতে ধর্মবিরোধী হলে কি হবে, আচারে ব্যবহারে সমগোত্রীয়। ভাষায়ও আশ্চর্য মিল—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের

ভাষায় বলেছে—সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। ধর্ম যতখানি fanaticism এর সৃষ্টি করেছে এখন দেখছি কোন কোন রাজনৈতিক মতবাদ তার চাইতে কিছু কম করেনি। যাক্ আমি নিজে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নই কিন্তু তা হলেও কোন ধর্মেরই যেমন নিন্দা করি না তেমনি কম্যুনিজম-এরও নিন্দা করি না। ধর্ম যেমন মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করেছে কম্যুনিজমও তাই করেছে। দু-এরই যেমন গুণের দিক আছে তেমনি দোষেরও। ধর্ম যদি অজ্ঞ অশিক্ষিতকে বুঝিয়ে থাকে, তোমাকে কিছু করতে হবে না, তোমার বোঝা ভগবানই বইবেন, কম্যুনিজমও তেমনি বলেছে, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, রাষ্ট্রই তোমার সব ভাবনা ভাববে—তোমার খাওয়া পরা বাসস্থানের ব্যবস্থা রাষ্ট্রই সব করবে—হ য ব র ল-র পোষা টিকটিকিগুলোর মতো নাইয়ে খাইয়ে রোদে শুকিয়ে পাট করে রেখে দেবে।

বলা বাহুল্য মাত্র যে, ধর্মের অপব্যাখ্যার জন্যে ধর্ম দায়ী নয়। কোন ধর্মই এমন অবিবেচক নয় যে, মানুষকে অন্নচিন্তা ছেড়ে কেবল ধর্মচিন্তা করতে বলবে। ধর্মেরও একটা সাংসারিক দিক আছে। মানুষ সাংসারিক জীব, সংসার-ধর্ম পালন ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। আজকাল আমরা সর্বদাই বলে থাকি—মানুষ ক্ষুধার্ত জীব, ক্ষুধার অন্ন বা খাদ্যের রূপ নিয়েই ভগবান মানুষের কাছে দেখা দেন। এটা কিছুই নতুন কথা নয়; ধর্মও এ কথাই বলেছে, নইলে তেত্রিশ কোটি দেবতা থাকতে ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণার পূজা কেন! give unto us our daily bread—এটিই মানুষের আদি প্রার্থনা। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, ধর্মের সুযোগ নিয়ে অধার্মিকের দল সরল প্রাণ মানুষের অভাববোধকে অনেকখানি ভোঁতা করে দিয়েছিল। আজকের পলিটিক্স মানুষের মনে অভাববোধ জাগিয়েছে, এ কৃতিত্ব পলিটিক্স-এর প্রাপ্য। নিরীহ নির্জীব জনসাধারণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, মুখে কথা ফুটেছে—তাই তো, খেতে পরতে পাব না কেন, মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই কেন? এত দিন ভেবেছে বঞ্চিত করেছেন ভগবান, এখন বুঝতে পেরেছে বঞ্চিত করেছে সমাজের লোভী সম্প্রদায়। অভাব দূরীকরণের প্রথম সোপান অভাববোধ। আশা করা যায় বহু শতাব্দীর শোষণ এবং বঞ্চনার কিঞ্চিৎ নিরসন হবে। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অধার্মিকের হাতে পড়ে ধর্মের যেমন অপব্যবহার হয়েছে, অবাঞ্ছিতের হাতে পড়ে পলিটিক্সেরও যথেষ্ট অপব্যবহার চলছে। বিবেকবুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা যে-কোন অবস্থারই সুযোগ গ্রহণ করে। পলিটিক্সেও শোষণের পথ প্রশস্ত। যজমানি প্রথা সেখানেও চালু আছে। পুরোতঠাকুর যেমন বলেন, তোমার পুজো করবার অধিকার নেই, আমি তোমার

হয়ে দেবতার কাছে পুজো নিবেদন করব। আমাদের পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসিও প্রকারান্তরে সেই যজমানিবৃত্তি—তুমি শুধু দক্ষিণাটি অর্থাৎ ভোটটি দিয়ে দাও, বাদবাকী সব আমিই করব। ডিক্টেটরশিপ হলে তো আর' কথাই নেই; সেখানকার মানুষ আরো বেশী বশংবদ। দেখা যাচ্ছে মনুসংহিতার যুগে শূদ্রের যে অবস্থা ছিল মার্কস সংহিতার যুগে তার খুব যে একটা পরিবর্তন হয়েছে এমন বলা চলে না। আমার কিসে ভালো হবে সেটা যত দিন অপরে বোঝাতে আসবে তত দিন কোন না কোন আকারে শোষণক্রিয়া চলতেই থাকবে।

আজকের পৃথিবীতে ধর্ম এবং রাজনীতি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি, একজন আরেকজনকে সুনজরে দেখে না। কিন্তু মজার কথা এই যে, দু-এর স্বভাবে আশ্চর্য মিল আছে। ধর্মের উন্মাদনা এবং পলিটিক্সের উন্মাদনা একই অবস্থার সৃষ্টি করে। ধর্মের টানে মানুষ ঘর-সংসার ছাড়ে, বহু ত্যাগ স্বীকার করে, প্রাণ দেয়। উন্মাদনা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বিধর্মীর উপরে হিংস্র ব্যবহার করে। রাজনীতিতেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটে। রাজনৈতিক আদর্শের জন্যে বহু যুবক ঘর-সংসার ছেড়েছে, নির্যাতন বরণ করেছে, প্রাণ দিয়েছে, আবার বিরোধী পক্ষের উপরে হিংস্র আক্রমণ করতেও দেখেছি। এরূপ উন্মাদনার সৃষ্টিও exploitation-এর একটি পন্থা। ধর্ম মানুষকে exploit করেছে, এ কথা যদি মেনে নিই তা হলে বলতে হবে পলিটিক্সও মানুষকে ততখানিই exploit করছে।

এক দিকে যেমন স্বভাবের মিল, অপর দিকে তেমনি আবার ভাবের অমিল। ধর্ম এবং পলিটিক্স—এ দু-এর মধ্যে মস্ত বড় একটা তফাত আছে। বলে নেওয়া ভালো, এখানে পলিটিক্স বলতে বুঝি খাঁটি সৎ পলিটিক্স, ধর্ম বলতেও যথার্থ খাঁটি ধর্ম। পলিটিক্স প্রধানত ভেবেছে মানুষের অভাব মোচনের কথা, ধর্ম ভেবেছে মানুষের দুঃখ মোচনের কথা। এ দু-এ মস্ত বড় তফাত। পলিটিক্স মানুষের মনে অভাব বোধ জাগিয়েছে, অভাব মোচনের চেষ্টাও করেছে এবং কতক পরিমাণে সফলও হয়েছে। কিন্তু অভাব মোচন হলেই দুঃখ মোচন হয় না। অবশ্য অভাবের সঙ্গে দুঃখের কোন সম্পর্ক নেই এমন নয়। অভাব মোচনের ফলে দুঃখ মোচন না হলেও দুঃখের লাঘব হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, মানুষের প্রকৃত দুঃখ গভীরতর জিনিস, সব সময়ে সাংসারিক অভাবজনিত নয়। মানুষের অনেক অভাবই সমাজ সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ সমাজের অব্যবস্থার দরুনই অভাবগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা এত বেড়েছে। কিন্তু মানুষের দুঃখ সব সময়ে সমাজের সৃষ্টি নয়। অভাবজনিত দুঃখ অবশ্যই আছে কিন্তু মানুষের বেশির ভাগ দুঃখ স্বভাবজনিত। মানুষ নিজের দুঃখ নিজেই সৃষ্টি করে। জীবনকে সহজভাবে

গ্রহণ করতে পারলে অনেক দুঃখ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। কিন্তু জীবন ক্রমেই এত জটিল হয়ে উঠছে যে, তাকে সহজভাবে নেওয়াও বড় সহজ নয়। আজকের রাজনীতি এবং টেকনোলজি এই নিত্য অশান্তির ইন্ধন যোগাচ্ছে। আগেই বলেছি রাজনীতি মানুষের অভাববোধকে জাগিয়ে দিয়েছে, আবার সেই সঙ্গে তার তুষ্টিবোধকে বিনষ্ট করেছে। এখন আর কিছুতেই তাকে তুষ্ট করা যায় না। এ মানুষ অসুখী হতে বাধ্য। এর উপরে আবার আধুনিক টেকনোলজি সমাজের প্রয়োজনকে ছাপিয়ে ভোগের এবং আরামের আয়োজন এত বাড়িয়েছে যে দেখে লোকের চোখে তাক লাগছে, মনে তাপ বাড়ছে, কারণ এসব বেশির ভাগ মানুষেরই নাগালের বাইরে। এ শুধু অভাববোধ নয়, দৈন্যবোধ। মানুষ নিজেকে দীন হীন মনে করছে। এদের দুঃখ বোঝা কিছু কঠিন নয়। কিন্তু ভোগের আয়োজনে যাদের কমতি পড়েনি দেখা যায় তারাও সুখে নেই। আসল কথা মানুষ নিজেই নিজের দুঃখের কারণ—তার পাওয়ার শেষ নেই, চাওয়ার শেষ নেই। 'আমি আপন দোষে দুঃখ পাই বাসনা অনুগামি' —এই যে বাসনা-কামনার জ্বালায় জর্জর মানুষ, এ শুধু অভাবগ্রস্ত দরিদ্র মানুষ নয়, বরং অভাবমুক্ত ধনী সম্পন্ন ব্যক্তিরাই বেশির ভাগ এর ভুক্তভোগী। ধনী দরিদ্র কেউ বাসনা-কামনা থেকে মুক্ত নয়, জরা-মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত নয়। বুদ্ধ মানুষের এই দুঃখের কথাই বলেছিলেন এবং মুক্তির পথ নির্দেশ করেছিলেন। খ্রীষ্ট মানুষের অভাবের কথা জানতেন না এমন নয়, কিন্তু মানুষের গভীরতর দুঃখের কথাই বেশি ভেবেছেন। বলেছেন, জীবনকে অনর্থক জটিলতর করে তুলো না। ঐ যে বলেছিলেন, শিশুর মতো সরল হও, তার মধ্যেই সহজ সরল জীবনের নির্দেশ ছিল। আর কিছু না হোক, একটি কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সংসারের সকল অভাব মিটে গেলেও মানুষের জীবনে যে শূন্যতা থেকে যায় পলিটিক্স সে কথা কখনো ভাবেনি ; ধর্ম কিছু করতে পারুক বা না পারুক সে কথা সে গভীরভাবে ভেবেছে।

পলিটিক্সের জীবনবোধ খুব গভীর নয়, প্রাত্যহিকের কলকোলাহলে আন্দোলিত জীবন নিয়ে তার কারবার। জীবনের উপরি স্তরটুকুই শুধু চিনেছে সেজন্যে অন্তর্দৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি কোনটাই ওর খুব বেশি নয়। ধর্ম জীবনের স্রোতে ডুব দিয়ে তল খুঁজবার চেষ্টা করেছে। বিশ্বসৃষ্টির রহস্য, মানবজীবনের রহস্য, ইহকাল পরকাল, মানুষের সুখ দুঃখ, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষের সাংসারিক এবং মানবিক কর্তব্য ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে সে ভেবেছে। সাধ্যমত এসব রহস্যের উত্তর সে খুঁজেছে। রাজনীতির চোখে কোথাও কোন রহস্য নেই ; সে শুধু

সমস্যাকেই বোঝে, রহস্যের ধার ধারে না। সমস্যাকেও তলিয়ে দেখবার তার সময় নেই। একটু বেশী রকম সংসারী বলে সে অতিমাত্রায় ত্রস্ত ব্যস্ত। পারিপার্শ্বিক জীবন এবং দৈনন্দিন ঘটনার দ্বারা এত বেশি আন্দোলিত এবং বিচলিত যে, কোন ব্যাপারে মনঃসংযোগ করা তার পক্ষে সহজ নয়। ধর্ম স্বভাবত ধীর স্থির, একটু ভীরু প্রকৃতিরও বটে। আমাদের দেশে যে ধর্মভীরু বলে একটা কথা আছে সেটা বলতে গেলে আক্ষরিক-ভাবে সত্য। ধর্মভীরু ব্যক্তিটি সারাক্ষণ কাঁচুমাচু হয়েই আছে; বলে, আমি কি বা জানি কি বা বুঝি। রাজনীতির সে সব বালাই নেই। স্বভাবটি রীতিমত arrogant—সব জেনে রেখেছে, সব বুঝে ফেলেছে। সকল সমস্যারই রেডিমেড সমাধান তৈরী আছে।

রাজনীতি এবং ধর্মের মধ্যে একটি মৌলিক ব্যবধান আছে। রাজনীতি দল বেঁধে কাজ করে, ধর্ম একক সাধনার ব্যাপার। ধর্ম যেখানে দল বেঁধে কাজ করতে গিয়েছে সেখানে সেও গোল বাঁধিয়েছে। সেখানে স্বধর্ম ত্যাগ করে সে নিজেকে রাজনীতিতে পরিণত করেছে। ধর্ম একলা স্বভাবের জিনিস বলে তাকে খুব আলগোছে গ্রহণ করা যায়, রাজনীতি তেমন স্বভাবের নয়। সাধনার কথা ছেড়ে দিলেও সৎ এবং সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ সাংসারিক কর্তব্য পালন করে গেলেই ধর্মসাধনা সম্ভব হতে পারে, কেননা স্বভাবে এবং ব্যবহারে ধর্ম কথনই সংসার-বিরাগী নয়। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, ধর্ম বলতে আমি পূজার্চনা বা আচার-অনুষ্ঠান বুঝি না।

রাজনীতি সম্পর্কে নানা কটুবাক্য উচ্চারণ করলেও একটি কথা স্বীকার করতে হবে যে, সমাজজীবনে ধর্মের তুলনায় রাজনীতি ঢের বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়াও বঞ্চিত মানুষের বহু অধিকার সে আদায় করে দিয়েছে। অভাব মোচনের প্রয়াসেও সে একেবারে ব্যর্থ হয়নি। সাধারণের অভাব-অভিযোগের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তাতে কিছু সুরাহাও হয়েছে। মানুষের সুখ-শান্তির কথাও সে ভাবেনি এমন নয়। তবে একগুঁয়ে স্বভাব তো, ভালো করতে গিয়েও কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়েছে ভিয়েৎনামে। সুখের বহর দেখুন। ভারতবর্ষের কথাই ভাবুন—দেশ বিভাগের রাজনীতি কি সুখের রাজ্যই গড়েছে। কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাঁধলে কুরুবংশও ধ্বংস হয়, পাণ্ডবদেরও মহাপ্রস্থানে যেতে হয়। চরম দুর্ভোগ ভোগে সাধারণ মানুষ।

মানুষের দুঃখকে ঠিকভাবে না বুঝলে মানুষের ভালো করতে যাওয়া কথনো সার্থক হয় না। জনসাধারণের সুখ-সুবিধার কথা ধর্ম না ভাবলেও রাজনীতি

ভেবেছে। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়; কারণ সুখের অভাব আর দুঃখ এক কথা নয়। মানুষের দুঃখের কথা ভেবেছেন দার্শনিকরা। বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠাতারাও মূলত দার্শনিক, তাঁরাও ভেবেছেন। মানুষের দুঃখত্রাতা হিসাবেই তাঁরা এসেছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হয়নি। দুঃখের কথা সবচেয়ে বেশি ভেবেছেন এবং বলেছেন কবি-সাহিত্যিকরা। তাঁরাও এর কূলকিনারা পাননি। তবে এর যথার্থ মর্যাদা একমাত্র কবিরাই দিতে পেরেছেন। দুঃখের মহিমা এবং সৌন্দর্য শুধু তাঁরাই বুঝেছেন। এও বুঝেছেন যে, মানুষের দুঃখের সঙ্গে আনন্দের কোথাও যেন একটি মিল আছে। দুঃখের অভিজ্ঞতাই জীবনের সব চাইতে বড় অভিজ্ঞতা, এ কথা কবি-সাহিত্যিক মাত্রই স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে বারংবার বলেছেন, দুঃখের মধ্য দিয়ে, বেদনার মধ্যে দিয়ে পেয়েছি—এটি সকল কবিরই মনের কথা। মানুষের মনের গহনে লুক্কায়িত নিগূঢ় যে দুঃখ তার দূরীকরণ মানুষের সাধ্যাতীত। কবি এবং দার্শনিকরা এর সম্বন্ধে ভেবেছেন, বলেছেন কিন্তু সমাধান কিছু খুঁজে পাননি। দারিদ্র্য বা অভাবজনিত দুঃখের একটা লৌকিক রূপ আছে, সেটা চোখে দেখা যায়, একমাত্র তার বিরুদ্ধেই সাধ্যমত সংগ্রাম করা চলে। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হতে দেখেছি, আবার এর কষাঘাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হতেও দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর তাপ জীবন থেকে যা শোষণ করে নেয় তার দ্বারাই বর্ষণের মেঘ সৃষ্টি হয়। দুঃখ হলধর মূর্তিতে সুতীক্ষ্ণ লাঙল দিয়ে মানবহৃদয়কে বারংবার শত শত রেখায় দীর্ণ বিদীর্ণ করে দিয়ে তাকে ফলবান করে তোলে। আজকের রাজনীতি এ সব কথাকে অবশ্যই তত্ত্বকথা বলে উড়িয়ে দেবে। শুনতে তত্ত্বকথার মতো শোনাচ্ছে, সে কথা আমিও মানি। তা হলেও তত্ত্বকথা সব সময়েই সত্য-বিবর্জিত এমন কথাই বা কে বলবে? এ কথা নিশ্চিত যে, দুঃখ না থাকলে মানুষের জীবন নিরর্থক হত। রিলকে এ যুগের কবি। এ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পরলোকগমন করেছেন, তথাপি আধুনিক কবি বলেই তিনি পরিচিত। এ যুগের দারিদ্র্যনিপীড়িত জনগণকে তিনি জানতেন, আধুনিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদও তাঁর অজানা ছিল না। তিনি যে দুঃখ-দুর্দশার ছবি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন তাকে দেখেছেন।

"less as an injustice to be remedied than as an impressive manifestation of the sublimely inscrutable and awe-inspiring aspects of life and fate, which should not be thoughtlessly eradicated out of deference for shallow notions of social

justice, equality or the greatest possible happiness of the greatest possible number."

লক্ষ করবার বিষয় যে, প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারদের জীবনদর্শনের সঙ্গে রিলকের এই দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যাক, সে আলোচনা এখানে অবান্তর। এ কথা নিশ্চিত যে, মানুষের দারিদ্র্য-দুঃখ এবং সামাজিক অসাম্য দূরীকরণের কথা যাঁরা আজ ভাবছেন তাঁরা রিলকের এই অভিমতরে reactionary আখ্যা দেবেন। আসল কথা, রিলকে মানুষের এই দুঃখ-দারিদ্র্যকে দেখেছেন with a sense of awe and reverence সেজন্তেই বলেছেন, আর্তত্রাণের চেষ্টায় কোন প্রকার প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করো না। রাজনীতির মধ্যে প্রগল্‌ভতা যতখানি সার্থকতা ততখানি নয়। আজকের পৃথিবীতে সাম্যবাদের আদর্শ বলতে গেলে সর্বত্র গৃহীত হয়েছে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সমাজে সমতা আনবার চেষ্টা চলছে, এ ছাড়া বহু সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান নিরন্ন বিপন্ন জনগণের সেবায় নিযুক্ত, কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে, মানুষের দুঃখ দিনে দিনে বাড়ছে বই কমছে না। ধর্ম এবং রাজনীতি উভয়েই যদি প্রগল্‌ভতা ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত সংযত ব্যবহার করে তা হলে মানুষকে সুখী করতে না পারুক, একটু অন্তত সোয়াস্তি দিতে পারবে।

স্নব

বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজি নাম কোন কাজের কথা নয়। কিন্তু স্নব শব্দটার বাংলা প্রতিশব্দ অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। যাহা নাই ভাষাতে তাহা নাই দেশেতে—একথা যদি বলতে পারতুম, তবে খুবই সুখের কথা হ'তো। দুঃখের বিষয়, স্নবারি জিনিসটা ক্রমে সংক্রামক রোগের মত আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। এই তো দেখুন না আপনারা এ পর্যন্ত ইন্দ্রজিতের খাতার দুটি পাতা মাত্র পড়েছেন, তা থেকে আর কিছু মালুম হোক বা না হোক এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছেন যে, আমি একটি প্রথম শ্রেণীর স্নব। যাঁরা এখনও বুঝতে পারেননি, তাঁদের কাছে আমার স্বরূপটা ক্রমশ প্রকাশ্য।

আমাদের ভাষায় স্নব কথার প্রতিশব্দ যে আজ পর্যন্ত দেখা দেয়নি, তার কারণ এ-জীবটি আমাদের সমাজে হালের আমদানি। এ জীবটি বঙ্গজ কুলীন নয়, বিজাতীয় কুলীন। ওর কৌলীন্য জন্মগত নয়, আচারগত—অশন-আসন, বসন-ভূষণে। বংশগত কৌলীন্যের দিন গিয়েছে, এ যুগের কৌলীন্য শিক্ষাগত এবং রুচিগত। আবার যে জিনিস শিক্ষার দ্বারা অধিগত হয়, সে জিনিস ক্রমে মজ্জাগত হয়ে আসে। কিন্তু স্নবের যে কৌলীন্য, সেটা হাড়ে-মাংসে-মজ্জায় লাগে না, বাইরের একটা প্রলেপ মাত্র। ওটা একটা সামাজিক প্রসাধন। যে কালচার বা মানসিক কৌলীন্য একমাত্র সাধনার দ্বারা লভ্য, সে জিনিস প্রসাধনের দ্বারা লাভ করা অসাধ্য।

স্নবারি আমাদের সমাজে হালের আমদানি বললে কথাটা স্পষ্ট হয় না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ইংরেজ আমলের আগে আমাদের দেশে স্নব ছিল না। হঠাৎ একটা নতুন জিনিস এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিলে যে দশা হয়, সেটাই স্নবের মূর্তি। মাইকেল মধুসূদন বোধ করি আমাদের দেশের সর্বপ্রথম স্নব। মহা-প্রতিভাশালী ব্যক্তিরও চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে, মধুসূদন তার দৃষ্টান্ত। এক মোহর দিয়ে চুল ছাটিয়ে বন্ধুদের কাছে এসে বাহাদুরি করা কিংবা বাঙলা কি একটা ভদ্রলোকের ভাষা, ও-ভাষা ভুলে যাওয়াই ভাল—এসব হচ্ছে স্নবের উক্তি। অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেই সেই স্নবারি থেকে তিনি পরে মুক্তি পেয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর স্নবারি তাঁকে বিসদৃশ করেনি, ইণ্টারেস্টিং করেছে। প্রথম ইংরেজীয়ানার উন্মাদনায় অনেকেরই সেদিন মতিভ্রম

হয়েছিল। স্নবারির বন্যায় বোধ করি দেশ ভেসে যেত যদি না বিদ্যাসাগর তার গতিরোধ করতেন। বিদ্যাসাগর পরশুরামের ন্যায় কুঠার-হস্তে সে-যুগের স্নবকুল নির্মূল করেছিলেন। ভূদেব এবং রাজনারায়ণও এ-কাজে সহায়তা করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায় সাময়িকভাবে মাত্র ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। তার পরে আবার এসেছে বন্যা, দ্বিগুণ বেগে। দেখা দিল ইঙ্গ-বঙ্গ স্নবের দল, কুঞ্চিত-ভ্রূ, উন্নতনাসা-নেটিভ সব কিছুর প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা। এরা এক বছর বিলেতে থেকে পঁচিশ বছরের দেশী মাটি জল হাওয়ার আবরণ ঘুচিয়ে আসতেন। পুণ্যসলিলা টেমস্ নদীতে স্নান করে স্নবারি-ধর্মে দীক্ষা নিতেন। আজকাল তো আর অত হাঙ্গামা করতেই হয় না। ফারপোতে লাঞ্চ খেয়ে চৌরঙ্গীর হাওয়া গায়ে লাগালেই স্নবারির স্বর্গোদ্যানে পাসপোর্ট পাওয়া যায়। পশ্চিমী সভ্যতা ধীরে ধীরে আমাদের সভ্যতার ভিত্তিকে জীর্ণ করে দিয়েছে। আমাদের সভ্যতার বাহন মন, পশ্চিমের সভ্যতার বাহন যন্ত্র। যান্ত্রিক মন স্নবারির জন্মভূমি।

এই সূত্রে স্নবারির জন্মবৃত্তান্তটা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে য়ুরোপের সমাজেও স্নবের দর্শন মেলে না। এর আগে ও দেশের ছিল বংশগত কৌলীন্য। যে-জিনিস বনেদী, সে জিনিসের মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। কৃত্রিম শিক্ষা আর ধার-করা রুচিকেই বলে স্নবারি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন। তার ফলে য়ুরোপীয় সমাজে হঠাৎ এক নতুন শ্রেণী দেখা দেয়। এরা বংশগত কুলীন নয়, ব্যবসাগত। হঠাৎ অর্থাগমে এরা সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করেছে, পুরানো অভিজাতদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসেছে। হালচাল, কায়দা-কানুনগুলো ওদের কাছ থেকে রাতারাতি অনুকরণ করেছে। এই অনুকরণসাধ্য আভিজাত্যের নাম স্নবারি। গোড়ার দিকে ছিল দুটি মাত্র শ্রেণী—মুষ্টিমেয় ধনিক আর সকলেই শ্রমিক। ক্রমে উচ্চ মধ্য-বিত্ত, পরে দেখা দিল নিম্ন মধ্যবিত্ত। পূর্বোক্ত অনুকরণপ্রয়াস ক্রমেই সমাজের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, স্নবারিও সেই পরিমাণে বিস্তৃত হয়েছে। এইভাবেই স্নবের জন্ম এবং ক্রমে বংশবৃদ্ধি। আয় যৎসামান্য, কিন্তু ঠাট বজায় রাখতে হবে, এটিই হ'ল নিম্ন মধ্যবিত্তের ট্রাজেডি তথা স্নবারির ট্রাজেডি। ঠাট রাখতে প্রণান্ত, সেই সঙ্গে যদি ঠাটান্ত হ'ত, তবে সমাজ রক্ষা পেত।

আমাদের দেশেও ইংরেজী শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার আমদানির সঙ্গে সঙ্গে স্নবের উৎপত্তি হয়েছে। সদ্য ইংরেজী শিক্ষার গরবে এরা নির্লজ্জভাবে সাহেবিয়ানার মহড়া দিয়েছে। আর একদল ব্যবসার দৌলতে রাতারাতি

বড়লোক হয়েছে। এরা হঠাৎ-গজানো ভদ্দর লোক—আধা দিশী, আধা বিলিতি। রুচি যেখানে বিকৃত সেখানেই ফ্যাশানের জন্ম। ফ্যাশান হচ্ছে রুচির জারজ সন্তান। কাথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বলা দরকার। আমি যাদের স্নব বলছি তাদের নিজস্ব রুচি বলে কোন বালাই নেই, এরা ফ্যাশানধর্মী। এদের রুচি পরকীয়। পররুচি খানা, পররুচি পরনা, পররুচি সব কুছ্‌ করনা। নিজের ভাল লাগা না-লাগাকে বিসর্জন দিয়েছে সামাজিক রুচির কাছে। বিংশ শতাব্দীর রাজসভায় এই জীবটি হচ্ছে দশম রত্ন—নাম পররুচি। ইচ্ছে করলে এই নামটি আপনারা স্নবের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করতে পারেন।

যাক্-গে স্নবদের অনেক নিন্দে করলুম, তাই বলে আপনাদের নিন্দে করিনি কিন্তু। মিছিমিছি কেউ নিন্দে গায়ে পেতে নেবেন না যেন। বরং নিজেকেই গাল দিয়েছি, বলেছি তো আমি নিজে একটি স্নব। কিন্তু স্নবদের ভালোর দিকটাও দেখতে হবে। নিখুঁত এদের ভদ্রতা। তাতে সামান্য একটু আতিশয্য আছে, সেটাতে একটু আলপিনের খোঁচার মত লাগে। তাছাড়া পরোক্ষভাবে এঁরা সমাজের কিছু কল্যাণও করেছেন। এঁরা আমাদের জীবন-ধারণের মান অর্থাৎ standard of living একটু বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেজন্য এঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ভালো খেতে হবে, ভালো পরতে হবে, ভালো থাকতে হবে—সমাজে এই বোধ জন্মানো নিতান্ত প্রয়োজন।

অবশ্য কালোবাজারের কাদা-মাটিতে ইদানীং এক অভিনব স্নব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। কালোবাজারের চুনকালি মাখা এদের মূর্তি। এরা স্নবকুল-কলঙ্ক। দোহাই আপনাদের এদের কখনো প্রশ্রয় দেবেন না। জীবনের সমস্ত decency-কে এরা পায়ে মাড়িয়ে মেরেছে, এ-কথাটি ভুলবেন না। কে যেন বলেছেন—the best way to treat a snob is to tread on his toes until he apologizes.

কালোবাজারী স্নবদের দেখলে দয়া করে এ-কথাটি স্মরণ রাখবেন।

সিনিক

আমার লেখা ব্ল্যাসফেমি নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পরে একাধিক ব্যক্তি রাস্তায় দেখা হতেই আমাকে বলেছেন, আপনার ব্ল্যাসফেমি পড়লুম। বুঝতেই পারছেন, শুনে আমার খুব হাসি পেয়েছিল। বলা বাহুল্য, কথাটা তাঁরা সরল চিত্তেই বলেছিলেন; কিন্তু এর যে তাৎপর্য অন্য রকম হতে পারে সে কথা তাঁরা খেয়াল করেননি। ব্ল্যাসফেমি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা এক আর লেখায়, কাজে ব্ল্যাসফেমি প্রকাশ করা সম্পূর্ণ আর। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমার লেখা ঘেঁটে দেখলে তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে blasphemous উক্তি পাওয়া যাবে। আর এ কথাও সত্য যে, আমি তার জন্য লজ্জিত বা অনুতপ্ত নই। কারণ আমার প্রবন্ধ থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্ল্যাসফেমিকে আমি নিন্দনীয় বলে মনে করি না। বরং যে জিনিস রসসৃষ্টির অনুকূল আমি তারই গুণকীর্তন করে থাকি।

ইতিমধ্যে একজন রসজ্ঞ পাঠক আমাকে একটি ফরমাশ করে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ব্ল্যাসফেমি তত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে ব্ল্যাসফেমার চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু এর যে একটি মাসতুত ভাই আজকের সমাজে আরো জাঁকিয়ে বসেছেন তার সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। এই জীবটির নাম হচ্ছে সিনিক (cynic)। উনি ঠিক কথাই বলেছেন; আজকের সমাজে 'সিনিক' ব্যক্তিটি প্রধানতম চরিত্র না হলেও অন্যতম প্রধান চরিত্র, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। তবে ঐ মাসতুত ভাই কথাটাতে আমার যা একটু আপত্তি। সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে মাসতুত ভাই ব্যাপারটা কিছু খারাপ নয়, কিন্তু বাঙলা ইডিয়াম মতে এর অর্থটা আপনারাও স্বীকার করবেন, তেমন সম্ভ্রমাত্মক নয়। ব্ল্যাসফেমার এবং সিনিক দুজনেই সর্বক্ষণ সর্ব বিষয়ে মানহানিকর উক্তি করে থাকেন, কিন্তু তাই বলে ফিরে এদের দুজনের মানহানি করতে হবে এমন কথা আমি মানি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ব্ল্যাসফেমার এবং সিনিক—উভয়েরই গুণগ্রাহী; কারণ এঁরা দুজনেই সমাজে এবং সাহিত্যে রসসৃষ্টির সহায়তা করেছেন। দু-এর মধ্যে কুটুম্বিতা যদি কিছু থেকেই থাকে তবে মাসতুত ভাই না বলে বরং জ্যাঠতুত ভাই বলা যেতে পারে। কারণ, সিনিকের ভাবভঙ্গিতে স্বভাবে কিঞ্চিৎ জ্যেঠামোর ভাব অবশ্যই আছে; বিজ্ঞজনোচিত একটি বক্র হাসি তার ঠোঁটে প্রায় লেগেই

থাকে। কার কতখানি মুরোদ, কার দৌড় কদ্দূর, কোন কাজের কী দর সব যেন তার জানা আছে। সিনিক মনোভঙ্গি প্রধানত প্রবীণের ধর্ম কিন্তু মজার কথা, এরা বেশির ভাগ বয়সে নবীন। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত খেয়ে জীবনকে জেনেশুনে বুঝে যদি জীবন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা জন্মে তাহলে তাকে বরং মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু যৌবনে প্রবেশ করতে না করতেই যদি কেউ জীবন সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হয়ে ওঠে তাহলে সেটা খানিকটা পাকামো বলেই মনে হয়।

আজকের দিনে ছেলে বুড়ো অধিকাংশ মানুষই সিনিক ভাবাপন্ন। আধুনিক জীবনের frustration থেকে সব উৎপত্তি। এর খানিকটা আভাস আমি পূর্বোক্ত প্রবন্ধেও দিয়েছি। তথাপি বলব, কঠোর বাস্তবের কাছে পরাজয় স্বীকার করা যৌবনের ধর্ম নয়। এ যুবকরা কি তবে যৌবন হারিয়েছেন? না, আমি তা মনে করি না। যুবকেরা যুবকই রয়েছেন। সিনিক মনোভাব এ যুগের একটা pose বা মানসিক ভঙ্গি, ফ্যাশানও বলা যেতে পারে। গভীরতর কোনো জীবনবোধ থেকে এর উৎপত্তি নয়। এটা একজাতীয় নাস্তিকতা, জীবনের সব কিছুতে অনাস্থা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, পুরোমাত্রায় ধর্মজ্ঞান যাঁর আছে তাঁকেই নাস্তিক হলেও মানায়; তেমনি যিনি সত্যিকারের জীবন রসজ্ঞ, সিনিক হবার অধিকার তাঁরই। জীবনের স্বাদ-গন্ধই যিনি পাননি, তিনি সিনিক সাজলে কি হবে, আমি তাকে সিনিক বলে মানতে রাজি নই। সিনিক হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়; কঠিনতম অভিজ্ঞতার মূল্য দিয়ে সেই গৌরব অর্জন করতে হয়।

আজ পৃথিবীময় যে সিনিকের সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার কারণ এটা খাঁটি সিনিসিজম্ নয় এ হচ্ছে সিনিসিজম্-এর এক অতি সুলভ সংস্করণ। এর আদি এবং অকৃত্রিম রূপ সম্পূর্ণ আলাদা। সিনিক দর্শনের আদি কথা যাঁদের জানা আছে তাঁরাই বললেন যে, আজ যাঁরা সিনিক বলে পরিচিত তাঁদের সঙ্গে পুরাকালের সিনিকদের আদৌ কোনো মিল নেই। পূর্বতনরা বিশেষ এক জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন, এঁরা সর্ব বিষয়ে অবিশ্বাসী। ওঁদের ফিলজফি পজিটিভ, এঁদের নিগেটিভ। সিনিক দর্শনের গোড়াকার ইতিহাসটা একটু ঝালিয়ে নিলে কথাটা আরেকটু স্পষ্ট হবে। গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনিস্ (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) cynicism-এর জন্মদাতা বলে পরিচিত। কিন্তু কারো কারো মতে তাঁরও প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে অপর একজন গ্রীক দার্শনিক অনুরূপ মতবাদ প্রচার করে-ছিলেন। প্রচলিত রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠানের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করাই এঁদের প্রধান কাজ ছিল; সমাজের সকল প্রকার অনাচারকে এঁরা অতি কঠোর

ভাষায় নিন্দা করতেন। স্পষ্টবাদিতা এঁদের অন্যতম চরিত্র বৈশিষ্ট্য, কাউকেই ছেড়ে কথা কইতেন না। মার্কাস অরেলিয়াস এঁদের আখ্যা দিয়েছিলেন 'Mockers of mankind'! অবশ্য এঁদের জীবনদর্শন কেবলমাত্র মানব-বিদ্বেষ কিংবা সমাজ নিন্দাতেই পর্যবসিত ছিল না। তাহলে এটিও একটি negative philosophy-তেই পরিণত হত। এঁরা জীবনের সর্বপ্রকার কৃত্রিমতার বিরোধী ছিলেন, জীবনকে যতখানি সরল এবং সহজ করা যায় তারই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের জীবনের সর্বপ্রধান, কাম্যবস্তু ছিল স্বনির্ভরতা—'to have all one needs within oneself'. সর্বং আত্মবশং সুখম্—এই ছিল তাঁদের জীবনাদর্শ। কোনো ব্যাপারেই পরমুখাপেক্ষী হওয়া তাঁরা অপরাধ বলে মনে করতেন। এই কারণে কৃচ্ছ্রসাধন তাঁদের অন্যতম ব্রত ছিল। ডায়োজিনিস্ নিজে কী কঠোর জীবন যাপন করতেন আজকের দিনে তা বিশ্বাস করা কঠিন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে সর্বপ্রকারে খর্ব করে ন্যূনতম উপকরণের সাহায্যে জীবন ধারণ করেছেন। এদিক থেকে এঁরা ঘোরতর আদর্শবাদী। পরে গ্রীস দেশে যে stoic ফিলজফির উদ্ভব হয় সেটি সিনিক দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

জীবনকে সকল প্রকার জটিলতা থেকে মুক্ত করে মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে যতখানি তাকে সংলগ্ন করা যায় তাই এঁদের লক্ষ্য ছিল। এই জন্যে সমাজের বাঁধাবাঁধি কিছুই তাঁরা মানতেন না, রীতিনীতি প্রথাকে উড়িয়ে দিতেন। এমন কি বিবাহ প্রথায়ও এঁদের বিশ্বাস ছিল না। এঁদের মতে নরনারীর সম্পর্ক একমাত্র প্রকৃতির অনুশাসনেই নির্ধারিত হওয়া উচিত, সমাজের অনুশাসনে নয়। এদিক থেকে এঁরা State of Nature-এর পক্ষপাতী ছিলেন।

বাধা নিষেধ, আইন কানুন, রীতি প্রথা, আচার ব্যবহার সকল কিছুর ত্রুটি ধরতেন বলেই এঁরা বিশ্বনিন্দুক আখ্যা লাভ করেছিলেন। কৌতুকের কথা এই যে, এঁদের সম্প্রদায়গত Cynic নামটিও বিরুদ্ধবাদীদের দেওয়া। গ্রীক ভাষায় Cynic শব্দের মূলগত অর্থ 'কুকুর'। সব কিছুতেই খেঁকিয়ে ওঠা কুকুরের স্বভাব। তাছাড়া কুকুরের আরেক স্বভাব হল—ও কোনো কিছুর মানসম্ভ্রম রাখে না, যেখানে সেখানে মূত্র ত্যাগ করে—ল্যাম্প পোস্ট আর তুলসী মূলে কোনো তফাত রাখে না। ঐ সব কারণেই নিন্দুকেরা এঁদের সিনিক আখ্যা দিয়েছিল। তাঁরা সেই অপবাদ শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন। বলেছেন, বেশ, ঐ নামই গ্রাহ্য। আমরা কোনো কিছুকেই অভ্রান্ত মনে করি না, সম্ভ্রান্ত বলেও মানি না। সমাজকে দুরস্ত করতে হলে সব জিনিসের মুখোশ খুলে দিতে হয়,

তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ব্যাপারেরও সম্ভ্রমহানি করতে হয়; সর্বব্যাপারে এদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তির্যক আর বাক্যভঙ্গি তীক্ষ্ণ।

এ যুগের সিনিকরা আদি যুগের সিনিক মতবাদের আদর্শটুকু ভুলে গিয়ে তাঁদের ভঙ্গিমাটুকু শুধু গ্রহণ করেছেন। শেষবাক্য প্রয়োগে এঁরাও সিদ্ধহস্ত। প্রচলিত বিশ্বাসের মূলে আঘাত করা সহজ, কিন্তু তার পরিবর্তে নতুন বিশ্বাসের ভিত্তিতে নতুন জীবনাদর্শ গড়ে তোলা সুকঠিন। এঁরা সেটি করতে পারেননি। এই জন্যেই বলেছিলাম, এঁদের জীবনদর্শন নেতিবাচক। প্রকৃত সিনিসিজম্ জীবন বিদ্বেষী নয়, জীবনের কৃত্রিমতার বিরোধী। আদি যুগের সিনিকরা চেয়েছিলেন জীবনের সরলীকরণ, আধুনিকরা চান লঘুকরণ।

একথা স্বীকার্য যে, আদি ও অকৃত্রিম্ সিনিসিজম্ বহুকাল পূর্বেই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। রেনেসাঁসের যুগে গ্রীক রোমান সভ্যতাকে পশ্চিম ইয়ুরোপ যখন নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে নিলে তখন সিনিসিজম্-এরও রূপান্তর ঘটল। এর সঙ্গে যে asceticism-এর ভাবটুকু যুক্ত ছিল তা সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হল। সিনিসিজম্-এর সংজ্ঞা গেল বদলে। গত কয়েক শতাব্দী ধরেই সিনি-সিজম্ বলতে আমরা বুঝে আসছি জীবনের সর্ব ব্যাপারে অনাস্থা। একে বলা যেতে পারে neo-cynicism, সংসারের কঠোরতম অভিজ্ঞতার ফলে যখন ঐ অনাস্থা জন্মায় তখন সেটাকে অস্বাভাবিক বলা চলে না; সেই অভিজ্ঞতাকে যেমন মূল্য দিতে হয়, অভিজ্ঞতাজাত অনাস্থাকেও তেমনি মেনে নিতে হয়। কিন্তু আজকের সিনিক মনোভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ যে সিনিসিজম্ এককালে সকল প্রকার কৃত্রিমতার বিরোধী ছিল এখন সেই সিনিসিজম্ নিজেই কৃত্রিম হয়ে উঠেছে। এটা যুগের ধারা। এখন সব কিছুতে ভেজাল, সিনিক দর্শনেও ভেজাল দেখা দেবে তাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু একথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, কৃত্রিমতারও একটা রস আছে। আর একথাও নিশ্চিত যে, সরল প্রাণ, বিশ্বাসপ্রবণ মানুষের চাইতে অবিশ্বাসী, দোষান্বেষী মানুষ ঢের বেশি ইনটারেসটিং। গুণগ্রাহী সহজেই হওয়া যায়, দোষগ্রাহী হতে হলে মনকে অনেক বেশি সতর্ক এবং সজাগ রাখতে হয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, দোষান্বেষী ব্যক্তিরা সমাজে সাহিত্যে যথেষ্ট রসের সঞ্চার করেছেন। সাহিত্যরসিক হিসেবে আমি যেমন ব্ল্যাসফেমারের ভক্ত তেমনি সিনিকের। আর সিনিক যদি খাঁটি জাতের হয় তবে তো কথাই নেই। আধুনিক সংজ্ঞা মতেই বলছি—মানুষ আজীবন যেসব ধ্যান-ধারণা মনেপ্রাণে লালন করে এসেছে, অকস্মাৎ কোনো নিষ্ঠুর আঘাতে যখন বিশ্বাসের

নিরাপদ আশ্বাস বিনষ্ট হয়ে যায় তখন যে অবিশ্বাসীর জন্ম হয় তারই নাম সিনিক। সেই সিনিকের অপূর্ব চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে হ্যামলেট চরিত্রে। নাটকের প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত হ্যামলেট ঘোরতর সিনিক, কিন্তু বরাবর তিনি যে তা ছিলেন না তারও আভাস গ্রন্থের মধ্যেই আছে। নাটকের ঘটনাবলী ঘটবার আগে ডেনমার্কের রাজপুত্রকে আমরা দেখিওনি, চিনিওনি; শুধু ক্ষণেকের জন্যে তাঁর উজ্জ্বল মূর্তিটি আমাদের চোখে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছে ওফেলিয়ার মুখে একটি স্বগতোক্তিতে—

O, what a noble mind is here o'erthrown!
The courtier's, soldier's, scholar's eye, tongue, sword;
The expectancy and rose of the fair state,
The glass of fashion and the mould of form,
The observed of all observers, quite down!

আদর্শ চরিত্র। বিদ্যায় বুদ্ধিতে, শৌর্যে বীর্যে, গুণে গরিমায় এমনটি দেখা যায় না, সকলের চোখের মণি। এই হচ্ছে হ্যামলেট যা ছিলেন, আর নাটকের হ্যামলেট হল সংসারের নিষ্ঠুর আঘাতে হ্যামলেট যা হয়েছেন। ডেনমার্কের রাজকুমারের মুখে—Denmark's a prison—শুনতে বড় অদ্ভুত লাগে। বলেছেন, সমস্ত দেশটাই এক বিরাট কারাগার। কী বিষম তিক্ততা! Frailty, thy name is woman—সিনিকের বিষোদ্গার। সিনিসিজিম্ যে কি ভয়ঙ্কর নিষ্করুণ হতে পারে তার চরম দৃষ্টান্ত ওফেলিয়াকে উদ্দেশ করে—Get thee to a nunnery: why wouldst thou be a breeder of sinners? ইত্যাদি। হ্যামলেটের কাহিনী যতই হৃদয়বিদারক হোক, হ্যামলেটের মানব-বিদ্বেষ, জীবন বিতৃষ্ণা অপূর্ব রসের সঞ্চার করেছে। এমন সিনিক স্বয়ং বিধাতাও সৃষ্টি করতে পারেন না, একমাত্র শেক্সপীয়ারই পারেন। শেক্সপীয়ার-সাহিত্যে আরো দু-চারটি সিনিক আছেন। টাইমন অফ এথেন্স তো বটেই। ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডার অন্যতম চরিত্র থ্যারসিটিস্ (Thersites) বলতে গেলে একেবারে মডার্ন সিনিক। এ যুগের সাহিত্যেও অনেক সিনিক চূড়ামণির সৃষ্টি হয়েছে, এঁরাও আমাদের রসের ভাণ্ডারে যথেষ্ট যোগান দিয়েছেন।

লক্ষ করবার বিষয় যে, সাধারণ মানুষরা চেষ্টা করলেও সিনিক হতে পারে না। সাহিত্যে যেমন, বাস্তব জীবনেও দেখা যায় এঁরা তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি এবং অধিকাংশক্ষেত্রে মহানুভব প্রকৃতির মানুষ। দুনিয়ার হালচাল দেখে, বিশেষ করে মানুষের অকৃতজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে পেয়ে এমন মানুষেরও মন তিক্ত বিষাক্ত

হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর, এমন মানব-প্রেমিক সংসারে ক'জন জন্মেছে? সেই দয়ার সাগরও শেষ জীবনে সিনিক হয়ে উঠেছিলেন। বন্ধুব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে জানালেন, অমুক আপনার বড় নিন্দা করছিল। বিদ্যাসাগর অবাক হয়ে বললেন, সে আবার মিছামিছি আমার নিন্দা করে কেন? তার তো কোনো উপকার আমি করিনি। এ হল সিনিকের উক্তি এবং অসাধারণ উক্তি। সাধারণ মানুষের মুখে এমন কথা সহজে যোগাবে না। বলা বাহুল্য, এ সিনিসিজম্ অনেক উঁচুদরের জিনিস। সংসারের সকল মানুষকে যিনি মনে প্রাণে ভালবাসেন, অথচ মূর্খ এবং অকৃতজ্ঞ মানুষরা যখন সেই ভালবাসায় উদ্দেশ্য আরোপ করে তখন মনে যে বেদনার সঞ্চার হয়, সেই বেদনা থেকে এই সিনিসিজম্-এর জন্ম। এর সৌন্দর্য অতুলনীয়। এই দরের সিনিকও সংসারে বিরল।

সাধারণ ক্ষেত্রে সিনিক মাত্রই চতুরানন অর্থাৎ কিনা মুখের কথায় চাতুর্যটাই প্রধান। অমিট্ রায়ের মতো এঁরা শাণিয়ে বলা কথা আগে থেকেই বানিয়ে রেখে দেন। এদিক থেকে এঁরা বিদূষণে ওস্তাদ অর্থাৎ নিন্দুক, সকল কিছুর নিন্দা করে বেড়ান, অপরপক্ষে বাকচাতুর্যে সকলের মনোরঞ্জন করেন। এককালে বিদূষকের কাজকে সামাজিক শিল্প বলে গণ্য করা হত। আজকের সিনিক বৃত্তিও সেই দাবি করতে পারে। তাই বলে শুধু যে বিনোদন কার্যেই এর ব্যবহার এমন নয়, বুদ্ধিমান লোকেরা একে সাংসারিক ব্যাপারেও ব্যবহার করে থাকেন। কারণ, ঠোঁট বাঁকিয়ে সব কিছুকে যদি উড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে জীবনের অনেক দায়িত্বকে দিব্যি এড়িয়ে চলা যায়। সমাজে এই জাতীয় সিনিকের সংখ্যাই বেশি। আমি নিজেও এই শ্রেণীর একজন সিনিক।

ব্ল্যাসফেমার এবং সিনিক—এই দু-এরই এক জায়গায় একটি মিল আছে। এঁরা দুজনেই ইংরেজিতে যাকে বলে iconoclast—এঁরা প্রতিমাভঙ্গকারী, মূল্য হননকারী। মূল্য বিবর্তনের দ্বারাই যুগ বিবর্তন সাধিত হয়। প্রচলিত মূল্যবোধকে এঁরাই প্রতি যুগে চ্যালেঞ্জ করে এসেছেন। 'দস্যুর মতো ভেঙে-চুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা' কিংবা 'প্রাচীন সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেলা'—একথা এঁদের প্রতিই প্রযোজ্য এবং এদিক থেকে এঁদেরকেই বলা যায় যুগ-প্রবর্তক। সিনিকদের সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার মনের মিল আছে এমন নয়, তথাপি আমি যে এঁদের তারিফ করে থাকি তার কারণ, ওঁদের ঐ চ্যালেঞ্জের ভাবটা আমার ভালো লাগে। বেশ লাগে যখন দেখি কত কত গণ্যমান্যদের এঁরা নগণ্য করে দেন। কোন পুরুষই মহাপুরুষ নয়, কোনো রমণীই দেবী

কিংবা অপ্সরা নয়, কোন স্থানই পীঠস্থান নয়, কোন যুগই সত্যযুগ নয়। স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে এঁরা একেবারে নির্বিকার। বলা বাহুল্য এরূপ নির্বিকার মন যথার্থ জ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ।

ক্লাউন

বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজি নামে আমি এখন আর কোন আপত্তির কারণ দেখি না। বিদেশী পোশাক পরেও মানুষটা যদিও স্বদেশী থেকে যেতে পারে তাহলে ইংরেজি নাম শিরোধার্য করলেই বাংলা প্রবন্ধের লজ্জায় মাথা কাটা যাবে কিংবা জাতি নাশ হবে এমন আশঙ্কার কোন হেতু দেখি না। আমি একবার যখন ব্ল্যাসফেমি নামে একটি বাংলা প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তখন যদ্দূর জানি, পাঠক সমাজে সেটা ব্ল্যাসফেমি বলে বিবেচিত হয়নি। ইতিমধ্যে অবশ্য পাঠকসমাজেও মেজাজের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। ক্লাউন শিরোনামে প্রবন্ধ লেখার দরুন লেখক স্বয়ং যদি ক্লাউন সাব্যস্ত হন তাতেও অবাক হবার কিছু নেই; এবং সে কারণে আমার মনে কোনো ক্ষোভেরও উদয় হবে না। কারণ আজকের সমাজে আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে ক্লাউন।

দু'শ বছর ধরে ইংরেজদের সংস্পর্শে থেকে আমাদের শিক্ষিত সমাজ অশন-আসন, বসন-ভূষণে এত বেশি ইংরেজি-ভাবাপন্ন হয়েছে যে কথায়বার্তায় এখন অনেকেরই ইংরেজি বাংলার ভেদজ্ঞান থাকে না। ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে আমরা সারাক্ষণ যে একটা দো আঁশলা ভাষা ব্যবহার করি সেটা নিয়ে অনেকেই হাস্য পরিহাস করে থাকেন, আমি তাকে খুব একটা নিন্দার ব্যাপার বলে মনে করি না। ভাষার ক্রমবিকাশে এর একটা মস্ত বড় স্থান আছে। বহু ব্যবহারে কোনো কোনো বিদেশী শব্দ দিশী ভাষার রক্ত মাংস মজ্জার সঙ্গে দিব্যি মিশে যায়। এ সব বর্ণসংকর শব্দ ভাষাকে বলিষ্ঠ তো বটেই, অনেকখানি বর্ণাঢ্য করে তোলে। সব দেশের ভাষাতেই এ ব্যাপারটা ঘটেছে এবং যত বেশি ঘটেছে তত তার প্রাণশক্তি বেড়েছে। বাংলা প্রতিশব্দ নেই বলেই যে আমরা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি এমন নয়, অনেক সময় দেখা যায় কোনো কোনো ইংরেজি শব্দ বাংলা প্রতিশব্দটির চাইতে ঢের বেশি লাগ-সই। অর্থাৎ ভারতচন্দ্র যে কারণে বলেছিলেন—'অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল', ঠিক সেই কারণেই আমরাও কহি ভাষা ইংরেজি মিশাল। ভারতচন্দ্র যে প্রসাদ-গুণের উল্লেখ করেছিলেন বর্তমান প্রবন্ধের 'ক্লাউন' কথাটিকে সেই প্রসাদ-গুণ বিশিষ্ট শব্দ বলেই আমি মনে করি।

আমি ভাষাতাত্ত্বিক বা শব্দতাত্ত্বিক নই, ক্লাউন শব্দের উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তি

নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু যে মানুষটি সমাজ-জীবনে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলকে হাসির খোরাক যুগিয়ে বেড়ায় সমাজে সে মানুষটির আবির্ভাব কি করে হল, সে বিষয়ে সকলেরই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এটিকে আমি সমাজ-বিজ্ঞানের একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রশ্ন বলে মনে করি। জীব হিসাবে মানুষের ক্রমবিকাশ এবং সমাজবদ্ধ জীবনের উদ্ভবের সঙ্গে এ প্রশ্নটি জড়িত। সমাজ বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে কিছু বলেছেন কিনা আমি জানি না। সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে ভাষা-বিজ্ঞানের একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। ভাষাতাত্ত্বিকরা ইচ্ছা করলে সমাজ-বিজ্ঞানের অনেক সমস্যার উপরে যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারেন, এবং করেছেনও। তবে পণ্ডিত ব্যক্তিরা সাধারণত এত সব গুরুতর ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন যে সামান্য ক্লাউনে-এর প্রতি দৃষ্টি-পাত করবার সময় তাঁদের হয়েছে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অতএব আমি নিজে যেমন যেটুকু ভেবেছি সেটুকু আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করছি।

মানব-শিশু জন্ম মুহূর্তে কাঁদে। মানব ইতিহাসের আদি কথা যদিচ আমাদের স্পষ্টত জানা নেই তথাপি মনে হয়, জন্মলগ্নের এই কান্নাটি অনাদি কাল থেকেই চলে আসছে। কান্না জিনিসটি বোধ করি মানব-শিশুর প্রাক্তন-জন্ম বিদ্যা। এই বিদ্যাটি নিয়েই সে জন্মগ্রহণ করেছে কিংবা সম্পূর্ণ অপরিচিত সংসারে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র এটিই তার অতি-স্বাভাবিক এবং তাৎক্ষণিক দৈহিক প্রতিক্রিয়া। এ কথা নিশ্চিত যে এ বিদ্যাটি কেউ তাকে শেখায়নি। কিন্তু এই সূত্রে অনেক সময় আমার মনে অপর একটি প্রশ্ন জেগেছে। সেটি হল—মানুষ হাসতে শিখল কবে থেকে? এটিও কি তার প্রাক্তন-জন্ম বিদ্যা কিংবা জন্ম-মুহূর্তে অধিগত? যদি তাই হত, তাহলে জন্ম-মুহূর্তে কোন শিশু কাঁদত, কোনো শিশু হাসত। তা যখন হয় না তখন ধরেই নিতে হবে যে হাসিটি তখনও ঠিক তার আয়ত্তে আসেনি। তবে সকলেই জানেন যে জন্মের অনতিকাল পর থেকেই শিশু ঘুমের মধ্যে কখনও কখনও হাসে; লোকে বলে 'দেয়ালা' করছে। কিন্তু—সেই আদিকালের শিশুরাও এ ভাবে হাসত কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দেখা যায় জীবজগতে একমাত্র মানুষই হাসতে জানে অন্য কোন প্রাণী হাসে না। আদি মানুষ আর জীবজন্তুতে খুব একটা তফাৎ ছিল না. আকৃতিতে প্রকৃতিতে সে অনেকাংশে বন্য জন্তুর মতই ছিল। কাজেই এমন মনে করা অযৌক্তিক নয় যে অন্যান্য জীবজন্তুর মত আদি মানুষও হাসতে জানত না। আনন্দবোধ সব জীবের মধ্যেই আছে এবং তা প্রকাশেরও প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ভঙ্গি বা রীতি

আছে। কুকুর খুশিতে লেজ নাড়ে, বেড়াল গলায় এক রকম শব্দ করে। আদি মানুষও বোধহয় অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা কিংবা কণ্ঠধ্বনি দ্বারা আনন্দ বা উল্লাস প্রকাশ করত। সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে মানুষের ভাষাও ছিল না। তার ভাষা কোথেকে এল সেও এক রহস্য। শিশুরও ভাষা নেই, কানে যা শোনে তাই থেকেই ভাষার টুকরো টাকরা সে সংগ্রহ করে। শিশুর প্রথম উচ্চারিত ভাষা—সম্পূর্ণ বাক্য নয়, অসংলগ্ন শব্দ মাত্র। আদি মানুষের ভাষাও ছিল অসংলগ্ন শব্দের সমষ্টি। শব্দই ভাষার মৌলিক উপকরণ। কানে শোনা শব্দ থেকেই মানুষের ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। আদি মানুষ প্রধানত কোন্ শব্দ, কিসের শব্দ শুনেছে? শুনেছে ঝোড়ো হাওয়ার শো শো শব্দ, কখনো গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের গুঞ্জন ধ্বনি, স্রোতস্বিনীর কল কল, খল খল শব্দ, কখনো বা পাখির কলরব—আকাশে বা বাতাসে জলে স্থলে অরণ্যে প্রান্তরে প্রকৃতির মুখে যত রকমের শব্দ তাই সে শুনেছে। রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় বলেছেন—এই সব শব্দকেই বুনো ঘোড়ার মত পোষ মানিয়ে মানুষ নিজ ভাব প্রকাশের বাহন হিসাবে ব্যবহার করছে। এ ভাবেই অতি ধীরে ধীরে মানুষের ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। বলা বাহুল্য ভাব প্রকাশের অঙ্গ হিসাবে হাসি কান্না দু-ই মানুষের ভাষার অন্তর্গত। কান্নাকে বলেছি প্রাক্তন-জন্ম বিদ্যা কিন্তু হাসি সে জাতীয় বিদ্যা নয়, এটি মানুষের অর্জিত বিদ্যা। প্রাণী হিসাবে মানুষ যখন ক্রমবিকাশের পথে বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছে তখনই সে হাসতে শিখেছে। অবশ্য আগেই বলেছি, অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় আনন্দ প্রকাশের অন্য কোন ভঙ্গি নিশ্চয় আগে থেকেই তার জানা ছিল। সভ্যতার প্রসাদ পেয়ে মানুষের মন যখন প্রসন্ন হতে শিখেছে তখনই মানুষ হাসতেও শিখেছে। হাসি জিনিসটা সভ্যতার সৃষ্টি। আদি যুগে মানুষ নিজ প্রয়োজনে পাথর বা কাঠের গুড়ি দিয়ে নানা রকম হাতিয়ার তৈরী করেছ; সে সবের চেহারা যেমন ছিল মোটা তেমনি ভারি। প্রথম প্রথম মানুষের আনন্দ প্রকাশের রীতিও ছিল তেমনি স্থূল বা crude। নেচে কুঁদে চেঁচিয়ে মনের উল্লাস প্রকাশ করত। বর্বর মানুষের হাসির মধ্যেও বর্বরতার ছোঁয়াচ ছিল, তাকে সুন্দর বলা চলত না। আজকের মানুষের পক্ষে তাকে হাসি বলে চেনাই কঠিন হত। সভ্য মানুষের হাসি সূর্যালোকের ন্যায় সমস্ত মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করে। এ হাসি একদিনে মানুষের আয়ত্ত হয় নি। আর আদি যুগের মোটা মোটা হাতিয়ার যেমন শত শত বৎসরের ক্রমোন্নতির ফলে শিল্প বস্তুর আকার ধারণ করেছে সভ্যতার ক্রম-বিকাশে মানুষের আকৃতি প্রকৃতিও তেমনি ধীরে ধীরে বদলিয়েছে। তার

চেহারা, তার চলন বলন, তার বসন ভূষণ, তার আনন্দ বেদনা প্রকাশের ভঙ্গি ক্রমে ক্রমে শিল্পায়িত রূপ ধারণ করেছে।

বহু শত বৎসর ধরে কেবলমাত্র জীবন ধারণের প্রয়াসেই মানুষের সর্বশক্তি ব্যয়িত হয়েছে। খাদ্যের অন্বেষণেই দিনমান কেটে যেত, রাত্রি কাটতো নিরালোক অন্ধতা আর বন্য জন্তুর ভয়ে। অন্য কথা ভাববার অবসর ছিল না। মানুষ তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জীব, আনন্দের অবকাশ বলতে গেলে ছিলই না। যখন কৃষি বিদ্যা আয়ত্বে এল তখন খাদ্য সমস্যার একটা সুরাহা হল। প্রাণধারণের ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল, দুর্ভাবনা কমল, অবকাশ বাড়ল, ভাববার চিন্তা করবার সময় হল। সভ্যতার জন্ম সেই সেদিন থেকে। বোধ করি সেদিনই তার মুখে সত্যিকারের হাসি ফুটেছে। আবার যেদিন থেকে মানুষ নিশ্চিন্ত মনে হাসতে শিখেছে সেদিন থেকেই সমাজ বলতে আমরা আজ যা বুঝি সেই মনুষ্য সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করেছে বটে কিন্তু সেটা প্রাণের দায়ে। এখন সমাজ সৃষ্টি হল প্রাণের আবেগে। মানুষের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না মানবিক এবং সামাজিক রূপ পেল।

মানুষের জীবনে যেদিন থেকে কিঞ্চিৎ অবসর জুটেছে সেদিন থেকেই তার মনে নানা শখের উদয় হয়েছে। এবং সেই তখন থেকেই সভ্যতারও সূচনা হয়েছে। বর্বরের কোন শখ নেই, সে তার দৈহিক প্রয়োজনটুকু নিয়েই ব্যস্ত। সভ্য মানুষ প্রয়োজনের বাইরে মনের নানা শখ মেটাবার চেষ্টা করে। অবসর সময়ে মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে কত জিনিস সে নিজের হাতে তৈরি করেছে। সে সব জিনিস নিত্য দিনের কাজে লেগেছে এমন নয়, কিন্তু আপন হাতে গড়তে গিয়ে নিজেও প্রচুর আনন্দ পেয়েছে, অপরকেও আনন্দ দিয়েছে। চারুকলার উদ্ভব এ ভাবেই হয়েছে। সভ্য সমাজের অনেক রকমের দাবি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবসর ক্রমেই বেড়েছে আর সেই সঙ্গে তার মাথাও নানান দিকে খেলতে শুরু করেছে। কারণ অবসর কাটাবার জন্যে বহু আয়োজন বহু সরঞ্জাম প্রয়োজন। বহুবিধ গুণচর্চার শুরু সেই থেকে হয়েছে—গান বাজনা, নৃত্য গীত, চিত্রকলা, খেলাধূলা; সেই সঙ্গে সঙ্গে গল্প গুজব আড্ডা অর্থাৎ রসালাপ।

মানুষ মনের আনন্দে হাসে, সেটা তার নিজস্ব জিনিস। কিন্তু শুধু ঐটুকু নিয়ে খুশি থাকেনা। নিজে যাতে রস পেয়েছে, অপরকে তা দিতে চায়। তার হাসির আনন্দটি সে রসিয়ে অপরের কাছে পরিবেশন করে। এই থেকেই হাস্যরসের জন্ম—এটি সমাজ জীবনের পরিণত বয়সের সৃষ্টি। হাস্যরস সভ্যতার

মস্ত বড় অঙ্গ। তবে মনে রাখতে হবে যে গোড়ার দিকে মানুষের হাসিটা ছিল একটু স্থূল। মোটা রকমের রসিকতাই চলতি ছিল। নানা রকমের অঙ্গ ভঙ্গি করে, রং ঢং করে কথা বলাটাই হাস্যরসের প্রধান উৎস ছিল। এর মধ্যে খুব একটা বুদ্ধির প্রয়োজন হত না। এমন কি অনেক সময় নিজেকে হাস্যকর করেই অপরকে হাসির যোগান দিতে হত। কিন্তু এই যে মানুষটি ঢং তামাসা করে লোককে আনন্দ দেবার চেষ্টা করত, ছেলে বুড়ো সকলেরই সে ছিল প্রিয়পাত্র। উৎসবে, ব্যসনে, আড্ডায় মজলিশে সে-ই জমিয়ে রাখত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের রসবোধ বাড়ল, হাস্যরস সূক্ষ্মতর হয়ে এল। লোকের কথা-বার্তায়, আচারে ব্যবহারেও একটি মার্জিত ভাব এল ইংরেজিতে যাকে বলে urbanity, ততদিনে শহর গঞ্জ গড়ে উঠেছে। শহর গ্রামের তফাতটাও ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। 'গেঁয়ো' 'পাড়াগেঁয়ে' ইত্যাদি কথার সৃষ্টি হল। এতকাল মানুষ যে ধরনের রঙ্গ তামাসায় আনন্দ পেয়ে আসছিল এখন সে সব তাদের চোখে খুব স্থূল মনে হতে লাগল। মার্জিত রুচির মানুষরা যে জিনিস পছন্দ করে না তার গায়ে একটা তাচ্ছিল্যের লেবেল এঁটে দেয়। তাদের দেওয়া এর নতুন নাম হল ভাঁড়ামো। আমরা যাকে বলি ভাঁড়, ইংরেজরা তাকে বলে ক্লাউন। এই ক্লাউন কথাটিরও মূলগত অর্থ চাষা—গেঁয়ো, অজ্ঞ, অমার্জিত মানুষ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ভাঁড়ই বলুন আর ক্লাউনই বলুন, এ সব পরবর্তী কালে শহুরে লোকেদের দেওয়া নাম। তবে প্রথমাবধিই কথাটা নিন্দাছলে ব্যবহৃত হয়েছে এমন নয়। ইংরেজ কবি সাহিত্যিকরা 'ক্লাউন' কথাটিকে সাদাসিধে ভাবে চাষী মজুর পাড়াগেঁয়ে লোক অর্থে বহুকাল ধরেই ব্যবহার করে আসছিলেন। তাতে নিন্দার ভার কিছুই ছিল না। কবি কুপার এর উক্তি—Tne clown the child of nature, without guile—এ তো রীতিমত প্রশংসার কথা। মেকলে খুব পুরোনো দিনের লোক নন, তিনি তার হিস্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড-এ লিখেছেন—The somersatshire clowns with their seythes …faced the royal horse like old soldiers. এখানেও কাস্তে হাতে গ্রাম্য চাষীদের কথাই বলা হয়েছে, কিছুমাত্র তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা হয় নি। বরং প্রশংসার সুরেই কথাটি বলা হয়েছে। মানুষের ইতিহাসে আর শব্দের ইতিহাসে সাদৃশ্য আছে। উভয়ের জীবনের উত্থান পতন ঘটে। কত কত শব্দের অধঃপতন ঘটেছে, কৌলীন্য নষ্ট হয়েছে। আবার বহু পতিত শব্দ শুধু যে জাতে উঠেছে এমন নয়, রীতিমত আভিজাত্য লাভ করেছে।

স্বীকার করতেই হবে এখন ক্লাউন বলতে সহজ সরল নিষ্পাপ (কুপার বর্ণিত

without guile) গ্রাম্য চাষী বোঝায় না। এখন সে একটি হাস্যস্পদ জীব, অত্যন্ত স্থূল প্রকৃতির একটি মানুষ— উদ্ভট কথাবার্তা, অদ্ভুত চালচলন, অশোভন আচরণ। দূর অতীতে যখন প্রথম সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল তখন সে রং ঢং করে লোককে আনন্দ দেবার চেষ্টা করেছে। লোককে হাসিয়েছে কিন্তু নিজেকে হাস্যস্পদ করে নি। লোকে তাকে গুণিজন হিসাবেই দেখেছে। বহু যুগ পরে সমাজ যখন অধিকতর সুসম্বদ্ধ হয়েছে তখন সামাজিক জীবনে প্রত্যেকটি মানুষকেই একেকটি জীবিকা অবলম্বন করতে হয়েছে। ততদিনে সমাজে আমোদ ফুর্তির প্রয়োজন এবং আয়োজন বেড়েছে। উদ্ভটের, অদ্ভুতের চাহিদা বাড়তে লাগল। নানা মজাদার ঢং করে লোককে হাসানোও একটা জীবিকা হয়ে দাঁড়াল। ভাঁড়ামো করে যদি মানুষ জীবিকার্জনে, পরিবারে প্রতিপালনে সক্ষম হয় তাহলে বলতে হবে যে সমাজের পক্ষে অন্যান্য ভদ্রজনোচিত ব্যবসা-বলম্বী—উকিল মোক্তার, ডাক্তার মাস্টার, কেরানী দোকানী যতখানি আবশ্যক, ভাঁড়ও ততখানি। সমাজ তাকে অত্যাবশ্যক বোধেই সানন্দে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ওর সেই প্রতিষ্ঠা ও নিজেই নষ্ট করেছে। গুণপনা দেখাতে গিয়ে ও ক্রমেই ভাঁড়ামোর মাত্রা বাড়িয়েছে; সে বাড়াবাড়িটা সকলে বরদাস্ত করেনি। আর যারা বরদাস্ত করেছে তারা লোকটিকে ঐ রংদার ভূমিকার বাইরে স্বাভাবিক মূর্তিতে যখন দেখেছে তখনও তাকে দেখে হেসেছে। বোধ করি তখন তার সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেও ভাঁড়ামোর ভাব এসে গিয়েছিল। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনেও লোকটি নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন ক্লাউন হয়ে গিয়েছে। ক্লাউন কথাটা এখন একটা গালাগালিতে পরিণত হয়েছে। অথচ দেখুন ক্লাউন মানুষটি নির্গুণ মনুষ্য নয়। অপরকে আনন্দ দেবার জন্যে সে বোকা সাজে; কিন্তু সকলেই জানেন যে খুব বুদ্ধিমান না হলে কেউ বোকা সাজতে পারেনা। তাছাড়া, আনন্দ দেবার জন্যে নিন্দা শিরোধার্য করে নেওয়া মস্ত বড় স্যাক্রিফাইস বলতে হবে। মহাপুরুষেরা পরহিতের জন্যে মাথায় কাঁটার মুকুট পরেছেন আর ক্লাউন পরের ফুর্তির জন্যে মাথায় গাধার টুপি পরেছে। আপনারা যাই বলুন, স্যাক্রিফাইস্ হিসাবে এ দু'য়ের মধ্যে আমি খুব একটা পার্থক্য দেখি না। সত্যি বলতে কি, যথার্থ সমাজসেবী হিসাবে তাকে আমি বরাবর অতি উচ্চ সম্মানের অধিকারী বলে মনে করে এসেছি। আজকে সেই সম্মানের আসন থেকে সে বিচ্যুত; কেন, তার আভাস এই মাত্র দিয়েছি, পরে আরো বলব।

ক্লাউন বলতে যার কথা সর্বাগ্রে আমাদের মনে পড়ে সে সার্কাসের ক্লাউন।

কুশলীদের চাইতে বেশী ছাড়া কম প্রয়োজনীয় নয়। ক্লাউন না থাকলে সার্কাসের আদ্ধেক আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যেতে। ছেলে বুড়ো সকলের কাছে সে সমান প্রিয়। ক্রীড়া নৈপুণ্যেও সে কারো চাইতে ন্যূন নয়। সব খেলাতেই তার কিছু পারদর্শিতা আছে কিন্তু ভাবটা দেখায় যেন সে আনাড়ি। ওস্তাদেরা খেলা দেখায়। সেও সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদি দেখাতে যায়। কোনটাই ঠিক পেরে ওঠে না; একটা কিছু করতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তার আনাড়িপনা দেখে সকলে হাসে কিন্তু বুঝতে বাকি থাকে না যে ঐ আনাড়িপনাটা একটা ভান, ওটা তার অভিনয়। তার যা প্রধান কাজ সেটাই সে করে—আগেই বলেছি লোককে আনন্দ দেবার জন্যে বোকা সাজে।

সার্কাস তো খুব বেশী দিনের ব্যাপার নয়; কিন্তু ক্লাউন চরিত্রটি বহু পুরাতন। প্রচীন গ্রীক লাতিন নাটকে একটি টাক-মাথা, হোঁৎকা চেহারার চরিত্র দেখা যেত। বোকার হদ্দ, উদ্ভট কথা বলে, উদ্ভট কাজ করে দর্শকদের হাসত। এরাই ক্লাউনের পূর্বপুরুষ। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকরাও এই পর্যায়ভুক্ত। রস রসিকতায় রাজা এবং পারিষদ বর্গের মনোরঞ্জন করাই তার একমাত্র কাজ ছিল। এদের সমগোত্রীয় চরিত্র পরবর্তী যুগে দেখা গিয়েছে এলিজাবেথীয় নাটকে। এ-সব বিদূষকরা court fools নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা রঙ্গ রসিকতা করে রাজা রাজড়ার মনোরঞ্জন করতেন। তাদের হাল্কা কথাবার্তায়, এমন কি আপাতশ্রবণে আবোলতাবোল উক্তির মধ্যেও অনেক সময় গভীর সত্য নিহিত থাকত। এ-সব তথাকথিত fools প্রকৃতপক্ষে রীতিমত জ্ঞানী ব্যক্তি। শেক্সপীয়ার-এর বহু নাটকেই এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শুধু যে কমেডি বা হাস্যরসাত্মক নাটকের ক্লাউন চরিত্রের পশার ছিল এমন নয়। ট্রাজেডির হৃদয়বিদারক ঘটনাবলীর মধ্যেও ক্লাউন-এর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। ট্রাজেডির শ্বাসরোধকর আবহাওয়াটাকে খানিকটা সহনীয় করবার জন্য মাঝখানে এক আধটু রঙ্গরসিকতার অবতারণা করা হত। নাট্যরীতিতে একে বলে কমিক রিলিফ। সেই রিলিফটুকু পরিবেশন করত সর্বজনের প্রিয় ক্লাউন। কিং লীয়ার এবং তাঁর fool দুজনেই সাহিত্য জগতে অমর হয়ে আছেন। হ্যামলেট নাটকে ঘটনাবলী যখন ক্রমেই জটিল এবং রহস্যময় হয়ে উঠেছে তখন হ্যামলেট স্বয়ং রাজ-সভায় একটি নাটকের প্রযোজনা করেছেন। নিজেই বলেছেন, এ নাটকে সব কিছু থাকবে—রাজা, রানী, উজির নাজির, যোদ্ধা, প্রেমিক—এরা সব তো থাকবেই, এছাড়া প্রাণ খুলে যারা হাসতে চায় তাদের জন্যে থাকবে ক্লাউন "the clown shall make those laugh whose lungs are tickle o' the sere"

তবে সাধারণ দর্শকের কাছে শেক্সপীরীয় fool-দের চাইতে অধিকতর জনপ্রিয় ছিল নিছক ক্লাউন অর্থাৎ ভাঁড়—নিতান্তই অঙ্গভঙ্গির রঙ্গ দেখিয়ে, হাসি মস্করা করে যারা শ্রোতা বা দর্শকদের মনোরঞ্জন করত। প্রাচীন গ্রীক লাটিন নাটকের অনুকরণে এই ক্লাউন চরিত্রটি পরবর্তীকালে ফরাসী, জার্মেন, সকল নাটকেই বিভিন্ন নামে দেখা দিয়েছিল। গায়ে ঢিলেঢালা জবরজঙ্গ পোশাক, পায়ে প্রকাণ্ড আকারের জুতো আর ইয়া বড় একটা নকল নাক লাগিয়ে কিম্ভুতকিমাকার চেহারা করে মঞ্চে হাজির হত। যা কিছু করতে যাবে তাতেই একটা অঘটন ঘটবে। চেয়ারে বসতে যাবে তো চেয়ারটি ভেঙে ধপাস করে পড়বে। স্থান কাল পাত্রের ভেদ জানে না। যেখানটাতে তার আসবার কোনই প্রয়োজন নেই ঠিক সেখানটাতে সে এসে হাজির হবে, যে সময়ে তার কোন প্রয়োজন নেই ঠিক সে সময়টিতে তার আসা চাই। একটি মূর্তিমান রসভঙ্গ। ক্রমাগত রসভঙ্গ করেই সে রসের উদ্রেক করে। এক সময়ে আমেরিকান নাটকেও এ চরিত্রটি একটি বিষণ্ণ প্রকৃতির লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরের মূর্তিতে দেখা দিয়েছিল। নিজে একটু বিষণ্ণ প্রকৃতির মানুষ কিন্তু তার কার্যকলাপে লোকে না হেসে পারত না। চার্লি চ্যাপলিন পরে এই চরিত্রটিকেই নিজের কাজে লাগিয়েছেন। চ্যাপলিন যে চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন তাকে দেখে লোকে যেমন হাসে তেমনি আবার হঠাৎ কখন চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে। এটা অবশ্য চ্যাপলিনের নিজস্ব অভিনয়-প্রতিভার কৃতিত্ব। এ সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই যে মানুষটি নাট্যমঞ্চে, সার্কাসে ক্লাউনের ভূমিকা নিয়ে নিজেকে বোকা বানিয়ে, হাস্যকর করে, নানাভাবে নিজেকে নাস্তানাবুদ করে উদরান্ন সংগ্রহের চেষ্টা করছে, এটিও জীবন নাট্যের একটি করুণ দৃশ্য।

যে কারণেই হোক ক্লাউন জাতীয় চরিত্রের প্রতি সকলেরই একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। শেক্সপীয়ার কত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন কিন্তু ফলস্টাফ্-এর কাছে কেউ লাগে না। বিশেষ করে ইংরেজ সমাজে এটিই সব চাইতে জনপ্রিয় চরিত্র। অথচ ফলস্টাফকে কেউ আদর্শচরিত্র ব্যক্তি বলবে না; ওর স্বভাবে অনেক গলতি আছে কিন্তু তা থাকলেও অনেক সাধু সজ্জনের চাইতে ও ঢের বেশি সহজে মানুষের মন কেড়ে নিতে পারে। আর. এল. ষ্টিভেনসন সে কথাটি বড় সুন্দর করে বলেছেন—"And though Falstaff was neither sober nor very honest, I think I could name one or two long-faced Barabbases whom the world could better have done without."

গল্প উপন্যাসেও ক্লাউন চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে কিন্তু সার্কাস বা নাট্যমঞ্চে চোখের

সম্মুখে প্রত্যক্ষ বলে এখানে সে ঢের বেশি জীবন্ত।

ক্লাউনকে আমরা সাধারণত সিনেমা থিয়েটার সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতেই অভ্যস্ত। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে লোকে শুধু হাসবার জন্যে পয়সা খরচ করে সিনেমা থিয়েটারে যায় না। হর্ষে বিষাদে, তরলে গম্ভীরে তাকে অনেক জিনিস মিলিয়ে তবে এ সবের পূর্ণ উপভোগ সম্ভব। সার্কাসেও ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখবার জন্যেই লোকে যায়—ক্লাউনের রং ঢং, হাসি তামাসাটুকু উপরি পাওনা। রঙ্গ তামাসার জন্য মানুষকে যদি টিকেট কিনে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে যেতে হয় তাহলে সেটা আর স্বাভাবিকের পর্যায়ে থাকে না। সমাজে হাসি তামাশার স্থান অনেক বেশি ব্যাপক। হাসি রঙ্গ সমাজ জীবনের নিত্য দিনের অঙ্গ। ক্লাউনের রসিকতা পেশাদারী ব্যাপার, তার জন্যে স্থান কাল নির্দিষ্ট থাকে। উৎসবে, ব্যসনে রাজদ্বারে সে আমাদের প্রিয় বান্ধব। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সে বেশ একটু বেখাপ্পা ; কারণ জিনিসটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। আবার যে জিনিস স্বাভাবিক নয় সেটা ঠিক সামাজিকও নয়। সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, চণ্ডীমণ্ডপে, বৈঠকখানায় একটি হাস্যরসের ধারা নিত্য প্রবাহিত। এই হাস্যরসটিই সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বলা বাহুল্য এ হাসি ক্লাউনের হাসি নয়। ক্লাউনের হাসি পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। সমাজের হাসি আলো জল হাওয়ার মতো স্বতঃউৎসারিত মুক্তধারা। তার মধ্যে বিশেষ একটি শ্রী আছে। কিন্তু ক্লাউন যে সং সেজে ঢং করে, সেই রঙ্গরসিকতা অনেক নিম্নস্তরের। মানুষ মাত্রেরই—সে যে কাজই করুক—একটা ডিগনিটি আছে। ক্লাউন সব সময়ে নিজের ডিগনিটি রক্ষা করে চলে না, ডিগনিটি বিসর্জন দিয়ে লোকের মনোরঞ্জন করে। এর ফলে সমাজে তার আদর যতখানি, সমাদর ততখানি নয়। সকল সমাজেই গুণ-কর্ম-বিভাগ বলে একটা ব্যাপার আছে (আমরা অবশ্য সেটাকে জাতি ধর্মের পর্যায়ে এনে ফেলেছি)। কিন্তু তাহলেও ক্লাউন বলে একটা আলাদা শ্রেণী কোন সমাজেই ছিল না। সব সমাজেই এরা সংখ্যায় ছিল অল্প, তাই রক্ষে। আতিশয্য করতে গিয়ে ক্লাউন যেমন তার ডিগনিটি নষ্ট করেছে, ক্লাউনের সংখ্যাধিক্য ঘটলে সমাজেরও তেমনি ডিগনিটি নাশের আশংকা থাকে। আর সমাজ যদি সামগ্রিকভাবে তার ডিগনিটি হারিয়ে ফেলে তাহলে দেশসুদ্ধ সকল মানুষই অল্পাধিক পরিমাণে ক্লাউন হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে সে আশঙ্কাটা অতি প্রবল হয়ে উঠেছে।

ক্লাউন ভেবে চিন্তে স্বেচ্ছায় লোককে হাসাবার বৃত্তি গ্রহণ করে। কিন্তু

মনে রাখতে হবে যে লোককে হাসানো এক কথা আর লোক হাসানো অন্য কথা। এখন সর্বক্ষণ সর্বত্র দেখা যাচ্ছে বহু লোক আপন অজ্ঞাতেই কথায় বার্তায়, আচার ব্যবহারে, কাজে কর্মে দিব্যি লোক হাসিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা নিজেরাই জানে না যে কখন নিজেদের অজ্ঞাতসারে তারা ক্লাউন-এ পরিণত হয়েছে। সমাজে এক আশ্চর্য শিথিলতা দেখা দিয়েছে; উচিত অনুচিত, শোভন অশোভন বোধ কমে যাচ্ছে। ফলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাচ্ছে। সভ্য সমাজের একটা সঙ্গতিবোধ এবং মাত্রাজ্ঞান আছে; কোন জিনিসেরই মাত্রাধিক্য সে বরদাস্ত করে না। স্থান কালের পরিমিত পরিধির মধ্যে একটি দুটি রঙ্গপ্রিয় মানুষ থাকলেই সমাজের সজীবতা রক্ষা হয় কিন্তু দেশশুদ্ধ মানুষ যদি রঙ্গরসিকতা শুরু করে দেয় তাহলে আর সমাজের শালীনতা বজায় থাকে না। সারা দেশে আজ সেই দুর্গতি দেখা দিয়েছে। শিক্ষিত বাঙালী সমাজের মুখমণ্ডলে একটি সহজাত সুষমা ছিল; সেটি দ্রুত লোপ পাচ্ছে। অশিক্ষিত অমার্জিত মানুষের চেহারায় যেমন একটা চোয়াড়ে ভাব থাকে বাঙালী সমাজের মুখে ক্রমেই যেন সেই চোয়াড়ে ভাব এসে যাচ্ছে। সমগ্র সমাজ যখন দলবদ্ধভাবে ক্লাউন সাজে তখন এই দশাই ঘটে। বিনা প্রয়োজনে হাত পা ছুঁড়ে, নেচে কুঁদে, চেঁচিয়ে মেচিয়ে লোকের দৃষ্ট আকর্ষণের চেষ্টাকেই বলা যেতে পারে ক্লাউন বা বাফুন-এর স্বভাব। আজকের সমাজে যেদিকেই তাকানো যায় সেদিকেই ক্লাউন আর ক্লাউনের কসরৎ। ক্লাউনের খেলা দেখবার জন্যে এখন আর সার্কাস বা থিয়েটারে যেতে হয় না; রাস্তায় ঘাটে, হাটে বাজারে, মাঠে ময়দানে, সমাবেশে, শোভাযাত্রায় লোকসভায়, বিধানসভায়, সরকারী দপ্তরে, ইস্কুল কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র ক্লাউনের খেলা। জনসভায় নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শুনলে (ইদানীংকালের বক্তৃতা অবশ্য শুনবার জিনিস নয়, দেখবার জিনিস) আস্থার সঞ্চার যতটুকু হয় তার চাইতে ঢের বেশি হয় কৌতুকের উদ্রেক—ডেমাগগ্ এবং ক্লাউন-এ এক পদক্ষেপের মাত্র ব্যবধান। ক্লাউন যেমন এক অভিনেতা, ডেমাগগ্ও তেমনি। দু'এর মধ্যেই ন্যাকামি এবং ভণ্ডামি প্রচুর। সেই ইংরেজ বাগ্মীপ্রবরের কথা মনে পড়ছে। খুব তোড়জোড় করে বক্তৃতা শুরু করেছিল—Friends, I stand upon the soil of liberty—শ্রোতাদের মধ্যে একজন ছিল জুতোবিক্রেতা; দাঁড়িয়ে উঠে বললে, Excuse me, sir, you stand upon a pair of boots for which you have not paid me. একটু খুঁচিয়ে দেখলে সকলেরই স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে যায়।

খাঁটি মানুষ বলতে গেলে এখন আর সমাজে নেই। কালোবাজার আর

চোরাবাজারের ছোপ সকলের গায়েই কম বেশি লেগে গিয়েছে। আমরা কেউ বাদ যাই না। তাছাড়া এ সব এখন আর দোষের বলে গণ্য হয় না। বড় জোর এ নিয়ে লোকে একটু রঙ্গ রসিকতা করে ; সকলেই হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। ভণ্ডামি আর ভাঁড়ামি, কালোবাজারি আর বাফুনারি এক সঙ্গে মিশে গিয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবিকঙ্কন ভাঁড়ু দত্তর যে চরিত্রটি এঁকে দিয়েছিলেন সেটি সমাজ জীবনের বিশেষ একটি টাইপ। বলা বাহুল্য দেশশুদ্ধু লোক ভাঁড়ু দত্ত ছিল না ; একটি দুটি ভাঁড়ু দত্তই সমস্ত সমাজকে তটস্থ রাখতে পারত। রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাব্যের ভক্ত ছিলেন না কিন্তু ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, এটি আমাদের সমাজের একটি সর্বাঙ্গীন চরিত্র। ঠিক কথাই বলেছেন—ভাঁড়ু দত্তর মরণ নেই, অদ্যাবধি সশরীরে বিদ্যমান তো আছেই—শক্তিতে প্রতিপত্তিতেই এখন তার দবদবা অবস্থা। চরিত্রের জৌলস আরো বেড়েছে। কবিকঙ্কনের সৃষ্টি—ভাঁড়ু দত্ত লোকটা পাজি ছিল কিন্তু ভাঁড় ছিল না। লক্ষ্য করবার বিষয় যে পূর্ব যুগের ক্লাউন ভাঁড় ছিল কিন্তু পাজি ছিল না। এখন পেজোমির সঙ্গে ভাঁড়ামি যুক্ত হয়ে ভাঁড়ু দত্তর মোক্ষম সংস্করণ সমাজে দেখা দিয়েছে। এরাই হল আধুনিকতম ক্লাউন।

সমাজের এ অধঃপতন একদিনে হয়নি। অধিকাংশ মানুষের আচারে ব্যবহারে নানা অসঙ্গতি বহুদিন ধরে চলতে থাকলে জাতীয় চরিত্র ক্রমে ক্ষয়ে যেতে থাকে। শিক্ষিতেরা অশিক্ষিতের মতো ব্যবহার করে, বয়স্করা শিশুর মতো। স্থান কাল পাত্রের বিবেচনা বোধ থাকে না। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। খেলা দেখাটা আনন্দের ব্যাপার তাই বলে দর্শকের গ্যালারিতে বসে শাঁখ বাজানো, কাঁসর ঘণ্টা পিটানো আর যাই হোক স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এ ধরনের সামান্য বিচ্যুতি থেকেই সমাজে ঘোরতর বিকৃতি দেখা দেয়। সমাজ বহুকাল ধরে এজাতীয় নানা অসঙ্গতি দেখেও নির্বিকার থেকেছে, বড় জোর মজা পেয়েছে কিন্তু লজ্জা পায়নি। এখন সেই অবসাদগ্রস্ত সমাজ রীতিমতো বিকারগ্রস্ত। সমগ্র সমাজই নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। মানুষ এখন আপন নিজস্বতা বজায় রেখে একলা চলতে ভুলে গিয়েছে। এখন সমস্তই বারোয়ারি, ব্যক্তিগত কিছু নেই, সবই দলগত। তাতে শক্তি বাড়ে কিন্তু বুদ্ধি কমে। কোন্‌টা মানায় কোন্‌টা মানায় না সে বোধ লোপ পেয়ে যায়। বারোয়ারি ইয়ুনিয়ন বারোয়ারি লুটতরাজ—এবং সেই সুবাদে এখন পরীক্ষায় বারোয়ারি লিখন প্রথা। দশে মিলি করি কাজ—যাই করি নাই লাজ। সমাজ লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছে। বারোয়ারি সব ব্যাপারই যে ইয়ার বকশীর

ব্যাপার সে কথা আমরা মনে রাখি না নইলে সহজেই বোঝা যেত যে বারোয়ারি প্রভাবিত সমাজ-জীবন প্রকৃতপক্ষে ক্লাউনের জীবন। চতুর্দিকে আজ যে জীবন দেখছি তাকে বারোয়ারি বাফুনারি ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

একশোবার স্বীকার করব, বিষম দুর্দিন, যে কোন ব্যক্তির পক্ষে মতিস্থির রাখা কঠিন। অভাব অভিযোগের অন্ত নেই। প্রত্যেকেরই মনে ক্ষোভ থাকাটা স্বাভাবিক। তাহলেও বলব যে অতি তীব্র ক্ষোভও ভদ্রভাবে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু এখন লোকে আর ক্ষোভ প্রকাশ করে না, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। প্রকাশ করা আর প্রদর্শন করা এক জিনিস নয়; ক্ষোভ আর বিক্ষোভও এক ব্যাপার নয়। ক্ষোভকে খুব বিকটভাবে প্রকাশ করলে তবে বিক্ষোভ হয়। আর সেটা প্রদর্শন করতে গেলে মানুষের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যায়। হাত পা ছুঁড়তে হবে, গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে হবে, চুল খাড়া হয়ে উঠবে, কপালের শিরা ফুলে উঠবে তবে তো বিক্ষোভ প্রদর্শন সার্থক হবে। আগেকার দিনে ক্লাউনের যে চেহারা আমরা দেখেছি—গায়ে ঢলঢলে জবরজঙ্গ পোশাক, পায়ে প্রকাণ্ড জুতো, মুখে ইয়া বড় এক নকল নাক—তার মধ্যে একটা অতিকায়তা এবং অতিশয়তা আছে। একটু ভাবলেই দেখতে পাবেন যে আজকে আমরা বিক্ষোভকারী মানুষের যে মূর্তিটি দেখি আতিশয্যের দিক থেকে ক্লাউন মূর্তির সঙ্গে তার খুব একটা বৈষম্য নেই। আর শুধু বিক্ষোভকারী কেন, আমরা কেউ বাদ যাই না। আজকে যে সমাজে আমরা বাস করছি তার বিচিত্র পোশাক, বিচিত্র বাচন ভঙ্গি বিচিত্র ক্রিয়া কাণ্ড সমেত তার ভাবমূর্তিটি যদি একবার মনশ্চক্ষে দেখবার চেষ্টা করেন তাহলে নিঃসন্দেহে একটি ক্লাউনের মূর্তি আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

মস্তান

ছেলেটা বোধ করি একটু ভালমানুষ গোছের, সেইজন্যই খামোকা হঠাৎ চটে গেল। আমার সামনের বাড়ির পৈঠেতে বসে গুটি চার-পাঁচ ছেলে আড্ডা দেয় সকাল বিকেল বাঁধা। আজও বসে গল্প করছিল। ছেলেটি সামনে দিয়ে যাচ্ছে, তাকে ডেকে বললে—এই যে মস্তান কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ছেলেটি এক নজর তাকিয়ে যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। সে যে ওদের সমগোত্রীয় নয়, ভাবেভঙ্গিতে সেটা ঘোষণা করবার একটু চেষ্টা বোধ করি ছিল। পৈঠেতে বসা ছেলেদের মধ্যে একজন বলে উঠল, কি হল, মস্তান বলাতে মান গেল বুঝি? ছেলেটি বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, মস্তান কে তা তো চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। ইঙ্গিতটা ওদের ঝাঁকড়া চুল আর লম্বা জুলপির প্রতি। ছেলে-গুলো চেঁচিয়ে বলল, আরে আমরা তো বলেকয়েই মস্তান, তুমি যে ছদ্মবেশী মস্তান, তুমি আরোই সাংঘাতিক।

মস্তান নামধারী এসব ছেলেদের অনেকদিন ধরেই দেখে আসছি। লোক-মুখে এদের সম্বন্ধে অপবাদ যতখানি শুনি, কার্যত তার প্রমাণ ততখানি পাই নি। চলনে বলনে, ধরন ধারণে, পোশাকে আসাকে একটু চক্ষু-পীড়নকারী ভাব অবশ্যই আছে তাহলেও খুব একটা ভয়ংকর জীব বলে এদের কখনই মনে হয় নি। বরং এর উল্টোটাই প্রমাণ কখনো কখনো পেয়েছি। পাড়ায় কারো বিপদ আপদ ঘটলে এরাই সর্বাগ্রে ছুটে আসে, অসুখে বিসুখে ডাক্তারের বাড়িতে ছোটে, রাস্তার মাঝখানে কারো মোটর বিগড়িয়েছে তো এরাই সোল্লাসে ঠেলে-ঠুলে কাছাকাছি কোন গ্যারাজে পৌঁছিয়ে দেয়, আবার পাড়ায় কেউ চক্ষু মুদল তো শ্মশানযাত্রায় সমান উৎসাহে স্কন্ধ দিতেও প্রস্তুত থাকে। ওদিকে আবার পাড়ার উৎসবে ব্যসনে এরাই প্রধান উদ্যোগী। আমাদের শাস্ত্রমতে যে ব্যক্তি উৎসবে ব্যসনে, রাজদ্বারে শ্মশানে চ সর্বদা হাজির থাকে তাকেই বলে প্রকৃত বান্ধব। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এসব প্রকৃত বান্ধবদের কেউ বন্ধু হিসাবে দেখে না। তার কারণ আজকাল সকল উৎসবে ব্যসনের অংশটাই বড়, সেজন্য চাঁদার অঙ্কটাও একটু ভারি। সেই চাঁদা উশুল করতে গিয়ে এদেরও ফিরে কিছু মাশুল দিতে হয় অর্থাৎ কিনা পাড়ার লোকের বিরাগভাজন হতে হয়। কোথাও একটা হাঙ্গামা ঘটলে পাড়ার লোকেরা তৎক্ষণাৎ বলবে, আর বলেন কেন, এসব

ঐ মস্তানদের কাণ্ড। আর রাজার চর তো পা বাড়িয়েই আছে—কারণে অকারণে এদেরই ধরে নিয়ে রাজদ্বারে হাজির করছে।

প্রশংসা কারো মুখেই শোনা যায় না কিন্তু নিন্দার বেলায় সকলেই পঞ্চমুখ। এদের যে কেউ সুনজরে দেখে না তার প্রধান কারণ সকলেই নিজ নিজ কাজ-কর্ম, সংসারধর্ম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। কঠিন দিনকাল, নানা ঝামেলায় মানুষ নিত্য নাকানি চুবুনি খেয়ে মরছে। মন মেজাজ কারোই ভালো নেই। এরই মধ্যে দেখছে এক দল জোয়ান ছোকরা দিনমান আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে—বিনা কাজে, বিনা ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে আর ক'দিন বাদে বাদে একটা হুজুগ তুলে চাঁদার নামে লোকের কাছ থেকে ট্যাক্সো আদায় করছে। আমরা খেটে মরব আর অপরে আরামে থাকবে, ফুর্তি করে বেড়াবে—এটা কেউ পছন্দ করে না, সেইজন্যই এরা সকলের চক্ষুশূল। কিন্তু লোকে জানেন যে এরা আরামে নেই। এরাও কাজ করতেই চায় কিন্তু কাজ তাদের দিচ্ছে কে? এদের অবস্থাটা হল পানিমে মীন পিয়াসী—সংসারে কাজের নেই অন্ত কিন্তু এদের বেলায় একরত্তি কাজ জুটছে না। নিষ্কর্মার জীবন যে লজ্জাকর সে তারা খুব ভালো করেই জানে, কাজেই মনে এদের শান্তি নেই। এই তো সবে যৌবনে পা দিয়েছে—সাধ আহ্লাদ এদেরও মনে আছে কিন্তু সাধ মেটাবে কি দায়ে? হাতে কাজ নেই, পকেটে পয়সা নেই, কাজেই মনের সাধ মনেই থেকে যায়। ফলে কর্মব্যস্তদের যেমন সব মেজাজ তিরিক্ষি, এই কর্মহীনদেরও তেমনি। কথাবার্তায় রুক্ষ, ভাবে-ভঙ্গিতে উগ্র। যারা কাজ ভালবাসে তারা বলে, কাজের জন্য হাত পা নিসপিস করে। তবেই দেখুন, যে কাজ চায় কিন্তু হাতে যার কাজ নেই তার নিসপিস করা হাত-পা দৈবাৎ কারো গায়ে পিঠে লেগে যেতেও বা পারে। কিন্তু লোকে তো অত কথা ভাবে না; বলে, এরা যেখানে সেখানে হাঙ্গামা বাঁধায় যখন তখন মারধর শুরু করে। এও এক অদ্ভুত লজিক বলতে হবে—শত শত লোক নিয়ে যদি বড়রকমের কোন হাঙ্গামা বাঁধানো যায় তাহলে জননায়ক আখ্যা পাওয়া যেতে পারে আর দু পাঁচজনকে নিয়ে যদি কোন হাঙ্গামা বাঁধে তাহলে তাদের নাম হয় মস্তান। দেখা যাচ্ছে বড় আকারে কিছু করতে পারলেই সব দোষ কেটে যায়।

আসল কথাটা হল, মস্তানরা সকলেই বেকার সন্তান। বেকারকে মুখের উপর বেকার বলাই যথেষ্ট আপত্তিকর, মস্তান বলাটা তারও বাড়া—মরার উপরে খাঁড়ার ঘা। এ সব যুবকদের ধরন ধারণ বড় শোভন নয় বলে যাঁরা অভিযোগ করেন তাঁদের বলব ওঁদের দেওয়া মস্তান নামটাই কি শুনতে বড় শোভন?

লোকে বলে নামে রুচি, জীবে দয়া—কিন্তু মস্তান নামটির মধ্যে রুচিও নেই, দয়ামায়াও নেই। নইলে মানুষের নাম নিয়ে অযথা রসিকতা করতে লোকের একটু বাধত। নামজাদা মানুষের নামের কোন প্রয়োজনই হয় না। মহাত্মাজী, পণ্ডিতজী, স্বামীজী ইত্যাদি বললে নামোল্লেখ ছাড়াই নামকীর্তন হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের ন্যায় অজ্ঞাতকুলশীলদের নামটাই একমাত্র সম্বল। অজ্ঞাতরা এমনিতেই অবজ্ঞাত। তার উপরে বেচারীদের নিজ নিজ নাম চেপে দিয়ে সকলকে একাকার করে থোকে মস্তান নাম দিয়ে ছেড়ে দেওয়াটা কি একটা শিষ্টাচারসম্মত ব্যাপার? নাম ডোবানো আর কাকে বলে! নিজের নাম না হয় নিজে ডোবাতে পারি কিন্তু অপরকে ডোবাতে দেব কেন?

বলতে বাধা নেই, বয়সকালে আমিও মস্তান ছিলাম। মস্তানদের যে সব দোষের কথা আপনারা বলে থাকেন সে-সব দোষ আমারও ছিল। কলেজ ছাড়বার পর সেটা অবশ্য আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। এদের মতো আমিও দীর্ঘদিন বেকার ছিলাম। চায়ের দোকানে দিনমান আড্ডা দিয়েছি, ঝগড়া করেছি, মেজাজ বিগড়িয়েছে, হাতাহাতি হয়েছে। এখন ভদ্র সমাজে আমি অতি শিষ্ট শান্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলে পরিচিত কিন্তু শুনলে অবাক হবেন, একবার মারামারি করে আমি ফৌজদারি মামলায়ও পড়েছিলাম। অথচ দেখুন এত সব করা সত্ত্বেও কেউ আমাকে বা আমার সমগোত্রীয়দের কাউকেই মস্তান আখ্যা দেয় নি। বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অন্যবিধ গালমন্দ দিয়ে থাকতে পারে কিন্তু তাতে আমাদের মানহানি হয়নি কারণ আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে কিছু বলে নি; যা বলবার আড়ালে বলেছে। তখনকার দিনে গালাগালের ব্যাপারেও লোকের রুচি বোধ ছিল। এখন সে বালাই নেই। শুনিয়ে তো বলেই তার উপরে আবার ছাপার অক্ষরেও বলে। অর্থাৎ গালাগালটা কানেও শুনতে হবে চোখেও দেখতে হবে। বাংলা কাগজে দিশী মতে বলে মস্তান, ইংরেজি কাগজে বিলিতি মতে বলে হুড্‌লাম, উহু বিলিতি বলাটাও আবার ভুল হল, হুড্‌লাম কথাটা ইয়াঙ্কী।

এদের বিরুদ্ধে আরেক অভিযোগ, এরা পলিটিক্স করে বেড়ায়। তা করুক না, পলিটিক্স করাটা কি নিন্দের ব্যাপার? আমাদের সময়ে আমরাও করেছি, জেলেও গিয়েছি। দেশ যখন স্বাধীন হয় নি তখন জেলে যাওয়ার মান মর্যাদা ছিল কত! এক আধ, বছর যিনি জেলে কাটিয়ে এসেছেন তিনি লোকচক্ষে রীতিমতো হিরো বনে যেতেন। ব্রিটিশ আমলের প্রথমার্ধে বিলাতফেরতের যতখানি কদর ছিল ইংরেজ শাসনের অন্তিম পর্বে জেল ফেরতদের কদর তাকেও

ছাড়িয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার পরে সব জিনিসেরই অবমূল্যায়ন ঘটেছে। এখন জেলে যাওয়া নিতান্তই শ্রীঘর বাস। দেশের কাজে জেল খাটলেও লোকে বলে মস্তানি করতে গিয়ে জেলখানার ঘানি টেনে এসেছে।

স্বাধীন হবার পরে স্বাধীনতারই মূল্যহানি হয়েছে সব চাইতে বেশি। তার প্রমাণ, স্বেচ্ছায় করলে আগে যাদের বলত স্বেচ্ছাসেবী, এখন তাদের বলে স্বেচ্ছাচারী। বর্তমানে আরেক ধাপ নেমে এদেরই নাম হয়েছে মস্তান। আমাদের সময়ে কথাটার চল ছিল না, তখন ভাষায় অধিকতর ভদ্রস্থতা ছিল। কালোবাজারী, চোরাকারবারী, মজুতদার, মস্তান ইত্যাদি নাম এবং নামধারী জীব আমাদের স্বাধীনতার বাই-প্রডাক্ট বলা যেতে পারে।

একটু আগেই এদের দিশী (মস্তান) এবং ইয়াঙ্কী (হুড্‌লাম)—এই দুই নামে কথা বলছিলাম। আসলে কিন্তু মস্তান কথাটা বঙ্গজ নয়, এমন কি দেশজই নয়। কথাটা এসেছে ইরাক ইরান দেশ থেকে অর্থাৎ ফার্সি ভাষা থেকে। এও এক মজার ব্যাপার ভাষা যে কোথা থেকে কোথায় ভেসে আসে! আলো বাতাসের মতো অবাধ তার গতি। মানুষের চাইতে ভাষার গতিশীলতা ঢের বেশি। কোথায় বা ইংরেজ দেশ, কোথায় বা ইংরেজ কিন্তু আমাদের গ্রামে গঞ্জে, যেখানে ইংরেজ কখনো দেখা যায় নি, সেখানেও ইংরেজদের ভাষা এসে পৌঁছেচে। ভাষা সর্বত্রগামী; শিক্ষিত পরিবারেও ইংরেজ অতিথির আনা-গোনা অতি বিরল, এলেও অভ্যর্থনা বৈঠকখানায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইংরেজী ভাষার গতিবিধি অন্দরমহলে বিস্তৃত। ইংরেজি ভাষা অল্পবিস্তর স্ত্রী পুরুষ সকলের মুখে। আমাদের খাট খাটিয়া তক্তপোশের সঙ্গে চেয়ার টেবিল সোফা দিব্যি গা ঘেঁসে অবস্থান করছে। আমাদের থালা বাসনের সঙ্গে কাপ ডিস সসার কেমন সহজে ভাব সাব করে নিয়েছে। অন্যান্য ভাষারও গতিবিধি অবাধ। আমাদের দেশে কথা আছে—ঘর হতে আঙ্গিনা বিদেশ। কথাটা বলতে গেলে অক্ষরে অক্ষরে সত্য কারণ আঙ্গিনা অবধিও যেতে হয় না, ঘর থেকে এক পা বেরিয়ে বারান্দায় এলেই আমরা পর্তুগালে পদার্পণ করি। আরবী ফার্সি শব্দের ব্যবহার উঠতে বসতে। অন্যান্য অনেক ব্যাপারে যতই আমাদের খুঁতখুঁতুনি থাক না কেন, ভাষার ব্যবহারে ছোঁয়াছুঁয়ির কোন প্রশ্ন নেই। যাবনী ভাষার ছোঁয়াচে আমাদের রান্নাঘর অপবিত্র হয় না, দেবমন্দিরও নয়। অবশ্য আমাদের পার্লামেন্টের কথা আলাদা, সেখানে হিন্দুয়ানীকে ছাড়িয়ে গিয়েছে হিন্দীয়ানী। উৎকট হিন্দীবাদীদের মতে ইংরেজি ভাষা অস্পৃশ্য অর্থাৎ অকথ্য এবং অশ্রাব্য।

মানুষের চাইতে মানুষের ভাষা ঢের বেশি মিশুক প্রকৃতির। চেনা অচেনার ধার ধারে না, যে একটু মুখের আদর দেখাবে তার কাছেই যাবো। মুখের আদরকে আমরা মূল্য দিই না, বলি মুখ দেখানো আদর। ভাষা কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট সে মুখের আদরই চায়। গুণী মানুষেরা ওর গুণের মর্যাদা বোঝে, কিন্তু একটু সরস প্রকৃতির বলে মতলবী মানুষেরা ওর উপরে যথেষ্ট জবরদস্তি করে। ও বলতে চায় এক কথা, মতলবীরা ওকে দিয়ে বলায় অন্য কথা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যেমন ভালো মন্দ দু-ই মিশে আছে ভাষার বেলায় দেখা যায় অনেক শব্দকেই ভালো মন্দ দু অর্থেই ব্যবহার করা চলে। কিন্তু কুচক্রীদের চক্রান্তে ভাল অর্থটা অনেক সময় একেবারেই চাপা পড়ে যায়। এ ভাবে অনেক ভালো ভালো কথারও অধঃপতন ঘটেছে। মস্তান কথাটিকেও এরই দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমি ভাষাতত্ত্বের প্রবন্ধ লিখতে বসিনি তাহলেও মস্তান কথাটার মূলগত অর্থ সম্পর্কে দু একটি কথা এখানে উল্লেখ করছি।

আগেই বলেছি মস্তান কথাটি এসেছে ফার্সি থেকে। ফার্সি ভাষায় এর অর্থ মদ্যাসক্ত নেশাগ্রস্ত। মদ্য পান সভ্য ভব্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গেই করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের কেউ মস্তান বা মদ্যপ বলে সম্বোধন করে না। সেক্ষেত্রে এক শ্রেণীর ছেলে ছোকরাকে নির্বিচারে মস্তান আখ্যা দেওয়াটা কি খুব ন্যায়সঙ্গত ব্যাপার হয়েছে? তা ছাড়া প্রত্যেক কথারই ব্যঞ্জনা বলে একটা জিনিস আছে। ঐ ব্যঞ্জনার মধ্যেই কথাটির ব্যবহারিক অর্থ ছাড়িয়ে সামগ্রিক রূপটি পাওয়া যায়, নতুবা শব্দটি হয়ে যায় একপেশে। মনে রাখতে হবে যে আপাতদৃষ্টিতে যা এক, অন্তর্দৃষ্টিতে তা আর অর্থাৎ আটপৌরে অর্থে এক পোশাকী অর্থে আর—আমরা যাকে বলি আলংকারিক প্রয়োগ। সুফি সম্প্রদায়ের কবিরা মস্তান কথাটিকে কদর্থে গ্রহণ না করে সদর্থে গ্রহণ করেছেন। মস্তান বলতে তাঁরা বুঝেছেন—যে ব্যক্তি কোন বিষয় নিয়ে একেবারে মশগুল হয়ে আছেন। সৎ চিন্তায়, ঈশ্বর আরাধনায় যে মানুষ বিভোর তাঁরা তাকেই বলেছেন মস্তান কারণ এটাও এক ধরনের নেশা। আমাদের মধ্যযুগীয় সন্তরাও শব্দটিকে ঐ অর্থেই ব্যবহার করেছেন—রসনা রটি যেহি লাগিগে, চাখি ভয়ো মস্তান—রসনায় নামটি যেই উচ্চারিত হল অমনি তার স্বাদে আমি মস্তান অর্থাৎ বিভোর হলাম। দেখুন তো কেমন সুন্দর কথা। মস্তান হতে তাহলে দোষটা কোথায়?

আসল কথা দোষ মস্তানদের নয়, দোষ আমাদের। আমরা কদর্থ পেলে

কোন কথাকেই সদর্থে গ্রহণ করি না। আমাদের অভিধান মতে দেখা যায় আমরা এর মূল অর্থের উপরে আরেক পোঁচ কালি মাখিয়ে মস্তানকে শুধুই নেশাখোর বলিনি, বলেছি কামাতুর। অবশ্য আমাদের সাহিত্যে কথাটির ব্যবহার ছিল খুবই বিরল। ভারতচন্দ্রে আছে—'কুটিনী গস্তানী, বড় যে মস্তানী / উভে উভে দিব শূলে'। কবি এক অমার্জনীয় অপরাধ হিসাবে দেখেছে এবং অপরাধীদের শূলে চড়িয়ে ছেড়েছেন। তাহলেও বলব—রায় গুণাকরের মুখে যে কথা মানায়, রাম শ্যামের মুখে তা মানাবে কেন? আর লোক, বিশেষ করে মস্তানরা তা বরদাস্তই বা করবে কেন? আর এইমাত্র দেখেছেন তো মূলগত অর্থে মস্তান কথাটা মস্ত বড় একটা কলঙ্কের কথা নয়। যে কোন একটা জিনিস নিয়ে একটু অতিমাত্রায় মেতে থাকলেই একজনকে মস্তান বলা যেতে পারে। সেটা যেমন মদ গাঁজার কল্যাণে হতে পারে তেমনি আবার নির্দোষ আমোদ প্রমোদেও হতে পারে। আর সত্যি বলতে কি একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সকলেই একটা না একটা কিছু নিয়ে মেতে আছেন। কেউ গান বাজনা, কেউ সিনেমা থিয়েটার, কেউ বা খেলাধুলোর নেশায় মত্ত। ব্যবসাদাররা সারাক্ষণ টাকা পাই-এর হিসাব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, বিদ্বান পণ্ডিতরা পুঁথির পাতায় নিবিষ্ট চিত্ত। এঁরা কি মস্তান নন? আর এই যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যাঁদের দিনরাত পলিটিক্স ছাড়া অন্য চিন্তা নেই, কই তাঁদেরও তো কেউ মস্তান বলে না। তবেই দেখুন বলতে গেলে দেশশুদ্ধু সবাই মস্তান কিন্তু মজার কথা এই যে বেছে যাদের মস্তান বলা হচ্ছে শুধু তারাই প্রকৃত অর্থে মস্তান নয় কারণ তারা কোন কিছুই নিয়েই মেতে নেই। কাজকর্মই নেই, কি নিয়ে মেতে থাকবে? বরং উল্টো—ওরা অস্থির, চঞ্চল, কোন কিছুতেই ওদের মন নেই। মেতে থাকবার মতো একটা কিছু পেলে তো ওরা বর্তে যায়। কালীপুজো দুগ্‌গো পুজোয় একটু হই হল্লা করে, তাও লোকে ভালো চোখে দেখে না। সব তাতেই দোষ ধরে।

লক্ষ করবার বিষয় যে এরা সমাজের ঠিক স্পেসিফিকেশান অনুযায়ী তৈরী হয় নি। এদের অনেকেরই বিদ্যে নেই কিন্তু বুদ্ধি আছে। সমাজ বলে—আমি বুদ্ধিমান চাইনে, ডিগ্রীধারী বোকা মানুষ হলেই আমার কাজ চলে যাবে। বুদ্ধিমানদের সহজে বাগ মানানো যায় না। কাজেই বুদ্ধির 'দোষে' এরা অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। বিদ্যা ফলাতে পারে না বলে মাতব্বরি করতে পারে না, চাকরি নেই তাই ঘুষ নিতে পারে না, ব্যবসা করে না, কাজেই কালোবাজারি করতে পারে না। পলিটিক্সের পলিমাটিতে নানা রকম ফসল ফলে,

এরা তারও ভাগ পায় না। সমাজের সঙ্গে এই নিয়ে ওদের বিরোধ। এজন্যে মস্তানদের আরেক নাম হয়েছে অ্যান্টি-সোশ্যাল বা সমাজবিরোধী অর্থাৎ কিনা আভিধানিক অর্থে যে মানুষ 'নেশাখোর' তাকে আমরা সমাজবিরোধী বলছি কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ঘুষখোর তাকে সমাজপতির আসনে বসাতেও দ্বিধা বোধ করি না।

সকলেই জানেন যে পশ্চিম দেশেও এক শ্রেণীর যুবক সমাজের সঙ্গে নিজেদের ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছে না। কিন্তু তাই বলে তাদের অ্যান্টি-সোশ্যাল আখ্যা দেওযা হয়নি তাদের বলেছে অ্যাঙরি ইয়ং মেন। দেখুন তো কেমন সুন্দর নামটি। ওদের তারা মস্তানের মতো শস্তা করে দেখেনি, যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখেছে। তাদের নিযে সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে। সমাজকেই দোষী সাব্যস্ত করছে, ওদের নয়। আমাদের সবই উল্টো, যারা ওদের সব রকমে বঞ্চিত করে রেখেছে তারাই ফিরে চোখ রাঙায়। অপর দিকে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এদের তোয়াজ করে নানা কাজ হাসিল করে নেয়। নানাবিধ লাভের লোভ দেখায়, অবৈধ প্রশ্রয় দেয। ফলে স্বীকার করতেই হবে এদেরও একটু বাড় বাড়েনি এমন নয। কিন্তু মজার কথাটা হল, যাঁরা বাড়িয়েছেন তাঁরাই ফিরে বদনাম দিচ্ছেন। আস্কারা দিযে যাঁরা মস্তান তৈরি করেছেন তারাই ক্ষমতাসীন হলে শাসিয়ে বলে—মস্তানি করা চলবে না। তাহলেই দেখুন—যার লাগি চুরি করি সে-ই বলে চোর—এর চাইতে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে।

এতো গেল এদের দুঃখের কথা, কিন্তু সরকারের কপালেও দুঃখ আছে। এক শ্রেণীর লোককে একটা বিশেষ নামে চিহ্নিত করতে গেলে সেটা তার গায়ে পাকা হয়ে লেগে যায এবং ঐ থেকেই ক্রমে একটি বিশেষ সম্প্রদাযের উদ্ভব হয়। গান্ধীজী হরিজন নামটির জন্মদাতা এবং সেই সঙ্গে তিনি একটি সম্প্রদায়েরও সৃষ্টিকর্তা। উদ্দেশ্যটা মহৎ হলেও ফলটা শেষ পর্যন্ত ভালো হয না। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজরা ডিপ্রেসড্ ক্লাশ বা অনুন্নত শ্রেণী, সিডিউলড কাস্ট বা তপশিলী জাতি ইত্যাদি সৃষ্টি করে গিয়েছে। এদের জন্যে কিছু বিধিবদ্ধ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থাও ব্রিটিশ সরকার করে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতার আমলে সে সব ব্যবস্থা অবশ্যই অক্ষুণ্ণ আছে, উপরন্তু তাদের দাবিদাওয়া অনেক বেড়েছে এবং সুযোগ সুবিধাগুলোকে তারা চিরস্থাযী বন্দোবস্ত হিসাবে কায়েম করতে চাইছে। অর্থাৎ অনুন্নতরা উন্নত হবার জন্যে আদৌ ব্যস্ত নয় কারণ উন্নতি হলেই যে সব অনুগ্রহ (সুযোগ সুবিধা না বলে অনুগ্রহ বা আনুকূল্য বলাই ভালো) তারা

ভোগ করে আসছে সে সব লোপ পাবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে অনুগ্রহ বা অনুকম্পা দিয়ে মানুষের উন্নতি বিধান কখনোই সম্ভব নয়। তাছাড়া অনুন্নত কথাটার প্রচলিত সংজ্ঞাটা বদল করা প্রয়োজন। প্রকৃত অনুন্নত শ্রেণী জন্মগত বা বর্ণগত নয়। সমাজের যে অংশ শিক্ষা এবং সম্বলের অভাবে দুর্বল সে অংশই অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত। তথাকথিত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ সব কথা এ কারণে বলছি যে কোন শ্রেণীর মানুষকে একটা বিশেষ নামে নামাঙ্কিত করতে গেলেই একটি নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় আর তারা নানা রকম সুযোগ সুবিধা দাবি করতে থাকে। যেমন দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সমাজে মস্তান নামে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হবে এবং তাদের তরফ থেকেও নানা দাবিদাওয়া উত্থাপিত হতে থাকবে। এই যে বেকারদের জন্যে পেনসানের ব্যবস্থা হয়েছে তাতে লোকে এরই মধ্যে বলতে শুরু করেছে যে মস্তানদেরই পেনসান দিয়ে পোষণ করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এটা সরকারের পক্ষে সম্মানের কথা নয়, মস্তানদের পক্ষে তো নয়ই। সরকারকে বলবে, মস্তানদের হাতে রাখবার জন্যে এঁরা তাদের ঘুষ দিচ্ছেন; আর মস্তানদের বলবে, জোয়ান জোয়ান সব ছেলেরা কিনা সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে আছে। তা লোকে যাই বলুক নিজে এক সময়ে মস্তান ছিলুম বলেই সরকারের চাইতে মস্তানদের উপরেই আমার আস্থা এখনও কিঞ্চিৎ বেশি। কারণ আমার বিশ্বাস মস্তানদের আর কিছু না থাক্ আত্মসম্মান বোধটুকু এখনও বজায় আছে। তারা নিশ্চিত বলবে, পার তো একটা কিছু কাজ দাও, খেটে খাব। তোমাদের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকার ভিক্ষা নিতে যাব না। যুবশক্তির প্রতীক—মস্তানদের কাছ থেকে দেশ মস্ত বড় কিছু আশা করে। উঞ্ছবৃত্তি তাদের মানায় না, প্রাণ থাকতে তা করতে যাবেই বা কেন?

———